পুবের মেঘ * দক্ষিণের আকাশ

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬২

প্রকাশক :
সুরেশ দাশ
লেকটাউন,
কলিকাতা-৮৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
মৃণাল রায়

মুদ্রাকর :
বাণীমালা প্রেস
ফাল্গুনী কুমার পাল
৫৬, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

এক

গায়ের ছালি মোটা আট-ন'ফুট উঁচু শাল খুঁটির ওপর দিয়ে টানা ছাউনি নিচু হয়ে এক চালু। খুঁটির সরলরেখায় খুঁটি বসিয়ে, বাটাম কাঁচি কাঠামোর গায়ে গা লাগিয়ে বারোখানা ঘরের ওপর করোগেট টিন চাপানো। ঢেউকাটা টিনের খাঁজে রোদ বসে। বৃষ্টি গড়ায়।

যেহেতু নিম্ন দক্ষিণবঙ্গ অবতল, ভারতবর্ষের গঙ্গা জলস্রোত নিয়ে পাহাড় সমতল চিরে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান থেকে দ্বিখণ্ড হয়ে ভাগীরথী নামে হুগলির মাটি ছোঁয়। নামান্তরিত হয়। সে নামে জলপ্রবাহ ক্রমে এগোয় এ-বঙ্গের দক্ষিণ অবতলে। গঙ্গা মিষ্টি জল হারায়। ক্রমে তার মাতৃগর্ভজ শরীর বদলায়। ছন্দ পাল্টায়। যতোই কলকাতা পাশ কাটিয়ে এগোয়, নোনা জলের মোহনা তার শরীরে সেঁধিয়ে নারী সুষমা অপহরণ করে। হয়ে ওঠে মধ্য বয়সের বিষয়ী চঞ্চল খিটখিটে রমণী। এই হুগলি রমণীকে বাগে আনতেই উঁচু করে বাঁধ। অববাহিকার ডাইনে-বাঁয়ে উঁচু বাঁধ।

বামপার্শ্বের উঁচু বাঁধ, সেচ বিভাগের পরিভাষায় 'এমব্যাঙ্কমেণ্ট' নিয়ে কাহিনী ক্রমশ বিস্তার পাবে। তারই প্রাক্-কথন হিসেবে আরও কয়েকটি অতীত খণ্ডাংশ উপস্থাপন করা হলো।

দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলাংশে হাজার হাজার বিঘে জমি প্লট বা লটে চিহ্নিত করে বন্দোবস্ত মূলে কলকাতার নামী উকিল-ব্যারিস্টার, কাঁথি হাওড়ার জোতদার কিংবা মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী ও সুন্দরবন এলাকায় চক, লট জমায় নিচ্ছেন খোদ ব্রিটিশ সাহেবদের কাছ থেকে—সেচ দপ্তরের বাঁধটাও জরুরি হয়ে পড়ে। নদীর ঘাটে-ঘাটে গঞ্জ। জলযান তো একমাত্র পরিবহন। বোট, ডিঙি, স্টিমার। গায়ে বড় বড় চাকা লাগানো হোরমিলার কোম্পানির স্টিমার। অবিভক্ত বাংলার আমলে এই স্টিমার তো কলকাতা থেকে সুন্দরবনের নদী বেয়ে এখনকার বাংলাদেশ গৌহাটিও যেতো!

সাল পর্বের দিক থেকে কাহিনীর চরিত্র উনিশশো চল্লিশ দশকের। এবং দক্ষিণবঙ্গের হুগলি অববাহিকা সংলগ্ন একটি অখ্যাত জনপদের বসবাসী মানুষ। মানুষটি মাত্র ন'বছর বয়সী অপরিণত কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। পাঁচ-ছ'বছর যাপন করে অপুষ্ট একটি পুত্রসন্তান সংসারকে দেয়। এর বছর তিনেক পরে আর একটি পুত্রসন্তান।

সদয়কুমারের ফর্সা চেহারা। লম্বা নাসিকা আকোমর সাদা উপবীত। গায়ের নামাবলীতে কয়েকশো বার একই পদচিহ্ন আঁকা আর চারটি শব্দ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাঠের ডাইসে ছাপা—হরে কৃষ্ণ হরে রাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। গলায় লাল চেলিতে গিঁট বাঁধা শালগ্রাম শিলা। আলগা করে ঝোলানো। খালি পায়ে পথের ধুলো উড়িয়ে সঙ্গে একখানা চার হাতি জ্যালজেলে গামছা।

গামছায় আতপচাল, সিদ্ধচাল, ফল-পাকুড়, সিদের ডাল, লংকা, সরষের তেল —এগুলো বাঁধা-ছাদা করে আনার ব্যবস্থা। সদয় মুখুজ্জের দুই সন্তান, যুবতী স্ত্রী, বৃদ্ধ পিতা-মাতা তখন গৃহে অপেক্ষমান। তণ্ডুল কাতর।

উনুনের কাঠকুটো তৈরি। তৈরি উদর জুড়ে ক্ষুধা। শিশু দুটির কচি পেটে খিদের প্রবাহ। থেকে থেকে মাকে জাপটে ধরে বলে, মা-আ খা বো-ও-ও।

মা দাওয়ায় বসে। সাজানো জ্বালুন কুটোর পাশে মাটি থাপড়ে দুই শিশুকে কোলে আগলে রাস্তার দিকে তাকায়। রাস্তা এঁকেবেঁকে মাঠের দিকে। তারপর হারিয়ে যায় সবুজ রোয়ায় আবাদি মাঠে। দূরে দূরে দ্বীপের মতো ছোট-বড় গাছপালা ঘেরা। ঘর-সংসার নিয়ে মানুষের বসবাস। ওই মানুষগুলোর মধ্যে একশো আট ঘর যজমানের দু-চার ঘরই তো!

নাদুস গড়ন কালো বছর তিনেকের বাচ্চাটা বায়না ধরে, মা—আ খিদে—এ।

কোলে বুক ঠেলে ঠেলে মায়ের স্তন খোঁজে শিশুটা। মা আঁচল সরিয়ে বাচ্চাটার কচি গালে নরম বুক গুঁজে দেয়। বড় বাচ্চাটা ভাইয়ের খাদ্যে জুল-জুল করে তাকায়। পাঁচ বছরের শিশু মায়ের আর এক বুকে খাদ্য খোঁজে। অল্পবয়সী মা আবাদি মাঠ ঘাটের মতো এলিয়ে ধরিত্রী হয়ে যায়।

দুই শিশু খাদ্য খোঁজে। খাদ্য শোষে। মা—যুবতী মা ক্ষুধার্ত হয়েও শিশুদের খাদ্য বিলোয়। নিজের দেহ নিঃসারিত পানীয় খাদ্য। বুকের মাংসে দাঁত বসে। স্নায়ুতে যাতনা। পেটের আধারে উসকানো খিদে।

সকাল থেকে পূর্ণিমা তিথি। বাঁধা বন্দোবস্ত অনুযায়ী সদয় মুখুজ্জে যজমান হালদারদের গেরস্তবাড়ি হাজির। বাড়ির কর্তা সদর আটকে বলে, চাল-আটার বড় টানাটানি। সত্যপীরের সিন্নি থাক গো বাবাঠাকুর—

চমকে ওঠে সদয়কুমার! ভাদ্রের চড়া রোদে শুকিয়ে এতো মাঠ এতো পথ ভেঙেছে! গলায় লালা টানে। জলাভাব শরীরে। অভাব যুক্তিসঙ্গত উপায়ের। তবুও বলে, সে কী! অমঙ্গল হবে যে—

সদর আগলে দাঁড়ানো মধ্যবয়সী হালদারবাবু বাবা সত্যনারায়ণপীরের উদ্দেশে জোড়হাত কপালে ছুঁয়ে প্রণাম জানায়, মাসে মাসে আর পারি কই? এবার তিন মাসান্তর প্রথম পূর্ণিমায় গুছিয়ে-গাছিয়ে পুজো দেবো—। বাপ-ঠাকুর তখন এসো। এই ব্যবস্থা বলা রইলো—

সদর দরজার ডানদিকে বস্তা সেলাইয়ের মোটা গুনছুঁচ। ক'খানা চটের বস্তা এলোমেলো পড়ে। মাঝরাত অবধি দু'প্যালি অর্থাৎ পাঁচ সোর ধামা পরিমাপে চাল বোঝাই হয়ে কয়েকমন চালের বস্তা সাজানো। মাথা মুটেয় সোজা গাঙ পাড়ে ইয়াকুব বেগ সাহেবের গাদা বোট বোঝাই হয়ে বিড়লাপুরের জুটমিলে চালান গেছে। চড়া দাম। সুতরাং দরজা আগলে দাঁড়ানো জরুরি। তাই হালদারবাবুর হঠাৎ মনে হয়, এতোদিন সিন্নির জন্যে কেন যে আড়াই সের করে চাল বামুনের পেটে দিলুম···। আড়াইপো দিলে···দেওয়া চালু থাকলে তো বুঝদার মানুষের মতো কাজ হতো! যুদ্ধের বাজারে কিসের না দাম বেড়েছে—?

সদয় মুখুজ্জে হালদারবাবুকে দেখে। উঠোনের বড় গোলার মুখ খোলা। গোলাঘরটার দিকে তাকিয়ে বলে, বাবু—ব্রাহ্মণকে সের দেড়েক চাল দান করো গে—

—দান ? চাল…! আমাদেরই ছেলেপুলে নিয়ে বাঁচাতে টানাটানি…!

গালময় কাঁচা-পাকা দাড়ি ! সাদা ফতুয়া, হাঁটুর ওপর টেনে পরা মোটা খোলের ধুতি। তামাক ছেড়ে বিড়ি, বিড়ি ত্যাগ দিয়ে হঠাৎ সাহেবি সিগারেট। লোকটা এসে দাঁড়াতেই হালদার জানতে চায়, খবর কী গো কাননদা—?

—হবে ? শ'ওয়ালেশ রেট বাড়িয়েছে—

একেবারে দুঃস্থ কুল ব্রাহ্মণের সামনে চালের দরাদরি ? ইস্পাহানির দালাল তো বিজয় কাঞ্জির চল্লিশ মণ দুধের সর চাল বোঝাই দিলো শেষ রাতে। সুতরাং কুল ব্রাহ্মণকে না সরালে যে কথা হচ্ছে না। হাতের ইঙ্গিতে থামতে বলে কাননকে। কানন ফতুয়ার পকেটে হাত রাখতেই সিগারেট প্যাকেট মুঠোয়। ব্রিটিশের পারমিটপ্রাপ্ত চাল ক্রেতা—অতো বড় কোম্পানির দালাল। হালদার-বাবুর কাছে মর্যাদা পেতে নিজেকে বেশ তুখোড় বানিয়ে তোলে কানন, জাপানিরা তো এগিয়ে আসতেছে গো—

—কোথায় ? কলকাতায় ? ছেলেটা কাজ করে কলকাতার কোম্পানিতে…, বলতে বলতে চড়া দামে চাল বেচে বেশ নগদ অর্থ কামিয়েও কেমন ঠাণ্ডা মেরে যায়। রাতের আকাশে গুম্ গুম্ শব্দ হয়। আকাশের পাখিগুলো ঘুমোয় গাছে পালায়। মানুষের তৈরি আকাশ পাখিগুলো ধাতব ডানা মেলে জেগে জেগে টহল মারে, জো খোঁজে মানুষকেই মারতে। চট্টগ্রাম থেকে গাঙ সমুদ্র টপকে কলকাতার আকাশে…।

সদয় মুখুজ্জে ঘরে কটা অভুক্ত প্রাণী রেখে এলেও জানতে চায়, ও কাননবাবু—

—বলুন গো ঠাকুরমশাই !

—জাপানিরা কাকে মারবে ? আমাদের, না সাহেবদের ?

শ'ওয়ালেশ ইস্পাহানিরা দালাল ছেড়ে দিয়ে চাল সংগ্রহ করছে। বড়লাট ছোটলাট বাংলার লিগ সরকারের সঙ্গে কোম্পানিদের সম্পর্ক। তাদেরই দালাল হয়ে দুর্বোধ্য আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সামান্য ঘণ্টা নাড়া ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে যে মান যাবে। সেজন্যই গুছোতে একটু সময় নেয়। কাননবাবু বলে,—এই তো পরশু দিন। কোম্পানির অফিসঘর কলকাতায় গেছিলুম। রাতের আগে রাত নেমে যায় কলকাতায়। জানালা দরজা বন্ধ। রাস্তাঘাটের আলো নিভনো—উফ্ কলকাতা যেন আমাদের খালপাড়ের বাবলা-বনের শ্মশান গো। আলো নেই, মানুষ নেই। কতো মানুষ যে ভিখিরি হয়ে গেছে…। সব ফুটপাথে বাবুদের গাড়িবারান্দায়।

হালদারবাবু শুধু শুনে যাচ্ছে। নিজেও একটু সংযোজন করে, আমাদের নুরপুরে ছাউনি গেড়েছে সেনারা। দেউলায় দু-তিনটে গ্রাম উঠিয়ে দিয়েছে ব্রিটিশরা। লালমুখো সাহেব আর কালো কুচকুচে কাফ্রি সোলজার ছাউনি

ফেলেছে—হুঁ, আমার বড় মেয়ে আইবুড়ো ননদকে নিয়ে আমার ঘরে উঠেছে। শালা ঘরছাড়া দেশছাড়া উপোসী সোলজার—তাদের সামনে মেয়েমানুষ বার হতে পারে ?

আচমকা ভয় ঢোকে সদয় মুখুজ্জের বুকে। ঘরে যুবতী বউ দুই বাচ্চা নিয়ে পথ পানে তাকিয়ে। বুড়ো বাপ-মার হেফাজতে একলাই তো। যদি নুরপুরের গাঙে জাহাজ আটকাতে টহল মারতে মারতে এদিকে আসে ? কেমন বিপন্ন বোধ করে যুবক ব্রাহ্মণ। জানতে ইচ্ছে করে, হ্যাঁ কাননবাবু—

—উঁ।

—আমাদের সুভাষ বোস কোথায় গো ?

—সে লোক তো জাপানিদের সঙ্গে ভিড়েছে।

সদয় মুখুজ্জে ঠিক ধরতে পারে না। খানিক পরে শুধোয়, তবে ওই কালো কাফ্রি লালমুখোরা কাদের হয়ে এসেছে গো ?

—সাহেবদের হয়ে। জাপানী জার্মানিকে পেটাবে বলে,—

গুলিয়ে যায় সদয় মুখুজ্জের। তার মধ্যে একটুকরো স্বস্তি। ব্রিটিশ সাহেবরা সাত সাগর তেরো নদী পার হয়ে নিজের দেশের ওপর চেপে বসেছে। জাপান জার্মানি সেও বিদেশ···বিদেশী। তবু ঘর-সংসার নিয়ে বাঁচতে এক বিদেশী হটিয়ে আর এক নতুন বিদেশীর উৎপাত ঠিক মন সয় না। কতো গুলি-গালাজ সাহেবরা তো চালিয়েছে—চালাচ্ছেও। নুন মারছিলো আশু দলুই নীলার গাঙ পাড়ে। সাহেবের পুলিশ এসে গুলি করলো ওইটুকু ছোকরাকে। নীলায় ক'ঘর যজমান তো আছে। বাবা পুজোগুলো সারে, ভাবতে ভাবতে মনটা ফাঁকা হয়ে যায়। সেই ফাঁকা মনে উঁকি মারে খিদেয় কাতর দুটো বাচ্চার মুখ।

দোরগোড়ার দাঁড়িয়ে সদয় মুখুজ্জে মিনতি জানায় হালদারবাবুকে, বাবা কৃষ্ণপদ—অন্তত সেরখানেক সিদ্ধচাল দাও গো—। ঘরে যে বাচ্চা দুটো দানার জন্যে ছটফট করছে—

সংসারের খুঁটিনাটি—সারতে সারতে কানে যায় হালদার-গৃহিণীর। মাথার ঘোমটা খসে পড়ে ঘাড়ে। ফর্সা চোখ-মুখ লম্বা নাসিকায় কুল ব্রাহ্মণের পুত্র সদয়কুমার কেমন ভিখিরির মতো সুর ধরেছে। কতো যত্ন করে পুজোর ঘরে বসানো হয়। থালায় পা ধুইয়ে সে জল দু-এক ফোঁটা চরণামৃতের মতো গালে ফেলে পুণ্যার্জন।

কৃষ্ণপদ হালদার গম্ভীর হয়ে বলে, ঠাকুরমশায়—চাল···চাল তো বরং ..., গেঁট হাতড়ে একটা চকচকে আনি বের করে সদয় মুখুজ্জের হাতে দিয়ে বলে, এটা নিয়ে যাও গো ঠাকুরমশায়।

বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে সদয়কুমার। ভাবে, দরকার তো চালের ? তার বদলে নগদ পয়সা ! আগে চাল-ডাল-নারকেল দিয়ে সিদে সাজাতো। নগদ দক্ষিণে তো মাত্র দু-পয়সা কী চার পয়সা ! কৃষ্ণপদ টাটকা একটা আনি বের করে কী করে ?

হালদার-গৃহিণী ছোট কুনকেয় প'দুয়েক পরিমাণ মোটা মোটা সিদ্ধ চাল দিয়ে বলে, বাবা—এই নিয়ে বাচ্চাদের মুখে দাও—।

দুর্লভ বস্তুর মতো চালটুকু কোচার খুঁটে বেঁধে পেটের কাছে ঢিবি করে ঝুলিয়ে নেয়। বাড়ির পথে পা ফেলে ভাবে, এখন নগদ পয়সার ছড়াছড়ি আবার চালের কাড়াকাড়ি কেন ?

মাঠময় ধান-চারায় সবুজ। পথ চলতে চলতে সরু আলপথ উজিয়ে রাস্তা কমাতে সদয় মুখুজ্জে ধানের মাঠ ফুঁড়ে এগোয়। কখনও কোমরের ঊর্ধ্বাংশ দৃশ্যমান। কখনও কালো মাথা ফর্সা চোখ মুখ দুলে দুলে এগোয়। সরু সরু ধান-চারার সবুজ ডগ হিলমিলিয়ে শিস শোনায়, আমরা বিদেশী মিলিটারির জন্যে জন্মাচ্ছি। তাদের বউ ছেলেমেয়েদের পেটের জন্যে বড় হচ্ছি—। সাহেবের হাত ফিরি হয়ে চলে যাবো লন্ডন আমেরিকা—দূর রণাঙ্গনে।

এ-ভাষা গলায় ঝুলন্ত শালগ্রাম শিলা বোঝে না। বোঝে না শিলাবাহক সদয়কুমার। শুধু ভাবে, পাত্রদের শিবঠাকুরকে চান করাতে হবে। নিত্য পূজার পূজারী—এক সের আতপচালের নৈবেদ্য যে বরাদ্দ। সেটা কমে যেতে···, আশঙ্কায় আর ভাবে না। তবু গোপনে মস্তিষ্কে পাক মারে পরিপূরক শব্দটা।

কাননবাবু সদরের ছাঁচ-ঘেরা দাওয়ায় আসন পেতে বসে বলে, ধানকল থেকে তো লরি লরি চাল যাচ্ছে। আমি শ'ওয়ালেসের জন্যে খুচরো কিনবো। দাও না দু-পাঁচ বস্তা যা হয়—।

—এতো চাল খাচ্ছে কারা ?

—মিলিটারি। কলকাতা। কলকাতার কারখানা। চট যাচ্ছে যুদ্ধে। থালা-বাসন-বিস্কুট সব যাচ্ছে যুদ্ধে। কলকাতায় কতো জাতের যে সাহেব। ডেনিস-মেনিস হল্যান্ড-ইংল্যান্ড—চুল কোঁকড়া ভীম ঘটোৎকচ, কাফ্রি-আফ্রি—সাইরেন বাজনা কী বলবো কৃষ্ণপদদা—

হাঁউমাউ কান্নায় কথার রেশ কেটে যায়। ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে কালী বউ আট বছরের মেয়েটাকে কোলে জাপটে ছুটেছে। পেছনে কানি জড়িয়ে রোগা পটকা বাপ। কৃষ্ণপদকে দেখে চেঁচায়—বাবু, কবিরাজ ঘরে আছে মনে হয় ?

—হ্যাঁ, সকালে দেখেছি—। কী হয়েছে মেয়েটার ?

শ'ওয়ালেশের দালাল কৃষ্ণপদর মুখে হাত চাপা দিয়ে প্রশ্ন ব্যাকুলতা দমায়। কানন ফলতা, নীলা কলকাতা বারবার যাতায়াতে জ্ঞান অর্জন করেছে। এই জ্ঞান, যা যুদ্ধের বাজারে জ্ঞান, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাধানো কালের জ্ঞান। তারই বিনিময়ে কৃষ্ণপদকে শাসায়, দেখছোনি মেয়েটার চেহারা ? ওর পেটে দানা আছে যে রোগের সঙ্গে যুঝবে ? বেশি দরদ দেখালেই ওরা বলে বসবে, এক পালি চাল ধার দাও গো বাবু—। তখন ?

এতোদিন এক পুকুরঘাট, দোলতলা গাজন ডাঙায় দেখা-সাক্ষাতে গোটা গ্রামবাসীর সঙ্গে কথাবার্তা। দুঃসময়ে কথা বলা মানেই আপদ টেনে আনা ! এমন করে তো ভাবেনি। ভাবা হয়নি। কামান-বারুদে আকাশময় বিষ চরে

বেড়াচ্ছে যুদ্ধের জায়গাগুলোয়। সে বিষ বাতাস বয় পাশাপাশি মানুষদেরও নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে।

কৃষ্ণপদ কাননকে তারিফ করে, এজন্যই শহর বাজারে না গেলে হালচাল বোঝা যায়? তোমার কথা ঠিক, ঠিকই—

শান বাঁধিয়ে চারপাশ আলগা দাওয়া। মাথায় খিলানের গম্বুজ-ডগায় কবেকার ত্রিশূলটা এখনও ঝড়-জলে অক্ষত। মোটা দেওয়ালের গায়ে চারকোণা পাথর কুঁদে ধ্যানস্থ শিব। সামনে পুরনো আমলের মোটা চৌকাঠের গায়ে কালপ্রবাহ কয়েক দশক আঁচড়ে খুবলে অতিক্রান্ত! ভারি কাঠের পাল্লায় সিঁদুরে ওঁ লেখাটা ক্রমশ বিবর্ণ। সদয় আলগা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে অবাক! চাবি খোলেনি পাত্রবাবুরা। কাঠের গরাদের নড়বড়ে পাল্লার জানালায় হাত দিতেই ভেতরটা দৃশ্যমান। কালো পাথরের শিবলিঙ্গ স্নান করে পরিচ্ছন্ন। গায়ে ফুল-চন্দন ছড়ানো। সামনের রেকাবিতে মাত্র এক চিমটি আতপ চাল। চমকে বুকের মধ্যে শত কীটের সমবেত দংশন। চুপচাপ কোনো দেবদেহ নয়, দেহের একটি অঙ্গ দেখে আর ভাবে, হেলে চাষা শিব—তারই চালের এই দশা…।

আকাশ বাজিয়ে মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে যায় বোঁ-বোঁ শব্দ। যেন কয়েকটা পতিঙ্গা ঘুড়ি। বোঁ-বোঁ শব্দটা প্রতিদিন কার গাঙ পাড়ে, খাল পাড়ে, আবাদি মাঠের ওপরকার আকাশে। সদয়কুমার মন্দির চৌপাশের উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হাত আড়ালে রোদ বাঁচিয়ে আকাশে নজর করে। কাদের উড়ো জাহাজ! ব্রিটিশের, না জার্মান জাপানের…!

মহাবিস্ময়ে তাকায় সদয়কুমার। বিস্তারিত আকাশ। মস্ত পৃথিবী আগলে যে মহাকাশ, সব ভুলে খানিক তাকিয়ে থাকে।

দুই

মাঠময় ধান-চারা ভরাট হয়ে সবুজ ডগ, আশ্বিনের রোদ লেগে ধারালো। হাওয়ার ঝলকে দোল মেরে সবুজ ঢেউ বয়ে যায় অনেক দূর। আকাশ মেঘ গাঁয়ের ওপারে হুগলির জলপ্রবাহ। চর কিনারে মাছ খুঁটে বকগুলো আকাশে ওড়ে। সাদা বকের ঝাঁক ধান-চারার সবুজ প্রচ্ছদে রেখা কেটে উধাও।

চালকটা সিলে বেটে জল মিশিয়ে আগুনে সিদ্ধ করে যুবতী ব্রাহ্মণপত্নী। পুজোয় পাওয়া ক'খানা বাতাসা দিতেই মিষ্টি স্বাদ। বাটি ভর্তি ধরে দেয় মা জবারানী। এক সাপটা খেয়ে পেটের খোলে খানিক প্রলেপ। বাচ্চা দুটো এবার আঙুল চাটে। বড় মহার্ঘ খাদ্যকণা।

জবারানী বাচ্চাদের খেতে দিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই মাঠ…ধান-চারার সবুজ মাঠ দেখে। তখন মনে হয় জবারানীর, এতো ভালো চাষ। থিকথিকে সবুজ রোয়া। আর ক'দিন পরে গভ্ভ থোড় পেরিয়ে শিস ফুটবে। ধান কাটা হলে মানুষের এতো কষ্ট থাকবেনি…। পেট ভরে নুন ভাত খাবে।

বাচ্চাদের বাটি খালি। বড় বাচ্চা গুড়ে বলে, আর এট্টু—

বর্ষার জল পেয়ে আম-জামরুল-বাঁশ-খিরিশের পাতা ডগমগে। পুকুর-ডোবায় শাপলা-কলমী পাতা বিছিয়ে শীতের গুপ্ত প্রস্তুতি চালায়। টিয়া পাখিগুলো টিনের মটকা ডিঙিয়ে খড় ছাউনি রান্নাশাল পার হয়ে যায়। লাল ঠোঁটে ট্যাঁ-ট্যাঁ ডাকে আকাশ ছিদ্র করে। চেরা লেজে বাতাস ছিঁড়ে নিজস্ব কোটর অভিমুখী। জবারানী বড় বাচ্চাটাকে আর এক হাতা মিষ্টি জাউ বেঁটে দিয়ে টিয়ার ঝাঁক দেখে ভাবে,...ওরা খাদ্য-খাবার পেয়ে তো বেশ আছে...।

আলপথে ডাঁটা ডগে দু-চারখানা কাশফুল। টাটকা তুলির নরম রোমের মতো কেয়ারি। উঁচু চড়ায় ঘন গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল হাওয়ায় নতমস্তকে ব্যাপ্ত শরৎকালকে সমীহ জানায়। টিয়ার ঝাঁকটা টকটকে লাল ঠোঁট সবুজ ডানায় লেজে বাতাস কেটে কাশগুচ্ছের ধবধবে সাদায় গতি কমায়।

খানিক ভরপেট গুড়ে আর ভুঁড়ের। গুড়ে বলে, মা—একটা পাখি দিবি—?

চালবাটার জাউ একবেলায় ফুটিয়ে দুবেলা কাটায় সদয় মুখুজ্জের ক'জনের পরিবার। গোটা পূর্বদেশীয় ভূ-ভাগের আকাশে সূর্য বেয়ে যায়। দিন কাটে। রাত কাটে। তখন জবারানী আর বাচ্চারা, সদয়কুমার ও তার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাবা-মাকে নিয়ে দিনযাপনে হিমসিম। প্রবাহিত দিন-রাতের ধারায় পুকুর উঠোন বাস্তু সংলগ্নতায় বিস্তীর্ণ ক্রম পারম্পর্যে যে ভূ-ভাগ তারই দূরতম পূর্বপ্রান্তে আটই মার্চ উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে রেঙ্গুনে ব্রিটিশ সৈন্য হেরে গেলো জাপানিদের কাছে। মালয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জাপানিদের অধিকারে। ভারত মহাসাগর, দক্ষিণবঙ্গের মাটি ছুঁয়ে বঙ্গোপসাগরে জাপানি নৌবহরের অভিযানে বঙ্গোপসাগরের নোনাজল তোলপাড়। জোয়ারে সেই নোনাজল সাগর মোহনা পেরিয়ে হুগলি বেয়ে কলকাতার হাওড়া ব্রিজের তলা দিয়ে যে কতো দূর বয়ে যায়। ভাটায় আবার প্রত্যাবর্তন।

উনিশশো বিয়াল্লিশের বাইশে মার্চ নয়াদিল্লিতে পোঁছলেন ব্রিটেনের যুদ্ধমন্ত্রী সভার প্রস্তাব-সহ ব্রিটেনের বামপন্থী নেতা স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্। তিনি ব্রিটেনের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ প্রস্তাব রাখলেন পরাধীন ভারতবাসীর কাছে।

এক, যুদ্ধের পর ভারতকে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে। ইচ্ছে করলে ভারত কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে।

দুই, প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির সদস্যগণের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, দেশীয় রাজ্যসমূহের জনগণের সংখ্যানুপাতিক হিসাবে রাজন্যবর্গের দ্বারা আংশিকভাবে মনোনীত সদস্যগণের সমন্বয়ে ভারতের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে পরিষদটি গঠিত হবে।

তিন, ব্রিটিশ ভারতের যে-কোনো প্রদেশ বা রাজ্য ইচ্ছা করলে ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে থাকতে পারবে ও আলাদা ডমিনিয়ন হিসেবে নতুন সংবিধান রচনা করতে পারবে।

চার, ভারতের জাতিগত ও ধর্মগত সংখ্যালঘুদিগকে রক্ষা করার যে নৈতিক দায় ব্রিটিশ সরকারের আছে, সে অনুসারে সংবিধান রচনাকারী পরিষদের সঙ্গে

ব্রিটেন ও ভারতের একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে।

উনিশশো একচল্লিশের বাইশে জুন হিটলার সোভিয়েট আক্রমণ করেছে। জাপানিরা এগিয়ে আসছে ব্রিটিশ ভারতের দিকে। যুদ্ধ ঢুকে পড়েছে ভারতে। এ-মুহূর্তে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শমূলক সহযোগিতার অধিকার ব্রিটেনের হাতে সম্পূর্ণভাবে থাকবে। কেননা যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতের হাতে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা দেওয়া হলো না। বরং ভারতকে টুকরো টুকরো করার চক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যে লুকিয়ে থাকলো। সুতরাং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ক্রিপস্ সাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।

উনিশশো বিয়াল্লিশের জুন। বকরই ঈদের সকাল। একশোখানা বোট ডিঙির মালিক বেগ সাহেব। সস্তায় দু'খানা গোরু কোরবানী দিলো। স্বজনদের দিয়েও পাড়া-প্রতিবেশীদের মাংস দান করলো। তেমন উৎসাহ নেই। মানুষের মুখে একই কথা, সাহেব রাঁধবো কী ? ভাতের চাল নেই—

সাদা টুপিতে বেগ-এর মাথা নিচু। ভাবে, বোটে চাল বওয়া বন্ধ করলে কি দেশে চাল থাকবে ? দত্তবাবু সাহাবাবুর লোকও তো কাল বায়না করে গেল দু'খানা বোট।

বিশ্বের একমাত্র শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের রাষ্ট্র সোভিয়েট আক্রান্ত। সুতরাং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা যুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্যদানে এগিয়ে এলেন। যে কমিউনিস্ট পার্টি আট বছর ধরে নিষিদ্ধ ছিল, তার ওপর থেকে বাইশে জুলাই উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে সব নিষেধ আজ্ঞা তুলে নেওয়া হলো।

পরবর্তী পর্যায়ে সাত ও আটই আগস্ট উনিশশো বিয়াল্লিশ। বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় প্রস্তাব পাশ হয় যে, ব্রিটিশকে এখনই ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে—'কুইট ইন্ডিয়া'। নয়ই আগস্ট ভোরবেলায় গান্ধী, নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, কৃপালনী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ জাতীয় নেতাকে ব্রিটিশ গ্রেফতার করলো। কংগ্রেস বেআইনি ঘোষিত হলো। নেতারা জেলে— ভারতীয় জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন এদেশে আগস্ট আন্দোলন। গোটা বিশ্ব যুদ্ধে মেতেছে। ফ্যাসিবাদী ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে মেহনতী মানুষের স্বপ্নের রাষ্ট্রকে চুরমার করে দিতে চায়।

শরৎকালের সকাল। কখনও ঝলমলে। সাদা মেঘের গায়ে সূর্যের সোনালি রশ্মি ঝাপটায় মেঘের খাঁজে খাঁজে গিনি জড়োয়ার কারুকার্য। বর্ষার জল ঝরিয়ে নিঃস্ব ফ্যাকাশে মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে ব্রিটিশ বেতনভুক সৈন্যের বিধবাদের সাদা থান কাপড়ের মতো এলোমেলো। একচাপ ধোঁয়াটে মেঘে পূর্ব ইউরোপের বারুদ গন্ধ মিশে গেছে ভারতীয় আকাশের শারদ সকালে।

এ বছর দুর্দিন। সতীশ আটাদের দুর্গা পুজোয় সে জাঁকজমক নেই। অতি ছোট আকারে নিতান্ত দায়সারা প্রতিমা। জেলে পাড়ার বোটের বড় বড় পাল খাটিয়ে আর ম্যারাপ হয়নি উঠোনে। বাজনা পার্টির ঢাক ঢোলের

বাজনদার মাত্র ক'জন। ঘরের দাওয়া ঘিরে দেবী দুর্গার আরাধনা। পাঁচ গাঁয়ের বউ-ঝিরা শুকনো। বাচ্চা-কাচ্চারা বিনা খাদ্য খাবারে দড়ি চেহারা। গা বুকের হাড় পাঁজরা প্রকট। চোখ দুটো কোটর ঠেলে বড় বড়।

বঙ্গের বর্ষা পেরিয়ে আকাশময় সপ্তমীর শারদ সকালের আভাস। যেন দুঃস্থ পরিবারে অপুষ্ট কিশোরীর দেহে যৌবন জ্ঞাপনের অনাদর উচ্ছ্বাস।

সপ্তমীর ভোরে ঢাক বাজে। উদ্যমহীন। বেআদব শিশুদের দেহে নৃত্য মাতন নেই। ক্ষুধায় ক্ষীণ চালচিত্রের দুর্গা। অসুর তখন সাদা চামড়ার। আলপট কাটা চুল মাছি গোঁফের ঝোপে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে বিশ্বের অধীশ্বর বাসনায় অস্ত্র শানাচ্ছে শতাব্দীর অসুর। বুম বুম শব্দ নীল আকাশ ব্যেপে। পাখি পক্ষী কাশ শাপলা শৈশব কাটিয়ে সবুজ ধান চারা কেঁপে কেঁপে ওঠে। এদেশের তাবত মানুষ চমকে চমকে তাকায় আকাশের দিকে। সদয় মুখুজ্জের লম্বা নাসিকার চামড়া কুঁচকে অনুজ্জ্বল। ফর্সা রঙে কালোর কষ। জবারানীর গা শুকিয়ে খটখটে। উৎসবহীন মানুষের আনাগোনা।

সাতাশে আশ্বিন সপ্তমী তিথির বঙ্গোপসাগরে কটকটে নোনাজল ফাঁসিয়ে জঘন্য কালো জলের স্রোত। সাধারণ জলস্তর থেকে পাঁচ সাত হাত উঁচু হয়ে কোটি কোটি ফণা তুলে সাঁ সাঁ গর্জনে এগিয়ে আসে চর চড়া নদীর বুকে। ছোট বড় বাঁধ ফাটে। বোট ডিঙি স্ফীতকায় কালো থাবায় পড়ে জলমগ্ন। লোহাচড়া, সুপারিভাঙা দ্বীপ জলমগ্ন হয়ে একাকার। মানুষ গোরু বাছুর নারী শিশু চকিতে ডুবে প্রাণহীন। তলিয়ে যায় গভীরে।

উঁচু ঢিবির ঘরবাড়িতে উৎকট কালো জলে বন্দী মানুষ। উঠোন-খামার জলাশয়। সমুদ্র গাঙ বাঁধ ধসিয়ে মাটির দাওয়া রান্নাশালে বাতাস তাড়নায় ঝপট ঝপট ঢেউ মারে। নোনা জলের দাঁতের কামড়ে খুবলে খাবলে কমজোরি করে দেয় নোনামাটির ভদ্রাসন, গোলাঘর। ঝপাঝপ খসে পড়ে মানুষের আবাস। ধরিত্রী আর ধারণ করতে চায় না নিম্ন দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র সংলগ্ন মানব সমাজকে।

বেগে হাওয়া। মাঠের ধান চারা জলতলে হাঁই ফাঁই! কালো বিষাক্ত জলে প্রাণ হারায় মানুষের সঙ্গে। ঝড় জলে সদয়কুমার বিপন্ন। যেহেতু উত্তর, দক্ষিণ ভাগের থেকে খানিক উঁচু স্থলভূমিতে সদয়কুমারের অবস্থান। পাশেই হুগলি ফুঁসোয়। আকাল মেঘের বাঁধ ধস নেয়। শ্রীফল বেড়ে ভাঙে। নোনা জল, বিষাক্ত জলস্রোত হঠাৎ আছড়ে পড়ছে অববাহিকা রেখা ধরে।

সতীশ আটাদের সপ্তমী পুজো তছনছ। ওলোট-পালোট মানুষের সংসার। মাঠে সবুজ ধান চারা শরীর হারিয়ে জল টইটই। সে জল ঝড়ের হাওয়ায় ঢেউ খেলে। জবারানী দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বলে, পালাই চলো। সব ডুবে মরবো যে—

—দুস্। গাঙের জল লাববে তো…

—নামে কই…

ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দাওয়া থেকে আকাশ নজর করে সদয়কুমার। কানে সেঁধোয় হৈ চৈ। তাকায় প্রতিবেশি ঘোষাল মামার ঘরের দিকে। জানতে চায়,

কি হয়েছে গো ?

চারদিকে জলমগ্ন বিপন্নতা তার মধ্যে আবার আকুল আর্তি। সুতরাং না জেনে তো স্বস্তি পায় না। সদয়কুমারের মা লাঠি ঠুকে ঠুকে দাওয়ায় এসে বলে, ওদের ঘর-দোর পড়ে গেছে ?

—না।

—তবে অতো কান্নাকাটি ?

চোখের সামনে সদয়কুমারদের রান্নাঘরটার খুঁটি খাটা হেলে পড়ে। মনটা ভেঙে যায়। উৎকণ্ঠায় আবার চেঁচায় সদয় মুখুজ্জে, কেউ জলে পড়েছে ?

—না, ঘোষাল মামা উত্তর দেয়। বরং জানায়, আড়কাঠে জোড়া মা মনসারে…

—জোড়া ? মেরোনি—

পাকা লেঠেল ঘোষাল মামা। একখানা লাঠি পেলে দু-চারজনের মাথা ফেলতে আর কতক্ষণ। বরং নিজের বাড়ির লোকজনকে বোঝার, খবরদার। ওরা আশ্রয়প্রার্থী। মোটে আঘাত করোনি—

চড়বড় করে বৃষ্টির ফোঁটা। জলের ছাঁট দাওয়া ছাড়িয়ে ঘরের ভিতর। চারদিক জল বন্দী। গোরু বাছুর গলা তুলে ভেসে ভেসে উঁচু ঠাঁই খোঁজে। ছাগল ছানাগুলো ভাসে। হাঁস মুরগি সাঁতরায়। সাপ বেঁজি বৈরিতা ভুলে প্রাণ-বাঁচানোয় বিব্রত। যেহেতু খাল ডিঙিয়ে বাঁধ উপচানো জল, তোড় কম। তবে টান সব সমতায় আনার। অবিরাম পুবের বাতাস। থেকে থেকে বৃষ্টির ঝাপটা। সদয়কুমার পাশে তাকিয়ে জবারানীকে বলে, পালিয়ে কোথায় যাবো বল তো… ?

—আমার বাপের বাড়ি। দাদা তো চাপরাশি—

—তারপর…বলতে বলতে যেন হঠাৎ নতুন জলস্রোতে আবার বন্দী হয়ে যায় সদয়কুমার। নিজের দেশ গাঁ জন্মস্থানের ভিটে। ক'বছর ভর খাদ্য খাবারের টানাটানি। পুজো আচ্চায় দান ধ্যান কমে আসছে। দেশময় হা-অন্ন হা-অন্ন। কুটুম্ব বাড়ি সেখানেও তো বন্দী দশা !

বাতাসে উন্মাদ ঝলক। মাটির দেওয়াল ভিজে কাদা। ঘুণ ধরা ছোট জানালার পাল্লা কব্জায় জং ধরে অকেজো। হুহু ভিজে বাতাস আটকাতে সস্তা পাল্লায় শুধু কাঠের ছিটকিনি। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে জবারানী এক ঘর এক দোরে। একপাশে বুড়ো শ্বশুর বুড়ি শাশুড়ি।

সারাদিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর সমুদ্র ঝাঁপানো বদ কালো জলে মানুষের সংসার ছয়লাপ। নারকেল খেজুর গাছের ডগ উন্মত্ত রমণীর এলোচুলের মতো লণ্ডভণ্ড ওড়ে। কড় কড় শব্দে বাগানের বাঁশ কাহিল হয়ে ভেঙে পড়ে। গলা থেকে মুচড়ে যায় পঞ্চাশ ষাট বছরের নারকেল গাছ। অবস্থানের উপরিভাগের আকাশ এখন তার নয়, যুদ্ধের মিত্র শক্তি শত্রু শক্তি উভয়ের। কে কাকে জব্দে রাখতে পারে। নারকেল গাছটার গোড়ায় কালো জলের মধ্যে বারুদের গন্ধ। সেটা সমুদ্রজ গভীরতায় প্রকৃতির গোপন বারুদ, নাকি প্রশান্ত মহাসাগরে

মার্কিন রণতরীর উপর হঠাৎ জাপানী বোমারু আক্রমণে শক্তিশালী বিস্ফোরণ! নাকি গোপনে নৌ-অভিযানে তোলপাড়—দূরে ভূ-ভাগের রণতরী আক্রমণের বিষজল মহাসাগর, সাগর বেয়ে ইউরোপ এশিয়ার জল রেখায় রেখায়—বঙ্গদেশের নোনা জলে··· ।

দমকা বাতাসে এক ঝাঁক বৃষ্টি শাবল বল্লমের তীক্ষ্ণতায় সদয় মুখুজ্জের দেওয়ালে গাঁথে। রসা দেওয়াল আরও ভিজে যায়। বাতাসের ধাক্কায় অপোক্ত জানালা নিয়ে মাটির দেওয়াল হুড়মুড় ভেঙে পড়ে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ক্ষীণালোক ঘরের ভিতর বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে জমা অন্ধকারে। বাচ্চা দুটো হাততালি দেয়, কী মজা···

সর্বনাশে বুক কেঁপে চমকায় জবারানী। বাচ্চা দুটোর অবোধ উল্লাসে বিরক্ত হয়ে এক ঘা চাপড় বসায় পিঠে।

বড় বাচ্চা গুড়োটা বেকুব বনে পরক্ষণে কাঁদে। পেটে দানা নেই। দিনের পর দিন অর্ধভুক্ত। অপুষ্টি ও রুগ্নতায় মানুষের বাচ্চার পরিচয় মাত্র। তাকে এমন সজোরে মারধোর। মায়ের বুক ছিঁড়ে যায়। বড় বাচ্চাটাকে বুকে টেনে নিজেও কেঁদে ফেলে জবারানী। ছেঁড়া বুক জোড়াতালি দেয়। তখন ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে বড় দমকায় বৃষ্টিছাট। ঘরে থেকেও পৃথিবীর উন্মাদ আক্রমণ ঢুকে যায়। ঘর আর আশ্রয় নয়।

বুড়ো বুড়ি দুটো গৃহদেবতা নারায়ণকে স্মরণ করে বলে, একি তোমার লীলা প্রভু···। রক্ষে কর—মানুষকে বাঁচতে দাও শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী মাধব-মাধব—

সদয়কুমার খালি গায়ে পুজোয় পাওয়া মোটা সুতোর জ্যালজ্যালে ধুতির এক খুঁট গায়ে জড়ায়। হাওয়ার ঠাণ্ডা প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচায়। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকায়। আলোর ঝলকানি ঘরের ভিতর। গুড় গুড় শব্দে ভয়ঙ্কর গর্জন চরাচরে। টিনের ছাউনিতে গর্জনটা খানিক স্থায়ী। পলকা ঘর-দোর কাঁপে। বাচ্চারা মাকে জড়িয়ে ধরে গুড় গুড় আওয়াজ দূরে হটে গেলে বলে, মা কোথায় থাকবি। বড় বাচ্চাটাকে কাছে টেনে সদয়কুমার বলে, ও গুড়ে যাবি?

—কোথায় গো? চিক্কির কেটে বিদ্যুৎঝলক আর একবার ভাঙা দেওয়াল ফুঁড়ে ঘরে ঢোকে।

আলার চমক কমলে সদয়কুমার অসহায় কণ্ঠে বলে, মামা বাড়ি—।

ছোট বাচ্চা ভুঁড়ে বাবার হাত ধরে বলে, জল হচ্ছে যে—

বুড়ো জানতে চায়, ভিটে ছাড়লে ভাত পাবি?

জবারানী বউ হয়েও শ্বশুরের মুখের উপর বলে, ভাত এখেনে মেলে কই বাবা? পুজো আচ্চায় পেট ভরবেনি—

কথাগুলো বলতে বলতে স্ত্রী জবা সদয়ের পাশে দাঁড়ায়। গুড়ের পাশে ভুঁড়ে। যেন গমনোদ্যোগী একটা প্রজন্ম। যুদ্ধকালীন আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে নতুন আকাশ খোঁজে। সামনে জড়বৎ দুই বুড়ো বুড়ি গত শতাব্দীর ভার

নিয়ে অচল।

বাইরে বাতাসের দমক কমে। খিদেয় ক্লান্ত শিশুরা অন্নকাতর মায়ের কোলে ঘুমোয়। ঝিমোয় দুই বুড়োবুড়ি। রাত দুটোয় চারদিক তছনছ করে চরাচর জিরোতে চায়। বাস্তু ভিটের জল সরে। সপ্তমী ফুরিয়ে অষ্টমী মুখি আকাশে দু-এক খানা নক্ষত্র মেঘ খসিয়ে আলো ছিটোয়।…বহুদূরত্ব থেকে নরম আলো। দক্ষিণ ভূ-ভাগের মানুষ শঙ্কিত পল্লবে তাকায়।

তিন

টানা বারান্দায় মাটির দেওয়ালের উপর মোটা মোটা ঢেউ কাটা টিনের ছাউনি। ছাউনি মটকায় দু-প্রান্তে দুটো সাপ ফণা তুলে হাওয়ায় লক লক করে। ভোর থেকে সারা দিন রাত।

পুকুরের ওপারে তাল খেজুরের গাছ পর পর ক'খানা। বাড়ির কোণে বড় তেঁতুল গাছটা ঝাঁকড়া হয়ে অনেকখানি জায়গা আটকে রাখে। প্রসারিত ডাল-পালা কাক পাখিকে ডাকে। মাঝে মাঝে দু-একখানা শকুনের উৎপাত। তাই লকলকে সাপটা হাওয়ায় দুলে দুলে পাখি তাড়ায়। মটকারই বাড়তি টিন কাটা দু-খানা সাপ।

বড় মাথা ভর্তি কালো চুল। চাপা মুখ মোটা নাকে কালো চেহারা। চওড়া ছাতি ডাঁটো শরীর। বুকময় লোম। দু-কানের লতিতে দুগুচ্ছ ঘন চুল। ব্রজেন ঘোষাল উবু হয়ে বসে স্টোভটায় পাম্প দেয়। সোঁ সোঁ শব্দে তেল পুড়ে আগুনটা জোরালো। যেহেতু আগুন, বারান্দার এক কোণ ঘেঁষে নিজের জল-খাবার নিজেরই হাতে তৈরির ব্যবস্থা। পাতলা কড়ায় ঘি ঢেলে সুজিগুলো নাড়াচাড়া করে। জল ঢালতেই চোঁক শব্দ!

ঘি সুজির অদ্ভুত গন্ধ। স্টোভের আগুন গুড়ে ভুঁড়ের গেরস্থালী অভিজ্ঞতায় একেবারে নতুন উপকরণ। সুতরাং একটু দূরত্ব রেখেই দাঁড়ায় বাচ্চা দুটো। তারা অবাক হয়ে দেখে তিন খানা কাঠির উপর একখানা গোল কাঁচ বাটি ঘিরে অতো জোর আলো। আগুন। তাদের শৈশব থেকে তো খড় কাঠ কুটো নাড়া জ্বাল দিয়ে আগুনের জন্ম দেখেছে।

কোচার কাপড়ে মুখ মুছে ব্রজেন ঘোষাল তাকায় ভাগনেদের দিকে, কিরে? তোদের দিদিমা মুড়ি দেয়নি।

বাচ্চা দুটোর পরণে দড়ি গলানো ইজের প্যান্টুল। দু এক খাবলা ছেঁড়া। গায়ে ক'বছরের জীর্ণ জামা পুঁটলি থেকে বের করে দিয়েছে জবারানী। ব্রজেন ঘোষাল ভাগনেদের তেমন করে চিনতো না! চেনেও না গুড়ে ভুঁড়ে তাদের মামাকে। শুধু তাদের শিশুসুলভ একটা অনুমান, মায়ের ভাই। খুব কাছের লোক!

সাধারণ প্রজাবর্গ, ভদ্রজনের বাড়িতে নোটিশ শমন জারি করতে গিয়েও তো এমন হতকুৎসিত ছেলেপুলে দেখেছে। সেটা শুধু চোখে দেখা। চোখের

মণি ফুটে তো হৃদয়ে গাঁথেনি ? আজ বুকের মধ্যে কেমন আঁকপাক যাতনা টের পায়।

সদয় মুখুজ্জে আধমন চাল, ছ'খানা থালা আর ছটা সিলভারের গেলাস বস্তার মধ্যে বেঁধে নেয়। জবারানী বের করে পিতলের বড় লম্ফোটা।

গুড়ে ভুঁড়ে মুড়ির সঙ্গে এক চামচ করে মিষ্টি সুজি পেয়ে বিস্মিত আনন্দে ভেসে যায়। সুজির ডেলাটা একটু একটু করে পরম মমতায় ভাঙে। গালে পুরে অপরিচিত খাদ্যের স্বাদ পায়। তারা তাকিয়ে থাকে তাদের চাপরাশি মামার দিকে। ভাবে, চাপরাশি জিনিসটা কী… !

বুড়ি দিদিমা একটা বাতিল বাট ছাড়ানো বঁটি পেতেনের তলায় আঁতি-পাঁতি খোঁজে। মাটির মেঝের উপর ইট বসিয়ে পায়া উঁচু কাঠের পেতেন। সংসারের কত জিনিস যে ঠাঁই পেয়েছে। রোগা কালো বুড়ি। কপাল জুড়ে টকটকে লাল সিঁদুরের টিপ। সস্তা লাল পেড়ে শাড়ি। বঁটিটা হাতের কাছে না পেয়ে উদ্বিগ্ন। তখন লোহার পুরনো চ্যাটালো খুন্তিটা হাতে লাগে। সেটাকে টেনে বের করে দিদিমা ডাকে,—ও জবা দেখ দেখি তোদের কাজে লাগবে কী ?

জবা আরও দু-চারটে জিনিস বস্তায় ঢুকিয়ে বাঁধার বন্দোবস্তে মগ্ন। বস্তা ছেড়ে চলে আসে মায়ের কাছে, কি গো ?

মা মেয়ে দু-জনেই মাটির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে সকালের আলোয় খুন্তিটা দেখে। জবা বলে, বেশ ভারি তো ?

—তোর ঠাকমার আমলের। তখন সব এক সংসারে—দরকার হত বড় খুন্তি।

—বঁটি পেলোনি ?

—খুঁজি থাম।

জং ধরে লালচে পুরনো আমলের ভারি খুন্তিটাও বস্তার মধ্যে ঢোকায়। মা তখনও বঁটিটা খুঁজে যায়। একখানা বড় সাইজের বঁটি।

সদয়কুমারের মাথায় চাল থালা গেলাস খুঁটিনাটি বস্তুর ভারি বোঝাটা। সামনে হেঁটে হেঁটে যায় মামা ব্রজেন ঘোষাল। পেছনে দুই ভাগ্নে গুড়ে আর ভুঁড়ে। বউ জবারানী আর একটা পোঁটলায় কিছু মুড়ি আলু আর গাছের তেঁতুল কাঁখে নিয়ে হাঁটে। বাপের বাড়ির দেশের পথ। পঞ্চাননতলার ঝাঁকড়া বটগাছ। মালিদের বাগানে বড় পুকুর। আম জাম পেয়ারা গাছ ডালপালা মেলে জায়গাটা মনোরম ছায়াস্থল। পুকুরটায় পাঁচ ছ'খানা হাঁস জল কেটে ভাসছে। বাঁ দিকে টালির ছাউনিতে এক ঘরে বিরাট পঞ্চানন ঠাকুর। ঘোড়ার পিঠে চেপে বড় বড় চোখ নাকে বিশালাকার মুণ্ড। কানে গাঁজার কলকেটা বেশ প্রমাণাকার।

কাঁখের পোঁটলাটা পঞ্চানন থানের সামনে নামিয়ে জবারানী ফাটা সিঁড়িতে কপাল ঠোকে,—বাবা গো রক্ষে করো। দয়া করো যেন—করে কম্মে খেতে পারি—। চোতের ঝাঁপ গোষ্ঠে ফি বছর তোমাকে পুজো দেবো বাবা—

গুড়ে আর ভুঁড়ে তাকিয়ে দেখে মায়ের কাছে আসে,—মা—

গড় কর বাবা ঠাকুরকে।

দুই বাচ্চা গড় করে সিঁড়িতে কপাল ছুঁয়ে। বটের শুকনো পাতা ভারি বোঁটায় সিঁড়িতে পড়তেই শব্দ। গুড়ে ভুঁড়ে হুটপাট তাকায়। বাসি হলদে পাতাটা তখন সিঁড়ির মাঝখানে।

মা বলে, আয়—

গুড়ে ভুঁড়ে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে, এটা মামাদের ঠাকুর?

—দুস্। আমার বাপের দেশের ঠাকুর থান—

গুড়ে ভুঁড়ে চট করে সন্তুষ্ট নয়। এখনও তাদের চোখে ভাসে ফেলে আসা টিনের ঘর। গায়ে বালি খসা শিব মন্দির। সেটাই যেন নিজেদের। এই পঞ্চানন মন্দির ঠিক মনে ধরে না। বরং কানে লাগে পঞ্চানন মন্দিরের বিবরণ দানে মায়ের গলার স্বর ধরে যায়। তখন বাচ্চা দুটো তাদের টিনের ঘরের সামনে উঠোন, ওপাশে পুকুর, তাল খেজুরের কটা গাছ পর পর মনে করে। বুকে মায়াময় ঘোর জাগে। সেটাই নিজের দেশ…জন্মস্থানের বলে মনে হয়। একই দেশ, একই থানার মধ্যে কেমন করে যে জন্ম গ্রাম…জন্মস্থানটুকু শুধু সবিশেষ নিজের…আপন এই বিভাগীকরণ কী করে যে অতি গোপনে, অজ্ঞাতে চলে আসে। সেই পাখি পুকুর গাছপালা খেলার সাথী ছাড়া বাকি পৃথিবী যে কতো ছোটো! কতো মূল্যহীন…!

—দাঁড়িয়ে থাকিস নি। আয়—মামা এগিয়ে গেলো—

এঁকেবেঁকে পথ গেছে। পথের পাশে দু-একখানা ঘর। ইটের দেওয়াল টেনে পুরনো পাঁচিল। বড় করে সদর। মুখ বাড়ালেই গোটা রাস্তা নজরে। শশধর বেরিয়ে এসে বলে, জবা না?

—হুঁ গো দাদা।

—সামনে বস্তা ঘাড়ে তো জামাই?

—হুঁ।

—যাবি কোথায়?

—দাদা নে যাচ্ছে ঘর দেখতে।

—ঘর!

—পাকা রাস্তায়।

কেমন ধন্দে শশধর। আবার শুধোয়, তোমার শ্বশুরদের দেশে খুব বিপদ?

—বিপদ বলে…

—আমরাও তাই ভেবেছি। আমাদের গাঙ পাড়ের বাঁধ মাত্র পাঁচ আঙুল জেগে। আর একটু জল বাড়লে—এখেনকার হাল যে কী হোতো…! বাপেদের আর দেখতে পেতিস নি—

—আর কি! মা মঙ্গলচণ্ডী রক্ষে করেছে—

পেছনে তাকায় ব্রজেন ঘোষাল। জবাটা অনেক তফাতে। ব্রজেন হাঁক মেরে

শোনায়, অই—তুই কী শ্বশুর ঘরে যাচ্ছিস ? বার বার আসতে যেতে হবে বাপের বাড়ি। লোকটাকে ধরবো যে—চল্।

খাল কেটে বড় গাঙের সঙ্গে জোড় মুখে লক গেট। বিস্তৃত এলাকায় জমা জল বেরুনোর নির্গম পথ। ফলেই খালের উপর দিয়ে ব্রিটিশের তৈরি টাঙানো পোল। কলকাতার সঙ্গে মহকুমার প্রধান সড়ক সেতু।

টাঙানো পোলের কাছে এসে গুড়ে ভুঁড়ে অবাক। এপার ওপার বাঁশ বিছিয়ে বাঁশের খোটায় বাঁধা সাঁকো দিয়ে সরু সুতি খাল অতি সাবধানে পেরিয়েছে। তার তুলনায় কতো বেশি জল…কত চওড়া নদীর মতো ক্যানাল…! টাঙানো পোলে লোহার গোল পিলারে জলস্রোত পাক খায়। সোঁ সোঁ শব্দ। শব্দ শুনে ভয় পায় দুটো শিশু। পোলের কাছে গিয়ে ডাকে, মা—আ—

পোঁটলা কাঁখে মা জবারানী সাহস দেয়, আয়—কিছু ভয় নেই।

পোলটার দু-পাশে ফাঁপা নলের পাইপ দিয়ে ঘেরা। কেমন সহজে মা হেঁটে যায়। পাশে পাশে হাঁটে দুই শিশু। তাদের শিশু জ্ঞানে মাকে মনে হয়, খুব সাহসী। সব জানে। তারা জানতে চায়, কোথায় যাবি গো মা—? আমাদের ঘরে ?

মা বাচ্চাগুলোর কথায় এখনই উত্তর না দিলেও চকিতে মোচড় খায় অন্তরে, সুখে দুঃখে যাহোক পুজো আচ্চায় চাল বাতাসা মিলতো ! এখন যে কোথায় …কিসের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি… ! এতগুলো পেট… !

এই কথাগুলো তো দুধের শিশুদের কাছে দুর্বোধ্য। তাই একটু স্বপ্ন গড়ে তোলে বাচ্চা দুটোর চোখের সামনে…চল। কত গাড়ি…লোক দোকানপাট দেখবি। চল—

বাঁধ রাস্তার ঢাল কেটে নামে ব্রজেন ঘোষাল। তার পিছু বস্তা মাথায় সদয়কুমার। খানিক পরে জবারানী। সঙ্গে সঙ্গে গুড়ে ভুঁড়ে।

লোহার খোঁটায় ফুটো করে কাঁটা তারের বেড়ার পর মাঠ। খাবলা খাবলা সবুজ ঘাস। পায়ের চাপে খোদল। বাঁশের খুঁটি পুঁতে দু-ধারে গোল পোস্ট। ইস্কুলের ছেলেদের মাঠ। মাঠের মাঝখান দিয়ে পায়ে পায়ে সরু পথ। কত মানুষ যে কত কাজে কতো বার হেঁটে গেছে।

ব্রজেন ঘোষাল মাঠের মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। ও প্রান্তে কড়ি বরগায় পেটাই ছাদের বড় বড় দরজা জানালায় দোতালা বাড়ি। মাঠের দিকে কাঠের ফ্রেম করে ঝুল বারান্দা। ব্রজেন ঘোষাল ভগ্নিপতি সদয়কুমারকে বলে, এই আমার কোর্ট। তোমার সঙ্গে রায়বাবুর দেখা করিয়ে আমাকে অফিসে হাজরে দিতে হবে—

আঙুল তুলে তুলে কাছারি ঘরটা দেখায়। বলে, বড় হাকিমের কাছে আমার খাতা পত্তর—

চাপরাশি দাদার চোখ মুখে প্রত্যয়। মনের মধ্যে একটা অহং উঁকি মারে। বোঝাতে চায় সদয়কুমারকে, তোমাদের চেয়ে আমরা—আমাদের বোন কত উন্নত

পরিবারের। কোন উচ্চারণে নয় হাবে ভাবে।

গুড়ে ভুঁড়ে মায়ের কাপড় ধরে অস্ফুট কণ্ঠে শুধোয়, ওখেনে কী হয় গো ?

জবারানী শৈশব কাটিয়ে সামান্য জ্ঞান হওয়াতক মায়ের সঙ্গে সংসারের গেরস্থালী সঙ্গী। তার এমন কিছু পুঁজি নেই যে শিশু দুটির কৌতূহল মেটাবার মতো উপযুক্ত উত্তর দিতে পারে। শুধু বলে, বিচার-কোর্ট-কাছারি। অনেক লেখাপড়া শিখে তবে কাছারির সাহেব হয়—

এখনও বর্ণ পরিচয় হয়নি শিশুদের। তারা শুধু শোনে। ও প্রান্তে কোর্ট দালান—মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই শিশু মায়ের দিকে অবোধ বিস্ময়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে।

মাথার উপর সকালের সূর্য গোটাগুটি হয়ে আকাশ ভরে রেখেছে। অপুষ্টিকর খাদ্য খাবারে শিশুমুখ রুগ্ন অথচ উজ্জ্বল। আত্মজদের দিকে তাকিয়ে সোনালি রোদ্দুরে স্বপ্ন জাগে…ভগবান সুদিন দিলে তোদের ইস্কুলে পাঠাবো। যাবি ?

দুই ভাই একসঙ্গে বলে ওঠে, হুঁ।

ইস্কুলের মাঠটায় তখন শরতের রোদ মাখা এক ঝলক হাওয়া পায়ে চলা পথ গড়ায়।

চার

বঙ্গোপসাগর জোয়ারের নোনাজল যখন ঠেলতো, ডুবে যেত এদিকটা অমাবস্যা পূর্ণিমার গণে। মহকুমাটা শুধু কেঁটকি বন, নোনা জলাশয়। কাঁটা ঝোপ, হেঁতাল গেঁমুয়া ক্যাওড়া বন। হরেক পাখি। লম্বা ঠোঁটে বক, বাটাম, টিয়া পাখির ঝাঁক। বড় বড় জেলে ডিঙি মাটি ভরে ডুবিয়ে নোনা স্রোতের তোড় আটকানো। তারপর শ'য়ে শ'য়ে লোক মাথায় মাথায় ঝড়া ভর্তি মাটি ফেলে ফেলে বাঁধ দেয়। ইরিগেশন এমব্যাঙ্কমেন্ট।

ক'খানা বড়ো বড়ো শিরিষ, অশ্বত্থ, মেহগনি ডালপালা মেলে সদ্য তৈরি বাঁধ শিকড় বাকড়ে আটকে রেখেছে। দু-একজন লালমুখো মহকুমা শাসকের পর এদেশি লোক মহকুমা শাসক হয়ে নিম্ন দক্ষিণ বঙ্গের লাট ঘাট দমন করে। দু-পাঁচ হাত রাস্তা ঘাট তৈরি করেছে। বাকিটা তো নদী, নদীর ঘাট আর বঙ্গোপসাগরের নোনা জলের যোগান। এই নিয়ে মানুষের জীবন যাপন।

বাঁধের বুক বেয়ে সড়ক আরও দক্ষিণগামী। ডাইনে কখনও হুগলির গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, কখনও নদী আর সড়কের মধ্যবর্তী দু-একখানা গ্রাম-জনপদের বিস্তারটুকু মেনে সড়কপথটা এগিয়েছে যতক্ষণ না সুন্দরবনের গভীর খরস্রোতা হেতানিয়া দুয়ানিয়া গাঙ তার চেহারা নিয়ে রুখে দিয়েছে মাটির পথটাকে।

রায়বাবুর বারোখানা ঘর। একটানা বাঁশ খুঁটি লাগিয়ে টিন চাপানো। কঞ্চি-বাখারির গায়ে পাঁক কাদার জাব দিয়ে পাশাপাশি দেওয়াল। এরই এক

কামরার সম্মুখটা দশ হাত ভেতরে লম্বা পঁচিশ হাত। ন্যাতা পোঁছা দিয়ে ঝকঝকে করে তোলে সদয়কুমার, জবারানী। সঙ্গে পরম উৎসাহে হাত লাগায় দুই শিশু গুড়ে আর ভুঁড়ে। কাদা গোবর হাতের কাছে দিতে দিতে গুড়ে জিজ্ঞেস করে, মা, এটা আমাদের ঘর ?

কব্জি অবধি গোবর-কাদার গোলা। বাঁহাতে কোলের কাছে টেনে এনে বলে, কেন রে ? এ-ঘর পছন্দ হচ্ছে নে ?

—সে ঘরে···টিনের ঘর···পুকুর উঠোন তালগাছের ঘর···

—সে তো আর আমাদের নেই।

—কেন !

—তোর বাবা বেচে দিয়েছে। ওখেনে পেটের ভাত হয়নে—

শিশু গুড়ে মায়ের উত্তরে কেমন বোবা মেরে তাকায় ! বেচে দেওয়া—সেটা যে কী ব্যাপার···। পেটের ভাত···তাও বা কি ? আতপচালের ভাত—জাউ সিদ্ধ তো খাচ্ছিলুম—।

মা আরও কাছে টেনে নিয়ে গুড়ের মুখের কাছে মুখ লাগিয়ে ধীর গলায় বলে, যদি কষ্টের আঁধার কাটে—তাই শহরে আসারে—

সামনে বাঁধের ওপর পিচ ঢেলে সামান্য রাস্তা। রাস্তার ঢালের ওপারে বড়সড় নিচু সমতলে ইঁট-সিমেন্ট বাঁধানো উঁচু দাওয়া। ইঁটের পর ইঁট বসিয়ে পনেরো ইঞ্চির চৌকো পিলার ঘন ঘন। পিলার থেকে মোটা মোটা শাল-সেগুনের গুঁড়ি একেবারে মটকা অবধি। চেরাই কাঠের বাটামে টালি চাপিয়ে বড় ঘরে থানা। থানার বারান্দায় পেটা ঘড়িতে বাজে ঢং···। পরপর এগারো খানা। ভুঁড়ে ছুটে যায় নতুন ঘরের সামনে। দু-চারখানা সাইকেল বেল দেয় ক্রিং-ক্রিং। রিক্‌শা হর্ন দেয়। কালো কালো ট্যাক্সি ঠেসে প্যাসেঞ্জার বয়।

মা আশঙ্কায় বলে, ভুঁড়ে—ওখেনে থেকে দেখ বাপ। রাস্তায় বড্ড গাড়ি—

ভাঙা ইট পাঁক কাদা, লোহার শিক দিয়ে গায়ে গায়ে প্রমাণ সাইজের দু'খানা উনুন গড়ে ফেলে স্বামী-স্ত্রী। শুকনো মাটির চাপ বসিয়ে গায়ে গোবর লেপে ভাতের হাঁড়ি ঝোল-ডালের কড়া রাখার জায়গা।

একখানা পুরনো টিন কেটেকুটে কাঠের ফ্রেমে বেঁধে বোর্ড, বাঁশীনাথকে ধরে ব্রজেন ঘোষাল লিখিয়ে এনেছে,

"মহারানী হিন্দু ভোজনালয়'

প্রোঃ—সদয় মুখোপাধ্যায়

সাইনবোর্ডটা তখন চাপরাশ ব্রজেন ঘোষালের শক্ত পেশী, চওড়া চেটোর মোটা মোটা আঙুলে ঝোলে। পথচলতি দু-একজন শুধোয়, ব্রজেনদা—কোর্টের কাজও চলবে আবার দোকানদারিও হবে ?

ব্রজেন ঘোষাল দাঁড়িয়ে বৃত্তান্ত বলে। শেষে অনুরোধ রাখে, খদ্দেরপাতি পাঠিয়ে দিও—

কেমন ব্যথিত গলায় কৌতূহলী মানুষগুলো আশ্বাস দেয়, নিশ্চয়ই। খদ্দেরপাতি তো বটে। নিজেও একদিন খেয়ে আসবো—তোমার ভগ্নীপতির

রান্না কেমন—চেখে দেখবোনি ?

অতি সাবধানে বোর্ডটা ধরে ধরে আনে ব্রজেন ঘোষাল। টিন নড়াচড়ায় বেঁকে গেলেই ঝন্‌ঝন্‌ বেজে ওঠে। তখনই থেমে রং দিয়ে ফোটানো বর্ণগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। একটুও রং চটেছে কিংবা ঝরেছে কিনা··· ?

দিনের শেষে ক্লান্ত শরীরে স্বামী-স্ত্রী দুই বাচ্চা নিকানো ঘরে পাশাপাশি বসে মুড়ি চিবোয়। এতক্ষণ একটা রচনা পর্বে ডুবে ছিলো সদয় আর জবা। মাঝে মাঝে দুই শিশুর ক্ষীণ সহযোগিতা। দাদাকে দেখে জবারানী মুড়ির ডিশ ফেলে রেখে ঘরের সামনে ছুটে যায়। হাতে অতো বড় টিনের দ্রব্যটা অবাক করে দেয়। তার ধারণায় এ-জিনিসটার প্রয়োগ ও যথাযথ উপযোগিতা জানা নেই। কিংবা যে পরামর্শের মধ্যে ঢুকবে সদয় ও জবারানী—সেখানে এটা কেমনভাবে কাজে লাগবে ভাবতে পারে না। তাই জবারানী জানতে চায়, এটা কেন গো দাদা— ?

—দূর হাবলি, তুই বুঝবিনি—

পাশের ঘর থেকে টর্চ রেডিও ঘড়ি সারানো দোকানদার বেরিয়ে এসে বোর্ডটা দেখে বলে, বাহ্‌, বেশ হয়েছে—

—হয়েছে ভাই ? বিনীত ভঙ্গিতে কথাটা বলে ব্রজেন ঘোষাল। পাশাপাশি থাকুক এবং পাশাপাশি একজন হয়ে উঠুক—এটুকুতেই স্বস্তিবোধ করে সদয়-কুমারদের চাপরাশি হিতাকাঙ্ক্ষী।

গুড়ে আর ভুঁড়ে সাইনবোর্ডটাকে দু'চোখ মেলে দেখে। বোর্ডটার সামনে উবু হয়ে বসে দেখে টিনের গায়ে গোটা গোটা করে কী সব আঁকা। মামা জিনিসটাকে কেমনভাবে কাজে লাগায় সেটাই তাদের আগ্রহের বিষয়।

ব্রজেন ঘোষাল ডাক দেয়, সদয়—আয় তো ভাই। এটাকে টাঙাই—

—কোথায় গো বড়দা ?

—আয় না, বলে ঘরটার ছাউনি থেকে নিচে খানিক কপালের মতো জায়গাটায় বাঁশের গায়ে টিন মারা। বোর্ডটাকে সেখানে টাঙাতে পরামর্শ দেয় ব্রজেন।

পাশের সারাই দোকানি বলে, থামো—আমার মই আছে। সেটা দিচ্ছি—

বাচ্চা দুটো তাদের বাপের শ্রম দেখে। দেখে, বাপটা চাপরাশি মামার কথার কেমন বাধ্য। মইটা টেনে বের করে পাশের দোকানি। সদয়কুমার সেটা নিয়ে দোকানঘরের সামনে দাঁড় করায়। পাউয়ের থাক বেয়ে বেয়ে সদয় উঠে যায় মইয়ের মাঝবরাবর। সেখান থেকেই বলে, বড়দা—দাও গো বোড়টা—

ছোট্ট হলেও টলমল করে সস্তা কাঠের হালকা পদ্ধতিতে কাজ সারা সাইন-বোর্ড। বোন জবারানীও হাত লাগায়। সদয়কুমার টানে,—এক হাতে পারে না। গুড়ে ভুঁড়ে ছটফট করে এগিয়ে যায় তাদের বাবাকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে।

চাপরাশি মামা হাঁ-হাঁ করে সামলায়, সরে যা তোরা মাথায় পড়বে। মামার নিষেধে তাদের উদ্যোগ বাধা পায়। একটু ভয় জন্মায়। ধীরে ধীরে সাইন-বোর্ডটা টাঙানো হয়। তার দড়ি দিয়ে বোর্ডের বালা বাঁধে বাবা। দুই ভাই

দেখতে দেখতে ভাবে, রঙচঙে বোর্ডটা বেশ মানাচ্ছে। পুকুরঘাট উঠোনের ঘরবাড়িতে তো এমন কিছু টাঙানো ছিল না…

পাঁচ

সকাল হতেই পুবের রোদ্দুর থানার উঁচু মটকায় টালির ছাউনি গড়িয়ে ছাঁচে। ফ্রেমের কাঠে ঝোলানো পেটা ঘড়িতে কাঠের হাতুড়ি সীমিত লয়ে মারে টহলদারি পুলিস। ঢং আওয়াজে কেঁপে ওঠে থানাঘর। সামনে দু-চারখানা ফুলচারা।

পরপর পাঁচখানা ধাতব আওয়াজ। সদয়কুমার জেগে ওঠে। তাড়াহুড়ো করে বিছানা ছাড়ে। ডাকে জবারানীকে, কই গো—বেলা হয়েছে যে—

সারারাত ঘেমে শেষরাতে হেমন্তের হিমে ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা। ঘুমিয়ে পড়েছিলো গুড়ে-ভুঁড়ে। তারাও বাবার ডাকে জেগে ওঠে। মাটির মেঝেতে সামান্য বিছানাপত্তর। মশারির বাইরে তাকাতেই আলো। দিনের আলো। দোকানঘরে ঝাঁপ জানালা ছাড়াও যে কতো ফুটো-ফাটায় আলোর পথ।

চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে হঠাৎ গুড়ের মনে পড়ে। মশারি থেকে বেরিয়ে দোকানঘরের সামনে আসে। সদয়কুমার পুরনো টিনের ঝাঁপটা খুঁটি দিয়ে ঠেলে উঁচু করে দেয়। ঘরের ভেতর অবধি আলো। গুড়ে চোখের ঘুম মুছে হাওয়ায় আলস্য উড়িয়ে দেয়। দোকানঘরেব সামনে দাঁড়ায়। সাইন-বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকে। রঙচঙে করে বর্ণগুলো লেখা "মহারানী হিন্দু ভোজনালয়"। সেগুলোর দিকে অবোধ মনোযোগে নিশ্চল তাকিয়ে।

একঘটি জল নিয়ে মুখ ধোওয়ার উদ্যোগে বাবা সদয়কুমার গুড়ের কাছে দাঁড়ায়, কী রে, কী দেখতিছিস—

গুড়ে আঙুলে দিশা দেখায় বোর্ডটাকে, এটা কী গো ?

—দোকানের নাম।

—কী নাম ?

সদয়কুমার তেমন ভাষাবোধ পুস্তকপাঠে রপ্ত নয়। এতোদিন পুজো-আচ্চায় যেটুকু মন্ত্রপাঠ করে চাল-ফলপাকুড় উপার্জন করেছে সে সবই শুনে শুনে, মুখস্থের মাধ্যমে আয়ত্ত মাত্র। কঠিন সংস্কৃত শব্দগঠন বাক্যবিন্যাসের কৌশল পাঠাভ্যাসের দ্বারা অর্জন করতে পারেনি। শুধুমাত্র ক'খানা বর্ণ চিনতে বা লিখতে পারে। সেই পুঁজিতে দাঁড়িয়ে আর চাপরাশি শ্যালকের বারবার কথা-বার্তাকে সম্বল করে বলে, মহারানী হিন্দু হোটেল।

গুড়ের জিজ্ঞাসায় 'হিন্দু' আর 'হোটেল' কথা দুটি নতুন বিপর্যয় সৃষ্টি করে এই সকালেই।

ঘটির জলে মুখ ধোয় সদয় মুখুজ্জে। সকালের রাস্তাঘাটে দু-একখানা রিকশা। দক্ষিণগামী কালো ট্যাক্সি একটা এগিয়ে যায়। কলকাতাগামী বাস তো তখন পোলের কাছে।

বিছানাপত্তর সরিয়ে জবারানী গোটা দোকানঘরের মেঝে ঝাঁটায়। গোবর

ছড়িয়ে আশপাশ পরিশুদ্ধ করে। দিনটাকে তাদের সংসারে অন্য আর দশটা দিনের থেকে আলাদা মর্যাদা দেয়। দোকানঘরের কোণে শালগ্রাম শিলাটাকে একটুকরো কাঠের ওপর রেখে ফুল-জল দেয় সদয় মুখুজ্জে। স্বল্প তেলে প্রদীপ দেয়। ঘুঁটের আগুনে গোটা দোকানঘরে ধুনো দেয়। উনুনের কাছে একটা ছোট্ট রেকাবে প্রথম চালের বস্তা থেকে একমুঠো চাল, দুটো আলু, গোটা সুপারি, সিঁদুর সাজিয়ে দুই স্বামী-স্ত্রীতে নতমস্তকে প্রণাম জানায়। প্রার্থনা করে, মা অন্নপূর্ণা মা গন্ধেশ্বরী তোমাদের চরণপদ্মে সব নিবেদন করে—এই কারবারে হাত দিচ্ছি মা—মঙ্গল করো—ছেলেপুলে নিয়ে যাতে করে কম্মে খেতে পাই মা—

গুড়ে-ভুঁড়েও মা-বাবার অনুকরণে প্রণাম জানায়। দুখানা বড় বড় উনুন। তাদের কাঁধ মাথা ছাপিয়ে উঁচু ঝিক।

পাশেই শুকনো কাঠকুটো, ঘুঁটের ডাঁই। এক বোতল লাল কেরোসিন তেল। উনুনের মধ্যে কাঠকুটো দিয়ে একফোঁটা কেরোসিনে ভিজোয়। চীনে দেশলাইটুকু মারতেই দপ করে আগুন। একেবারে নতুন বসবাসের গুহায় যেন আবিষ্কারের ঝলক। বাচ্চা দুটো এতো আলোয় হাততালি দেয়।

দিদিমার দেওয়া হাঁড়িটায় জল ভরে সের দুয়েক চাল চাপায়। গুড়ে-ভুঁড়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, এ চালের রঙ সাদা নয়, পুজোয় পাওয়া নৈবেদ্যর আতপ নয়…।

চালের বস্তায় দড়িটা তখন খোলা। গুড়ে অতিসাবধানীর মতো এগিয়ে যায়। বস্তার মুখটা টেনে টেনে ঢাকা দেয়। বহু কষ্টের খাদ্যকণা যদি পড়ে নষ্ট হয়।

জবারানীর হাত থেকে জলে-চালে হাঁড়িটা তুলে কাঠের আগুনে গনগনে আঁচে বসিয়ে দেয় সদয়কুমার। জবারানীর হাতের ভার খালি হলেও অন্তর ভারী। নতুন জীবনধারণের ঝুঁকিতে।

গুড়ে-ভুঁড়ে দুই ভাই বস্তার মুখে দড়িটা বাঁধার বাসনায় খুঁট খোঁজে। পায় না। মোটা চটের বস্তা। এখন কত হাজার হাজার পিস…বড় বড় চেহারার হেসিয়ান তো জাহাজ ভর্তি হয়ে চলে যাচ্ছে রণাঙ্গনে। সুতরাং আতঙ্কে মা জবারানী চেঁচায়, হ্যাঁ বাপ—তোরা টানাটানি করে ছিঁড়ে ফেলিসনি। কিনতে পারবোনি রে—

ইটের ধাপ কেটে কেটে সিঁড়ি। বাঁয়ে টিনের চালা দেওয়া কালীমন্দির। সামনে লাল টকটকে রঙের বারান্দা। উঠোনে ইট বিছিয়ে কাদামাটি ঢাকার ব্যবস্থা। মাঝখানে গর্ত রেখে বলির হাঁড়িকাঠ পোঁতার জন্যে মাটি অংশ। পাশে পুরনো অশ্বত্থ গাছটা বাঁক নিয়ে মন্দিরকে অক্ষত রেখেছে। ডালপালা ছড়িয়ে ছায়া দিচ্ছে উঠোনে। দু-একটা শুকনো পাতা বলির মাটিতে পড়ে হাওয়ায় সড়সড় পাক খায়।

ক'খানা রেলপোলের খোঁটায় বেশ বড়সড় ছাউনির টিনের আটচালাটা দাঁড়িয়ে। কাঁচা সবজির বাজার, মাছ, মাংস, আলু, পেঁয়াজ ভর্তি। বাঁধা দোকানে মুদিখানা জিনিসপত্তর।

চাপরাশি মামা ঘুরে ঘুরে আলু, ঝিঙে, পেঁয়াজ, আদা কেনে। আর এক ব্যাগে সের দেড়েক পোনা মাছ। মাছ-দোকানি বলে, ঘোষালবাবু—

—বলো গো ভাই ?

—ওপার থেকে আমাদের বাজারে ? ইস্টাশনে তো বাজার ছিল—

—থাকলেই বা ? আমার বোন ভগ্নীপতি দোকান করেছে—

মাছদোকানি উৎসাহে জানতে চায়—কোথায় ? কোনটা ?

—ওই তো 'মহারানী ভোজনালয়' থানার কাছে—

—হুঁ, সকালে বোড় দেখেছি।

খুশি হয়ে চাপরাশি ব্রজেন ঘোষাল খানিক দাঁড়ায়। পাশের খদ্দেরকে পয়সা চাওয়া হলে তিন-চারজন মানুষ ভীখরি হয়ে হাত বাড়ায়, বাবু—দুটা পুইস্যা দেবে গো ?

কোলে বাচ্চা নিয়ে রোগা হাতে বিবর্ণ শাঁখা। দোকানদার ধমকায়, বাজারহাটে ভিড় করলে দোকানদারি করবোনি ?

—সাতদিন ভাত দেখ্‌ছিনি গো বাওয়া, শীর্ণ হাতে শাঁখা পরা বউটা কাকুতি জানায়।

মাছদোকানি ধমক দেয়, দোকানে ভাত পানতা মিলে ? নাও একটা পয়সা—, বলতে বলতে একখানা তামার ফুটো পয়সা বাড়িয়ে দেয়।

ব্রজেন ঘোষাল অনুরোধ জানায়, আমার ভগ্নীপতিকে একটু দেখবে ? যাতে ব্যবসা-বাণিজ্যটা চালাতে পারে—

—আপনি আমাদের ওপারের কাছারির লোক। আপনি জামিন থাকলেই হলো—

প্রস্তাবটায় মর্যাদা দিতেই ব্রজেন ঘোষাল আরও বিনয়ী হয়ে বলে, ভাই আজ যাবে হোটেলের দিকে—?

—হাঁ। সন্ধ্যের কাছাকাছি তাগাদায় যাবো। আলাপ করবো আপনার নাম করে—

—খুব ভালো। শেষে দামের টাকাটা এগিয়ে দেয় ব্রজেন ঘোষাল।

দু'হাতে দুটো ব্যাগ। এক হাতে কাঁচা বাজার আলু, বেগুন, অন্য হাতের ব্যাগটায় মাছ। বাঁয়ে মুদিখানা দোকান পরপর তিনটে। দোকানের খুঁটিতে পাট পাকানো গরুর দড়ি, টিনের নলওলা লম্ফো, চকচকে মগ ঝোলে। রাস্তাটার পাশ দিয়ে নোংরা জল বয়ে যায় বড় পুকুর অবধি। পুকুরের পাড়ে ক'ঘর গণিকা। তাদেরই আশপাশে সরাইখানা।

মহকুমাশাসকের কোর্টের নোটিশ জারি করা পেয়াদা বাসুদেব ব্যাগ হাতে থমকে দাঁড়ায়!—দাদা! তুমি এখেনে বাজার ? কই এতোদিনে তো চোখে পড়োনি—

ব্রজেন ঘোষাল সরকারি পর্যায়ে একই স্তরের কর্মী। শুধু দপ্তর ক্রমে একজন সিভিল কোর্টের আর একজন ক্রিমিন্যাল কোর্টের। একজন ঘোষাল আর একজন চাটুজ্জে। দু'জনে দাঁড়ায় ইটের সিঁড়ির ধাপে। নামতে গেলে

কালীমন্দির বাঁয়ে, উঠতে গেলে ডাইনে। মন্দিরের সামনে সব কথা হয়। শুনে বুঝে বাসুদেব চাটুজ্জে ভরসা দেয়—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমার কোর্ট থেকে খদ্দের পাঠাবো। মন লাগিয়ে চালাতে বলো—

—তোরা সকলে দেখিস ভাই। তা না হলে তো আমার দায়—তায় বোনের বুড়ো শ্বশুর আর শাউড়ি আমার বাড়ি উঠেছে—

—তাই নাকি?

—আর করি কী?

—পুজোটুজো পারে?

—তা পারে।

—থামো। কাজে লাগবে। খবর দেবো দাঁ মতো।

ব্রজেন ঘোষাল সহজীবিকার মানুষটার প্রতি সহমর্মীর দৃষ্টিতে তাকায়।

ক্রমবিলীয়মান কেশের কারণে বাসুদেবের মাথার মধ্যভাগে ফাঁকা। একটু মগ্ন চিন্তা করলেই নিজেরই অজ্ঞাতে হাত চলে যায় সেখানে। ফলে মাথা চুলকেই পরের কথাটায় নামে, বাজারটা সারি? দেখা হবে—

দু'হাতে তখন ভার। থানার পেটাঘড়িতে ঢং-ঢং…সাতখানা আওয়াজ। জোরে জোরে পা ফেলে ব্রজেন ঘোষাল।

পুরনো ইটের সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই পাকা রাস্তা। বাঁদিকে খানিক গেলেই মহকুমাশাসকের অফিস, বাংলো, জেলখানা। এরই সামনে দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে আরও দক্ষিণের গ্রামগঞ্জ আবাদভূমির জনপদের দিকে। এতোদিন তো শুধু নদীপথ…নদীর ঘাটই সেইসব মানুষদের যাতায়াত বা অবতরণের ক্ষেত্র। যেখান থেকে তারা মূল প্রশাসনের মুখের খানিকটা দেখতে পেতো বা আন্দাজ করতে পারতো। এস. ডি. ও. জিনিসটা কী? কেমন? কোর্টকাছারি কিংবা জজ হাকিম—তাঁদের নির্দেশে পুলিসবাহিনী, দেশশাসন, খাদ্যদ্রব্য বণ্টন বা সিভিল সাপ্লাই—ইত্যাদি রাজকীয় শব্দবন্ধ।

দু'হাতে ব্যাগ টানতে টানতে ব্রজেন ঘোষাল হাজির। জোরে জোরে ডাকে, ও সদয়—সদয়—

হাঁড়ির ভাতে খুন্তি চালায় জবারানী। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মুখ বাড়ায়। বোনের মুখ দেখে চাপরাশি দাদা মৃদু নির্দেশের মতো বলে, এইসব বাজারহাট দিয়ে গেলুম। খদ্দেরপাতি ডেকে হেঁকে খাইয়ে পুঁজি কর—। আমি আর নেই তোদের মধ্যে।

সদয়কুমার উনুনের কাঠ বের করে নিয়ে আগুনের তেজ কমায়। ঝড়ায় ভাত ঢালে। ঝড়ার নিচে নতুন মেজলায় ভাত ফোটা সাদা মাড়ের ফ্যান। ধোঁয়া ওড়ে। ক'দিন আগে তো নিজের জন্মগ্রামের মা-বউরা বাচ্চা কোলে ঘরের উঠোন ঝোরে কেঁদে কেঁদে গেলো, একটু ফ্যান দিবে গো বামুনদিদি—। বাচ্চাটার মুখে দিই—।

সদয়ের দু'চোখ ভারি। কৃতজ্ঞতায় চোখ ফেটে জল টপে। ভিজে চোখে রান্নাঘরের বাইরে এসে চাপরাশি শ্যালককে বলে, আশীর্বাদ করো গো দাদা—

তোমার ব্যবস্থায় যেন মা-লক্ষ্মী দয়া করে।

গুড়ে রান্নাঘরে এসে ঝড়ায় এতো ভাত দেখে অবাক! সাদা ধবধবে ভাতের থেকে খাদ্যের ভাপ। ভুঁড়ের হাত ধরে বলে, দেখবি আয়—

তখনও ভাতের গা বেয়ে ফ্যান টপছে নতুন মেজলায়। দিদিমার দেওয়া বস্তার চালে ঘর আলো করা ভাত। ভুঁড়ে বলে, কী হবে রে এতো ভাতে…।

মোটাসোটা চেহারায় জোড়া গোঁফ। বড় খাকি হাফপ্যাণ্টের পর হাঁটু উরুতে কালো রোমের বন। খাকি মোজায় পা ঢেকে ভারি জুতোয় এক পাক টহল দিয়ে দেওয়ালের গোল ঘড়িটা দেখে সিপাই ভৈজুলাল। কাঁধের পাশ দিয়ে বন্দুকটা পিঠের ঠেকনোয় খাড়া। ভেতরে ঘরের ডানদিকে মোটা মোটা গরাদে হাজতখানা। পাশ কাটিয়ে টেবিল পেতে মেজবাবুর ফাইল কাগজপত্তর। পাশে বড়বাবুর র‍্যাক। আলমারি। উল্টোদিকে গরাদ ঘেরায় বন্দুক রাখার ঘর। মালখানা।

গোল ঘড়িতে ন'টা বাজলে সান্ত্রী বদল। সুতরাং ভৈজুলাল পেটাঘড়িতে কাঠের হাতুড়ির ঘা দেয়। পেতল কাঁসা নিজেকে চিতিয়ে আওয়াজ তোলে ঢং…। ভৈজুলাল আবার ঘা মারে—ঢং…ঢং…

থানাঘরের ওপাশে পুকুরটার জল বেয়ে লাল ব্যারাকে ঘণ্টির শব্দ যায়। লোহার খাটিয়ায় বসে পরবর্তী কর্মী জুতোর ফিতে আঁটে। কালো চামড়ায় ভারি বুট।

ঘণ্টার আওয়াজটা সম্মুখের উঁচু রাস্তা ডিঙিয়ে এপারে 'মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ে'র মাটির ঘরে। মাত্র আটখানা তালপাতার আসন পেতে একখানা কলাইয়ের বাটিতে এক থাবা নুন। খদ্দেরের আশায় পেতে রাখা।

যেহেতু বেলা ন'টা, অফিস-কাছারি খোলার মুখ। লাটঘাটের মানুষ হেঁটে বোট ডিঙিতে চেপে মহকুমা শহরে আসবে। উকিল মুহুরির সঙ্গে দেখা করে কিংবা কাজ সেরে খাওয়ার জন্যই তো এই ভাতের হোটেল।

জবারানী কাপড় ছেড়ে দোকানের সামনে জল ছড়া দেয়। ঘুঁটে পুড়িয়ে সামান্য ধুনোর গুঁড়ো দিয়ে ধুনাচিটা দোকানঘরে নাড়াচাড়া করে। দূরে কালীমন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম জানায়। মনে মনে প্রার্থনা করে, মাগো—এতো কষ্ট করে যোগাড়পাতি—খদ্দেরজন পাঠিয়ে দাও। দুটো পয়সার মুখ দেখি—

পথচলতি মানুষ। উকিল-মোক্তারের সঙ্গে কাগজপত্তর বয়ে নিয়ে যায় লোকজন, কাছারির পেশকার নাজির সিভিল সাপ্লাইয়ের লোক যায়। সদয়কুমার কাউকে চেনে না। কিংবা বোঝে না তাদের মধ্যে কে যে খদ্দের। খেতে পারে সদয়কুমারের নতুন হোটেলে! কী দিয়ে, কেমন করে যে একজনের পর আর একজনকে খদ্দের বলে সনাক্ত করা যায়? এতোদিন বাঁধা যজমান বা নিত্যপুজোয় শিবমন্দিরে পুজারী হিসেবে অর্জিত জ্ঞান তার সঙ্গে কতো বিপরীত যে এখন এই পরিস্থিতি!

দুজন চারজন করে লোক পথ দিয়ে চলে যায়। রিকশায় হর্ন টিপে চালক বয়ে নিয়ে যায় কালো কোট, সাদা পা-প্যান্টুল পরা বয়স্ক উকিলবাবুকে।

অতো দামী লোক তো এই দুঃস্থ ব্যবস্থায় সাজানো হোটেলের খদ্দের হতে পারে না। সঙ্গের মুহুরি-মক্কেলই তো খদ্দের—। হঠাৎ মনে হয় সদয় মুখুজ্জের, এটা যে হোটেল তা বোঝার উপায় কী? পাশে ঘড়ি-টর্চ সারাই দোকানটা তবু ক'খানা পুরনো টর্চ দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে। লোকের নজরে আসছে। কিন্তু···তখন টিনের ছাউনিতলায় কপালের মতো চ্যাটালো জায়গাটায় তাকায় সদয়কুমার। রঙিন ক'খানা বর্ণ জুড়ে সাইনবোর্ডটা দেখে। সামনের পথ দিয়ে মানুষ চলে যায়। সেই মানুষগুলোর মধ্যে মিশে থাকা খদ্দেরের উদ্দেশ্যে গলায় একটু জোর আনে সদয় মুখুজ্জে। পিচঢালাই রাস্তা—রাস্তায় চলতি রিকশা সাইকেল দু-একখানা গাড়ি বেরিয়ে যায়। সদয় মুখুজ্জে জন্মের গ্রাম ছেড়ে এসেছে, ছেড়ে গেছে ঘণ্টা নাড়িয়ে পুজোর ক্ষেত্রগুলো। তাই গলায় একটু জোর এনে হাঁক দেয় পথের লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, আসুন বাবু—আসুন খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থা আছে—আসুন—

গুড়ে-ভুঁড়ে মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। দু'জনের মাথা আঁচড়ে চুল ঠিক করে দেয়। কাচানো দুটো ইজেরের প্যান্ট দিয়ে বলে, ওটা খুলে একটা পর। ক'দিন পরে পুঁটলি থেকে খোলা প্যান্টে কেমন স্যাঁতা গন্ধ।

বাবা তখনও গলা ছেড়ে ডেকে যায়, আসুন বাবু, আসুন—ভোজনের সুব্যবস্থা—

লোকটার ফোলা হনু। চুল উঠে চওড়া কপাল। হাতে কাপড়ের ব্যাগে একগাদা কাগজপত্তর। নীলচে ওকালতনামা সাদা ডেমি পাটের দড়ি ঘিরে বাঁধা। হাতে গোল মতো রিস্টওয়াচ। লোকটা মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা ব্রজেনদার ভগ্নীপতির হোটেল— ?

সদয়কুমার পরিচ্ছন্ন পোশাকের মানুষটাকে বিনয়ে বলে, হ্যাঁ বাবু—

—ওপারের দেওয়ানি কোর্ট থেকে আসতেছি। দাও—তোমার হোটেলে খেয়ে আবার সেরেস্তায় যাবো—

মানুষটা মাটিতে বিছানো তালপাতার আসনে বসে। পুরনো আসন। শুকিয়ে খড়খড়ে। পাশে কাগজপত্তরের ব্যাগ। দু'পা মুড়ে আসনে বসতেই খড়মড় শব্দ। নুনের বাটিটা কাছে টেনে নেয়। মেজে ঝকঝকে সিলভারের গেলাসে জলটা রেখে যায় সদয়। মাটির মেঝে সামান্য উঁচু-নিচু। গেলাসটা বসালেও টলমল করে। সদয়কুমার পরম আত্মীয়ের আতিথেয়তায় হাঁটু মুড়ে জীবনের প্রথম খদ্দেরকে যত্ন করে ভাত-জলের ব্যবস্থা করে। গেলাসটা বসলে সদয় মাথা নত করে শুধোয়, বাবু—

—দাও। মাছ, ভাত, তরকারি যা আছে—

জবারানী কলাইয়ের থালা রগড়ে রগড়ে ধুয়ে একেবারে ঝকঝকে করেছে। মায়ের দেওয়া চালে সাদা ধবধবে ভাত সাজিয়ে পরিপাটি চুড়ো করেছে। থালার একধারে সবজি আর একটা কলাই বাটিতে মাছের ঝোল। গৃহিণীর অভ্যাসে দোকানির পণ্য সাজায়, গোছায়। জবারানী বলে, তুমি—বাবুকে ভাতের থালা ধরে দিয়ে এসো—। আমি ঝোল এগিয়ে দিচ্ছি—

সদয় মুখুজ্জে খদ্দেরের সামনে ভাতের থালাটা বসিয়ে দেয়। একটু থমকে দাঁড়ায় সদয়। ভাবে···এতোদিন তো আত্মীয়-কুটুম্ব-যজমানদের বাড়ি নিমন্ত্রণ বা সারাদিন পুজো-অর্চনার পর বাড়ির গিন্নিরা এই কুলব্রাহ্মণকে বসিয়ে অন্ন-ব্যঞ্জন ধরে দিয়েছে!

সদয়ের আত্মমগ্নতায় ঘা লাগে। স্ত্রী জবারানী মাথায় ঘোমটা আঁচলটা পেট কাপড়ে গোঁজে। হাতে মাছের ঝোলের বাটিটা ধরে মৃদু গলায় বলে, এটা বাবুকে দিয়ে দাও—

দেওয়ানি কোর্টের বাবুটা ভাতের থালাকে গোল করে একটু জল ছিটিয়ে তারপর প্রথম গেরাসটুকু গালে পোরে। সবজি মাখিয়ে ভাতটা দু-একবার চিবিয়ে ভেতরে চালান করে বাবুটা বলে, বাহ—বেশ রান্না করেছো তো গো ঠাকুরমশাই— ?

সদয় মুখুজ্জে ঠাকুরমশাই হয়ে তারিফ চায়, ভালো হয়েছে বাবু— ?

—বেশ ভালো হয়েছে। ঝাল-মশলা কম। মথুরাপুরে—আমার বাড়িতেও এমন রান্না চালু—

—আপনাদের ভালো লাগলে আমি দুটো খদ্দের পাবো তবু।

—নিশ্চয়ই। ব্রজেনদা বললো, দেবেনবাবু—যাও না আমার ভগ্নীপতির হোটেলে—। ভালো করে চালাও, আরও লোক পাঠাবো—

ঠাকুরমশাই দেবেনবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে। একটু ভেতরে রান্নাঘরের আড়ালে সব শোনে জবারানী। গেরস্ত বউয়ের মতো ব্রীড়াময়ী হয়ে। পরক্ষণে ভাবে জবারানী, একজন কুটুম্ব এলে তো দুটো কথা বলতে হয় খেতে দিয়ে। কিন্তু এখানে ? এই খাদ্য-খাবারের বিনিময়ে তো দাম—পয়সা। তাহলে একজন রাঁধুনি কিংবা দোকানের গিন্নি হিসেবে কেমন আচরণটা যে হওয়া উচিত!

খোলা দোকানঘরে একজন মানুষকে খেতে দেখে পথচলতি মানুষটা থমকে দাঁড়ায়। মানুষটা গুড়ে ভুঁড়েকে বলে, হ্যাঁ খোকা—এটা হোটেল ? হাবার মতো দাঁড়িয়ে চণ্ডমণ্ড করে বাচ্চা দুটো।

ঠাকুরমশাই হুমড়ি খেয়ে ছুটে আসে, বাবু বলুন—

—হোটেল ? খাবার পাওয়া যাবে ?

—হ্যাঁ, আসুন, আসুন—

দেবেনবাবু ভাতে ঝোল মাখিয়ে লোকটাকে বলে—এমন মাটির ঘরদোর হলে কী হবে, রান্না খুব ভালো—

লোকটা দ্বিধা কাটিয়ে বলে—এক্ষুণি হবে—

—বসুন, দিচ্ছি—

দেবেনবাবু আরও বলে—কেন হবে না ? এই সকালবেলায়—

আর একটা খদ্দের পেয়ে জবারানী রান্নাঘর থেকে কাঠের ওপর শালগ্রাম শিলাকে প্রণাম জানায়। তার গ্রাম্য গেরস্তালিতে কখনও মনে হয় না, এটা অফিসটাইম। কোর্ট-কাছারি খোলা। মানুষজনের ভিড় বেড়েছে পথে। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে। চাপরাশি দাদার গোপন প্রচার

বিজ্ঞাপন···বরং মনে হয় ঘরের ওই ঠাকুরটার করুণা। তাই নারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যত্নে থালা ধোয়। ভাত বাড়ে। গুছিয়ে গুছিয়ে ভাত বাড়ে।

ঠাকুরমশাই নতুন খদ্দেরকে জলের গেলাস ভাতের থালা ধরে দেয়। দেবেনবাবু বলে, মুখ ধোওয়ার জল?

সম্মুখের কোণে মাঝারি সাইজের জালা। মগ ডুবিয়ে জল ধরে দেয়।

গুড়ে-ভুঁড়ে দেখে। মানুষগুলোকে পেট ভরে তারিয়ে তারিয়ে খেতে দেখে। দেবেনবাবু ডাকে, ও ঠাকুর—

সদয় কাছে আসে।

দেবেনবাবু বলে, কতো দাম?

—দিন না। অন্য হোটেলে তো খেয়েছেন—

—সেই দাম দেবো? ভালো কথা, রাতে রান্না হবে তো?

—কেন হবে না?

—তবে রাতেও খেতে আসবো—

নতুন খদ্দেরটা খায়। দেবেনবাবু গুনে গুনে ঠাকুরমশায়ের হাতে পয়সা বুঝিয়ে দেয়। গুড়ে-ভুঁড়ে বাপের হাতে অনেকগুলো পয়সা দেখে। মানুষটা ভাত খেয়ে পয়সা দিয়ে যাচ্ছে। দেখে তেমন অবাক হয় না বরং দরিদ্র সংসারে পয়সা যে কী পরিমাণ দুর্লভ সামগ্রী সেটা স্বল্প জ্ঞান হলেও একটা আতঙ্ক কাজ করে। সেজন্যই আরও পয়সা আসুক—আরও খদ্দের ঢুকুক এরকম একটা ক্ষীণ বিবেচনা থেকে গুড়ে খালি গায়ে জোরে জোরে হাঁকে, আসুন বাবু—আসুন—খাওয়া দাবা—, আর মেলাতে পারে না বাচ্চাটা। গুড়েকে নকল করে ভুঁড়েও হাঁকে, আছুন বাবু আছুন ভালো খাবা-দাবা আছুন—

মোটা-সোটা লোকটা চারজন সাক্ষী নিয়ে হাজির। মোটা লোকটা ডাকে, কই গো ঠাকুরমশাই? বাসুদেবদা পাঠালে। খাবার হবে? ঠাকুরমশাই হাত জোড় করে বলে, হ্যাঁ বাবা হবে—

গুড়ে ভুঁড়ের শিশুমনে প্রতীতি জন্মায় তারা ডাকছে বলেই খদ্দের আসছে।

মা জবারানী এঁটো থালা তুলতে তুলতে বাচ্চাদের দিকে আনন্দে তাকায়। বাচ্চারা তখন রাস্তার লোক দেখে হাঁকে, আছুন বাবু—আছুন—

ভীষণ তাড়াহুড়োয় থালা ধোয়, গেলাস ধোয় দুই স্বামী-স্ত্রী। ভাত সাজায় জবারানী। হাতায় করে যত্নে মাছ তুলে ঝোলের বাটিতে ভরে। খদ্দেররা উকিলের নামে বলে, ইচ্ছে করে দিন ফেলালে মণ্ডলবাবু—

আর একজন বলে, দাদা বলেছিলু ধীরেন মুখুজ্জেকে দিয়ে মামলাটা মুখ করাও। শুনলেনি—

পাঁচটা গেলাস বসিয়ে যায় ঠাকুরমশাই। নুনের বাটিটা টেনে দেয় পাঁচজনের মাঝামাঝি।

জবারানী রান্নাঘর ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে দু'হাতে দু'থালায় ভাত। ঠাকুরমশায় ভাতের থালাগুলো নিয়ে ধরে দেয় খদ্দেরের সামনে। মাছের

ঝোলের বাটি একটা একটা বয়ে নিয়ে যেতে যে অনেকক্ষণ লাগবে ? অথচ সংসারে বউ হিসেবে এসে প্রথম শিক্ষা দিয়েছিলো শাশুড়ি, খেতে বসিয়ে একসঙ্গে তরকারি মাছ থালায় সাজিয়ে আনবেনি। যা দেবার একজনকে দাও। পরের জনকে আবার গিয়ে দিয়ে এসো—। যত কষ্ট হোক, যতোবার যেতে হোক—মেয়েমানুষকে এ-ক্লেশটুকু মেনে নিতে হবে। তবে তো সংসারের সকলে তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ভালোবাসবে, আপন করে নেবে ?

পাঁচজনের জন্য পাঁচ বাটি মাছের ঝোল। কেমন করে যে গুছিয়ে দেবে লোকটাকে ! লোকটার তো একবার এসে একটা নিয়ে আবার পরেরটা আনায় কষ্ট। ভোজনরত মানুষগুলোও তো মাছের ঝোলের জন্য বসে বসে বিরক্ত হবে। এমতাবস্থায় সংসারের বৃদ্ধা শাশুড়ির গেরস্তালি শিক্ষা আর নতুন জীবিকায় প্রবেশ করে দ্রুত ব্যঞ্জন সরবরাহ—কোনটাকে যে বেশি গুরুত্ব দেবে সেটা স্থির করতে না পেরে ভীষণ সঙ্কটে জবারানী।

সদয়কুমার স্ত্রীকে বলে—কই গো, থালায় সাজাওনি ?

—সাজাবো ?

—হুঁ। ওরা কোটকাছারির লোক—একটা একটা করে কতক্ষণ নে যাবো—

—সাজাই তাহলে ? অনুমতি চায় জবারানী।

রেগে ওঠে সদয়, ঠাট্টা হচ্ছে ?

কলাইয়ের থালায় ঝটপট সাজিয়ে ধরে দেয় স্বামীর হাতে। বলে, এই নাও—

একটু মিচকি হাসিতে গরিব নারীমুখ উজ্জ্বলতা পায়। প্রথা ভাঙায় নয়, সময়ের চাপে কেমন করে সদয়কুমারদের তৈরি গেরস্তালি গুঁড়ো হয়ে যায় খেয়াল করতে পারে না সদয় মুখুজ্জে।

খদ্দের পাঁচজন খায়। দ্রুত খেয়ে নিতে চায়। আবার তো তাদের উকিল-মুহুরির সঙ্গে সাক্ষাৎ। সুতরাং তাদের জরুরি ভিত্তিতে খেয়ে নিতে হয়।

রুগণ চেহারা ছেঁড়া ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে গা জড়ানো। ফর্সা রঙ হারিয়ে কালচে পিটে মা বুকে বাচ্চাটাকে নিয়ে ডান হাতে কলাই-চটা ডিশ ধরে হাঁকে, মা গো—দুটো ভাত দিবি মা—

মাথায় মাথায় দশ, আট, ছ'বছরের বাচ্চা তিনটে ছেলে মেয়েও সুর ধরে, দে না মা। কদ্দিন ভাত মুখে দিইনি—

সদয়কুমার ছুট্টে বেরিয়ে আসে, ভাত কোথায় পাবো মা—। এ কি আমার চাষের চাল ? বাকি করে দোকান—আবার বেচে তাদের দাম—

বাচ্চা কোলে মা আবার সুর ধরে, দিবিনি বাপ্—দুটি খানেক দে—।

খদ্দেররা চেঁচিয়ে ওঠে—ঠাকুরমশায়, ওদের সরাও—। এমন করে কি খাওয়া যায় ?

গ্রামদেশে যজমানের আতপচাল প্রার্থী সদয়কুমার চকিতে ঠাকুরমশায় হয়ে খদ্দেরদের মন জয় করতে চেঁচায়—সরে যাও এখেন থেকে—সরে যাও—

—কোথায় যাবো বাবা ?

—যাও না দেশের দিকে। যার ঘরে চাল-ধান আছে—দুটো ভাত দেবে 'খন।

দশ বচ্ছরের মেয়েটার গা বুক আলগা। ছেলেগুলো ন্যাংটো। গুড়ে-ভুঁড়ে দু'ভাই দেখে। একবার বাবার দিকে তাকায়, একবার সমবয়সী ছেলেগুলোর দিকে তাকায়।

বাচ্চা বুকে শীর্ণকায় মা পিনপিনে গলায় বলে, দেশে কেউ একটু ফ্যানও দেয় নে গো বাপ্। সক্কলে বলে, শহরে যাও—গরমেণ্ট শহরে জমিয়ে রেখেছে—

খদ্দের পাঁচজন বিব্রত হয়ে ভাতের থালা ঘুরিয়ে নেয়। তালপাতার আসন সরিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষ, মানুষের শিশুসন্তানদের দিকে পেছন ফিরে বসে।

খদ্দেরদের এমন বিপন্নতা দেখে জবারানী বেরিয়ে এসে মেয়েটাকে সানুনয়ে বলে, সবে—খোলা দোকানপাট। ভাত দিতে পারবুনি রে মা—

বাচ্চা কোলে মা-টা বলে, ফ্যান দিবি গো মা—

—ফ্যান···হুঁ দুবো। একটু সরে ওদিকে বসো—

যেন মোহিনী মন্ত্রে অবশ করে দিয়েছে একটা বড়সড় আক্রমণ। খদ্দেররা খেয়ে উঠে দাম দেয় মাথাপিছু দু'আনা। হলদে রঙের চারকোণা দু'আনি। পাঁচজনের দাম মিটলে মোটাসোটা লোকটা বলে, ঠাকুরমশায়, খাবার জায়গা একটু পর্দা ঘেরো। এরকম হলে লোক খাবে কী করে?

নতুন মেজলার ফ্যান বালতিতে কাটায় জবারানী। মা, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হাতে নিজ নিজ ডিশ। কাণ্টা উঁচু গোল পরিসর। যে কোনো ধরনের খাদ্য-খাবার হোক, একটুও না অপচয় হয় তার জন্য সস্তা তোবড়ানো পাত্র।

মা ডিশ বাড়ায়। জবারানী বাটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে ডিশ ভরায়। দশ বছরের মেয়েটা সিলভারের তোবড়ানো বাটি ধরে তাকিয়ে থাকে জবারানীর দিকে। ভরে দেয়। সর পড়ে। মোটা মাড়।

কোলের বাচ্চাকে একচুমুক খাওয়ায়। নিজে খায়। মেয়ে দুটো আর ছেলেটা চোঁক চোঁক করে ক্ষুধার্ত পেটে ভাতের গন্ধে ভাতেরই নিষ্কাশিত তরলটুকু ভরে দেয়। ধোঁয়াটে চোখ ঝিম ধরে; পেটের মধ্যে কল কল শব্দ।

বালতির তলায় দু-চারখানা ভাত ফ্যানেরই অবশিষ্টে। নজর যেতে মা-টা জবারানীকে বলে, দিবি মা ওই কটা ভাত— ?

জবারানী বালতি উপুড় করে ঢেলে দেয় মা-টার ডিশে। বাচ্চাটা কোল থেকে মুখ বাড়ায়। ফ্যানের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে একটা ভাত খোঁজে। যেন পুকুরঘাটে কানের সোনা-গয়না পড়ে গেছে—হাঁচায়······হাত দিয়ে ফ্যানের মধ্যে ভাতের দানা খোঁজে। একটা পেতেই হড়হড়ে আঙুলে ভাতটা টিপে কোলের বাচ্চার গালে দেয়। সদ্যগজানো সামনে দু'খানা কচি দাঁতেও ওই ভাতটুকু কুলোয় না। দেশের ধান-চালে ওইটুকু শিশুর দাঁতের পরিমাণ খাদ্যকণা এদেশেরই শিশুটা পায় না। তখন সানন্দে চিবোয় ফর্সা কটা চুল, নীল পিটপিটে চোখে তাকিয়ে সুস্বাস্থ্যে ভবা শিশু শান্ত সরল অবোধ মনে। নদী-সমুদ্র পার হয়ে ইংলন্ডের মাটিতে ভারতের তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যশস্য।

গুড়ে-ভুঁড়ে বাচ্চাটার কচি দাঁতে ভাত চিবনো দেখে।

গায়ের চামড়া হাড়গোড়ে জড়িয়ে পাতলা ন্যাতাকানি। চোখগুলো খোঁদলে। ফ্যানের ভারে শুকনো শরীরে পেটগুলো ডাবরা। খিদের দাহে ফ্যান পড়তে চোখে-মনে খানিক যন্ত্রণা লাঘব।

বাচ্চা কোলে মা বলে, ও মা—

—উঁ।

—ডিশগুলো রেখে যাবো? ফ্যান ঢেলে রাখবে—

—হুঁ।

রান্নাঘরের পেছনে ধোয়া ডিশগুলো থাক দিয়ে সাজানো থাকে। মানুষের খাদ্যে ভরে উঠবার জন্য।

ছয়

যতো সন্ধ্যে বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি ঝিমিয়ে যায় এই মফস্বল শহরটা। দোকানের আলো কারবাইটে জল দিয়ে গ্যাসলাইট, দশ-বিশখানা হ্যাজাক আর রিংয়ে ঝোলানো বড় ডে-লাইট সোঁ-সোঁ শব্দে জ্বলে। ম্যান্টেল থেকে আলো গোটা-দোকানময়। কাচের আলমারি, জিনিসপত্তরের মোড়কে রাংতা ঝলমল করে।

সারাদিনের কোর্টকাছারির মানুষজন কাজ সেরে বোট-ডিঙি চেপে পালে হাওয়া লাগিয়ে ঘরমুখো। যারা রাস্তা পোটের কাছাকাছি, নতুন মাটি পড়ে নির্মীয়মান সড়কের ওপর চলার মতো কালো ট্যাক্সিতে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে। প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে ট্যাক্সি উপচোয়। ট্যাক্সির ডালা আটকায় না। লক ঠেলে বেরিয়ে আসে। তখন মোটা নারকেল দড়ি দিয়ে ডালার সঙ্গে পাশের হাতল বাঁধা। গাড়ি ছুটলে বাতাসে নতুন ফেলা মাটি শুকিয়ে ধুলো। প্যাসেঞ্জারের চোখে নাকে মাথার চুলে। গাড়ি থামলেই গরম, চললেই পৃথিবীর ধুলো সেঁধিয়ে যায় যন্ত্রযানটার অন্দরে। সেই সময় আবাদে একমাত্র যন্ত্রযান।

রাস্তাঘাটে মানুষ কমে। থানাবাড়ির ভিতর থেকে হ্যাজাক লাইটের আলো দরজা ফুঁড়ে উঁচু দাওয়ায় গড়ায়। সিঁড়ির নিচের ধাপে দু'পাশে পোঁতা কামানের দু'খানা মুখ সুচলো অকেজো গোলা। নিস্তেজ গোলার গায়ে এখন গড়ানো আলোর ছিটেফোঁটা।

ঠাকুরমশাইয়ের হোটেলে পিতলের লম্ফো বড় শিস কেটে জ্বলে। দশ হাত বাই পঁচিশ হাত পরিসরে সে আলো নিতান্তই ক্ষীণপ্রভ। সম্মুখভাগের একধারে খেজুরপাতার চ্যাটাই পেতে দুই বাচ্চা হাওয়ায় ঘুমোয়। ক'দিনে একটা কুকুর আদুরে হয়ে গেছে। চ্যাটাইটার ধারে চার পা মেলে ঘুমোয়। কুকুরটার ঘুম ছটকে গেলে চোখ পিটপিট করে তাকায়। জবারানী কুকুরটাকে বলে, কেলো—ছেলে দুটোকে দেখিস—।

রোগা সরু নাকে ফর্সা মুখ মানুষটার। দাঁতে পানের কষ, ঠোঁট লালচে। পা দুটো টলমলিয়ে হাঁটে। রোগা পায়ে চামড়ার চটি। ফিনফিনে ধুতি-

পাঞ্জাবি পরে। সোজা সিঁথে কেটে চুল পাট করে চিরুনি টানা। হাতে পুরনো আমলের ঘড়ি বাঁধা। রোগা চিমসানো শরীর হলেও আভিজাত্যের চটক আছে। চটিতে একটা ঢিলের ঠোক্কর সামলিয়ে সোজা দাঁড়ায়। দু'পা হেঁটে দোকানের সামনে। ডাক দেয়, সদয়—ও সদয়!

ঠাকুরমশাই সদয়কুমার লম্ফোর আলো কেটে দশ বাই পঁচিশ হাত ভূমিতল আর ছাউনিটুকুর মালিকের দিকে নজর করে। সম্মুখের রাস্তাঘাটের আবছায়ায় দাঁড়িয়ে মানুষটা। রান্নাঘর থেকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে সদয়-কুমার। কাছাকাছি এসে ব্যস্ত হয়ে দু'হাত জোড় করে বলে, বাবু—আসুন বড়বাবু, আসুন—

এমন বিনীত জোড়হাত দেখে রায়বাবুর চোখের সামনে বুধাখালির লাটে আড়াইশো বিঘের এক লপ্তে জোতজমির ওপর বাইশ ঘর প্রজার এক ঘর বলে মালুম হলো। খুশি হয়ে বলে, তুই লম্ফো জেবলে কী কারবার করবি রে?

তখনও জোড়হাতে সদয়কুমার।

রায়বাবু আবার বলে, একটা হ্যাজাক-ট্যাজাক কেন—

—এক্ষুণি পারবোনি বাবু। আপনাদের দয়া থাকলে হয়তো পারবো—

সদয়কুমারের কথায় তোষামোদ থাকলেও টের পায় চালাকি নেই। বরং সমর্পণের সুর। রায়বাবুর মধ্যে হঠাৎ একটা কিছু জারি করার লোভ জেগে ওঠে। তখন পাশের ঘড়ি-টর্চ সারাই দোকানি নিজেরই একখানা টিনের চেয়ার এনে বলে, বড়বাবু—বসুন।

লিজ নিয়ে ইরিগেজন বিভাগের বাঁধের ঢালে রায়বাবুর ক'খানা দোকানঘর ভাড়ায়। ভাড়াটেরা ভীষণ সম্মান দিচ্ছে। সে-সম্মান চাষামজুরের কাছ থেকে নয়, একেবারে মফস্বল শহরের দোকানদার ভাড়াটেদের কাছ থেকে তো!

লোকগুলো খালি গায়ে ছেঁড়া টেনা পরে নয়, যাহোক নিজের গ্রামপাড়ায় ঘরদোর আছে, দু-চার বিঘে জমিজমা আছে, দু-এক বর্ণ লিখতে-পড়তে পারে —তারাই সম্মান জানাচ্ছে। মর্যাদার ক্ষেত্র বড়লাটদারের কাছ থেকে পাওয়া চকদারি জমির চাষীদের পরিবেশ থেকে আরও একটু বেশি ভিত, বনেদে গড়া মানুষগুলোর কাছেই পাচ্ছে রায়বাবু। ফলে জমিদারি ফরমানের ইচ্ছাটা উগ্র হয়ে ওঠে! মানুষগুলোকে বিস্মিত করে জমিয়ে রাখার যে কতো সুখ ক্রিয়া করে। কতো ভালো লাগে যে রায়বাবু যখন বুধাখালির লাটে বিঘের পর বিঘে জমি জুড়ে এক লপ্তে আড়াইশো বিঘের ভূমি দু'চোখ মেলে দেখে! চোখের মণিতে আরাম……এগুলো আমার……এই ভাড়াটে জ্যান্ত মানুষগুলোও আমার…।

কাচা ধবধবে জামাকাপড়ে ওধারের বড় দোকানদার গিরিবাবু। বাড়ির সাজা পানের ডিবেটা আঙুলের চাপে ঘটাং করে খুলে রায়বাবুর সামনে ধরে বলে, কই জমিদারবাবু--নিন। জর্দা আলাদা আছে—। দিচ্ছি—

পানটা নিয়ে জড়ানো গলায় বলে, গিরি--তুই আমাকে ঠাট্টা করছিস?

—ছিঃ।

—না হয় তুই রেডিও সাইকেল ডে-লাইট পাল-ত্রিপল সব ব্যবসা করে বড়লোক হইছিস। আমার ঘর থেকে তো হয়েছিস ?

—একশো বার।

—দে না, মুখ দিয়ে মদের গন্ধ ছোটে।

—কী বড়দা ?

—সদয়কে একটা হ্যাজাক—

—দোবো। কবে নেবে বলুক—

—এখন দাম দিতে পারবে নে।

—না পারুক। ডেলি, না হয় সাতদিন অন্তর দেবে ?

—ওই তো যা। নিয়ে নিবি একটা ব্রাইটেক্স পেট্রোম্যাক্স—

—কতো দাম ? জানতে চায় সদয়কুমার। সবে কদিনের নতুন দোকান।

লাটঘাটের ভূস্বামী। এই মফস্বল শহরে পাকা ঘর-দালান। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে ধানকলের মালিক, বড় দোকানদার স্বদেশী করা লোকজনের সঙ্গে রায়বাবুও জুটে গিয়ে লম্বা সড়কটার পাশ ধরে দাগ নম্বরে পার্ট পার্ট করে বন্দোবস্ত নিয়েছে লং টার্ম লিজে। ডি. সি. আর.-এ। সরকারি জমি রূপান্তরিত করে ড্যামেজের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়। রায়বাবু সে জায়গায় ঘর বানিয়ে ভাড়াটে বসিয়ে চাষীরই রূপান্তরিত চেহারা দেখছে। সুতরাং একই সঙ্গে লাটের ভূস্বামী শহরে বাড়িওয়ালা। আলাদা ইজ্জতে চলা-ফেরা। সেই তাপে ফরমান জারি করার জো খোঁজে। জল বর্ষায় মাটি ভিজলে তো হাল লাঙল নামাবার জো ?

সদয়কুমার বলে, অতো দামের আলো। শোধ দিতে পারবো ?

জো পেয়ে রায়বাবু বলে, পারবি, পারবি। যাহ—তোকে ভাড়া দিতে হবে নে। শুধু পানে খাবার একটা কিমাম রোজ সন্ধ্যেবেলায় কিনে দিবি—

বড় দোকানদার দোহারকি দেয়, তবে ? এতো বড় ঘরের এ আবার একটা ভাড়া ?

সাত

বিকেল থেকে বাবার সঙ্গে গুড়ে-ভুঁড়ে ব্যস্ত। একখানা লোহার রড সংগ্রহ করেছে সদয়কুমার। সেটাকে বাঁকিয়ে ইংরেজি লম্বা 'এস'-এর মতো। 'এস'-এর এক মাথা কীভাবে যে টাঙানো যায় ! টিনের ছাউনির বাটাম কাঠামো তো অনেক উঁচুতে। তাই ছাউনির উচ্চতার দিকে তাকিয়ে সদয় একটা উপায় বাৎলাতে চায়। সঙ্গে গুড়ে-ভুঁড়ে। তারাও বাপের লক্ষ্যস্থলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাঠের বাটামের ওপর খাঁজ কাটা টিন। দু-একটার নাট খুলে জোড় মুখের ফুটো দিয়ে আকাশের আলো আন্দাজ করে। ওইটুকু নাট স্ক্রু-র বিঁদ মাত্র—সেটা দিয়ে আকাশ দেখার খেলায় মেতে ওঠে দু'ভাই।

সদয়কুমার তখন ভাবে, হাত দশেক মোটা তার এনে পেঁচিয়ে বাটাম থেকে

ঝুলিয়ে দিলে কেমন হয়? পরক্ষণে মনে হয়, অতো উঁচু—বাটামের কাঠ-ছোঁয়া যাবে কেমন করে? একখানা মই তো লাগবে। হঠাৎ মনে হলো ঘড়ি-টর্চ সারাই দোকানির তো আছে। অতএব দেরি না করে পাশের দোকানিকে বলে, আপনার মইটা দেবেন গো দাদা—?

মোটা মোটা শালখুঁটির ওপর বাঁশ কাঠের কাঠামো। শালের গায়ে ছাল বাকল এখন ঘুণ ধরে ফোঁপরা। গুড়ে-ভুঁড়ে খুঁটিটার গায়েই হাত দিতেই ভট্ করে ছালটা ফুটো হয়ে যায়। ভেতর থেকে পোস্তর মতো কাঠকোরা দানা বেরোয়। ভীষণ মজায় ছেলে দুটো মগ্ন।

সদয়কুমার মইটা টেনে টেনে আনে। মাটির ছিটেবেড়া থেকে এঘর ওঘর পার্টিশন। মইটা দেওয়ালে ঠেকা দিয়ে ওঠে সদয়কুমার। মোটা তার গোছা বাটামে বেঁধে—সেই ফাঁসে লোহার 'এস'টা ঝুলিয়ে দেয়।

ভুঁড়ে বাবার কর্মকাণ্ড দেখে আকুল বিস্ময়ে! গুড়ে নতুন আলোটার কাছে দাঁড়িয়ে পাম্প দেওয়ার জায়গা দেখে। ম্যান্টেল খাটানো গোলাকার পরিপার্শ্বে ঝকমকে কাচের খাঁচাটা দেখে। পিন করার কানমোড়া নবটা দেখে। দেখতে দেখতে ভাবে, এতো আলো দেয় কেমন করে! আশপাশের দোকানপাটেও তো এমন আলো জ্বলে!

লাল কেরোসিনের বড় বোতল এনে সদয়কুমার হ্যাজাকের পাশে রাখে। পিন, একটু ন্যাকড়া দেশলাইও কাছে রাখে। গুড়ের পর্যবেক্ষণ এতোক্ষণ খেয়াল করেনি ভুঁড়ে। ছুটে চলে আসে হ্যাজাক লাইটটার কাছে। আলোর কেরোসিন ভরা চকচকে আধারটার গায়ে তাদের দু'জনের মুখ ফুটে ওঠে। আয়নার মতো কাজ করে।

ক্রমে ক্রমে শীত এগিয়ে আসছে। দু'খানা পুরনো জামা একটু সাবানকাচা করতেই বেশ ঝকঝকে। জবারানী বলে, তোরা গায়ে দে। নতুন হাওয়া। ঠাণ্ডা লাগলে গাল-গলা ফুলবে যে—

ইসলামিয়া হোটেলের মালিক মকবুল সাহেব চেক লুঙ্গির ওপর আধ-ময়লা সাদা গেঞ্জিটা পরেই চলে এসেছে। সঙ্গের লোকটা খালি গায়ে হৃষ্টপুষ্ট। মাথার মধ্যিখানে চুল অনেক ফাঁকা হয়ে কাঁচাপাকা স্পষ্ট। ফুকফুক বিড়ি টেনে মকবুল সাহেব বলে, ও সদয়দা—

নতুন হ্যাজাকে কেরোসিন তেল ভরতে ভরতে তাকায়, খবর কী গো বড়ভাই—

—তোমার কাছে।

একখানা তালপাতার আসন বাড়িয়ে দিয়ে বলে, বসো ভাই—

মকবুল বসতে বসতে বলে, কই গো মতিদা, বসি এসো—

সদয়কুমার হ্যাজাকের তেল-মুখ আঁটতে আঁটতে বলে ছেলেকে, বাবা গুড়ে, আর একটা আসন দে তো ওই বাবুকে—

প্যাঁচ আঁটা হলে হাতটা শুঁকে দেখে সদয়কুমার। কেরোসিনের গন্ধ তিন আঙুলে। ন্যাকড়ায় মুছে বলে, হ্যাঁ—কি খবর দাদা?

মকবুল বিড়িটার শেষটুকু টেনে পাশে ফেলে দেয়। গালের ধোঁয়া উগরে বলে, চলছে কেমন দোকান?

—এই টুকটাক।

—চাল নাও কোত্থেকে?

—যে দোকানে মুদি-বাজার করি।

মতিলালকে কাছে ডেকে মকবুল পরিচয় করিয়ে দেয়।—আমরা তো এর কাছ থেকে নিই মণ হিসেবে—

—এক মণ করে ডেলি। বেশ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে সদয় মুখুজ্জে।

—দুস! আমার হোটেল কি কোলকাতায়? এইটুকু গেঁয়ো টাউন তার আবার কতো খদ্দের যে ডেলি এক মণ খাওয়ার খদ্দের পাবো?

সদয় শুনে যায়। মন্তব্য করে না।

মকবুল শুরু করে, মতিদা বলছিলো, তুমি ওর কাছ থেকে চালটা নাও। রোজ সকালে গাড়ি আনে। বস্তা নামিয়ে দেবে।

—তারপর দাম?

—একটা বেচে দাম শোধ দেবে। আর এক বস্তা দিয়ে যাবে—

সদয়কুমার খুব শান্ত গলায় বোঝায় মতিলালকে, আমার ছোট দোকান। একটু রয়েসয়ে নিতে হবে মতিবাবু—

—হুঁ-হুঁ, হবে-হবে। আপনি ঠিক থাকলে আমিও ঠিক আছি—

চালব্যাপারী মতিলালের আশ্বাসে মনে জোর পেলেও সদয়কুমার হঠাৎ চলে যায় নিজের গ্রাম ভূমিতে। ইস্পাহানি শ'ওয়ালেশের দালাল ফড়েরা চাল কিনছে, দেশময় একমুঠো ভিক্ষের অন্ন জুটছে না সেই কটা মাস! পুজোর নৈবেদ্য তণ্ডুলহীন। আর আজ···চালের জন্য সওদাগর ঘর বয়ে! এখনও চাল-ফ্যানের যে কতো কষ্ট। ছ-সাতখানা ফ্যানের ডিশ তো রান্নাঘরের পেছনে। মনে মনে সদয়কুমার মা অন্নপূর্ণা, নারায়ণকে গড় জানায়। মাগো—সেই দুঃসহ দুঃখের গ্রামে যেন ফিরে যেতে না হয় মা···

জবারানী রান্নাঘরের মুখ থেকে দাঁড়িয়ে শুনছিলো সব। হুট করে পুরুষ-মানুষদের আলাপ-আলোচনায় যেতে বাধে। শুনে যেটুকু গ্রহণ করেছে তার প্রতিক্রিয়ায় প্রশ্ন রাখে, চালে ভাত বাড়বে তো?

মতিলাল খুঁজে প্রশ্নকারীর অবস্থানটা দেখতে চায়। জবারানীকে দেখে পাকা চাল ব্যবসায়ীর মতো বলে, মা—একদিনের জন্য কি বেচতে আসবো? দোকানের জন্য চাল—খারাপ হলে দোবো কেন?

আবার বিড়ি ধরায় মকবুল। পাশে নতুন লাইট। বিড়িটায় এক টান দিয়ে লাইটটাকে দেখিয়ে বলে, কতো নিলো—?

হাসে সদয়কুমার। দামের হিসেব কিছুই হয়নি। শুধু সপ্তাহে সপ্তাহে দু-পাঁচ টাকা দিয়ে গেলে হলো। তারপর তো হিসেব। তাই তেমন মুখ খুলে কিছু বলতে পারে না। পারার মতো তথ্যও তার কাছে নেই। মকবুলের কথার উত্তর দিতে সদয়কুমার বলে, বাকিতে—

—কার দোকান ?

—গিরিবাবু—

—সাবধান। তাল পেলে সাতকে সতেরো করতে ওস্তাদ কিন্তু গিরিবাবু—

সবিস্ময়ে সদয়কুমার বলে, তাই নাকি !

বুকটা কেঁপে যায় জবারানীর। কীসে যে কী ঘটে যায় ! সারাজীবন ঋণ বইতে হবে নাকি…এরকম ভেবে উসখুস করে জবারানী। এক্ষুণি স্বামীকে সতর্ক করতে চায়। কিন্তু মকবুল আর মতিলাল যায় কই ?

মকবুল আবার বলে, কোর্টটা তো ওদিকে। এস. ডি. ও. ম্যাজিস্ট্রেটরা সিভিল সাপ্লাই—কোর্টের কাছে জমজমাট। ওদিকে দোকানটা হলে ভালো হতো।

—তা হতো, সদয়কুমার নিজের দীনতা জানায়। পরমুহূর্তে বলে, তোমার দোকানঘর যাই হোক কোর্টের কাছগোড়ায়—

—তাই দু-পাঁচ জন খদ্দের পাই। আল্লা চালিয়ে দিচ্ছে—

মতিলাল উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি বার হবো যে—

—তুমি বার হবে আর আমি থাকবো ? এরা খেতে দেবে ?

—কেন দুবোনি ভাই ? সদয় সহ-ব্যবসায়ীকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়।

দোকান ঘরের বাইরে ক্ষীণতর আলো। ঘরের ভিতরে ক্রমে ঝাপসা। আলোটা জ্বালার দরকার। দুই ভাই রাস্তায় লোকজন দেখে। হঠাৎ থানার পেটা ঘড়িতে ঢং…আওয়াজটা কানে আসে। পর পর ছ'টা।

মকবুল চলে যেতেই লাইটে পাম্প করে সদয়কুমার। হাটের ময়রা দোকান, মচ্ছবের প্যান্ডেলে দু-পাঁচবার পেট্রোম্যাক্স জেলেছে। সেকারণে একটা গভীর আগ্রহে হ্যাজাক জ্বলায় মন দেয় সদয়কুমার। এতদিন পরের আলো পরের ঘরে জেলে দিয়ে এসেছে। আজ নিজের ঘরে নিজে আলো জ্বালতে জমাট মগ্নতা !

স্ত্রী জবারানী আস্তে করে ডাকে, শুনলে—

সাড়া পায় না।

আবার ডাকে, তুমি এক্ষুণি যাও।

পাশে তাকায় সদয়কুমার, কোথায় ?

—ওই গিরিবাবু নাকি, কে ?

—কেন ?

—কেন আবার ? আমাদের কৃষ্টবাবুর মতো লোক কি না কে জানে। একবার গয়না বন্দক দিলে যতই সুদ দাও—শোধ আর হয় না। যদি তেমন লোক হয় গিরিবাবু ? হপ্তায় হপ্তায় দিয়ে গেলেও—যদি বলে আরও বাকি—আরও বাকি—

ম্যান্টেলের গায়ে আগুন। নতুন ম্যান্টেলের সাদা রঙ পোড় ধরে লালচে। জবারানীর কথাটা মন্দ নয়। একটা আশু বিহিত তো দরকার। ধেনো চাষা জোত জায়গার দেশ থেকে টাউনে এসে ব্যবসায়ী কলাকৌশল তো অন্যরকম হতেই পারে !

এখন লাইটটায় পাম্প দেওয়া জরুরি। সদয়কুমার এক হাতে হ্যাজাকের তলাটা ধরে পাম্প দেয়। পাশে যুবতী স্ত্রী। একটা অন্যরকম ঠাট্টার অনুভব কাজ করে। দুই স্বামী স্ত্রী ফিক করে হাসে। বাচ্চারা এ হাসির মর্ম বোঝে না। তারাও বাপ মায়ের হাসিতে যোগ দেয়। একটু হাসির দমক কমলে সদয় বলে, রায়বাবু আসুক—

ধীরে ধীরে চরাচরে আঁধার। আঁধার নেমেছে পৃথিবীর গোলার্ধে। বিষিয়ে যাওয়া যুদ্ধক্ষেত্রের কোথাও। নিজেদের দশ হাত বাই পঁচিশ হাত দোকান ঘরের মধ্যে অন্ধকার। সদয়কুমার পিন মারে। কাঁচের ভেতর থেকে আলো ছিটোয়। ন্যাতা পোঁছায় জীর্ণতা লুকোনো ঘরময় আলো। পথচলতি মানুষ দু-চারজন হঠাৎ আলোর আবেশে 'মহারানী হিন্দু ভোজনালয়'এর দিকে তাকায়।

বাচ্চা দুটোর জামায় চিকমিক কাটে। দু-ভাই কেমন অদ্ভুত আনন্দে হাসে। দোকানঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। তাদের মাথায় ঢোকে নতুন আলোর বান সম্মুখের আঁধার ঠেলে কতদূর বেড়েছে। সেই রেখা ধরতে মশগুল। উঠোন পুকুর তাল খেজুরের শৈশব মুছে গিয়ে মফস্বলীয় শহরের আলো তাদের চোখে মুখে। বৃষ্টি গড়িয়ে উঠোন ভেজার দাগ কিংবা টিনের মটকার ওপারে সূর্য উঁকি দিলে উঠোন জুড়ে রোদের ছায়া খোঁজার অভ্যেস। এখন সম্মুখে আলোর রেখায় সেঁধিয়ে বুকের মধ্যে আকুল করে।

জল ছড়িয়ে ঘটিটা রাখে মা। জ্বলন্ত ধুনাচি নেড়ে চেড়ে থানা ঘর পেরিয়ে কালীমন্দিরের উদ্দেশে কপালে ঠেকায়। মানুষের সমাজে থেকে মন্দিরের দেবীকে বলে, মা—মাগো। রক্ষা কর—করুণা কর···।

আজ পিতলের বড় পলতের লম্ফোটা রান্নাঘরে। কাঠের উনুনে ভাত ফোটে। ওবেলার বাড়তি ঝোল সব্জি এক তরফ গরম করার প্রস্তুতি নেয় সদয়কুমার। দুই বাচ্চা সামনে।

কালো মুখ, দুহনু সামান্য উঁচু। কপালটা চওড়া হয়ে চুল ফাঁকা ফাঁকা। হাতে দু-ব্যাটারি টর্চ নিয়ে হোটেলে ঢুকে ডাক দেয়, ও ঠাকুর—ঠাকুর মশাই—

সদয় বেরিয়ে আসে, ও দেবেনবাবু?

—ভাত হবে? তাড়াতাড়ি এক মুঠো খেয়ে কাজে যাবো?

—হবে। ভাতটা আর এক ফুট হলেই একেবারে গরম গরম।

মাটিতে পাতা আসনে বসে পথশ্রমের কষ্ট লাঘব করে। আসনের পাশে টর্চটা দাঁড় করিয়ে দেয় দেবেন মুহুরি। শুরু করে ব্রজেন ঘোষালের কথা। আগ্রহে শুনতে যাবে তখনই পুলিশটা ডাকে, হোটেলের মালিক কে আছে? হাতে চুনের সঙ্গে খইনি দলে যায়। হাফ শার্ট হাফ প্যান্ট। কোমরে বেল্ট। মাথায় টুপি। কালো ভারি জুতোর ডগায় নতুন হ্যাজাকের আলো ঝকমক করে।

সদয় জোড় হাতে এগিয়ে যায়, আমি বাবু—

—চলিয়ে মেরা সাথ। বড়বাবু ডাক দিতেছে—

—কেন গো বাবু ?

কোন উত্তর না দিয়ে হাতের তালুতে খইনি দলে যায়। দলে যায় সদয়কুমারের বুকের ভেতরটা। পুলিশটা গ্রাহ্য করে না সদয়কুমারকে। ঝট করে দেবেন মুহুরির কাছে মুখ নামিয়ে বলে, হ্যাঁ—দাদা। কী করবো ?

—যাও। ডেকেছে যখন—

—কিন্তু !

—কিসের ভয় ? চুরি ডাকাতি কর নি তো ?

—সে কী কথা—

পুলিশটা খইনি ঠোঁটের পাশে ঠুসে দু-একবার থুতু ফেলে। দেবেন মুহুরির কাছে ঠাকুরমশায় দেরি করছে। পুলিশটা ধমকের সুরে বলে, কী কানে লিচ্ছে না হামার বাত—

—না বাবু। তা নয়—

—তবে ? কাম আছে।

জবারানী বেরিয়ে আসে। গুড়ে-ভুঁড়ে মায়ের হাত ধরে দাঁড়ায়। বোবা চোখে তাকায়। বাবাটা পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে।

চোখ ছল ছল করে মায়ের। মায়ের চোখে বিপদের আভাস দেখে বাচ্চা দুটো ফোঁপায়, মা—কেন বাবাকে ধরে নিয়ে পুলিশটা…

জবারানী লজ্জা সংকোচ ত্যাগ দিয়ে দেবেন মুহুরিকে বলে, হ্যাঁ দাদা—আমার দাদাকে একটু খবর পাঠানো যাবে ?

—কেন ? কী জন্যে ?

—পুলিশ ধরে নিয়ে গেল যে…, কেমন অসহায় সে বলা !

—গেল তা কী হয়েছে ? দেবেন ভরসার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে।

আর একটু খতিয়ে জিজ্ঞেস করার বাসনায় মুখটা নামায়, রান্নাঘর থেকে আগুনে ফ্যান পোড়ার গন্ধ আসে। পট করে ছোটে রান্নাঘরের দিকে। ভাতের হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দিয়ে খুন্তি চালায়। একটা ভাত টিপে দেখে এখনও বাকি। বাস্তবত হাতে আর একটু সময়। আবার ফিরে আসে দেবেন মুহুরির কাছে। বলে, হ্যাঁ দাদা—যদি কোনো বিপদে ফেলে থানার পুলিশ দারোগা ?

—কেন ? তোমরা স্বদেশি করতে দেশে ?

—না।

—কমিনিস্ট পার্টি ? যদিও দেবেন মুহুরির মনে দ্বিধা, এখন সোভিয়েটকে আক্রমণ করেছে হিটলার। ব্রিটিশরা…দেবেন মুহুরির ভাবনায় পরিচ্ছন্ন ভাঁজ কাটার আগেই জবারানী উত্তর দেয়, সে সব কিচ্ছু জানি নি আমরা।

—তবে ? যাও ভাত বাড়ো গে—

গুড়ে ভুঁড়ে দু-জনে বাবা হারিয়ে মাকে আঁকড়ে আঁকড়ে থাকে।

—যদি হাজতে আটকে রাখে ?

—রাখলেই হল ?

ডেলি খদ্দের হয়েও দাবড়ি হাঁকড়ি মারে জবারানীকে। জবারানী এতটুকু আহত নয় বরং গোপন মনোবল পায়। বিদেশ বিভুঁই—একেবারে আনপোট জায়গা! কিসের বড় দারোগা, এস. ডি. ও ম্যাজিস্ট্রেট ? তার নিত্য থালা বাসন ধোওয়া, রান্নাশাল ন্যাতা পোঁছা লাগানোয়—এসব জজ পুলিশ প্রত্যক্ষত অনুপস্থিত। ফলে জন্মসূত্রে এ মাটির হলেও মাটির উপর যে প্রশাসন তার কোনো আকার তার কাছে গড়ে ওঠেনি। শোনে মাত্র। শোনায় যেটুকু জ্ঞান। কিন্তু আজকে ? সামান্য দোকান ঘরে পুলিশ কেমন বিনা নোটিশে কোনরকম কারণ বা প্রয়োজন না জানিয়ে ধমকি দিয়ে নিয়ে গেল মানুষটাকে। তবে কি দেশ, দেশ প্রভু মানে ধমক, দাপট, শাসানি…।

গুড়ে ভুঁড়ে মায়ের কাপড় খামচে ধরে বলে, বাবা কখন আসবে গো মা ?

একটা কাজ দেবেন মুহুরির মাথায় পাক মারছে। সে জন্যেই বলে, খোকা তোদের মাকে বল আমার ভাত দিতে—

নতুন আলোয় হোটেলের সব কিছু স্পষ্ট। দেবেন মুহুরির মুখের বিরক্তি আরও স্পষ্টতর। একজন খদ্দেরকে কতক্ষণ আর এমন করে ঘরের কথা বলে উপকার প্রার্থনা জানানো যায় ? সত্যিই তো সদয়কুমার কোনো দুর্নীতি মজুতদারি কালোবাজারি গুপ্ত ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে নেই। সেই অতি পুরোতন সামাজিক মূল্যমানের কাছে আশ্রয় নিতে চায় জবারানী। সংকটের সুরাহা খোঁজে।

আজই প্রথম থানার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওঠে ঠাকুরমশাই সদয় মুখুজ্জে। মোটা মোটা শালের দীর্ঘ কাণ্ড বিছিয়ে তার উপর চারকোণা কাঠের ফ্রেম। আলকাতরার কালো রঙ এক একটা বছর শুষে নিয়ে নিজেকে কয়েক দশক পার করে আরও কয়েক দশকের উপযোগী বানিয়ে রেখেছে। পেটা ঘড়ির গোল ধাতবের ফুটোয় মোটা তার গলিয়ে কাঠের ফ্রেমে ঝোলানো। বন্দুক কাঁধে সিপাই থানার চৌপাশে উঁচু বারান্দায় এক পাক টহল দিয়ে পেটা ঘড়ির সামনে দাঁড়ায়।

বড় টেবিল। ওপারে চেয়ার। কাগজ পত্তর। ফাইল বন্দী খবর, নির্দেশ, সরকারি আদেশনামা। টেবিলের ডানপাশে মাথার টুপি। টিনের কৌটোয় সিগারেট দেশলাই, চায়ের খালি কাপ।

খইনির চুন সাদাটে হাল্কা দাগ রেখেছে পুলিশটার বাঁ-হাতে। বুড়ো আঙুলের নখে চুনের সূক্ষ্ম রেখা। ডান হাতটা কপালে ঠেকিয়ে স্যালুটের মুদ্রায় রেখে বড়বাবুকে বলে, সার—এই যে হোটেলের ঠাকুর—

বড়বাবুর মাংসে ভরাট ফোলা গাল, কাঁচা পাকা গোঁফ যত্ন করে ছাঁটা। মোটা ফ্রেমের ভারি চশমা। চশমার ফাঁক থেকে একবার দেখে হাতের কলমে ইঙ্গিত করে। যার মানে দাঁড়ায়, বসো—

ঠাকুরমশায় দু-হাত জোড় করে প্রণাম জানায়। টেবিলের এপারে একখানা সরু বেঞ্চ। বসা উচিত হবে কি না ঠিক করতে পারে না ঠাকুরমশায়। সবে বসতে যাবে—ঢং করে পেটা ঘড়ির বুক কাঁপানো আওয়াজ। মাত্র একটা।

বার অর্থ—সাড়ে ছটা। উঁচু বারান্দা, মোটা মোটা থাম ইটের দেওয়ালে সে আওয়াজ ছেতরে বেরিয়ে যায় বাইরে। আওয়াজটা দুলতে দুলতে, কুচি কুচি হয়ে পৌঁছয় সামনের সড়ক পার হয়ে ওপারের ঢালে 'মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ে'র নতুন হ্যাজাক লাইটের ঝকমকে আলোর গায়ে।

দেবেন মুহুরি ভাত চিবোয়। ঝোল মাখায় ভাতে। জবারানী দেবেন মুহুরিকে বলে, হাঁ দাদা—লোকটার কী হলো বলো তো?

—কিছু হয়নি। আমরা কোর্ট কাছারির লোক—পুলিশ থানা কী বুঝিনি? গুড়ে ভুঁড়ে হাঁ করে মুহুরির বাক্য শোনে। শিশুমনে যে টুকু মানে বোঝা যায় তাই দিয়ে বুকের ভেতরে উৎকণ্ঠা খানিক কমায়। দুই ভাই সম্মুখের রাস্তার দিকে তাকায়। পথচলতি মানুষের সংখ্যা কমতে থাকে। গুড়েটা খোঁজে। ভাবে, এই দু-চারজন মানুষের মধ্যে থেকে বাবাটা যদি বেরিয়ে আসতো···।

হাতে চটের ব্যাগ বগলে ছাতা নিয়ে দু-জন মানুষ হোটেলের সামনে দাঁড়ায়। গায়ের জামায় শত কুঞ্চন। খালি পা, পায়ে নখের গোড়ায় নোনা কাদা শুকিয়ে জমে। ফাটা গোড়ালির ফাঁকে শুকনো কাদা। ভ্রু জোড়ার রোম রোদে তাতে লালচে। রোগা লোকটা বলে, খাবার মিলবে?

—হুঁ।

—ঠাকুরমশায় কাঁই গো মা?

—আছে। একটু কাজে গেছে থানায়—

পাশের বেঁটে খাটো কালো মানুষটা বলে, এউখানে থাকা যাবে মা? ব্যাগে বিছানা কাঁথা আছে—

—উঁ···

রোগা লোকটা বোঝায়, কাল কোর্টে দিন। উকিলের দোরকে যাবো। যদি থাকা মিলে তাহলে ব্যাগ বিছানা রেখে উকিলের কাজ সারতে যাবো—

দ্বিধায় পড়ে জবারানী। ক'দিনের দোকানপাটে এধরনের খদ্দের এই প্রথম। অথচ দু-দুজন খদ্দের। ফেরালেও তো লোকসান। তবুও খদ্দের দু-জনকে জিইয়ে রাখতে জবারানী বলে, এই মাটিতেই তো···, শেষ করে না কথাটা, রোগা লোকটা আগে ভাগে বলে, উতেই হবে গো মা—। আমরা লাট আবাদের মানুষ —মাটি কাদায় জীবন—

জবারানী একটু থেমে বলে, পুরুষ মানুষটা··· কাজে গেছে···

দেবেন মুহুরি লোক দুজনকে বলে, কোথায় আপনার সাকিম—

—বাবু গদামথুরা, রোগা লোকটা উত্তর দেয়।

—গদা মথুরা? জগদীশ জানাকে চেনো—?

—কেনো চিনবো নি বাবু? আমানকে কুটুম্বতো?

—দেশের খবর কেমন?

—মানুষ বড্ড অভাবে পড়ছে। গোরু বাছুর তো ভাসি গেছে—আমরা ক'ঘর উঁচু ঢিবা করছিলি তাই বাঁচছি। বেবাক মেদিনীপুর পালাইছে! পুরানা

কেস ফরেস্টার থিকি দিছিলি তাই আসছি—

ডান হাতে একখানা সাদা কাগজের চিরকুট বাঁ-হাতে তার গাঁথা কাঠের চাকতি ফাইল। সদয় মুখুজ্জে হাসি মুখে হোটেল ঘরে ঢোকে। গুড়ে ভুঁড়ে দেখতে পেয়েই চেঁচায়, ওই তো বাবা—বাবা গো মা ?

জবারানী আচমকা তাকায়।

সদয় মুখুজ্জে হাতের চিরকুটটা দেখিয়ে জবারানীকে বলে, একটা ভালো কাজ হলো।

যাহোক মানুষটা হাসিমুখে ফিরে এসেছে আবার সঙ্গে সুসংবাদ বহন করে এনেছে—এ-দুটোরই পারস্পরিক ক্রিয়ায় জবারানীর মধ্যে একটা কৌতূহল জেগে ওঠে। বলে, হাতে কাগজটায় কী ?

খদ্দের দু-জন চুপচাপ দৃশ্যটা দেখে।

জবারানীর উৎসাহ তৎক্ষণাৎ নিভিয়ে না দিয়ে থানা বড়দারোগা পুলিশ বন্দুক এসবের মধ্যে থেকে অতিহীন পূজারি বাড়ির ছেলে হয়ে কোট কাছারির চাপরাশি বাড়ির মেয়ের কাছে নিজের পৌরুষের পরিচয় দৃঢ় করতে কাগজটা নিয়ে এগিয়ে যায় দেবেন মুহুরির সামনে, দাদা এটা কী বলে দাও তো— ?

চিরকুটটার উপর গোল করে স্ট্যাম্প মারা থানার। পাশে লেখা দু-জন আসামীর মিল দেবে। মুহুরি খুশি হয়ে বলে, থানা তো তোমার খদ্দের হলো ?

—হ্যাঁ। সদয় মুখুজ্জে আরও বিস্তারিত বলে, যে ক'জন আসামী হাজতে থাকবে—দু-বেলা তাদের খাবার পাঠাতে হবে। মাস গেলে বিল দেবে। জবারানী জানতে চায়, আজ থেকে ?

—হুঁ। রাত ন'টার মধ্যে দিয়ে আসতে হবে—, বলতে বলতে তারের ফলায় কাগজটা গেঁথে জবারানীর হাতে দেয়, এটা গুছিয়ে টাঙাও। কাগজ হারালে দামও হারাবে—

দেবেন মুহুরি সন্তোষ জানায়, ভালো হলো। পুলিশ দারোগার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। কম কথা ?

দারিদ্র্য পীড়নে দেশ গাঁ ছেড়ে এসে নতুন দোকানপাট। কোথায় সাহেব শাসক কোথায় তার দীনতম প্রজা। কেউ চিনতো না, জানতো না। বরং সামান্য পুঁজির ব্যবসায় ঢুকে ঔপনিবেশিক ছোটো বড়ো অঙ্গ উপাঙ্গের পরিচয় ঘটছে। এতদিন দেশ গাঁয়ের ভোরবেলা শুধু মাঠ-ঘাট যজমানদের পুরনো শিব-মন্দির দিয়ে শুরু হতো। এখন চাপরাশি শ্যালকের চেষ্টায় ভাতকে পণ্য করে যে দোকান-পাট সেখানে সকাল হলে রাস্তায় দু-চারজন পুলিশ, জামা চটি পরে বাজারে যাওয়া উকিলবাবু, বড় দারোগা মেজ দারোগার বউ ছেলে মেয়ে, বড় দোকানদার ছোট দোকানী, যুদ্ধের গল্প, হিটলারের বিপর্যয় আর জাপানী বোমার ভয়ংকরতা দিয়ে শুরু হয়। মাঝে মাঝে হেঁটে যায় লালমুখো সাহেব, কালো কুচকুচে কোঁকড়ানো চুলে দৈত্যাকার আফ্রিকান সেনা। তারা ছাউনি গেড়েছে দূরে—কেল্লায়। গাঙ আটকাচ্ছে—এই গাঙ পথ দিয়ে তো কলকাতা ঢোকা সহজ।

সাঁ সাঁ ঝকমকে আলো হ্যাজাকের কাচ থেকে বেরিয়ে আসছে। মুহূর্তের অতি ক্ষুদ্রাংশের ব্যবধান নেই। অবিরাম কালচক্রের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে নতুন আলো। বাকি বরাদে হ্যাজাক আলোটা।

খদ্দের দু-জনের হাতে ব্যাগ বগলে ছাতা। জিজ্ঞেস করে, বাবু—ও ঠাকুর মশায়—

—আজ্ঞে ?

—আমরা রাতে আহার করবো এউখানে। থাকা যাবে ?

ঠাকুরমশায় কেমন কুণ্ঠায় পড়ে।

রোগা লোকটা উদ্বেগ কমাতে বলে, আমানকে সঙ্গে বিছনা মশারি আছে—

যেন তল পেল ঠাকুরমশাই। এখনও তো অন্য হোটেলের মতো বিছানা কাঁথার ব্যবস্থা করা হয়নি ! খদ্দেরদের নিজস্ব ব্যবস্থার কথা শুনে আশ্বস্ত। তাই বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই সামনের গোড়ায় থাকবেন—আর একটু খদ্দের পাতি মিটুক—।

রোগা লোকটা সংকটমুক্ত হয়ে হাসি মুখে বলে, নিশ্চয়—। এ তো দোকান ঘর ?

নতুন আলোয় খদ্দেরদের মুখের স্বস্তি উজ্জ্বল। উজ্জ্বল ঠাকুরমশাই জবারানী আর দুই বাচ্চার মুখ। তারা সাঁ সাঁ আলোর ছটায় নিজেরা খুব কাছাকাছি হয়ে দশ বাই পঁচিশ হাত পর ঘরে আপন হয়।

আট

হোটেল ঘরের ঝাপ বন্ধ। ভেতরের নতুন হ্যাজাক লাইট অনেকক্ষণ নিভে ঠাণ্ডা। গাঙের জোয়ার রুখতে তৈরি বাঁধ। সেই বাঁধের গায়ে মফস্বলী শহর। মাঝ রাতের আঁধার শহর, চরাচরে। আঁধার দোকান ঘরে।

থানার উঁচু বারান্দায় টহল দেয় রাতের সান্ত্রী। গোটা থানা বারান্দা এক পাক দিয়ে বন্দুক কাঁধে সান্ত্রী পেটা ঘড়িতে কাঠের হাতুড়িটা মারে। ঢং··· শব্দটা অন্ধকার নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকটুকরো করে দেয়। ঢং-ঢং করে বারোটা ঘণ্টা পড়ে। ঘণ্টা শেষ হয়। চারদিক বেঁকে চুরে আবার আগের চরাচর হয়ে যায়। পিতলের লম্ফোটায় পলতের কালো ছাই জমে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়।

সদ্য ঘুমের মধ্যে তলিয়েছে সদয়কুমার, জবারানী, দুই বাচ্চা। একেবারে সামনের গোড়ায় ঝাঁপের কাছাকাছি নতুন খদ্দেরা দু-জন। নিজের বসত ভিটে, গ্রাম গাঁ ছেড়ে একেবারে হারিয়ে গেছে অন্য স্নায়বিক জগতে। এখন গ্রাম জেলা দেশ—সব একাকার। ঘুমন্ত পৃথিবী।

হঠাৎ টিনের ঝাঁপে বড় হাতের চাপড়। ক্লান্ত শরীরে গলায় সাড় সরে না। বড় হাতটা টিনের গায়ে চাপড়াতে টিনের শব্দ দূরে সরে গেলেও নোয়া শাঁখার ঝিন্‌ঝিন্ শব্দটা এগিয়ে এসে দখল নেয়। দশ আট ছ'বছরের শীর্ণ হাতের

রোগা কচি কচি আঙুল তালুর আঘাত। আঘাতের ক্ষীণতায় ঝাঁপের টিনে অতি দুর্বল আওয়াজ।

বুকে জড়ানো কোলের বাচ্চা দু-তিন বার টিনে চাপড়ায় বড় হাত। ক্লান্ত শরীরে হাতের জোর কমে যায়। আগের তুলনায় শাঁখা নোয়া তার বাজনা ভার হারায়। সে জায়গায় জুড়ে যায় দশ বছরের রোগা অপুষ্ট মেয়েটার হাত। রঙচটা চুড়িটাও বেজে যায় হাতের রুগ্ন আঙুলের ধাক্কার সঙ্গে। ক্লান্ত হয়ে যায় দশ বছর। সেখানে জো ধরে আট বছরের ছেলেটা। টিন চাপড়ায়। ভেতরের লোকজনের ঘুম ভাঙে।

যেহেতু খদ্দের দু-জন একদম ঝাঁপের কাছে, চেঁচায়, কে ?

বাচ্চা বুকে মেয়েটা মিয়োনা গলায় উত্তর দেয়, আমরা গো বাবু ?

জেগে ওঠে সদয় মুখুজ্জে, এতো রাতে কী গো ?

বাচ্চা তিনটে ওপার থেকে জোরে বলে, আমাদের ফ্যান কই ?

জবারানী ধড়ফড় বিছানা ছেড়ে ওঠে। পিতলের লম্ফোটা জ্বালায় ; ঝাঁপের কাছে এসে এপার থেকে শুধোয়, এতো রাতে তোরা কেন রে ?

—খেতে দে গো মা

রেগে যায় জবারানী।—সবে আমরা শুলুম—আর তোরা দোর চাপড়াচ্ছিস ?

—দে গো মা। কোথাও কিচ্ছু পাইনি। ডিশের ফ্যানটুকু বার করে দে—। গুট গুট করে হাজির গুড়ে ভুঁড়ে।

হাতে লম্ফো। সামনে সদয় মুখুজ্জে। জবারানী তাকায় স্বামীর দিকে, খোলো—

সদয় মুখুজ্জে ধীরে ধীরে ঝাঁপের আংটায় বাঁধা তার খোলে। ঠেলতেই ঝাঁপটা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মা, দশ, আট ও ছ'বচ্ছরের বাচ্চারা সরে সরে যায়। ঠিক করতে পারে না কতটা সরে গেলে ঝাঁপটা ঠিক নিজের পরিসরে দাঁড়াবার বা উন্মুক্ত হবার জায়গা পাবে । হাতে খুঁটি। সেটা লাগিয়ে টিনের ঝাঁপটা দাঁড় করিয়ে দেয়।

ভরপেটে ঘুম ছুটকানো মানুষগুলো চোখ রগড়ায়। সামনে অন্নহীন ক্ষুধার্ত মা শিশুদের দেখে রাগ উবে যায়। রাতের কালিমায় আরও কালো রুগ্ন ক'খানা মুখ। পেটে ভীষণ খিদে নিয়ে ভাতের হোটেলের সামনে এতো রাতে খাদ্যপ্রার্থী।

ডিশে ঢালা ফ্যান ধরে ধরে আনে। সন্ধ্যেবেলায় প্রথম রান্নার তরলটুকু গুছিয়ে রাখা। দু-পাঁচজন খদ্দের মাত্র রাতে। মায়ের বড় ডিশটা রাখতেই চোঁক চোঁক দু-ঢোক খায়। বুকের বাচ্চা চিঁ চিঁ কাঁদে। পেটের জ্বালা খানিক কমে।

দশ আট বচ্ছরের মেয়েটা, ছেলেটা তাকিয়ে তাকিয়ে মায়ের খাওয়া দেখে। ছ'বচ্ছরের বাচ্চা মেয়েটা সইতে না পেরে মায়ের কাছে ছুটে যায়, আমার—

—দেবে তো।

—আনতে গেছে—

—যদি না থাকে ?

ভয় পায় বাচ্চা বুকে। আর এক ঢোক খেতেই বিস্বাদ টোকো। বুকের বাচ্চার জন্যে ভাত খোঁজে। ভাতের নরম দানা। এক ঢোঁক খাইয়ে দেয় ছ'বছরের বাচ্চাটাকে। এক ঢোঁক বুকের বাচ্চাকে। নিজের রোগা শীর্ণ বুকে দুধহীন মাতৃত্ব।

নিজের ডিশে পর-পর দু-চুমুক দিয়ে দশ বছর বলে, টক।

আট বছর তিন ঢোঁক গিলে বলে, হ্যাঁরে দিদি—

ছ'বচ্ছরের মেয়েটা বলে, আমারটাও রে দিদি—

বাচ্চা তিনটের খাওয়ার ধরন দেখে জানতে চায় তাদের মায়ের কাছে, এতো রাত অব্দি কোথায় ছিলিস ?

—লঙ্গরখানা আর তো নেই রে মা। তাই পথে পথে ভিখ মাঙতে মাঙতে অনেক পথ গে পড়িছিলুম, ছ'বচ্ছরের বাচ্চাটা জবারানীকে অনুযোগ করে, এতো টক কেন গো ? বাচ্চাটার কথা জবারানীর বুকে ধক্ করে লাগে ! নিজের গুড়ে ভুঁড়ে আর কতো বা !

ডিশ কুড়োনো দুটো চারটে ভাত পায়। বুকের বাচ্চাটাকে মা টিপে টিপে দাঁতে দেয়। লম্ফোর আলোয় জবারানী দেখে, বাচ্চাটার রোগা শরীরে দড়ির মতো হাত। চোখ দুটো ফুলে বড় বড়। দু-গাল ফুলে বয়েস বাড়িয়ে যেন বীভৎস অনুপাতহীন। জবারানী ভয় পেয়ে নিজের বাচ্চাদের কাছে টানে। তাদের দুই দুই চার চোখ থেকে বুকের শিশুটার দাঁতে ভাত টিপে টিপে খাওয়ানোর দৃশ্য সরে যায়।

জবারানী ছ'বচ্ছরের মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে, কাল বেলাবেলি আসবি —ভালো রাখবো।

নয়

শেষরাতের বয়াটা তখনও ক্ষীণ ভাবে আবছা। মাটিতে আঁধার লেপটে থাকলেও জলের উপর প্রকৃতির ফিকে ফর্সা। মোটাসোটা মতিলাল পাঁচখানা বস্তার উপর ছেঁড়া ত্রিপল পাট করে চাপায়। একবার দেখে নেয় ছেঁড়া ফুটোটা বিপদ-জনক ভাবে চালের বস্তার উপর কি না ? কারণ আকাশের উপর ভরসা নেই। এবার রোগা রোগা বলদ দুটো সামনে জুতে দিয়ে নিজে উঠে বসে। হাতে বাতা চেঁচে গেঁটে লাঠি।

বলদের পাছায় লাঠির গুঁতো দিতেই চলতে শুরু করে। শুকনো মাটির পথে ইঁটের খোয়া বিছোনো। পথটা সড়ক হলেই দক্ষিণের দূরতম ভূমি অংশে বাস লরি চলাচল সম্ভব। মতিলালের গোরুর গাড়ি লিক ধরে চলে। মাঝে মাঝে কাঠের চাকায় ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ। বলদের খুরে খোয়ার কোনা লেগে খট্ খট্ বাজনা।

ডাইনে কাঁটা তার ঘেরা বড় বাগান। মোটা মোটা ঝাউ গাছ লিকলিকে

ডালপালা ছড়িয়ে সরু পাতায় ঝির ঝির হাওয়া টানে। ভোরের হাওয়া। লম্বা শাখায় আকাশ গেঁথে প্রকাণ্ড দেওদার গাছ। ঝাঁক ঝাঁক টিয়াপাখি কোটর থেকে বেরিয়ে চোখে ভোর ঠেকতেই কলরবে চারপাশ ছুড়ে দেয়। সবুজ ল্যাজে প্রথম ভোর। ভোরের বাগানে মোটা মোটা দেওয়ালে দোতলা বাড়ি। নিচের তলে বিশালাকার খিলেন দরজা ঋজু ঋজু। আচমকা জলোচ্ছ্বাস হয়ে গাঙ বাঁধ টপকালে ভয়ঙ্কর জলস্রোত খিলেন দরজা গলে হুড়মুড়িয়ে বয়ে যাবে দূরে। দোতলা কোয়ার্টারে মহকুমা শাসক অক্ষত থাকবেন। নোনা গাঙ নদীর দেশ। দেশ ভাসলেও তিনি ভাসবেন না। ভাসলে যে সাহেবদের ক্ষতি। রেভিন্যুয়ের, প্রশাসনের। মহকুমা শাসকের কোয়ার্টার প্রহরা দিতে সিমেন্টের চো-খুপি সরু পিলারের উপর। ঘাস জঙ্গলের মাঠ-বাগান। টহল দেয় গার্ড—আলোর জন্যে হ্যাজাক লাইট এখনও জ্বলছে।

ফট করে পূব আকাশ ছিঁড়ে গোলাপী রঙে প্রথম সূর্য। মতিলাল ঠুক করে লাঠিটা মারে বলদের পাছায়। বলদ দুটো জোরে হাঁটে। প্রাতঃকালের শহর। রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা। শুধু দু-একজন দোকানদার ঝাঁপ সরিয়ে সামনে বসে দাঁত মাজে। মতিলালের গোরুগাড়ি খট্ খট্ শব্দ করে এগোয়।

ঝাঁপ খোলা দোকানঘর। মেঝে থেকে উঁচু করে সিমেন্ট বাঁধানো। বাঁয়ে গাঙ ঘেঁষে ইটের ক'খানা দেওয়াল ঘিরে ঘর। সামনে বরফগলা জল, কাঠের ভুষি। ঝড়া চাকন থেকে রাতের বাসি মাছের গন্ধ। আড়তের দরজা খুলে হিসেবরক্ষক সরকার সারারাত জেগে এখন ভর ঘুমন্ত।

ঝাঁপ খোলা দোকানঘর। মেঝে উঁচু করে সিমেন্ট বাঁধানো লাল চাতাল। চাতালেই বসা এবং খানা খাওয়ার জায়গা। ওপাশে বাসি হাঁড়ি ডেকচি তখনও বসানো। মকবুল সামনে বসে তামাক দিয়ে একটা একটা করে দাঁত ঘষে। তামাকের লালচে কষ পুচ করে সামনের মাটিতেই ফেলে। বার বার থুতু ফেলায় জায়গাটা লালচে।

পূবের রোদ্দুর সামনে কাঠের বেড়া ফুঁড়ে দেওয়ালে লাগে। রঙিন ক্যালেন্ডারে মক্কার মসজিদের গম্বুজ আলোময়। কাঠবেড়ার জানালার গায়ে চৌকো টিনের ফ্রেমে লাল রঙে লেখা "এলাহি-ভরসা"।

'ইসলামিয়া হোটেল' প্রোঃ মকবুল মোল্লা।

বোর্ডটাকে কর্মচারি ছোকরা কাঠবেড়ার গরাদে টাঙিয়ে দেয়।

মতিলাল গোরুর গাড়ি থামিয়ে হাঁক দেয়, মকবুলদা—দুবো এক বস্তা?

—উঁহু। আগের চাল এখনও বেচাতি পারিনি—

—আসবো? কিছু দাম হবে—?

—সক্কাল বেলায়? বেচাকেনা করি—তারপর তো?

—হুঁ। তা নাতো কী? মতিলালের গোরুগাড়ি খুট্ খুট্ চলে। রাস্তার পাশে পুরনো কালী মন্দির। সেটা ছাড়িয়ে থানা ঘর। কাছাকাছি এসে দাঁড়ায় গো-যান। মতিলাল থানার সামনে গোরুর গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিশ্চিন্ত। যদিও এতদিনে একবারও ঘটেনি তবু থানার সামনে বস্তার গায়ে কেউ হাত দেবার

সাহস পাবে না। পুলিশ ব্যারাকে রেশন আছে চাল ডাল তেল ঘিয়ের। মাঝে মাঝে ফাইন চালের খোঁজ করে সিপাইরা। সেটার যোগানদার তো মতিলাল। সুতরাং থানার হাবিলদার পুলিশ সবাই তো তার পরিচিত। প্রশাসনের বলিষ্ঠ অংশের সঙ্গে তার যোগাযোগ। যেহেতু এই যোগাযোগ তার পক্ষে এই দুর্দিনে এমন ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায় খানিক নিরাপত্তার গোপন আশ্বাস আছে। এই আশ্বাস না থাকলে সব চাল কলকাতায় যায় কী করে? মজুতদারি হয় কী করে?

মিলিটারি কেল্লা থেকে পাওয়া ছেঁড়া ত্রিপলটা টেনে টুনে সরায় মতিলাল। স্বাস্থ্যবান পুরুষ। হেঁচকা মেরে চালের বস্তা মাথায় তুলে 'মহারানী হিন্দু ভোজনালয়'এর সামনে দাঁড়ায়। হাঁক দেয়, কইগো—ও ঠাকুরমশায়?

গুড়ে ভুঁড়ে ছুটে আসে। মা জবারানী বাসি থালা বাসন ধোয়। বাবা আলু বেগুন কোটে ধারালো বঁটিতে।

গুড়ে ভুঁড়ে ফিরে বলে, বাবা—সেই লোকটা।

ঠাকুরমশায় সদয় মুখুজ্জে দোকানের সামনে হাজির। চালের বস্তা মাথায় মতিলাল হিমসিম। বলে, কোথায় রাখবে গো বাবু— ?

—এক মণ চাল··· !

—ধুর বাপু আগে রাখবো কোথায় বলো না ?

ধীরে ধীরে নামায় মতিলাল। ঠাকুরমশায় হাত লাগায়। কাঠের পিঁড়েয় শালগ্রাম শিলা। পাশে মাটির লক্ষ্মী। বাসি প্রদীপ, পোড়া সল্তে, ধুনুচিতে মরা ছাই। যেহেতু অন্নদানা দেবতার মতো দুর্লভ। চালের বস্তাটার স্থানও পবিত্র জায়গায়।

ঠাকুরমশায় বলে, চালটা কেমন গো মতিবাবু?

কাঁধের গামছায় ঘাড় মুছে বলে, একনম্বর সরেস। দেখবেন? বলেই বস্তার মুখ খুলে বাঁধন আলগা। বস্তাভর্তি ঝকঝকে সরু চাল। গুড়ে ভুঁড়ে উৎসাহে মুখ বাড়ায় আলগা বস্তার দিকে। অবাক হয়ে গুড়ে তাকায় ভুঁড়ের দিকে। একসঙ্গে এতো চাল! এমনভাবে থাকে। তাদের দুঃস্থ জীবনে কখনও ধারণা গড়ে ওঠেনি চালের এমন বিপুল সম্ভার। দেশের গাঁয়ে আতপচাল বাটা জাউ খাওয়া শিশুকাল কাটিয়ে—এ এক অদ্ভুত ধারণা।

একট বিড়ি ফুকোয় মতিলাল।

ঠাকুরমশায় বলে, কতো করে?

—এক মণ আছে। পাঁচ টাকা—

—একটু কমবেনি ?

—এক পয়সা কম দেবে। ছেলেপুলে সংসার নিয়ে নতুন কারবার যখন— ?

গুড়ে-ভুঁড়ে বস্তার গায়ে হাত বুলোয়। চাপ দেয়। খানিক বসে যায়। সবে ঢেঁকি ভানা গন্ধ। একদম অচেনা!

কয়লার ইঞ্জিন। গাড়িটা একটু লেট। রায়বাবু একেবারে ঢুকে পড়ে গিরিবাবুর দোকানে। পাতলা ধুতির ওপর বাসি পাঞ্জাবি। দু-এক ফোঁটা পানের

পিক জেঁকে বসে আছে। সাদার ওপর চুন-খয়ের দাগ যেন খুনীর রক্ত। গিরি-বাবু দু'টাকা একটাকার নোট গুছিয়ে বাণ্ডিলে রাখতে রাখতে নজরে পড়ে দাগটা। রায়বাবু বলে, ও গিরি—কাগজটা দে তো রে—

শো-কেসের জায়গাটা খুঁজে খাঁজে বলে, হ্যাঁ রে কর্ণ—খবরের কাগজ ?

টর্চের সুইচঘরে ফাইল ঘষতে ঘষতে বলে, এখনও দে যায়নি ?

কথাবার্তা শুনে রায়বাবু হুটপাট বেরোতে উদ্যোগী, তবে একটা পান খেয়ে আসি।

রোগা ফর্সা মানুষ। চামড়ার নিউকাট মস্‌মস্‌ শব্দ তোলে।

—বসুন না, ও জমিদারবাবু—

—কেন ?

—দুস্‌, তোর কাগজ নেই।

গিরিবাবু কর্মচারী কর্ণকে ডেকে বলে, একটা পান এনে দে তো ?

চকচকে রিং আলগা স্পোক, রিকশার হর্ন, হ্যাজাক, ডে-লাইটের খুঁটিনাটি দ্রব্য। রেডিওর কয়েল, নব, কাঠের কেস ইত্যাদি। খদ্দেরপাতি আসে যায়। মানুষের ভিড়।

রায়বাবু কাঠের চেয়ারটার ওপর দু-পা তুলে উবু হয়ে বসে আরাম পায়। একটা হাই তুলে স্বস্তি পায়। সরু সরু দাঁতে চুন-খয়েরের দাগ।

খদ্দেরের পয়সাটা নিয়ে গিরিবাবু বলে, বড়দা—

রায়বাবু উত্তর দেয়, কি বলছিস ? বল—

—যুদ্ধের খবর কী ?

—হিটলার মস্কোয় হেরে ভূত। স্টালিন একেবারে বাঘের বাচ্চা—

—আবার কি কলকাতায় বোমা পড়বে নাকি ?

ফর্সা মানুষটার ফর্সা রোগা হাত। গায়ের রং বেশ পিটপিটে। হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে বলে, ওকথা আর বলিসনি। এবারের বোমা যখন খিদিরপুরে জাপানিরা ফেলে, আমি সবে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে পান কিনতে গেছি। আমার শালারা পান-দোক্তা কিছু খায় নে। সকালে পরোটা-মিষ্টি টিফিন খেয়ে মুখ টক। সবে পানটা নিইছি—তখনও পয়সা দিইনি। শালার সাইরেন বেজে উঠলো। তারপর আকাশে নীল ধোঁয়ার মতো আলো। পাড় কী মরি ঘরে ছুটে আসি—উফ্‌ কী জোর আওয়াজ রে ভাই, বলে দু'হাত দিয়ে নিজের দু'কান চেপে ধরে এখন এই দোকানে বসে তীব্রতা বোঝায়।

শ্রোতা বড় দোকানদার। রায়বাবু লাল টুকটুকে পাতলা ঠোঁটে মৃদু হাসি মেলে বিবরণ দেয়, বুড়ো পাঞ্জাবি। পাকা চুল বড় বড়। সেও দোকানে রুটি-ডাল কৌটোয় ভরে কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। আওয়াজের চোটে গলির ফাঁকা রাস্তায় হট্‌ করে হাঁটু মুড়ে বসে কানে আঙুল দিয়ে ভাবলো, গালে কী দেবো ? পাগড়ি তো সঙ্গে নেই। যদি দাঁতকপাটি পড়ে ? সঙ্গে সঙ্গে রুটির গোছা গালে পুরে চেপে রাখে—, বলতে বলতে মধ্যবয়সী রায়বাবু কচি কচি পানের কষ-পড়া দাঁত ছড়িয়ে হাসে।

কর্ণ পানটা নিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে।

—বড্ড ক্ষতি হয়েছিলো খিদিরপুরে ? শুধোয় গিরিবাবু।

—ক্ষতি বলে ক্ষতি। একঘণ্টা ধরে বোমা বর্ষণ। ভাঙতে এলো ডক। ক্ষতি হলো কাঁটাপুকুর, হাইড রোডে—

আন্তর্জাতিক যুদ্ধের একটা অতিক্ষুদ্র ঘটনার শারীরিক সাক্ষী থেকে বলার মতো গল্প পেয়েছে রায়বাবু। আরও কিছু বলতে যাবে কর্মচারী কর্ণ বলে, বাবু পান—

—কিমাম এনেছিস ? জানতে চায় রায়বাবু।

—নেই। জর্দা দিয়েছে—

—দুস্।

গিরিবাবু খদ্দেরকে লাইটের একটা পিন দেয়।

খদ্দের দর করে, ডজন নিলে কতো করে হবে বাবু ?

বাঁহাতে এক পাঁজা খবরের কাগজ। যুগান্তর, বসুমতী, দু-চারখানা স্টেটসম্যান কোর্টের উকিলবাবু আর এস. ডি. ও.-র জন্য।

রায়বাবু বলে, ওই তো কাগজ এসে গেছে। যুগান্তর দে—

ঢং···করে পেটাঘড়িতে আওয়াজ। পরপর আটখানা বাজে। দু'জন খদ্দের ঢুকে বলে, সাইকেলের টিউব আছে ?

রায়বাবু খবরের কাগজটা নিয়ে যুক্তি সাজায়, গিরি তুই খদ্দের সার। আমি ওপাশে ঘড়ি দোকানে পড়ি—

রায়বাবুর হাতে খবরের কাগজ। মুখে পান। নাকে এখন খিদিরপুরে যুদ্ধের বোম্ব পড়া বারুদ গন্ধ।

সদয়কুমার রায়বাবুকে দেখতে পেয়ে বলে, বড়বাবু—

দুম্ করে রায়বাবু বলে, হ্যাঁ রে, তোর বাড়ি তো ফলতার কাছে ?

—হুঁ।

—তুই এরোপ্লেন ভেঙে পড়তে দেখেছিলিস ?

—দেখবোনি ! শুধু আমি ? গোটা গ্রাম ছুটে গেছিলুম রাজরামপুরে—

গুড়ে-ভুঁড়ে হাঁ করে বাবা আর বাবুর গল্প শোনে। একখানা ভাঙা কাঠের পেটির ওপব বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। ঠাকুরমশায় সদয় মুখুজ্জে হাঁকে পথচলতি লোকের দিকে, আসুন বাবু—আসুন ভালো খাওয়া—পেট ফুরোন মাত্র দু'আনা—

একঝাঁক খদ্দের ঢোকে। খুব ব্যস্ত হয়ে বলে, ঠাকুরমশাই এক্ষুণি খেতে দিতে পারবে ?

—এক্ষুণি। এবিঘাড়ি দেবো। বসুন—

ঠাকুরমশায় তড়বড় করে রান্নাঘরে ঢোকে। জবারানী কোমর সেঁটে থালা ধোয়। জিজ্ঞেস করে, ক'জন ?

—ছয়।

থালাটা বাড়িয়ে দিয়ে, নাও। ভাত বাড়ো—

মানুষগুলো গোগ্রাসে গেলে। কালো ট্যাক্সির ধুলো তাদের মাথার চুলে। জলদি খায়। একজন বলে, ঠাকুরমশায় হরিসাধন উকিলকে চেনো ?

—চিনি।

—পথ দিয়ে গেলে বলো তো গিলের ছাঁটের মক্কেলরা ভাত খাচ্ছে—

থানার পেটাঘড়িতে দশখানা ঘণ্টা বাজে। চনমনিয়ে ওঠে লোকগুলো। তাড়াতাড়ি জালার জলে মুখ ধুয়ে বলে, আমাদের ব্যাগ জিনিসপত্তর রইলো। কোর্ট সেরে এসে দাম মিট করবো—

যেহেতু হোটেলে খদ্দেরপাতির জরুরিটা বিবেচ্য ঠাকুরমশায় সেটাই মেনে নেয়। চার-পাঁচখানা ব্যাগ, ব্যাগের জিনিসপত্তর টেনে টেনে নিরাপদ জায়গায় রাখে।

গুড়ে-ভুঁড়ে কেমন জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। সব খদ্দের পয়সা দিয়ে যায়, এরা ব্যাগ রেখে গেল ? পয়সার বদলে জিনিস বন্ধক রাখলে চলে তাহলে ?

জবারানী এঁটো-কাঁটা তোলে। গুড়ে-ভুঁড়ে রান্নাঘরে আসে। রান্নাঘরের বাইরে মাটি ঘাসে খানিক চওড়া মাঠের মতো। তারপর কাঁটাঝোপ গেঁমুয়া ক্যাওড়া গাছ। গোড়ার মাটি ভিজে। গাঙ ঝাঁপিয়ে চড়া ডুবে জোয়ার পেছন অবধি এসে যায়। এসে যায় বলেই তো সেচ বিভাগ চওড়া করে বাঁধ বেঁধেছে। তার ওপর রিকশা, দু-চারখানা হালকা গাড়ি চলে। শহরের সড়কে বাঁধ বদলে যায়।

গুড়ে এসে ভাতের ঝড়া দেখে বিস্ময়! একসঙ্গে অনেক ভাত। ভুঁড়ে দাঁড়িয়ে জঙ্গল দেখে। জঙ্গলের গাছপালার ফাঁক দিয়ে গাঙ দেখা যায়। কালো কালো বিশাল চাকায় জল ছিটকে হোরমিলার কোম্পানির স্টিমার যায়। নোনা গাঙ ফাঁকা। ভুঁড়ে এখান থেকেই জল, জলের ফেনা কাটা এবং ফেনা ভাঙার শব্দ শুনতে পায়।

গুড়ে রান্নাঘর থেকে কাটা দরজায় পা দিয়ে দেখে, ডিশগুলো পরপর পাতা চাপা। প্রথমেরটা বাচ্চা বুকে মায়ের··· । পরেরটা দশ বছরের মেয়ের। পাশেরটা আট বছরের ছেলেটার···! পাতা তুলতেই টাটকা ফ্যানে মোটা করে সর। পরেরটা সর বসে চাপড়া। মাত্র দু'খানা ভাত সরে লেপটে একলা জেগে আছে। চকচকে নিখুঁত দু'খানা ভাত। যে ভাতের একটা একটা খুঁটে খুঁজে বাচ্চা বুকে মা আঙুলে টিপে টিপে বাচ্চাটার সামনের ধারালো দাঁতে ধরে। বাচ্চাটা দু'দাঁতে চেপে চিবিয়ে গিলে নেয়। গলা সরাতে এক চুমুক ফ্যান···রোজ দেখা দৃশ্যটা আজ গুড়ের বুকে ধাক্কা মারে।

এখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখে মা জবারানী নখ বসিয়ে মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে মাছের কাঁটা, ছড়ানো ভাত একটা একটা করে তুলেছে। ফট্ করে চোখ চলে যায় ঠাকুরঘরের কোণে। এক বস্তা···কতো চাল··· । ওই চালে যে কতো ভাত ···কতো ঝড়া ভর্তি সাদা সাদা ভাত··· ।

অতি সন্তর্পণে ভাতের ঝড়ার কাছে দাঁড়ায়। ঝপ্ করে একমুঠো ভাত তুলে নেয়। তখনও অল্প গরম। কচি হাতের আঙুল গলে দু'চারখানা ছড়িয়ে যায় মেঝেয়। দ্রুত বাচ্চা বুকে মায়ের ডিশটার পাতা তুলে ফ্যানের মধ্যে ঢেলে দেয়।

ভাতগুলো ফ্যানের মোটা সরে আটকে জেগে থাকে। তলিয়ে যায় না। যায় না বলেই নিজেকে লুকোতে পারে না। নিরুপায় হয়ে ফ্যানের ডিশে পাতাটা চাপা দেয়।

আর এক খাবলা ভাত হাতের মুঠোয়। গুড়ের ইন্দ্রিয়-চেতনার মনে হলো মায়ের এঁটো-কাঁটা কুড়োনো শেষ হয়ে গেছে। তাই অপরাধীর মতো কাজটা অপটু হাতে সেরে ফেলে। ভাত কিছু ছড়িয়ে যায়। ঝটপট পরের ডিশটায় ভাত কটা রেখে পাতা চাপা দেয়। এখনও দুটো ডিশ তো বাকি?

থালা-বাটির পাঁজা নিয়ে মা রান্নাঘরে ঢুকে চমকে ওঠে! ছড়ানো ভাত দেখে বিপন্ন। ভাতের রেখা ধরে কাটা দরজায় এসে অবাক! ফ্যানের ডিশ অগোছালো।

ভাতগুলো মাটির কালচে মেঝেয় পড়ে জ্বলজ্বল করে। মুখ কাঁচুমাচু করে গুড়েটা দাঁড়িয়ে। জবারানী গলায় অসহায় আকুলতা এনে চেঁচায়, এ কী রে—নষ্ট করছিস!

গুড়ে শিশুমনে বুঝে পায় না, নষ্ট কোথায়! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুঁড়ের স্টিমার গাঙের নোনা জল কেটে কেটে বাঁক ঘুরে বাঁধ রাস্তাঘাটের আড়ালে গিয়ে নজর থেকে হারিয়ে যায়। হারিয়ে গেছে বলেই সে এখন নিঃস্ব। মাকে পেয়ে সেটা ভরাট করতে চায়।

ভুঁড়েকে কাছে পেয়ে জবারানী বলে, ওকে মানা করবি তো—

পরামর্শ নয় বরং কড়া শাসন। ভুঁড়ে বুঝতে না পেরে কাঁদে। কান্না ছোঁয়াচে হয়ে গুড়েকে ভয় ঘিরে ফেলে। মায়ের পরবর্তী ধমক থেকে পরিত্রাণ পেতে হঠাৎ চওড়া মাঠটা দেখে। মাঠটা তাকে ডাকে। গুড়ে তখনই মায়ের আওতা থেকে নিজেকে দূরে সরাতে ছোটে। বেশ জোরে একঝলক ছোটে।

জবারানী এঁটে থালাবাসন নামিয়ে পিছু পিছু দৌড়োয়, ওরে—আয়। ওরে ছুটিসনি—।

বকবোনি—আয়—বাপ্—

ভুঁড়ে বেকুব হয়ে ছোটে। ডাকে, দাদা—আয় রে—দাদা আয়—

—এ কাহিনীমালায় এই পর্বে আপাতত থামছি। তবুও কয়েক অনুচ্ছেদ গদ্যাংশ পাঠকের অবগতির প্রয়োজনবোধ করি।

শেষ পর্যন্ত দেশ ও বিদেশের জনমতের চাপে, বিশেষ করে সম্ভবত ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা ভেবেই, ভারত সরকারকে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয়। স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে। উডহেড ছাড়াও কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—ডঃ ডি. ডি. আর. অ্যাকরয়েড, এস. ভি. রামমূর্তি, খান বাহাদুর আফজল হোসেন, মণিলাল বি. নানাবতী এবং আর. এ. গোপালস্বামী (কমিশনের সেক্রেটারি)। ভারতীয়।

"—পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো প্রায় হাজার দেড়েক পৃষ্ঠার সেই অসংশোধিত গ্যালি প্রুফ এবং অত্যন্ত গোপনীয় নোটের ছটি ফাইল আজ নানাবতী

পেপার্স' নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এই নানাবতী দলিল দিল্লিতে মহাফেজ-খানায় রাখা আছে। বাঙলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের ওপর বিস্ফোরক দলিল কিন্তু আজও অপ্রকাশিত। ভারতে ইংরেজ সরকার সেই দলিল প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছিলো। কেন তা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু স্বাধীনতালাভের বত্রিশ (?) বছরের মধ্যে ভারত সরকারও সে-দলিল প্রকাশ করেনি কেন ? দলিল পড়লে সম্ভবত তাও বোঝা শক্ত হবে না।"

নানাবতী নিজে কমিশনে বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "১৯৪৩ সালে বাঙলা সরকারের হাতে মোট ২০২,০০০ টন খাদ্য এসেছিলো। তার মধ্যে ১৪০,০০০ টন কলকাতায় মজুত রাখা হয়েছিলো। মাত্র ৬২,০০০ টন মফস্বলে পাঠানো হয়।...গ্রামাঞ্চলে আরও খাদ্য পাঠানো হলে হয়তো দুর্গতদের জীবন বাঁচতো। ...বৃহত্তর কলকাতার একজন অধিবাসীও সেই মন্বন্তরে খাদ্যাভাবে মরেনি। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক কলকাতার পথে অনাহারে মরেছে গ্রাম ছেড়ে এসে।"

দশ

হেমন্তের হিমে ভোরটা ভিজে। খালি পায়ে হারুবাবু উঠোনে দাঁড়ায়। লম্বা চেহারা। কালো মাংসল পেশী দাবনা পিঠে। শক্ত ঘাড় গলা। ভরাট গোলমুখে বড় বড় চোখ। ঘন ভ্রূজোড়ায় চোখ দুটো অবিরাম তীক্ষ্ন ভেদি। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুলে বীর পুরুষ।

শেষ রাতে হিম পড়ে পৃথিবী শীতল। আশপাশে হাজার হাজার বিঘে ধান চারার সবুজ পাতা হিম মেখেছে। এখন তারা শিশির হয়ে পাতা গড়ায়। পাতার ডগে শিশির নাকছাবির মুক্তো বিন্দু হয়ে ঝিলমিল করে।

সামান্য গুমোট মাঝ রাতে। ঘামে নেয়ে গাময় চ্যাটচেটে ভিজে। চওড়া পিঠে বড় বড় লোম যেন বর্ষায় সদ্য সবুজ রোয়া জলে লেপটে। পেশীময় বিস্তারিত ছাতির খাঁজে কালো লোম। ভোরের হিমে রাতের জ্বলুনি মুছতে বুকে হাত বোলায় হারুবাবু। লোমগুলো চামড়ার পরতে সিরসির করে। তখন এক ঝলক মৃদু হাওয়া গাঙ ঝাঁপিয়ে হারুবাবুর পঁচিশ বিঘে বাস্তুর কাটা গড়ের জলে ভিজে আর একটু ঠাণ্ডা। গায়ের ঘাম জুড়োয়। আবাদী মাঠের মতো, গাঙ বাঁধে মাটির মতো ঠাণ্ডা হয় হারুবাবু। বাস্তুর আম জাম ডাব নারকেল গাছে পাখি পক্ষী ডাকে। হাঁস খোঁয়াড়, মুরগি ঘর থেকে প্রাণি-গুলো ডেকে ওঠে। গোয়াল ঘরে দুধেল গাইয়ের বাঁধা বাছুর মায়ের জন্যে হাঁপায়, এ্যাম-ব্যা-এ্যা—

যেহেতু বিশাল বপু, দশহাতি ধুতিটা দু-পাক পরতেই ফুরিয়ে যায়। তাই দু-ফেত্তা দিয়ে কোমরে দু-খুঁট গুঁজে লুঙি বানিয়ে পরলেই আরাম। হাঁটু, পায়ের মাশল্, কুচকুচে কালো পা-অব্দি ঢেকে সঙ্কোচ রুখে দেয়।

বুকের লোমে হাতটা বার কয়েক বুলিয়ে ক্রমশ ভুঁড়ির দিকে আনে। চর্বির চাপে ডাইনে বাঁয়ে দু-তিনটে খাঁজে চামড়া ঢুকে আছে। সেই খাঁজে তো

সারারাতের ঘাম জমে নালা বন্দী। আলগা গায়ে হাওয়া লাগে। হাত দিয়ে পেটের খাঁজে ঘাম ছেনে ছেনে বের করে দেয়। চর্বি থকথকে পেটের ঢালে দু-তিনখানা দাগ। কতদিন আগে লাঠির চোট। ঘা ব্যথা সেরে ক'বছর। চামড়া ছড়ে যাওয়া দাগটা আজও যায় না। নিজের শক্তিমান দেহের প্রতি বিশ্বাসে খানিক ক্ষত। বিরক্ত লাগে, কেন যে সেদিন জমির আলীর বাঁখারির ঘা-টা ছাটা মারতে পারলুমনি?

চাপা গ্লানিটা এতদিন পরে এই সকালে জেগে ওঠে। নিজের চওড়া কব্জি, লম্বা লম্বা পুষ্ট আঙুল মেলে দেখে। সকালের আলোয় হাতের তালুর আঙুল মূলে মাংস শক্ত হয়ে রুক্ষ কড়া। বাঁ-হাতের আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখে। আবার বাঁ-হাতের তালু ডান হাতের আঙুলে চেপে চেপে দেখে। কব্জির চামড়ায় সরু দড়ির মতো ক'খানা শিরা ফুটে আছে, রক্ত বয়ে যায়। বয়ে যায় হৃত মর্যাদা।

বড় উঠোনের উত্তর ঘেঁষে বসানো খড়ের বড় বড় গাদা লাইন দিয়ে। তার পাশে ছ'ফুট উঁচু ইটের পিলারে বাঁশ কাঠের মেঝে বানিয়ে টিনের দেওয়ালে গোলাঘর। গোয়ালঘরের উপর গোল করে টিনের ছাউনি। দশ-বারোখানা জম্পেশ গোলা। এখনও ক'খানায় লুকনো গত সালের ধান। সোনার মোড়কে মুক্তোকুচি। হাজার খানেক মানুষের খাদ্যকণা। অনাহারে, ক্রন্দনে ক্লান্ত ঘুমিয়ে পড়া কত শিশুদের যে কত মুঠো ভাত তালাবদ্ধ!

পোনা পুকুর, ভেটকি, বাগদা, ট্যাংরা, পার্শে মাছের নোনা পুকুর মিলিয়ে পাঁচ সাতখানা। দশ বাই পনের হাতের আট কামরা ঘর। বড় বারান্দা। সামনে কাছারি ঘর। তুলসি মঞ্চ, বেলতলা, হলুদ গোলাপি কল্কে ফুলের ঝাড়। বাসি কল্কে ফুল গাছের গোড়ায় ঝরে সবুজ ঘাসের উপর থুবো থুবো হলুদ। ফ্যাকাশে গোলাপি। হিম জাপটে আছে টাটকা পাপড়িতে। মেখে আছে বাসি পাপড়িতেও। বাস্তু ঘিরে গোল করে কাটা গড়। গড়ের জলে লাল শাপলা, সাদা শাপলা। গড়ের জল···জলের উপর গোল গোল পাতা বিছিয়ে সবুজ জল। সবুজ জল গভীর খাদ নিয়ে আগলে আছে হারুবাবুকে। হারুবাবুর কাছারি বাড়িকে।

গড়ের ওপারে তো মাটির বাঁধন। লাইন ধরে নারকেল গাছ। গাঙ পাড়ের ঝড় জলে যুঝে খাড়া দাঁড়িয়ে। গোল গোল ডাবের দু-কাঁদি গলা বয়ে ঝুলে। চেরাপাতায় ডগলা থাবড়ে নিচু। সারারাত ঘুমিয়ে আলগা চুলে মাথা ঝামরে যেন বিছানা ছাড়ল ক'জন নারী। তাদের সবুজ ডগলা পাতার ফাঁক দিয়ে বয়ে যায় নোনাজলের হুগলি। বড়তলা নদীর ঘোলা জল ঘোড়ামারা দ্বীপ বেড় দিয়ে সমুদ্রে নামে। পাড়ের নরম তুলতুলে বেলে কাদা ছুঁয়ে ভেসে থাকে নীল জলের আয়না।

বনেদী পরিবারের দামী পালঙ্ক। মেহগনী কাঠের বাজু কেটে আয়না। আয়নায় মুখ গেঁথে যায়। শ্যামবর্ণ গোলমুখে কপালময় সিঁদুর ঘাঁটা। লাল-পেড়ে শাড়িতে গেরস্ত বধূ। ভিন পুরুষ পরিচারিকায় গিজগিজে সংসার।

অপয়া, অলক্ষণে মুখ চোখে পড়ার আগেই নিজের মুখ দর্শন করে সকাল শুরু। শুভ দিয়ে সূত্রপাত। সেজন্যেই হাই ওঠে, চোখ ডলে ঘুম ছাড়ায় কমলারানী। পুকুরঘাট, ধান চালের গোলা নিয়েও তো কমলারানীর মাঠ ঘাটে আট'শ বা হাজার বিঘে ধানি জমি! সে জমি পৃথিবীর মাটিতে। মাটিতে সীমানা কেটে দেশ, দেশের মধ্যে ভাগ করে জেলা। জেলার সবুজ ধান চারা বিছিয়ে আছে হারুবাবুর কাছারিবাড়ির গায়ে গায়ে। ছড়িয়ে আছে নতুন গঞ্জ কাকদ্বীপ বাজারের সংলগ্নতায়। মানুষ বাড়ছে। দোকানপাট গজাচ্ছে। গঞ্জটা জমে উঠেছে।

ঘুমটা দু-চোখের কোটর থেকে মুছেও মুছছে না। বাসি মুখে আর একবার হাই ওঠে। হাতের শাঁখা সরু নোয়া ঠিন ঠান্ বাজে। হাতে সোনার পেটি আয়নায় ঝিকিয়ে ওঠে। গায়ের কাপড় সামলে কমলারানী পাশে তাকায়। মশারির চৌ-খুপি বন্দী বিছানা। সাদা চাদরটায় ঘামের দাগে গোটা মানুষটা। পালঙ্কের বালিশ থেকে পা চলে যায় ওপাশের আড়াল কাঠ অব্দি। বাটালি কাটা মেহগনীর সরু সরু রেলিং পালঙ্কে। মানুষটার গন্ধ আছে, দাগ আছে, মানুষটা কই! তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামে কমলারানী। আলগা চুলে বেটে খাঁটো চেহারা। সাদা খোলের উপর বড় করে লাল পাড়। গা গতরে ভারী গিন্নী। ভরাট পায়ের পাতায় গত বিকেলের আলতা। ছোট ছোট আঙুল। আঙুলে রুপোর মটরদানায় আঙট। মেঝেয় পা ফেলতেই ঝম্, ঝম্ ঝম্ বাজনায় এগোয়। সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে বাজনাটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আরও ঘন স্থায়ী করে। ঘর থেকে বারান্দায় আঙটের দানা ঝুমঝুমি বাজায়।

নোনা মাটির বিশাল উঠোন। খামার। বারান্দার সিঁড়ি থেকে পা ফেলতেই মাটি। সামান্য ইট সুরকিতে পা মাড়িয়ে পথ। রুপোর আঙট ঝমকে উঠে আর তেমন বাজনা তোলে না। মাটি শুষে নেয় সে বাজনার দমক। কত শত বছরের দমক দাপট শুষে নিয়ে তো নির্বিকার সাধ্বী ধরিত্রী।

গড় বন্দী বাস্তুর আকাশে সকালের সূর্য উঁকি দেয়। কমলারানী দু-হাত জোড় করে প্রণাম জানায় সূর্যদেবতাকে। শাঁখা নোয়ায় ঝন্‌ঝন্ বেজে ওঠে। হারুবাবু পিছনে এক পলক দেখে আবার নিজের মতো দাঁড়ায়। কমলারানী প্রণাম করতে করতে ভাবে,···দেবতার দয়ায় তো আমার সংসারে এই সম্পত্তি?

শেষ রাত খানিক গুমোটে গা জ্বলেছে হারুবাবুর। এতবড় শরীর। শুধু উশপাশে ছটফট করেছে। পাশে স্ত্রী থাকতেও একটুও কথা হয়নি। বরং গায়ের কাছে একটা বাড়তি মানুষের শ্বাস। গায়ের ঘাম গন্ধে অস্বস্তি ছিল। এখন সকালের ফাঁকা হাওয়ায় নিজের মেয়েমানুষ। এগিয়ে এসে কথা বলুক তা নয় ঠকাস ঠকাস গড় ঠুকছে। মেয়েমানুষ তো? বলীয়ানের কাছে ঠিক নত। তখন পুরুষ হিসেবে, এত বিষয় বৈভবের মালিক হিসেবে মর্যাদায় লাগে। মুখ ঘুরিয়ে গড় পেরিয়ে ডাব নারকেলের ফাঁক ফোকর দিয়ে প্রবাহিত নোনাজলের ধারা দেখে। কাছের দ্বীপটা, তার ওপারে ধুয়ে মুছে সাফ সুপারিভাঙা দ্বীপের জেগে থাকা কাদা চরটা দেখে। সেই মগ্ন দ্বীপের পাশ দিয়ে নীল জলের উপর

একখানা বয়া। বয়ার ডগায় তখনও আলোটা জবলে। নেভে। খানিক পরে আবার জবলে।

—তুমি এত সকালে উঠে এলে? কোথাও কাজে যাবে?

কোনো উত্তর করে না বিশালাকার স্বামী পুরুষ।

—আজ মামলা মোকদ্দমার দিন আছে? জানতে চায় স্ত্রী কমলারানী।

—না। এইটুকু কথা ছুঁড়ে দিয়ে তো তাকে আর কিছুতে ব্যস্ত হতে হয়। তখনই নিজের হাতটা চলে যায় পেটের পুরনো দাগের উপর। বড় শরীরে প্রমাণ সাইজের ভুঁড়ি। কালো রঙের আস্তরে এক ঝলকে পাহাড়ের এক চাঙ পাথর মালুম হয়।

—না বলছি তো, বউয়ের দিকে মুখ রেখে কথাটা ছোঁড়ে। মাথাভর্তি চুল, গোল মাংসময় মুখ, বড় বড় চোখ। চোখ দুটোয় অতীব লজ্জা জেঁকে বসে। রাগে ভাঁটার মতো ঘোরে সে চোখের মণি। মণিতে গাঁথে না সম্মুখের স্ত্রী কমলারানী। বরং হারুবাবুর দু-চোখ জুড়ে ভেসে ওঠে পয়লা নম্বর ধানির আবাদী মাঠ।······

ভদু মাইতি এসে হারুবাবুর পায়ে পড়েছিল, বাবু—বাবুগো বাঁচাও—আলগা গায়ে সাদা ধুতিটা ফেত্তা মেরে লুঙির মতো পরে। প্রায় বাপ কাকার বয়েসী মানুষ। মধ্য বয়েসী তাগড়াই চেহারা হারুবাবু ধানের হিসেব নিচ্ছিল সরকারের কাছ থেকে। লাল লম্বাটে খেরো খাতা। বোটের মালিক তখনও বসে। এক গোলা ধান বোট বোঝাই হবে।

হারুবাবু ভদু মাইতিকে দু-হাতে সরিয়ে বলেছিল, কী হয়েছেটা কী শুনি?

—গতসনের বানে সব ভেসে ভুসে গেল। মাঠের ধান হেজে পচে খড়—

হুঁ। তারপর? যেহেতু ১৯৪২-র বন্যা তো এখনও শুকোয়নি, মুছে যায়নি, তার বিশদ বৃত্তান্তে যেতে মন চায় না হারুবাবুর। সে দিন তো হারু-বাবু এই কাছারিবাড়ির ছাদে। ছেলে মেয়ে বউ চাকর বাকর নিয়ে চিলে কোঠায়। ধান চালের মতো ঠাসাঠাসি হয়ে গোলাজাত। গাঙ তখন ফুঁসছে। অবিশ্রান্ত ঝড় আর বৃষ্টি। মানুষ ভেসে যাচ্ছে—জ্যান্ত মরা গোরু ছাগল ভাসছে নোনাজলে। পুঞ্জ পুঞ্জ কচুরি পানা নোনা কালো জলে ভেসে যায়। বড় বড় সবুজ পাতায় বৃষ্টির আঘাত। ছিঁড়ে কুটেও পাতাগুলো আরও সবুজ। মানুষের গেরস্তালি পুকুরঘাট সব তো তখন নদী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভদু মাইতি নিজে মাত্র আশি বিঘে ধান জমির মালিক। সামনে বসে তার চেয়ে দশ-বার গুণ বেশি মেঠো সম্পত্তির মালিক। সুতরাং যথাযথ বিনীত ভঙ্গিতে বলে, বাবু—আমার পনের বিঘার গায়ে চিত্রনাথ বোয়ালদের বাস—

—হুঁ। জানি—

—তা বানের জল নামলে পেটের জবালায় বউ বাচ্চা, ষোল সতেরোর বড় ছেলেটাকে নিয়ে কলকাতায় যাবে। পোটলা পুঁটলি বাঁধা রেডি—। যাবার সময় বুড়ো চিত্রনাথ বলতে এল, বাবা দেখো গো—বাস্তু ডোবা আর দশকাঠা-

টুকু। মেঙে পেতে খেয়ে যদি বেঁচে থাকি তো ; ফিরবো—

চিত্রনাথ বোয়াল ভদু মাইতির পায়ে মাথা নুইয়ে গড় সারে। অভুক্ত পেটে রোগা বুড়োর কপাল মাটিতে ঢিপ্ করে বেজে ওঠে। তখন আশি বিঘের মালিক ভদু মাইতির ঘরে গোটা সংসারের সম্বৎসরের খোরাকি মিটিয়েও একটা দু'শ মণি বোট বোঝাই বিক্রির মতো চাল মাঝঘরে টাল দেওয়া। ক'মুঠো ভাত আর একটু মাছ চিংড়ি মাখিয়ে দিলে সাতখানা বিড়াল চালের বস্তার উপর আরামে ঘুমোয়। মেটে ঘরে ইঁদুরের উৎপাত। বস্তা কাটার উপদ্রব। ফলে বিড়ালগুলো তাক করে থাকে গর্তমুখে। ধরতে পারলে কচমচ চিবোয় ইঁদুরের কাঁচা মাংস। সেদিন প্রাণিগুলোর পেটের ক'মুঠো ভাত বাঁচে। বেঁচে যায় চালগুলো। বিক্রির পণ্য হয়ে যায়।

—তা, যাবি গো চিত্রনাথ ? জানতে চায় ভদু মাইতি।

চিত্রনাথ বলে, শহরে লঙ্গরখানায় ভিখ মেঙে খাবো—

—থাম, বলে ভিতরে যায় ভদু মাইতি। খানিক পরে পালিখানেক চাল এনে ধরে : সরু সরু দুধেরসর চাল। যেন সবে ঢেঁকি ছাঁটা করে বস্তায় বাঁধা হয়েছে। এখনও টাটকা গন্ধ। ক'দিন শাক পাতা ঘেঁটে তো পেটের আগুনে খানিক খাদ্য যোগানো! একেবারে হাতের নাগালে, নাকের কাছে চাল··· ! সিদ্ধভাপ গন্ধে পৃথিবীর মহার্ঘ বাদশাহী আতর হার মানে। গন্ধরাজ কিংবা চামেলির পাপড়ি পরতে রক্ষিত সুবাস কত যে হীন !

—এটা কি ? কি করবো—, বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে চিত্রনাথ। কৃষিকর্মের ক্ষেত মজুরি করে অন্ন সংগ্রহই জীবন। তার কাছে এ খাদ্যশস্য মোটেই অচেনা নয়। তবে একঝটকায় কেড়ে নিতে পারে না বা এতখানি অনুগ্রহ তার কল্পনায় নেই। অখাদ্য কু-খাদ্য খেয়ে শিরাস্নায়ু তৎপরতা হারাচ্ছে। তাই হাবার মতো শুধোয়, "এটা কি !"

ভদু মাইতির বেতের বোনা পাত্র "পালি"টায় আড়াইসের পরিমাণ চাল ধরে। চিত্রনাথের গোটা সংসারে পাঁচজনের উদরভর্তির তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য। সেটা এগিয়ে বলে, নেরে—চিত্র নে—

চালকটা কোঁচায় খুঁটে বেঁধে নিতে নিতে চিত্রনাথ প্রস্তাব দেয় ভদুবাবুকে, বাবু আপনি—কিনে নিন গো আমার বাস্তুভিটা ডোবা, দশকাঠাটা—

ভদু মাইতি প্রলেপ দেয়, দুস্। দেশে ফিরবিনি ? কলকাতায় কদ্দিন থাকবি ? পারবি ?

—ঠিক বলেছ। ফিরে এসে এখেনে যেন মরতে পাই—

ভদু কথার পাক তৈরি করে, তবে বাস্তু ভিটে পুকুর ডোবাটা থাক। দশকাঠা জমিটা দিবি ? নগদ টাকা দোব—

চিত্রনাথ হাঁ-করে তাকায়। ভদু মাইতি তার মুখে দুর্লভ খাবার গুঁজে দেওয়ার মতো জো বুঝেই বলে, নগদ একশ টাকা। রাজি— ?

—এক্ষুণি।

পরম আগ্রহে বলেছিল চিত্রনাথ বোয়াল। কেউ তো নেবার লোক নেই।

তবু তো কিনে নেওয়ার মতো মহাজন মিললো।

—তবে চাল কটায় তোরা রেঁধে বেড়ে খা। কাল না হয় কলকাতায় বার হবি। তুই—, বলে আকাশে তাকিয়ে বেলা আন্দাজ করে, চল। এখন রেস্টারি অফিসে—

খড়ের চালায় মাটিতে চ্যাটাই মাদুর পাতা। একখানা করে টিনের হাত-সুটকেস। সুটকেসের ভেতর সাদা কাগজ ডেমি স্ট্যাম্প। পাশাপাশি মাদুর চ্যাটাইয়ে এক একজন বাক্স নিয়ে বসে। পাশে দোয়াত কলম, হ্যান্ডেল। যখন মুহুরি লিখল, দাতা—শ্রী চিত্রনাথ বোয়াল পিং-হরনাথ বোয়াল সাং-পয়লা নম্বর ধানি জেলা-২৪ পরগনা—গ্রহিতা—শ্রী ভদুনাথ মাইতি পিং-যদুনাথ মাইতি তখন চিত্রনাথ দেখে, সুটকেসের উপর কাগজ ফেলে লিখছে এক একজন মুহুরি। কত লোক···বউ বুড়ি এক একটা মুহুরিকে যে ঘিরে বসে। একজন বেচছে। আর একজন কিনছে।

ভদুনাথের মুহুরি বলল, হুঁ। মৌজা—দাগ নম্বর, খতেন ?

ভদুনাথ চিত্রনাথের পৈতৃক কাগজপত্তর উল্টে বলে, মুহুরি দেখে নাও—

পুরনো ন্যাকড়ায় পাট করে বাঁধা কাগজপত্তর। নোনাজলের দাগ। ঝড় বৃষ্টির প্রহার লেগে আছে দলিল, পড়চা, খাজনার রসিদের লালচে কাগজে। মুহুরি কাগজ পত্তরের ভাঁজ খোলে। চিত্রনাথ ভাবে, পৈতৃক বাসভূমির পরিচয় ওই ক'খানা কাগজই শুধু বহন করবে ? বাপ যে জন্মেছিল এ মাটিতে, মরেও ছিল এ মাটিতে—সেটা কে বলবে ? আমার জন্ম···বিবাহ···সন্তান-সন্ততির জন্ম সে কথা কি বলতে পারবে ওই কাগজের বাণ্ডিল ? আজ বাদে কাল যে চলে যাব···পেটের ভাত যে হচ্ছে না এখানে···সে কথা কে বলবে ? কেমন করে কথা হ'ল ভদুবাবুর সঙ্গে—সে কথা কি দলিল বলবে ?

মুহুরি কাগজগুলোর ভাঁজ খোলে খুব সাবধানে। অল্প চাপ পড়লে ভাজা পাঁপড়ের মতো মচকে ভেঙে যাচ্ছে। বহুকষ্টে ছেঁড়া খসা কাগজের টুকরো জুড়ে দলিলের শেষাংশে মৌজা দাগ খতিয়ানের তপশীলটা গোছ করে। মুহুরি গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, ভদুবাবু—পেয়েছি। তো এবার বল—দশ কাঠার উত্তরে কার জমি ? পুবে কার ? পশ্চিমে কে আছে ?

ভদু মাইতি প্রখর স্মৃতি চালিয়ে চতুষ্পার্শ্ব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে। তখন চিত্রনাথ অন্য দলিল লেখক মুহুরিদের দেখে। দেখে তাদের সামনের লোকজনকে। ভাবে,···তবে যে কেউ নাকি কিনবার মতো লোক নেই···! মহাজন মেলা দায় ? তাহলে এরা যারা বেচছে—ওই লাঠি হাতে বুড়ো, বাচ্চা কোলে মা···ছেঁড়া কাপড়ে বউটা···ওরাও কি আমার মতো বেচে দিচ্ছে! ওরাও কি আমার মতো বেচে দিয়ে কলকাতার পথ ধরবে ?

—নাও, একটা সই কর। না, টিপ দেবে— ? মুহুরির প্রশ্নে তাকিয়ে থাকে চিত্রনাথ। ভাবে, এখনও তো দশকাঠাটা আমার। আমাদের মাঠের জমি মাঠে পড়ে আছে। তবুও আমার। বুক ভরে এঁটে আছে !

মুহুরির গলায় ঝাঁঝ. আরে—নাম লিখতে পার ?

চিত্র ঘাড় নাড়ে, না।

কালির প্যাডটা এগিয়ে দিয়ে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা টানে, ছাপ লাগাও—

বুড়ো আঙুলের রেখায় রেখায় কালির দাগ। দাতার নামের পাশে বুড়ো আঙুলের ছাপটা দিতেই মনে হ'ল জিনিসটা…বস্তুটা…সম্পত্তিটা চলে গেল! কিন্তু মাঠের যেখানে সেটা লেগে আছে—সেখানেই তো ছিল…! তাহলে বদলটা কোথায়…!

সাব-রেজিস্ট্রারের সামনে কুচকুচে কাল কালিতে বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে যখন ছাপ দিল, চিত্রনাথের বুক চিরে ব্যথা। বানের দিনের বিদ্যুৎলতা ভয়ঙ্কর আওয়াজে আকাশকে হঠাৎ ফালা ফালা করে দিল।

ভদ্র মাইতি মিষ্টি দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, খাবি?

চমকে যায় চিত্র। এইসব দামি রসগোল্লা পানতুয়া সন্দেশ—জমিদার লাটদারের খাদ্য। এটা সম্ভব!

—চল, দু-জনে খাই।

দোকানটার সামনে ছেঁড়া জামা ছেঁড়া শাড়ি পরে একগাদা বাচ্চাকাচ্চা। বাঁকা চোরা থালা—রুগ্নশরীরে একটা প্রজন্ম। দোকানদার ধমকায়, হট্। হট্ যাও—

ভেতর থেকে একজন এক ডাবু গরম জল নিয়ে বলে, খদ্দেরের সময় সামনে থেকে পালা। যা না দারোগা—সার্কেল অফিসারের কাছে। মালিকটা কথা জোড়ে, সুরাবর্দি—নিজামুদ্দিন সাহেবের কাছে—

অবোধ শিশুরা বিস্তারিত ভূমি জুড়ে দেশের একটা বংশধারা। কে যে সুরাবর্দি…কে যে সার্কেল অফিসার, কোনো বিকার নেই। তারা শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। চায়। মাঙে। খাদ্যের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খাদ্য ভিক্ষা করে।

কানা উঁচু সাদা কলাই করা ডিশ। শক্ত ধাতবের গেলাস। লোক মুখে মুখে চালু, উড়োজাহাজ ভাঙা শিট, প্লেট গলিয়ে গেলাস। বেঞ্চিতে বসে হাতে সাদা ডিশ। পোড়া লালচে রঙের পানতুয়া। পর পর চারখানা খেতেই ডিশ খালি।

ভদ্রনাথ নিজের ডিশে আর দু-খানা দেখে বলে, আর আধসের দাও তো আমার লোকের ডিশে—

চিত্রনাথ কৃতজ্ঞতায় টইটম্বুর। এমন দুষ্প্রাপ্য খাদ্য তার রসনায়। তার পেটে…।

কিয়ৎক্ষণ পর ডিশ খালি। চিত্রনাথ ডিশের রস চাটে। ক্ষুধার্ত বাচ্চাগুলো ওপারে দাঁড়িয়ে দেখে। তাদের শুকনো শরীরে লালা আসে টাকরা ভিজিয়ে। ধীরে ধীরে।

—আর আধসেরটাক খাবি?

চিত্রনাথ চুপচাপ থাকে। তখনও ডিশের রস চাটে। দোকানদার আরও আধ-সের পানতুয়া এনে দাঁড়ায়। ভদ্রনাথের নির্দেশের আগেই চিত্র খালি ডিশটা বাড়িয়ে দেয়। বড় বড় পানতুয়া একদম নিটোল। ভেতরে খানিক ফাঁপা দু-একখানা বড় এলাচ দানা। ঘি-গন্ধ পানতুয়া জুড়ে। দেবভোগ্য খাদ্য পেয়ে

চিত্রনাথ মাত্র একবার ভদ্রবাবুর দিকে তাকায়।

বাবু বলে, খা—আত্মানারায়ণ যখন চাইছে—

এবার ডিশের কটা খেয়ে মাইতিবাবুকে বলে, আমার ঘরের জন্যে কিছু দেবে গো বাবু? এতক্ষণে এই প্রথম চাইতে শিখল চিত্রনাথ। গতরখাটা মজুরটা।

—দোব। তুই প্রাণ ভরে খেয়ে নে—

চিত্রনাথ খায়। গালের মধ্যে পানতুয়াটা ধরে রাখে। একটু আস্তে চাপ দেয়, কুল কুল করে রস টাকরা, গালে ভরে যায়। মাঠের ওই টুকুর বিনিময় যে এত মনোরম। ভাবে, বাপ যদি আরও দু-বিঘা করে রেখে যেত…! যাদের চালাক চতুর বাপ এমন রেখেছে তাদের খেয়াল হলেই সুখ কত কাছে।

মাটির তিজেল হাঁড়িতে একসের পানতুয়া। ভাল করে শালপাতা মুড়ে দড়ির বাঁধন। ডিঙি থেকে নেমে বাঁধে ওঠে। বাঁ-হাতে অতো দামি খাদ্যটা দড়ি ঝুলিয়ে নিয়ে আসে। অতি সন্তর্পণে। ঢালু পথে নামার মুখে ভদ্রনাথ মাইতি বলল, ও চিত্র?

—আজ্ঞে বাবু?

—দশটা টাকা রাখ—,

চিত্রনাথ পানতুয়ার হাঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে। আচমকা ভাবে, দু-সের পানতুয়ার দাম কত যে…! বাকি টাকা কি তার বদলে বাদসাদ…!

একটা দশ গুঁজে দেয়। কুড়ি হয়। আবার দিতে ত্রিশ, চল্লিশ…চিত্রনাথ বিপন্ন। একসঙ্গে এতগুলো টাকা! খুঁদ কুড়ো বাজরা আটা কিনতে কত লাগবে?

ভদ্রবাবুর হাতে টাকা। চিত্রনাথ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। তার চেনা এলাকায় ক'জন মানুষ বললেই, মৌমাছির মতো টাকা…খাদ্য পিলপিল করে হাজির হয়। কি যে সেসব কলাকৌশল! শুধু তাদেরই জানা!

দ্বিধায় চুপচাপ থাকে চিত্রনাথ। ভদ্রবাবু নাড়ির টের পায়। চিত্রনাথ কে বলে, তুই কালই কলকাতায় যাবি?

—শুধু আমি নয়। গোটা সংসার—

—সেজন্যই তো ভাবনা। বড় ধুরন্ধর প্যাঁচের জায়গা। দুর্দিন…সব টাকা নিয়ে রাস্তাঘাটে কোথায় শুবি, কোথায় খাবি—তার উপর কটা টাকার বোঝা। গেলে তো সব যাবে—কলকাতায় এখন কেড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে মানুষ।

বাবুর কথা চিত্রনাথের মনে ধরে। ধরে আছে তো বাবুর অনুগ্রহে একেবারে এক সের পানতুয়ার হাঁড়ি। পকেটে দশটা টাকা। আবার হাতে নতুন ক'খানা। তা বাবু সব খুইয়ে তো যাচ্ছিনি। ফিরতেই হবে দেশে তখন! কথার সুতো ধরে খ্যাঁচ মারে, হ্যাঁ-হ্যাঁ। মন্দ নয়।

একেবারে শেষের অংশটুকু ইচ্ছে করে অমীমাংসিত ভাবে গোপন রাখে ভদ্রবাবু।

বৃত্তান্ত শুনে হারুবাবু বলেছিল, আমি যেয়ে করবটা কী?

বাক্যটায় ভদ্র মাইতির মনের জোর চকিতে ধসে যায়। আঁকুপাকু বলে, সে

কি গো বাবু ! তাহলে যাব কোথায় ? ক'বছরে সব ক্ষয় ক্ষতি। এবারে যেটুকু হয়েছে—তা গুণ্ডামি করে চুঁচে নেবে ?

হারুবাবু শুনে অবহেলা করতে পারে না। একটা হুজ্জুতি যদি ঘটে যায় তাহলে নিজের জমিতে সে ঢেউ আসতে কতক্ষণ ? এরকম ভাবনায় খানিক বাস্তবতা পায় হারুবাবু। দেশময় নিরন্ন, অনাহারি। যদি সব অনাহারি অভুক্তরা দল পাকায় ? সুতরাং ডগ ঠেলার মুখেই সেটা উপড়োতে হয়। তখনই বলে, চলো তবে।

ভদু মাইতি কৃতজ্ঞতায় গলে যায়। হারুবাবুর পায়ে পড়ে বাপের বয়েসি ভদু মাইতি। এক পা সরে দাঁড়ায় হারু চাউলে। দেশ গাঁয়ের মানুষ। লঘু গুরু জ্ঞানটা এখনও মুছে যায়নি। পরক্ষণে মনে হয় হারু চাউলের, আমি··· আমি তো নয় আমার বল···লাঠি···লাঠির গুরুই সব। মনে মনে এ প্রণাম কিংবা পাপ—লাঠি শিক্ষার গুরুর প্রতি চালান করে। এটুকু পেরেই দেহ পরিষ্কার। মন একদম সাফ।

সাড়ে ছ'ফুট লম্বা মানুষ হারুবাবু। লাঠিটা প্রায় মাথা ছুঁয়ে যায়। নিত্য সরষের তেল মাখিয়ে চকচকে ক'খানা লাঠি। গাঁটগুলো তেল পেয়ে মজবুত। পাকা গেঁটে বাঁশের শক্ত ডগালি। পরিচর্যায় যেন লোহা। লাঠিটা গাঙ বাঁধ ঠুকে হাঁটে। বাঁধ থেকে আলপথে নামে দুই মালিক। একজন ত্রাতা। আর একজন প্রার্থী। হারুবাবু ধান বনের আলপথে নেমে লুঙিটার এক পাট কোমরে গোঁজে। লাঠিটায় গায়ে জল কাদা লেগে অযথা নোংরা হবে তাই কাঁধে নেয়। লাঠিটা বন্দুক হয়ে যায়। তখন কাঠের বন্দুকে ছররা ছুটে এক দু-জনকে তো আঘাত করত। হারুবাবুর লাঠি এক পাক ঘুরলেই তো এক দু-জন জখম। কিংবা প্রাণে শেষ।

দশ কাঠার দিকে হাঁটে দু-জন। গত বানের পলি পড়ে আকাশের জল খেয়ে আবাদী মাঠ উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে। গর্ভ থোড়ে গা ভারী ধানচারা-গুলোর। কোথাও ধানের ফুলে ফুপড়ি। কোথাও গায়ে সোনার বরণ। ভেতরে ক্ষীর জমেছে। চালের তুলতুলে ভ্রূণ নরম খোসার পেটে। মানুষের খাদ্য। এদেশের মানুষকে ডিঙিয়ে দেশ পেরিয়ে কোন দূর দেশে যে চলে যাবে! নেটিভের পেটের দানা সাহেবদের লাঞ্চ। শোলজারদের ব্যারাক ছাউনির ক্যান্টিনে ফুটবে।

উঁচু বাঁধের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরের নোনা জল। যেহেতু জোয়ার, জল ফুলছে। ঢেউ চলকাচ্ছে। গুটি গুটি জোয়ার এগোচ্ছে ট্যাংরার চর, নুরপুর ফলতা বজবজ ছুঁয়ে কলকাতা। টহল দিচ্ছে জাহাজ। লোহার খাঁচা, রেলিং ঘেরা ডেকের উপর কামানের মুখ। মিত্রপক্ষ ব্রিটিশের গোলা তাক কষে আছে বঙ্গোপসাগর, ভারত সাগর ওদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের নোনাজলের সঙ্গে আকাশের মিথুন রেখার দিকে। জার্মান ইটালি ক্রমে জাপান তো মহামিলনে জমাট। জাপান সাগর, চীন সাগর ফিলিপাইনস দ্বীপগুলো বেড় দিয়ে কখন যে নোনাজলের বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে ঢুকে পড়ে কলকাতার গাঙে জাপানি

জাহাজ ? তাই টহল দিচ্ছে···কলকাতা আগলাচ্ছে মোহনা মুখে। হঠাৎ আকাশে বোঁ বোঁ শব্দ। শব্দটা নিকটতর হতে ক্রমশ ঘন। গা-চকচকে উড়োজাহাজটা চকিতে মাথায় হাওয়া দিয়ে গাঙের দিকে যায়। সদ্য ধানভারে নত চারাগুলো এক পাক দোল খায়। গাছাগাছালির পাখি কিচিরমিচির ডাকে। কাকগুলো গলা ছেড়ে আঁৎকে ওঠে, কা-কা-কা। হারুবাবু গাঙের দিকে চেয়ে উড়োজাহাজের চেহারাটা মনের মধ্যে গাঁথে। টহলদারি জাহাজের মাথায় পাক খায়। বোঁ বোঁ শব্দটা গাঙের জলে ছিটকে আকাশে বালার মতো ঘোরে। উড়োজাহাজের ধাতবে ঝকমকে আলো!

সঙ্গী ভদু মাইতিকে বলে হারুবাবু, দেখেছো—

—কি গো বাবু ?

—আমার নোনা পুকুরে বুড়ো বোয়াল মাছটা যখন লাফ মারে—তার গায়ে ঠিক এমন এনামেল রঙ। মুখটাও উড়োজাহাজের মতো ছুঁচোলো—

বলীয়ান বাবুর কথায় সাহায্যপ্রার্থী ভদু মাইতি হাসে। গাঙের জাহাজটাকে তখনও এরোপ্লেনটা পাক মারে। হঠাৎ ভদু মাইতি বলে, কি ফটর ফটর কথা ?

—কার ? জাহাজের সঙ্গে উড়োজাহাজের ?

—দুস্। বাবু কি যে কয় ?

—তবে!

—ষোল সতেরোর ছোকরাটা। চিত্রনাথের ব্যাটার—

—উম্। বেশ গম্ভীর হয়ে কথাটা শোনে হারুবাবু। আবার জানতে চায়, অনেক লোক জুটিয়েছে জমির গায়ে ?

—না না। কটা ন্যাকড়া পরা লোক—আর কানি কোমরে বউ মেয়ে—।

হারুবাবু কাঁধের লাঠিটা নামিয়ে হাতে নেয়। বলে, সেবাদলের দু-চারজনকে খবর দিলে পারতে ?

আঁকপাক করে বলে ভদু মাইতি, বাবু গেছিলুম হরেকিষ্টবাবুর কাছে। তারা তো রিলিফের চাঁদা চাল ভিক্ষায় বার হল—

অমন ডাকসাইটে বলবান পুরুষটা ঝিমিয়ে পড়ে। সঙ্গে হাঁটে। লাঠিটা আবার কাঁধে তুলে নেয়—, চল—তাড়াতাড়ি।

হাঁটার গতি একটু থামিয়ে ভদু মাইতি বলে, বাবু—আপনি গিয়ে দাঁড়ালেই হবে। এলাকার একজন বর্ধিষ্ণু মানুষ। একটু মধ্যস্থতা করে দেবেন শুধু—

ছোট্ট ডোবাটায় গত সনের বন্যার জল মুছে এ বছরে বর্ষার নতুন জল। নীল আকাশ ডোবার জলে। মৃদু হাওয়ায় আকাশ টলমল করে। বানের তোড়ে পাড় ধসে ক্ষয়ে আরও সরু। আঁটি ফুঁড়ে দু-চারখানা খেজুর চারার ঝুপসি পাড়ের মাটিতে। ফলফলে পাতায় বেলা দশটার রোদ আটকে নিচে ঘাস দুর্বোকে ছায়া দিচ্ছে মান পাতা। ছোট্ট উঠোনে ঘাস আগাছা জন্মে বুনো আগান বাগান। মাটির ভাঙা দেওয়াল ঝরে ধুয়ে খানিক অবশিষ্ট। সেই

দেওয়ালটুকুর উপর খান কয়েক কাঁচা তালপাতার ডাগলা বিছিয়ে ছাউনি। ছাউনি ছায়ায় তোবড়ান থালা ডিশ। তার পাশে ছেঁড়া কাঁথা কানির পুঁটলি ক'খানা। কাঁচা পাতার ছাউনিতে দেশে ফেরা মানুষের গৃহ হয়েছে। কলকাতার ধুলো নালার জলে বিবর্ণ তৈজসপত্র নিয়ে পুনর্বাসন। কিংবা স্বভূমিতে বসবাসের উদ্যোগ। কালুনাথ বন ঝাঁটি গেঁমুয়া চারা উপড়োয়। বনজঙ্গলের দানা বীজ ভাসিয়ে নিয়ে বানের জল ডুবিয়ে দিয়েছিল দাওয়া উঠোন। বীজ তো থেকে গেছে মাটিতে। শুধু গত বানে নয়। দশক, শতক হাজার বচ্ছর ধরে। কেবল বুনো অরণ্যের আগ্রাসন নয় আগ্রাসন মানুষেরও।

কচি কচি ভাই বোন। সাদা থান কাপড়ে মা। পাতার ছাউনি তলায় পুঁটলি খোলে। কালুনাথ উঠোনের আগাছা তোলে। হাওয়ায় মাঠের ধান চারাগুলো দোল খায়। এখন আকাশে নীল মেঘ। উঠোনটায় ছায়া করে। গৃহস্থের অনুপস্থিতিতে ঝাঁটি গাছটা নির্বিবাদে ডালপালা ছড়িয়ে ঝাঁকড়া। অপুষ্ট শরীরে সতেরোর কালুনাথ। প্রাণপণে ঝাঁকুনি দেয়। ঝাঁটি চারার শিকড়বাকড় আলগা। আর একবার টান দিতেই ভুস করে উঠে আসে। ঝুরো মাটি ছিটকে যায়। গাছের বিস্তারিত ভূমিটুকু ফাঁকা। উঠোনে মাটির সেই রঙ দেখতে পায়। কত শৈশবের খেলামারি খেলার উঠোন। নোনা মাটির কাদা মেখে ভূত হলে বাপ চিত্রনাথের মুখ ঝামটানি! ভাবতে ভাবতে কালুনাথের হাত থেমে যায়। সতেরো বছরের হাতে হঠাৎ সাতাত্তরের জড়তা।

—কিরে আমি হাত লাগাব? জানতে চাইল জমির আলি।

—উঁহু। তুমি আমার বাপের পান তামাকের বন্ধু। তুমি থাকায় আমরা সংসারে বসতি হতে পারি সে ব্যবস্থা করে দাও—

তালপাতার ডাগলা ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসে মা। জমির আলির হাতটা ধরে বলতে গিয়ে বাক্য হারিয়ে যায়। ধরা হাত ধরে থাকে। শুধু হাউ মাউ কেঁদে বানভাসি হয়। চোখ বেয়ে গাল গড়িয়ে সে জলের ধারা। দেশটা আছে··· দেশের গাঁটা আছে···সে মানুষের সঙ্গীটা আছে···সে মানুষটা কোথায়!

সতেরোর কালুনাথ মাকে দেখতে দেখতে ভাবে,···দেশে চাল নেই···ডাল নেই···! তবে কি করে যে লঙ্গরখানায় বাবুরা চালে ডালে ফুটিয়ে অমন ঝারানি ডাবু কাটিয়ে দিতে পারত···? তাহলে কাদের কাছে চাল কাদের কাছে ডাল! ভারী মনে কালুনাথ মা, মাকে ছেড়ে ভাইবোনদের দেখে। রোগা পটকা হাড় ক'খানা নিয়ে তারা তবু আছে। নেই শুধু বাপটা। ছোকরা বয়েসে রেগে ওঠে কালুনাথ,···যাদের কাছে চাল ডালের হাত ফিরি হত, তারাই মেরেছে। মেরে তবে ছাড়ল বাপটাকে···

মাথা সমান লাঠি। লাঠির ডগায় রোদ। ওপারে গাঙের জলে স্টিমার। ভোঁ বাজিয়ে প্যাসেঞ্জার বয়।

হারুবাবু লাঠি রাখতেই মাটিতে ঠক্ শব্দ। লাঠিটা কেঁপে ওঠে। কেঁপে ওঠে নিজের পৈতৃক বাস্তুতে কালুনাথ। হারুবাবু ছোকরা কালুকে বলে, হ্যাঁ খোকা কী হয়েছে?

দীর্ঘকায় মানুষটার গায়ে সাদা ফতুয়া। কোমরে সাদা কাপড়ের ফেততায় লুঙি। মাথায় ঘন চুল। বেশ বাবু চেহারা। তারই মাথা ছুঁয়ে লাঠি। বাচ্চা ভাইবোন কটা অবাক হয়ে দেখে! লাঠি যে বাবুলোকের সঙ্গী। সুতরাং তারা জীর্ণ খোড়ো চালের পচা লক-পকে কটা বাঁখারি টেনে টেনে বের করে। একটা নেয় ভাইটা। আর একটা নেয় উপরের ভাই। বোনটা লিকলিকে কঞ্চি হাতে একেবারে ডোবার পাড়ে।

ভদ্র মাইতি হাত নেড়ে নেড়ে বলে, এই—এই যে বাবু এই ছোকরা গণ্ডগোল করছে—

হারু কথাটা শুনে একবার তাকায় পুকুর পাড়ে। কালুনাথের পাশে মা, মায়ের পাশে জমির আলি। তার রোগা হাতে শিরা ফুটে পাকা খড়। রোগা হাতের তালুতে কালশিটে দাগ। বুড়ো আঙ্গুলের মূলে চামড়া মোটা হয়ে শক্ত এক লোহা পিটান পাত। জমির আলির ভেতরটা নিশপিশ করে। ভাবে, যদি হাত লাঠিটা সঙ্গে আনতুম···।

হারু চাউলে কথা শুরুর আগে চোখ পিটপিটিয়ে বলে, জমির তুমিও এখেনে?

ভীষণ বিনীত ভাবে বলে, আজ্ঞে। এরা ধরে আনল—

—বেশ। একটু সমঝে নিয়ে হারুবাবু বলে, কেন গো খোকা গোল পাকাচ্ছে?

—আজ্ঞে। ওটা আমাদের দশকাঠা—

হারু চাউলে তার চওড়া চেটো মেলে ইঙ্গিতে থামায়, হ্যাঁ। তোমাদের ওটা ছিল। এখন নেই—

বছরখানেক কলকাতার রাস্তাঘাট ঘুরে, পার্কে গাড়ি বারান্দায় ছোটবড় সভার সামনে দাঁড়িয়ে শিখে এসেছে, মুখ খুলতে হবে। বুঝতে হবে। হাতে ভিক্ষের ডিশ নিয়ে ঘুরেছে। শুনেওছে কিছু কথাবার্তা। তাই বলে, না বাবু। ওটা এখনও আমার—আমাদের।

মায়ের মাথার কাপড় এক খাবলা ছেঁড়া; হাওয়ায় সেটা খসে যায়। নতুন করে টেনে কপাল ঢাকে না। কী দিয়ে ঢাকবে? সব যে পচে এইটুকু টিকে আছে। বেশি টানাটানিতে যদি আবার একটু ফেঁসে যায়। বড় মানুষের প্রতি সম্মান? পুরুষ মানুষের কাছ থেকে নিজেকে খানিক নিরাপদ আড়াল? কী যে আছে দেহে তার আবার আবরণ? বরং সঙ্কোচ লজ্জা সরিয়ে মুখের উপর মা বলে, না; এটা এখনও আমাদের—মরণ সময়ে আমার স্বামী বলে গেছে—

হারুবাবু ধমকায়, থামবে—ও মেয়েছেলে?

ভদ্র মাইতি দলিলটা বাড়িয়ে বলে, এটা তাহলে কি? এটা রেস্টারি হল কি করে? হারুবাবু একটা যুক্তি পায়। বলে, এতে সব লেখা আছে···অত্র দাতা শ্রী চিত্রনাথ বোয়াল সজ্ঞানে সহমতে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ন্যায্য মূল্য বিবেচনায়···কালুনাথ বাধা দেয়, ওতে সব কথা লেখা নেই—

হারুবাবু কড়া গলায় বলে, থাকতেই হবে। তা নাহলে সাবরেজিস্টার সই

করে ?

—ওটা তো জালিয়াতী দলিল—জোতদারি চালাকি।

হার চাউলে সতেরোর কালনাথকে দেখে। পাশে ভদ মাইতিকে ফিসফিস করে বলে, কলকাতার লঙ্গরখানাগুলোয় তো কমনিস্ট্রা ঢুকে গেছে। পরের ডাল চালে খিচুড়ি খাওয়াচ্ছে—আর সোভিয়েত সোভিয়েত করে বীজ ছড়াচ্ছে।

কালনাথ খিচুড়ি খেয়ে সহ্য করতে পেরেছিল। অমন পাঁচ মিশালি ঝারানিতে সইতে পারেনি চিত্রনাথ। পা পেট ফুলে কলকাতার হাওয়ায় শেষ বাতাসটুকু টেনে ছিল। চোখের সামনে বাপটাকে মরতে দেখেছে। দেখেনি তো সোভিয়েত! দু-চারজন বাবু ছোকরারা খাদ্য বিলির সময় অমন কথা দু-একবার বলা কওয়া করত। তাতে দশকাঠার কি? হারুবাবুর কি ছুঁয়েছে? টান ধরেছে?

মাথার উপর রোদ। মধ্যস্থতা করতে এসে হারুবাবু ঘেমে যাচ্ছে আরও। কাজটা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্যে হারুবাবু ভেবে চিন্তে বলে, দেখ বাবা—এ জমি নিয়ে দলিল লেখা। তখন এ জমি ভদুবাবুর—

কালনাথ বাধা দিয়ে বলে, ওতে কি লেখা আছে দু-সের পানতুয়া?

হারুবাবু পাশে ভদ মাইতির দিকে তাকায়। লাঠিটা কাঁধের কাছে ঠেকনো দিয়ে হেলান।

কালনাথ আবার বলে, মাত্র দশ টাকা—বাঁধের উপর চল্লিশ, একথা লেখা আছে?

বিড়বিড় করে জমির আলি, কিরে শালার জমিদার লেখা আছে?

হারু চাউলে ভদুর দিকে ফিরে জানতে চায়, ব্যাপারটা কি?

তখন বড় বাচ্চার হাতে লকপকে পচা বাতাটা নিয়ে জমির আলি ঠোক্কর মারে হারুবাবুর লাঠিতে। অস্ত্রহীন হলেই মানুষটাকে কাবু করা যাবে। যেহেতু লকপকে বাতা, লাঠির বদলে লাগে হারুবাবুর পেটে। ছড়ে যায় চামড়া। সম্বিত ফিরতেই চমকায় হারু চাউলে! নজর করে, ধারালো অস্ত্রের আঘাত কি না? গায়ের ফতুয়া ভিজে রক্ত। খুন চেপে যায় হারুবাবুর মাথায়। জমির আলি দৌড়য়। পুকুরপাড় টপকে আঁক বাঁকে অনেকদূর। হারুবাবু লাঠি বাগিয়ে তাড়া করে। বেকায়দা বুঝে, লাঠিটাকে বল্লামের মতো ছোঁড়ে। বাতাস কেটে সাঁই সাঁই এগোয়।

জমির আলি প্রাণভয়ে দৌড়য়। লাঠিটা একদম মাথার উপর। লাঠিহীন লেঠেল। ফট করে শুয়ে পড়ে মাটিতে। লাঠিটা তখন বল্লাম হয়ে এগিয়ে যায় মাঠের দিকে। হারুবাবুর চামড়া ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ে। সাদা ফতুয়া ভিজে লাল। কমনিস্ট্দের পতাকার রঙ। গা চিড়বিড়িয়ে জোরে চেঁচায় হারুবাবু, থামরে জমির আলি—। শালা মোল্লার পো—তোকে আমি লুবো—

গড়বন্দী বাস্তুর আকাশে সকাল আরও উজ্জ্বল। রোদ ফুটছে পুবের সীমানায়। ছড়িয়ে যাচ্ছে দিগ্‌বিদিক্। বাতাস শীতলতা হারিয়ে গরমের দিকে। হারুবাবুর পেটের চামড়ায় গরম বাতাসের মৃদু ঝাপটা। নোনা ঘাম পুরনো

দাগের নুন ছালে। ঘা নেই, পুঁজ নেই তবুও চাপা চিট্‌মিট্‌।

জোরে জোরে পা ফেলে হারুবাবু। উঠোনময় বেজে ওঠে। হাঁস খোয়াড়ের ডেস্কো কাঠ খুলে দেয় কমলারাণী। মুরগি ঘরের বাঁখারি বোনা দোর্‌ টেনে ধরতেই প্রাণিগুলো উল্লাসে বেরিয়ে পড়ে। ডিম কটা কুড়িয়ে আঁচলে রাখে কমলারাণী। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, এবার মানুষটা ছোটার ভঙ্গিতে। দ্রুত উঠোন ডিঙোয়। দু-খানা বাঁশের মাথায় তার ঝুলিয়ে রেডিওর এরিয়াল। বাঁশের ডগায় কাকটা। খাদ্য খোঁজার মতলবে দিক ঠিক করতে একটু সময় নেয়। কিন্তু মানুষটার দ্রুত দৌড়ের শব্দে উড়ে পালায়। কোন দিকে যে খাদ্য তার আর ভাবা হয় না।

একেবারে শোওয়ার ঘরে ঢুকে দু-হাতে দু-খানা লাঠি আনে। এক হাতে মাথা সমান দীর্ঘ, অন্যহাতে খানিক ছোট। রোজ তেল খেয়ে লাঠিগুলো তামার রঙ। দিশি গেঁটে বাঁশের ডগালি হলেও মজবুত ধাতু। পায়ের কাছে ছোটটা রেখে বড় লাঠিটা উঠোনে ঠোকে হারুবাবু। পা-দিয়ে হাত পাঁচেকের একটা দাগ টানে লম্বা করে। ডান হাতের পাঁচ আঙুলে লাঠিটা ধরে ক্রমশ মাঝখানের দীর্ঘতায় আনে। গুরুর নাম জপে লাঠিটা একবার ঘোরায়। আবার সাইজে এনে হাতটা ঘোরায়। কব্জি ঘোরায়। ক'খানা আঙুলের কৌশলে লাঠিটা পাক খায়। ক্রমশ গতি বাড়ে। বাতাস কেটে কেটে ঘোরে। লাঠিটার পাকা রঙ মুছে যায়। আরও জোরে ঘোরায় হারুবাবু। লাঠিটার দৈর্ঘ্য হারিয়ে যায়। কেবল চক্রাকারে ঘোরে। তার সীমার মধ্যে পৃথিবীর বাতাস ছিঁড়ে কুটে তছনছ। বনবন ঘোরে। চকিতে ডান হাতের আঙুল থেকে বাঁ-হাতে চালান করে। এতটুকু গতি শ্লথ হয় না। তখনই জোরে একজন লেঠেলকে আহ্বান করে, আয়রে জমির—, পরমুহূর্তে প্রবল অবহেলা, আয় শালা জমির আলি—

শূন্যে পাক খায়। মাথার উপর, সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে লাঠিটা আবর্তিত। আর বিড়বিড় করে, জিন্না বলে কি না ভারতবর্ষটা কোন কালে এক ছিলনি। যে টুকু এক···উত্তর দক্ষিণে, পুবে পশ্চিমে সবটুকু সাহেবদের তৈরি! তখন পুবের বাঁ হাত থেকে পশ্চিমের ডান হাতে লাঠিটা বদল করে।

কমলারানী লাঠির ঘূর্ণন বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকে, এই যে গো—

কানে পৌঁছয় না গৃহিণীর গলার স্বর।

কমলারানী আবার চেঁচায়, শুনতে পাচ্ছ—

একটু গতি কমিয়ে হারুবাবু বলে, ডেকে দাও জমিরটাকে। এক ঘায়ে মাথাটা ফাটিয়ে দিই—

—সে কি গো? জমির আলি তো ক'মাস তোমার কাছে খেলা শিখতে এসেছিল। শিষ্যর মাথা ফাটাবে?

বাধ্য। জিন্নার সঙ্গেও ও দাবি রাখবে—

কমলার আঁচলে ডিমগুলো বেশ ভারী। রাগ করে বলে, কাঠের রেডিও বাক্সো ফেলে দুবো পুকুরে—। কী সব শুনে কী সব বকে শুধু—

মন্দ গতিতে লাঠিটা ঘোরে। হারুবাবু বলে, উঁহু। একদম নয়। তাহলে পৃথিবীতে আমি কানা হয়ে যাব—। দেশের খবর পাবনি—

—ছাই পাশ শোনার চেয়ে বরং ভাল।

—তাহলে সারাই করতে আবার ডায়মণ্ড হারবার।

কথায় মন দিয়েছে লোকটা। কমলারানী বলে, খাবে ?

স্ত্রীর আঁচলের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, কটা— ?

—মুরগি হাঁসের করে গণ্ডা পাঁচেক।

—দুস্! মাত্র কুড়িটা—। তাই সিদ্ধ বসাও—, খুব হালকা গলায় বলে আবার লাঠিটা ঘোরায়। সকালের কসরৎ। হাত মক্সো। কব্জির তেজ একটু কমে। লাঠির বেগ ঝিমোয়। চকিতে মনে হয়, তবে গোখেল সাহেব বলতো··· জিন্না যোগ্য প্রতিভাওলা উদার মানুষ। ইনি পারবে হিন্দু মুসলমানকে এক-সঙ্গে এক করে রাখতে··· ! তবে, কিসে কী যে ঘটলো··· !

নিজের প্রশ্নে নিজেই মজে যায় হারু চাউলে। মার প্যাঁচ ভুলে লাঠিটা একদম বাঁশ ডগালি। দরদরিয়ে ঘাম। গড়ের ওপারে নোনা গাঙ। বাতাস আসে নোনা। ঘামে নুন। নুন বেয়ে জমে পেটের দাগটায়। ক্ষারে চাপা চিড়-বিড়োনি। দুম করে মনে পড়ে,···জমির···জমির আলি। তখনই লাঠিটা মাটিতে ঠুকে আর এক প্রস্ত অনুশীলনের আগে গৃহিণীর উদ্দেশে চেঁচায়, শুনতে পাচ্ছ—, ওগুলো সব হাফ বয়েল করবে। দেহে বল করতে হবে-এ।

এগার

পুকুর ডোবায় বন্যার পলি বসে খানিক চড়া। গত বর্ষার মিঠেন জল জমলেও মৃদু নোনাভাব। পাড়ের গা ধরে গিয়ে সুজনি শাকের পাতা মুড়োনো। একদম জলে হিংচে কলমি। লতিয়ে গেছে গাঁটাল ডগে বাঁশ পাতার মতো ধারাল ছোট ছোট পাতায় ক্যাঁচড়া শাক।

মায়ের সঙ্গে বছর সাতেকের মেজ ছেলেটা। গায়ে কোমরে কাদা। মায়ের সঙ্গে লুটোপুটি করে হাত লাগায়। একটা একটা হিংচে পাতা নখের চাপে কাটে। পুটুস করে শব্দ হয়। কাঁচা পাতাটা কোঁচড়ে রাখে মা। মেজ ছেলেটা কচি আঙুলে চাপ দেয়। পাতার বৃন্ত কাটে না। দু-হাতে চাপ দেয়। তবুও কাটে না। জোরে টান মারে। হাত দেড়েক লতানে ডগ পাতা মিলিয়ে শাকের জলজ মূল অব্দি উঠে আসে। একসঙ্গে পাঁচ ছ'খানা পাতা। মায়ের কোঁচড় অনেকখানি ভর্তি হয়ে যাবে। মায়ের কাজে বড় রকম সাহায্য ভেবে ডাকে, মা—ধর—

—দুস্ ছেলেটা! উপড়ে দিলে ডগ থাকবে ? শাক পাতা জন্মাবে ? কাল খাবি কি ?

অত আশা করে মায়ের হাতের কাজ কমাতে গিয়ে বকুনি ? মনটা খারাপ হয়ে যায় মেজ ছেলেটার। ছ'সাত বছর বয়েস পরনে ইজের কিংবা গামছাটাও

দুর্লভ। ফলত মায়ের সামনে একদম উলঙ্গ। মুদু বকুনিতে এক চিলতে লজ্জার আবরণ ন্যাংটো ছেলেটার। এবার খুঁটে খুঁটে একটা পাতা বাছে। নখের চাপে শাকের পাতা কাটে।

জলে বিছিয়ে পাতাহীন কলমি ডগগুলো কাঁচা কঞ্চি পালার মতো ভাসছে। মেজ ছেলেটা বলে, পাতা কই যে তুলব—

হুঁ। তাই তো···বলে জল ছেড়ে পাড়ে ওঠে। বাঁশ পাতার মতো ধারাল পত্রগুচ্ছে কাঁচড়া ঘাস। পট করে একটা তুলে দাঁতে চিবোয় মা। মুখময় তেতো। ক্রমে টাকরায় তেতো চলে যায়। জলে কুলকুচো করে তেতো কাটায়। বার কয়েক কুলকুচোয় মুখটা ভাল হয়ে যায়। বলে, হ্যাঁরে মেজো—তোর বোনটা ?···

—সে। সে তো ধান বনে, বলেই চারদিকে চঙমঙিয়ে দেখে নেয়। মাঠ ঘাট অন্য মানুষের। ধান, ধানের চারাগুলো তো তাই।

মা তাকিয়ে থাকে মেজোর দিকে। উত্তরের জন্যে উৎকণ্ঠা। বুঝতে পেরে আরও কাছে আসে মেজোটা। এতক্ষণ তো নিজেও ভাই বোন আর কটা কুচো কুচো ছেলে মেয়েদেরই সঙ্গে ছিল ধান বনে। সদ্য গজিয়ে ওঠা ধানের পাতলা খোসার আবরণ। ভিতরে চালের আদল নিয়ে টলটলে সাদা তরল। শিস থেকে কুটুস কুটুস খুঁটে গালে পুরেছে। ধীরে ধীরে দাঁতে চাপ দিলেই খোসা ফেটে মিষ্টি দুধ। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ফিসফিসিয়ে মাকে বলে, সে—চন্দারা ধানের ক্ষীর চিবাচ্ছে।

মা আতঙ্কে আরও কাছে আসে, কাদের ধান ?

—সেই লাঠিবাবুদের।

মা পুকুরপাড় থেকে পুবে তাকায়। হারুবাবুর গড়বন্দী কাছারিবাড়ি ক'খানা ধানের মাঠ পেরিয়ে অনেক দূর। সুতরাং নিরাপদ। তাই···যদি একটু খেয়ে পেট ভরাতে পারে, খাক না। ভাতের দানা আর কোথায় যে পেট ভরাতে দিই···, এটুকু ভেবে আবার হিংচে ডগে হাত দেয়।

যে কটা পাতা কদিনে জন্মেছিল কিংবা গোঁজ ঠেলে ছিল, খুঁটে নিতে প্রায় ফাঁকা। পাঁচটা পেটের মতো হয় কই ?

মেজটা বলে, মা—আর কোথায় তুলব— ?

—যাবি খোকা ? মেজোর কথায় নিজের প্রস্তাবটা জুড়ে দেয় মা।

হুঁ। এটুকু বয়সে তার ধারণা যে, দেশে খাদ্য না পেলে কলকাতায় ডিশ নিয়ে ভিক্ষেয় যেতে হয়। কিংবা খাদ্যের খোঁজে স্থানান্তরে। নয়ত দেশান্তরে বেরোতে হয়।

বাস্তুর পুকুরে পাঁচটা পেটের শাকপাতা অকুলান। কোঁচড়ের কটা রাখতে ঘরে ঢোকে মা। রোদে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ মেজো গা শুকোয়। ঠাণ্ডা খানিক কমে। স্বস্তি পায়।

মা শাক কটা তোবড়ান সিলভার বাটি চাপা দিতে গিয়ে ভয় পায়। মেয়েটা কাছে নেই। ছোট ছেলেটাও বোনের সঙ্গে। কালুনাথ কোথায় যে হন্যে হয়ে

ঘোরে, কারও কাছে গতর খাটা কাজ…কাজের পর খোরাক…না হলে শুধু খোরাক… ! যে কোনো একটার আশায়।

যেহেতু ডেরাটুকু পরিজনহীন, এটুকু শাকও তো কেউ ফাঁকা ঘরে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে ? তাই আর একটু আড়াল জায়গা খোঁজে। হঠাৎ নজরে না আসে এমন গোপনীয় গর্ত। ফাটল। পোটলা পুঁটলি। মা একটু থতিয়ে দাঁড়ায়। দরজা জানালাহীন চৌহদ্দি। পলকা ছাউনির ছায়া মাত্র এই আবাসন। ফলে কষ্টে খুঁটে খুঁটে তোলা ভোজ্য পাতা কটা কোচড়ে নিয়েই হাঁটে। পেটের খাবার পেটের কোচড়ে বাঁধা থাকে।

ঢালু বেয়ে গাঙ বাউন্ডারি বাঁধে ওঠে। অনেক ঢেউ ঝাপটায় হাজার চোট বাঁধের গায়ে। বড় বড় ধস নিয়ে জ্বালা মুখ। নোনা পাঁক কাদায় চোখ ডিমরে গায়ে চাকা চাকা দাগে চেঙো মাছ হড়হড়িয়ে বেয়ে যায়। গাঙের আমাছা তবু সিদ্ধ করলে খানিক খাদ্য। এক দঙ্গল বউ ছেলে বুড়ো হাত চেপে চেপে ধরতে গিয়ে হাঁপায়। চালাক চেঙো সুড়ুৎ করে পালায়। গর্তে সেঁধোয়। হাড় জির-জিরে বুড়োটা দু-হাতে কাদা ছেনে গর্ত রেখা খোঁড়ে। পাশে পাঁকের ডাঁই। মরিয়া হয়ে খুঁড়ে যায় কাদা। অখাদ্য মাছটুকুর জন্যে পাতাল খনন করে।

মা আর মেজ পাশে তাকায়। মানুষগুলোর মাথা পিঠ ছাড়িয়ে তাকায়। নোনা গাঙের জল পাড়ে ছপছপ ছুঁয়ে যায়। তারপর ধুধু নোনা জলের সাগর। মাথার উপর সাদা নীল মেঘ।

ক্রমশ কালো মেঘ ঠেসে আছে জলস্পর্শে দিগন্তে। দূরে নোনা জলের যেন কৃষ্ণ সাগর। তারপর বাঁধের এপারে তো ধানের মাঠ। থিক থিক করছে সবুজ। পাতায় পাতায় হাওয়া। দু-চারখানা সদ্য শিস ঠেলেছে। জানাবাবুর চক ক্রমশ শস্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ওপাশে গাঙের বাঁধ কেটে নদীর মতো খাল। এলাকার স্বাভাবিক জলবন্দীত্বের মুক্তি নালা। মা ডাইনে তাকাতেই দেখে, হারুবাবুর কাছারি ঘেঁষে আর একটা খাল। নদী বাঁধে পুরোতন স্লুইশ চাতাল। মুখ ফেরাতেই বোট ঘাটার চালা। বাঁশের ধ্বজিতে এক খণ্ড সাদা কাপড়ের নিশানা। দূরের বোট ডিঙির ফলক যে ওটা বোটঘাটা। দোকানপাট, তেল লবণের দোকান। এক শিশি কেরোসিন বা একসের চিড়ে বাতাসার বিকি কিনি কেন্দ্র। ঘাট।

বাঁধের ঢালু বেয়ে মা আর মেজো। ধনুকের মতো বাঁকা মাটির পাহাড়। পাদদেশে থেকে ঘাস মাটি ঝোপ ঝাপ ক্রমশ উঁচু হতে হতে একেবারে আকাশের কাছাকাছি। তারপর ক্রমশ ঢালু হয়ে আবাদীর মাঠের সমতলতায়। কোন কারণে যে এত মাটি…। এই পাহাড়ের একটু তফাতে পঁচিশ ত্রিশ বিঘে পরিমাণ দিঘি। টলমলে জলে বুনো ঘাস। হিংচে কলমির দাম। লাল সাদা শালুকের মূল গেঁথে আছে। ভূপৃষ্ঠের কোন অবতল উচ্চতলের প্রক্রিয়ায় এতখানি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাভূমি। দিঘি। নাকি হ্রদ। মানুষে ভর্তি সে জলকর। নারী শিশু পুরুষ হুমড়ি খেয়ে শাক পাতা ছিঁড়ছে। গায়ে গায়ে পাঁচ ছটা গ্রাম উঠে এসেছে পাতা খুঁজতে। শাক তুলতে। গোটা হ্রদের

জল ঘুলিয়ে কাদা।

নিজের কোচড়ে একমুঠো শাক পাতা। তখন নিজের পুকুরে তেতো শাক পাতা রসের তীব্রতায় গা-গলা ঘিনিয়ে ওঠে। দুষোয়, হে ভগবান, ও শাক-গুলো যদি খাওয়ার মতো হত…।

আত্মপীড়নায় অস্থির মা। মেজটা মায়ের হাত ধরে দাঁড়ায়। এলোমেলো তাকিয়ে একটু আশ্রয় খোঁজে মা। ডাইনে দূর গ্রাম। ডাব খিরিশের পাতায় আঁজলা আঁজলা সবুজ। তারপর আকাশ। আবার মানুষের বসবাস ঘিরে সবুজের পুঞ্জ। চার পাঁচখানা সবুজের চাঁদোয়ার পর চোখ রাখতেই ফাঁকা আকাশ। ওখানে ঘোষবাবুদের হাট। বাবুদের বংশবিস্তার নিয়ে নিজ ঘর বাড়ি। পাকা দালান কোঠা। হাটের দোকানপাট ক'খানা। এলাকার পুরাতন হাই স্কুল। চাল ধানের গো-ডাউন। এখন পাশ দিয়ে নির্মীয়মান কাঁচা সড়কের ধুলো উড়িয়ে কালো কালো ট্যাক্সি যায়। ট্যাক্সিভর্তি লাট আবাদের প্যাসেঞ্জার।

বউটা ভিজে কাপড়ে কোলে বাচ্চা, পাঁচ বছরের শিশুটার হাত ধরে একেবারে পাহাড়ের মাথায়।

—ও বুন!

পাশে তাকায় মা, কি রে শাকিলা?

আরও কাছে এসে শাকিলা বিবি বলে, বুনরে—তোদের ভাইজান পেলিয়েছে।

—জমির আলি…! মায়ের গলায় অসহায়তা। একজন তো তবু নিজের মতো ছিল। পরে বলে, কোথায়?

—কোলকাতায়। বলে গেছে, লাঠিবাবুর রাগ পড়ুক তারপর ফিরব। তোরা কন্টসিণ্টে চালিয়ে নে—আমার একটা পেট কোলকাতায় ভিখসিক করে চলে যাবে—

বাচ্চাটা মেজর মাকে বলে, আমার বাপজানকে তোমরা একটা লাঠি দিতে পারুনি—?

মেজর মা শিশুর মধ্যে বয়েসী লোকের গাম্ভীর্য দেখে মৃদু হাসে। বাচ্চাটা খুশি হয় না। বরং অনুযোগ করে, বাপ—নজেন দেবে বলেছিল…বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

শাকিলা বাচ্চাটার গালে চুমু খায়, চল্। শাক কটা খুঁদ কুড়োয় সিদ্ধ করে দিই। খাবি—

দেশময় খিদে। খিদের জ্বালায় মানুষ কোলকাতায় ছোটে। মেজর হাত ধরে দাঁড়িয়ে মা। আর এক মা মাটির পাহাড়ের গা ধরে নামে। তাদের অবতরণ ক্রমশ মিশে যায় দেশের সমতলীয় ভূমিতে। হুদে মানুষের ভিড়। তাদের কাপড়ে কোচড়ে শাক পাতার ক্ষীণ পুঁটলি দেখে মা ভাবে, ওদের তো ওইটুকু। আমি গেলে কী আর পাব? মানুষের পেটের দানাতে টান। টানাটানি গাছপালার পাতা নাতায়…! এত অনটন…! হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে, এ আকাশ

গাঙ পারিয়ে ওপাশের দেশ। এখেনে কত কষ্ট···এ কষ্ট কি ওদেশে···! ওদেশের বাইরে কি মানুষের এত কষ্ট···!

অবরুদ্ধ যাতনায় চুপচাপ দেখে হ্রদের মানুষগুলোকে। তখন নোনাজলের সাগর কালো মেঘের ছায়ায় কৃষ্ণসাগর হয়ে যায়। দূরে জানাবাবুর শস্যের মাঠ শস্যভাণ্ডার ইউক্রেন। গাঙ কেটে বড় খালটা নীষ্টার নদী। ডান দিকে হারু-বাবুর কাছারি বাড়ি সংলগ্ন খালটা নীপার নদী। মাটির পাহাড়টা কার্পেনথিয়ার পর্বত। পঁচিশ বিঘের দিঘিটা যেন লেনিনগ্রাদের উত্তর পশ্চিমে লাডোগা হ্রদ। অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে ত্রিশ লক্ষ মানুষ অনাহারে।

জার্মান হাইকম্যান্ড থেকে হিটলার বারবার নির্দেশ পাঠাচ্ছে তার সেনা-বাহিনীর জেনারেলদের, রুশেরা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে চাইলেও সে আত্মসমর্পণ গ্রহণ করবে না। কারণ ত্রিশ লক্ষ মানুষকে খাওয়াবে কে? বরং যুদ্ধে জিতে গোটা লেনিনগ্রাদকে গুঁড়ো করে মাটিতে মিশিয়ে দাও। রুটি চাইবার মানুষ আর কেউ থাকবে না।

উনিশ'শ একচল্লিশের সেপ্টেম্বর থেকে অবরোধ। ন'শ দিন ধরে মানুষ আটকা পড়ে আছে। রেল পথ জংশন সড়কে ঘাঁটি গেড়েছে জার্মানিরা। সুতরাং মানুষের জন্যে খাদ্য আসে না।

···তখন শহরের উপান্তে শিশু নাতির হাত ধরে খাদ্য খুঁজতে বেরোয় বুড়ো ঝুনোকভ। যত বছর গড়ায় ঝুনোকভের চামড়া দড়ি হয়। গোল ফর্সা মুখে ধবধবে শণের মতো চুল পাঁচ ছ-বছরের নাতিটার। চোখ ঢুকে গেছে কোটরে। জামা ঢিলে। প্যান্টের বেড় কোমর গলে নিচু। শীতের পোষাকে ঢল-ঢলে। ড্রেনের গর্ত মুখে বিড়ালটা বসে! ঝুনোকভের দু-চোখে চকচকে কাচের মোটা চশমা। হাতের লাঠি নিয়ে সতর্ক এগোয়। নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিতে নাতিকে বোঝায়, একদম কথা নয়—

ড্রেনের গর্তমুখে লোম তুলতুলে বিড়াল। যেন লাডোগা হ্রদে জমা এক খাবলা বরফ। চোখ পিটপিট করে চেয়ে গর্তের দিকে। সাদা ইঁদুরটা ঢুকে গেছে। কখন যে বেরুবে। চুপটি মেরে অপেক্ষা।

ঝুনোকভ বৃদ্ধ চোখে নজর আনে। বয়স্ক শরীরে স্নায়ু শিরার দুর্বলতা। বাগানো লাঠি একটু আধটু কাঁপে। ধীরে ধীরে তাক কষে।

বিড়ালটা পলকহীন বসে। মানুষের গৃহে খাদ্য নেই। সে পায় না। গোটা লেনিনগ্রাদ খাদ্যহীন।

বুড়ো উঁচোন লাঠি নিয়ে পা টিপে টিপে এগোয়—।

ধানের মাঠ সবুজ। গোড়ায় ছিপছিপে জল। আলের গা ধরে সাপটা বেয়ে যায়। একদম জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

ঘাসে ঢাকা গর্ত খোঁদলে আল। মাথার উপর রোদ। কালুনাথ সন্তর্পণে মুখ বাড়ায় জলের দিকে। গোল মোটা চেহারায় বেশ লম্বা সাপটা। বিষাক্ত কি না সাব্যস্ত করতে এক পা এগোয়। পায়ের চাপে মাটি ধসে জলে পড়ে। ঝুপ করে শব্দ হয়। সাপটা ওই শব্দ কম্পনে বা জলের তরঙ্গে একটুও তড়বড়িয়ে

এগোল না। কিংবা ফণা তুলে রুখে উঠল না। বরং আগের মতোই নিড়বিড় গতি।

এমন পর্যবেক্ষণে কিছুটা সময় যায়। কালুনাথের মধ্যে উত্তেজনা থিতোয়। তখন দু-চোখে আরও তদন্ত আনে। ধীরে ধীরে অনুমানগুলো সাজায়, সাপটা বিষাক্ত নয়। হয়ত একটু আগে ভর পেট খাদ্য পেয়ে ধীরে ধীরে যাচ্ছে। কিংবা কেউ বেশ জোরে চোট করেছে। সুতরাং অনুমান থেকে সিদ্ধান্তে যাবার আগে আরও এক পা জলে নেমে, সাপটার চোখ মুখ দেখে। চকিতে আত্মহারা কালুনাথ। ধান বাদায় ঝাঁপিয়ে খপ্ করে প্রাণীটাকে ধরে।

লাঠিটা জোরে মারতেই বিড়ালের পিঠে শব্দ ঢপ্। খিদের যাতনায় জ্বলে ওঠে বিড়ালটা। ঘাড় ফুলিয়ে দু-চোখে আক্রোশ ঝুনোকভের টুঁটি।

শিশু নাতির গলায় বিপন্ন প্রজন্মের আর্ত ডাক, দাদু—

পশ্চিম এশিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রবল আত্মস্থিত দাদু জীবনের অব্যর্থ মারটা দেয় লাঠির ঘায়ে।

রুগ্ন আঙুলের কমজোরি চেটোয় প্রাণীটাকে জাপটে ধরে কালুনাথ ভাবে, কেটে কুটে বেঁড়োটা শাক সিদ্ধোয় দিলে অনেকখানি তরকারি হবে। মাংসের স্বাদ—

বুড়ো ঝুনোকভ মৃত বিড়ালটার ছাল ছাড়ায়। এক একটা টানে আদুরে লোমের গুচ্ছ নিয়ে ছাল উঠে যায়। পাশে ক্ষুধার্ত নাতি খাদ্যের অভিযানে অবাক! বিড়ালটার গায়ে লালচে মাংস। মাংসের কোষে কোষে তখনও সদ্য হত্যার উত্তেজনা। নরম কোষ তুপতুপ কাঁপে। নাতিটা বলল, সিদ্ধ করবে? না, ভাজা—?

তার গলায় কত হাজার শিশুর কণ্ঠস্বর যে!

গোটা পরিবারটার আজ তবু অনেকখানি মাংস খাবার টেবিলে। তাই মন দিয়ে ঝুনোকভ ছাল ছাড়ায়। শিশু নাতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তার শৈশবে প্রিয় পশুটাকে এমন ভাবে ভোজ্য করে তোলার দৃশ্য প্রথম। শৈশবের নতুন পাঠ। কিন্তু ঝুনোকভ তার শিরা ঝুলঝুলে কব্জি কনুইয়ে সর্বস্ব ঢেলে বাকি ছালটুকু ছাড়াতে ছাড়তে আর একটা পাঠ্য তৈরি করে,...কত হাজার যুগ আগে ...অরণ্যের, পশুচারণের দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ পৃথিবীরই কিছু পশু বিক্রমী লোভি, কুলীন রক্তগর্বী মানুষ। আর কিছু দূরদৃষ্টিহীন নির্মম তাঁবেদার।

সন্ধে মুখে উৎসব জাগে উঠোনে। বাতাসে শীতের ছোঁয়া। ক্রমশ বসবাসের দাওয়া উঠোন ঝাটপাটে পরিষ্কার। দাওয়া ঘেঁষে নিকোনো উনুন। উনুনে শুকনো পালা খোঁচার আগুন।

কালুনাথ বেঁড়োটার গা ঝলসে চাকা চাকা কাটে। বঁটিতে তখনও রক্ত। পোড়া ছালে মাংসের গন্ধ। তেল মশলাহীন পদ। শাকপাতার মধ্যে জলচর প্রাণীটার গণ্ডা কয়েক টুকরো। মেজোটা, ছোটটা তার কোলে ছোট মেয়েটা—সবাই উনুন ঘিরে বসে।

মেজোটা শুকনো পালা ঠেলে দেয়। আগুন চড়বড়িয়ে জ্বলে ওঠে। উনুনের ঝিঁকের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আলো। ঘর দাওয়া ভরে যায়। আনন্দে হাত-তালি দেয় বাচ্চা কটা। ছোট মেয়েটা ঝিম মারা।

শাকপাতা সিদ্ধ হয়। বুট বুট শব্দ। ভাপ ওঠে। তারমধ্যে প্রাণীটার ছাল ছাড়ান মাংস ফোটে। বহুদিন পরে গোটা সংসার নতুন খাদ্যের সুবাসে মাতোয়ারা।

ছোট ছেলেটা সিদ্ধ তরকারি খুন্তি ধরে একটু ঘেঁটে দেয়। মা বকতে গিয়ে বোঝায়, সব পড়ে যাবে রে সোনা—

ছোট মেয়েটার পেট আবার ব্যথা করে। মায়ের কাছে গিয়ে বলে, মা যাব—।

এত আনন্দের রান্নাবান্না। মা মেয়ের কথায় বলে, গেলি তো। আবার! ছোট মেয়েটা কাঁদে।

মা আশ্বাস দেয়, যা না পুকুর পাড়ে। আমি তো এখেনে—

গাঙ আলো করে জাহজটা যায়। মেজোটা এক ছুটে দাওয়ায় ওঠে। তখন গাঙ বাঁধের উচ্চতা যেন মেজোটার থুতনি সমান। জাহাজটা, জাহাজটার গায়ে আলো—সব জলে ঝকমকিয়ে ভাসে।

মেজোটা দাওয়া থেকে হাঁকে, মা—আলো।

—কোথায়?

—জাহুজে।

—থাক, মা ছেলের কথায় না সেঁধিয়ে তরকারিটায় মন দেয়। জাহাজের আলো দেখে মেজোটা বলে, ওটা থেকে যদি একটা আলো আমাদের ঘরে থাকত! উঠোন দাবা সব দেখা যেত—

টিপ টিপ করে আকাশের আলোটা জ্বলে। একটু বাদে আলোটা হারিয়ে যায় মেঘের মধ্যে। খানিক পরে আকাশ কেটে লাল আলোটা এগোয়। মেজোটা কান খাড়া করে শোনে, বোঁ বোঁ শব্দ।

আকাশ হাঁচিয়ে শব্দটার উৎস খোঁজে। এত রাতে তো কোনো ঘুঁড়ি নেই। তবে! অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করে, সকালের সেই আওয়াজের মতো! কালু-নাথের কাছে গিয়ে বলে, হুই কী যায় গো দাদা—? সরু হাতে কচি আঙুল রাতের তারা চিনতে চায় না। ছায়া পথ, সপ্তর্ষি মণ্ডল কিচ্ছু নয়।

কালুনাথ বিজ্ঞ দাদার মতো বলে, উড়োজাহাজ।

—গাঙে জাহাজ আকাশেও জাহাজ?

পাঁচ বছরের ছোট ছেলেটা বলে, হুগো। খজরামি করলেই বোমা ফেলবে—

হৈ চৈ হাসির শব্দ উঠোনে। মা হেসেও চুপসে যায়। মেয়েটা উঠোনে শুয়ে। তবুও জানতে চায়, ও কালু—নতুন রাস্তায় গেছিলিস?

—হুঁ। রেঙ্গুন চাল দিচ্ছে ব্রিটিশ

বড় ছেলের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে শুধোয়, কোথায় রে?

—কোলকাতায়। শহর বাজারে—

—আমাদের দেবে নে? মায়ের গলায় যে কত আবেদন!

—শুনলুম ঘোষবাবুরা না, সেবাদল কারা কণ্টোলের দোকান খুলবে।

মা শুধোয়, দোকান ? তাতে কী ?

—যারা কিনতে পারে, কম দামে কিনবে। যারা দীন ভিখিরি—তাদের নামে কাড় হবে—

মা কাড় বা কার্ড কিছুই বুঝতে পারে না। ছেলের দিকে তাকায়। কোলকাতার পথঘাট ঘুরে আর বাপকে হারিয়ে এখন এতগুলো ভাই-বোনের তো দায়িত্বশীল বড় ভাই। ফলে তার পৌরুষ, অস্তিত্বের সীমায় পড়ে মায়ের জিজ্ঞাসাটা। তার পুঁজি থেকে যতটা সম্ভব খোলসা করতে বলে, নামে নামে ছিলিপ—কাগজ—

ছেঁড়া কাপড়ে শরীর ঢেকে মা ছেলেতে কথা হয়। ইচ্ছা মতো পাশ ফিরতে গেলে আশঙ্কা, ফেঁসে যেতে পারে। সেই আতঙ্ক থেকে জানতে চায়, কাপড় দিবেনি ?

কালুনাথ যেন সব কিছু যোগান দিতে পারে সেরকম ভেবে প্রত্যাশাময় প্রস্তাবটা রাখে। দীন সন্তান মাকে ধমকায়, আগে পেটের দানাটা দিক দেখি গরমেন্ট—

বাচ্চা তিন ভাইবোন দাদার কথায় জেগে ওঠে। শাকপাতার মধ্যে দিশি ভাতের গন্ধ ভরিয়ে নেয়। খাদ্যকণার গায়ে দেশ আর কতটুকু লেগে থাকে। মানুষের জন্যে শস্যের উৎপাদন। শস্যের শরীরে দেশান্তরের ডাক। কোটি কোটি মহাপ্রাণীর অন্তরের লালসা বাতাসে ভেসে ছুঁয়ে দেয়।

মেজোটা বড় কাঁটা পালা উনুনের মুখে গোঁজে। ঝিঁক উপচে অনেক আলো। ডোবা পার হয়ে দশকাঠার গায়ে। অপুষ্ট ধানের জটায় সোনার চিক্কির। কালুনাথ ধীরে ধীরে ওঠে। কোমরের ছেঁড়া গামছাটা আলগা করে। কাঁধে নিয়ে এগোয়। পুকুর পাড়টা পার হয়। তারপর হারিয়ে যায়।

দু-নখে চাপ দেয়। সোনার ধানের জটায় কাঁচা কাঁচা শিস। গায়ে গা লেগে চুড়ি পেটির কিঙ্কনী। ভয় পায় কালুনাথ। কোনো রমণীর দুল, গলা বেড় দিয়ে হার, নাকছাবি অপহরণের মতো দ্বিধা। তবুও গামছাটার দু-খুঁটে গিঁট দিয়ে শস্য ভরাবার কোচড় রচনা করে। দু-আঙুলের নখে ধানের ডগ কাটে। পুট পুট শব্দ হয়। নিজেদের জমি···যা এখনও পুরোপুরি সত্ত্ব বদলায়নি। দলিলের অক্ষর তো ঠিক স্বরে কথা বলেনি ! আইনের সে কণ্ঠ যে কবে তৈরি হবে··· !

কালুনাথ, একটু একটু করে ধানের জটা থেকে খাদ্য দানা খসায়। খসে যায় তার গেরস্ত পালক। ভাবে, ভদ্দু মাইতি তো সব শোধ করেনি। বাপের দশ কাঠার সামনে তার ছেলেপুলেরা অন্নের অভাবে ভুগবে ? নিজের যুক্তিতে যুঝেও হাতটা কাঁপে কালুনাথ বোয়ালের। গাঙ পাড়ের গাছতলায় আটেশ্বরী থান। পাশ গাঁয়ে লক্ষ্মণ রঞ্জিতদের অশ্বত্থ বৃক্ষতলে মা ওলাইচণ্ডী, মনসার থান। বানে তো মাটির মূর্তি গলে ভেসে নিশ্চিহ্ন। গাছটা আছে। গাছের তলায় থানটা তো মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। মুছতে পারে না কালুনাথ

বুকের ভেতরটা। ধানের শিসে হাত থমকে যায়। আকাশে তাকায়। কোটি নক্ষত্র আলো ছিটোয়। যেন কোটি মানুষের তীক্ষ্ম দৃষ্টি। বাপটা কোলকাতায় ভিখ মাঙতে গিয়ে তো শেষ। সে মানুষটা মিশে আছে জল মাটি বাতাসে একাকার হয়ে আকাশের তারায়। উজ্জ্বল তারাটা বড় বড় চোখে বলে, নে। নে না। হারুবাবু ভদুনাথরা একজোট হয়। তুই তোর ভাইবোন কটা···পাশগাঁয়ের জমিরদের বউ বাচ্চা একসঙ্গে চুঁচে নে না দশ কাঠার ধান--

কালুনাথের কানে বাপের কণ্ঠস্বর।

—অন্তত বাকি টাকার মতো কাটিয়ে নে দশ কাঠা থেকে···।

কালুনাথ বুকে বল পায়। দু-আঙুলের নখে ধানের শিস কাটে। পুট্‌পুট ···শব্দ হয়। নির্মেঘ আকাশ। যেন চারদিকে বৃষ্টির মতো শব্দ। পৃথিবী শুকনো। ভিজে যায় কালুনাথের চোখের মাঠ।

বার

বহুকালের অশ্বত্থ গাছটার গোড়ায় মাটি চাপানো। পিটিয়ে পিটিয়ে গোলাকার করে বাঁধান। তারপরে পুকুর। পুকুরের ওপারে মানুষের ঘর বাড়ি। ফলে দিনের বেলায় অশ্বত্থতলায় বসে হাত জাল বোনা কিংবা তাস পাশার আড্ডা। গাছটা খুব রোদ্দুর মাথায় নিয়ে ছায়া দেয় আশ্রয়ী মানুষদের। এখন রাত। রাতকে মাথায় নিয়ে আকাশ ধরে রাখে। শাখা পল্লবে রাতটা আরও ঘন গাছ-তলায়। সেই ছায়ায় বসে জন তিনেক দাঁড়ি মাঝি বিড়বিড় করে, বললুম হারু-বাবুকে মন দশেক চাল দিন বজবজে ব্যাপারির ঘরে দি আসি—।

পাশের লোক জানতে চায়, কি বলল বাবু— ?

—কি আর ? মন পিছু রেট বাড়াতে কয়—

অশ্বত্থ গাছটার পাশ দিয়ে গাঙ বাউন্ডারি বাঁধ গাঙের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে এঁকে বেঁকে কোলকাতা বরাবর। ফলে নগর কোলকাতার পাদভূমি তো এতদূর পর্যন্ত প্রত্যক্ষত বিস্তারিত। এদিকের ইলিশ মাছ ধান চাল খড় গুড়ের বড়সড় বাজার কলকাতা। জলপথই প্রধান পরিবহন। সড়ক পথ সবে তৈরি হচ্ছে। কাঁচা সড়কে ধুলো উড়িয়ে দু-চারখানা ট্যাক্সি। মাঝি নুর আলি খানিক থম মেরে থেকে বলল, যদি কাঁচা সড়কে ইঁট খোয়া বিছিয়ে পিচ ঢালাইটা হয়ে যায়রে ভাই—

পাশে দুই দাঁড়ি গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে মাঝির মুখে পরবর্তী বাক্য যোজনার জন্যে। কিন্তু অন্ধকার। তাদের আগ্রহী মুখচ্ছবি দেখতে পায় না বুড়ো মাঝি। তাই দাঁড়ি দু-জন বলে, তাহলে ?

—ওই লাঠিবাবুর তেল মরে যাবে।

কথাটায় গায়ের জ্বালা মেটায় মাঝি। দাঁড়ি দুজন জানতে চায়, কিরম— ?

—পাকা রাস্তা হলে লরি বোঝাই হয়ে ধান চাল যাবে। লরিওয়ালারা রাস্তা পোটের কাছাকাছি মালিকদের খুব তেল মারবে। তখন—

মাঝির কথা থামিয়ে দিয়ে ছোকরা দাঁড়িটা বলে, হারুবাবু ধান চাল নিয়ে রাস্তায় টাল দেবে—

বুড়ো মাঝি ধমকায়, দূস্ মুখ্যু। মাথায় মুটেয় বউনি খরচ কত জানিস? এক আধ মাইল নয়—তা, বলে জিজ্ঞেস করে পাশের লোককে মাঝিটা, এখেন থেকে কাঁচা সড়ক কতটা বল দিকি?

ছোকরা দাঁড়ি অগ্রিম বলে ফেলে, মাইল তিনেক—

মাঝি মুখ বাঁকায়, তোমার মুণ্ডু। পাক্কা চার মাইল।

পাশের দাঁড়ি লোকটা জল কেটে কেটে দাঁড় বায় শুধু। হাওয়া বুঝে পালের দড়ি আলগা করে কিংবা খ্যাঁচ দেয়। তাদের মাঝির কথার ঝাপটা ঠিক ধরতে পারেনি। কেমন ভাবে যে মাঝির প্যাঁচের ঘূর্ণিতে দাঁড় মারবে বুঝতে পারে না। তাই বলে, হ্যাঁ। চারমাইল—। তাতে তোমার কি? আমার কি?

তামুক খোর মাঝি। নেশা ছুটে যায়। ভাবে ছোকরা দাঁড়িকে একবার বলে, যা দিকি এক কলকে সেজে আন ঘর থেকে—। পুকুর ডিঙোলে তো ঘর। নুর আলি বলতে গিয়েও থেমে যায়। বরং সমবয়সী দাঁড়ির উদ্দেশে বলে, ওরে পাঁঠা বটকৃষ্ণ—তখন ওই মহা হুঙ্কেরে লাঠি বাবুই হাতে ধরবে, বাপ—এক বোট ধান বেচে দি আয় দিখিনি চেতলার হাটে। লরি ফরি হবেনি—মুটে খরচ যা। ডুলি ভাড়ায় বউ বিকিয়ে যাবার যোগাড়—যা।

ছোকরা দাঁড়ি মাঝি নুর আলির ব্যাখ্যায় অবাক! এমনভাবে তো নিজেরা ভাবেনি। ভাবতে পারেই বলে তো আলাদা। দূরদৃষ্টি আছে বলেই তো মাঝি। এক বোট মানুষ নিয়ে গাঙ পারায়। মেঘ দেখলে, অগ্রিম বোঝে ঝড় উঠবে। আঁধার রাতে গাঙের জল কূল আকাশ একাকার। তবু ক'ঘণ্টা পাল খাটিয়ে দাঁড় বাওয়া হলে বলে, থাম তো তোরা। ট্যাঁকের মুখে এসে গেছি মনে হয়···

মাঝি বলল, চল। জোয়ার লেগেছে। জল বেড়ে গেলে সাঁতরে বোটে উঠতে হবে—

বাঁধের এপাশটায় মাটি উঁচু। অনেকখানি। স্বাভাবিক জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস ডোবাতে পারে না। সেজন্যেই ক'খানা দোকানপাট নিয়ে জমজমাট। ফাঁকা গাঙ পাড়। হাওয়া সব সময়।

শক্ত কাঠের বেঞ্চিতে বাবু হয়ে হারু চাউলে। তার মাথা প্রমাণ লাঠিটা দোকানের গায়ে হেলান। মুড়ি চিঁড়ে কলসিতে আখের গুড় নিয়ে পসরা। পাশে বস্তার মুখ এঁটে গুড়ের মুড়কি। দোকানদার পিতলের প্রদীপটা রেখেছে বাতাসের প্রকোপ থেকে আড়ালে। সলতেয় রেড়ির তেল ঢেলে মিটমিটে আলো। ক্ষীণ আলোয় দোকানটা যেন গভীর গুহা। সেই গুহা থেকে সামান্য আলোর বিচ্ছুরণ হারুবাবুর আলগা ভুঁড়িতে।

পাশ গাঁয়ের বাসিন্দা, ব্যাপারির আনাগোনা। কাঠের বেঞ্চিতে পা বদল করেও আরাম পাচ্ছে না হারুবাবু। গা হাতটায় মালিশ পেলে ভালো হত। সঙ্গী সম্বচ্ছুরে ধনাকে দেখতে পায় না। নোনা বাতাসের আর্দ্রতায় চোখে একটু ঘুম আসে। হাই ওঠে। হারুবাবু বলে, ও জগো—

শিখাটা বাঁচাতে নিতান্ত আড়ালে তো রেড়ির তেলের প্রদীপটার অবস্থান। সেজন্যে দোকানটায় অন্ধকার বেশি। দেওয়াল ছাউনি বন্দী অন্ধকার। সেখান থেকেই দোকানদার বলে, আজ্ঞে—বাবু—

—সের খানেক মুড়কি দেতো। খেয়ে ঘুম ছাড়াই—

ওপাশে সামান্য তেল ডাল শুকনো লংকা সাজিয়ে মুদিখানা দোকান। বোটের দাঁড়ি মাঝিদের হঠাৎ বাজার হাট। বস্তাখানেক নুন একদম দোর-গোড়ায়। দোকানের মধ্যে ছোট্ট লণ্ঠনটার বাতি কমিয়ে দোকান জাগানো। উল্টোদিকে ক'খানা কাছি, এক বস্তা পেঁচানো তুলো, টিন দুয়েক আলকাতরা আর নানা সাইজের পেরেক। বোট ডিঙির গা মচকালে বা পালের হানজা দড়ি ছিঁড়লে জরুরি কেনা কাটা।

একেবারে খড় ছাউনি দিয়ে কমল ডাক্তারের ওষুধখানা। তার পাশে ফাঁকা চালাটায় খড় রেখে যায় গাঁয়ের লোক। মাথায় টেনে টেনে নিয়ে যায় নুরআলির লোক।

সম্বচ্ছরে খোরপোষে বাঁধা কাজের লোক ধনারাম এক পাক বোট ঘাটা ঘুরে বলল,—বাবু চালের দাম আরও বাড়বে—

—বাড়ুক। তুই কোথায় গেছিলিস ? বলে এক মুঠো গুড়ের মুড়কি গালে পুরে পাকলায়। একসঙ্গে তো অনেকগুলো। গলা এঁটে যাওয়ার উপক্রম। কষ্ট পায়। কষ্টটাই ঘুমকে ছুটিয়ে দেয়।

গালের মুড়কি লালারসে জারিয়ে চুপসে গেলে এক ঢোকে মুখগহ্বর খালি। কাজের লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, কেনরে ?

—রেঙ্গুন চাল বোলতার মতো মোটা মোটা। মানুষে খেতে পারছেনে। যার পয়সা আছে আপনার সরু দুধের সর চামরমনি খাবেই—

ধনার কথা শুনে হারুবাবু খিক করে হেসে ওঠে। গালে মুড়কির গুড় ফুরিয়ে ভিজে খই ছিটকে যায়। পরে গোপন মজুতের দুরদৃষ্টিতে নিজেকে মনে মনে তারিফ করে হারুবাবু। খুশি হয়ে বলে, নে। পিঠটা দলে দে—।

দুর শহরের সঙ্গে যোগাযোগ তো নদীপথে। সুতরাং খবর বোটঘাটায় আগে পৌঁছয়। তারপর ছড়ায়।

কমল মাস্টার তক্তাপোশের উপর বসে বাক্সটা সাজায়। খাপে খাপে ওষুধের শিশি। কিছু গুঁড়ো সুগার। সাবু দানার মতো গ্লোবিউলস্।

একই তক্তাপোশে বাচ্চা কোলে মা। বাচ্চাটার জ্বর যাচ্ছে না। কমলবাবু তিন মোড়া ওষুধ দেয়। মা আর বাচ্চা বেরিয়ে যাওয়ার পর কমল ডাক্তার হাজির হারুবাবুর সামনে। ধনা বাবুর পিঠ দলে। ছোট্ট ছোট্ট কিল সারা পিঠে বুনে দেয়। যেন দু-তিন গাছি লকলকে তোলা পট পট পুঁতে যাচ্ছে বাবুর কাদা করা জমিতে। সামন্ত সুখে বিভোর। হাতটা চলে যায় কলাপাতার ঠোঙায়। ভেতরটা একদম ফাঁকা। পাঁচ আঙুলে খোঁজে। একখানা মুড়কিও নেই। বড় আপশোস। চেঁচায় হারুবাবু, ও জগো—আর এক সের হবে ?

জগন্নাথ বাজখাঁ মেপে রেখে ছিল অনেক আগে। নতুন পাতার ঠোঙায়

মুড়কিটা বাড়িয়ে দেয়। হারুবাবু পরম আনন্দে দ্রব্যটা ধরেই এক খাবলা গালে পোরে।

মাথায় খড়ের বোঝা। উঁচু গাদায় যার যতটুকু ভাল ছিল বেচে দিচ্ছে। আশপাশের গ্রাম গঞ্জে, ওপারে মেদনীপুরে খড়ের বড্ড দাম। পশুখাদ্যের টানাটানি। খড়ের বোঝা খস্ খস্ শব্দে এগোয়। নুর আলির বোট বোঝাই হয়। চালান যাবে কোলকাতায়। মোষ গরুর খাটালে। কোলকাতার মানুষকে দুধে ভাতে বাঁচাতে।

নুর আলি এগোয়। পাশে ছোকরা দাঁড়ি। তার পাশে বয়সী দাঁড়িটা। নুর আলি সঙ্গীদের বলে, কি আজ আর রান্না চাপাবি ?

সবাই চুপচাপ। চালটুকু বাঁচালে কাল সারাদিনের নিশ্চিন্তি। নুর আলি মনের কথার আঁচ পেয়ে বলে, চল্। আধসেরটা চিড়ে কিনি— ?

কলাপাতার ঠোঙা থেকে মুঠো ভরে মুড়কি বের করে চেপে চেপে গালে দেয় হারুবাবু। খানিক পরে চপাট চপাট শব্দ জিভে আর গালের খোঁদলে। ছোকরা দাঁড় বলল, নুরো দা—বাবু

নুর আলি মাঝি হলেও ব্যবসায়ী ঝোঁকটা আছে। দু-একদিনের মধ্যে কোনো ভাড়া বা বায়না নেই। এতগুলো লোকের পেট তার বোটে। খালি বোটে তা শুধু ঘরের পয়সায় খাওয়া। তাই সামান্য রোজগারের আশায় বলে, বাবু।

মুড়কিটা চিবোন থামিয়ে বলে, কে—

মাঝি একটু কাছে যায়। আঁধার হলেও চোখ মুখ স্পষ্ট। হারুবাবু সমঝে নিয়ে বলে, ও নুর। বোসো—। পরক্ষণেই মনে হয়, জমিরের কুটুম্ব···শালা জমির···।

দু-পা গুটিয়ে বাবু হয়ে বসেও হারু চাউলের বেঞ্চিতে অনেকখানি জায়গা। আর পাঁচজনের আতিথেয়তার মতো উচ্ছ্বাসে গায়ের কাছে বসতে গিয়ে নুর আলি থমকে যায়। মাঝি মানুষ। মাথা ভর্তি চুল। গালের গোঁফ দাড়ি অপরিষ্কার। মাত্র লুঙি গামছা পরে। অতএব নিজেই সামলে নিয়ে নিচে উবু হয়ে বসে নুর আলি।

হারুবাবু সকালে ফিরিয়ে দিয়েছিল মাঝিকে। কিসের জন্যে যে এখন··. অনুমানে ঠিক করতে পারে না। মুড়কিগুলো পাতায়। একটা মানুষ গায়ের কাছে। খাদ্য চিবোতে বাধা। তাই বিরক্ত হয়ে বলে, আবার কি গো বাপু— ?

—আজ্ঞে। বাবু একটা গাদা খড় দিন।

—মানে···, বেশ বিস্মিত হারু চাউলে! দাম দস্তুর নেই একেবারে জবর-দস্তি!

মাঝি হাত কচলে বলে, কিচ্ছু মানে নেই বাবু। খড়গুলো বেচে চালান হাজির করব। সব আপনার—শুধু বোট ভাড়া, মজুরিটা আমাদের—।

প্রস্তাবটা মনে ধরে। ভাবে, আমার মালে ওরা তবুতো বেশি কিছু দাঁ মারতে পারবে না। মাঝখান থেকে বিক্রি···লাভ···। ঠিক আছে পরে কথা হবে—

—বাবু কথা নয় শুধু। পাকা কথা—

—হুঁ তাই।

—তাহলে কাল, না পরশু সকালে আপনার কাছারি গোড়ায় নোঙর ফেলাবো— ?

উনুনে শুকনো পালার তেজে আগুনের জ্বলন্ত শিখা : আঁধার পুড়িয়ে চকিতে আলোটুকু ছোট মেয়েটার মুখময়। মায়ের বুকে কাঁটা ফোটে। মেয়েটা চোখ উলটে চেয়ে থাকে। মা উঠোন কাঁপিয়ে চেঁচায়, ওরে—ও কালো ছুটে আয়রে—এটাও বোধ হয় চলে গেল···

মায়ের এমন আর্ত চিৎকার উঠোন ডোবা পার হয়ে দশ কাঠার ধান চারার ফাঁক গলে তীরের মতো কালুনাথের বুকে লাগে। মুচড়ে যায় ভেতরটা। গামছার ধানটুকু নিয়ে দাঁড়াতেই মেজোটার ডাক, হই দাদা—আয় গো—

কাছের বা পাশের দু-চারজন দুঃস্থ রুগ্ন প্রতিবেশী বউ বুড়িরা হাজির। ছোট মেয়েটার সকালে খেলার সঙ্গী সাথীরাও ঘিরে দাঁড়ায়। তাদের দাঁতে এখনও ধানের ক্ষীর। আঙুলে ধানের খোসায় ছড়ে কেটে ফ্যাকাশে দাগ। লালচে হওয়ার মতো রক্ত তো তেমন নেই শরীরে। তারা তাদের ধানবাদার সাথীর মুখোমুখি দাঁড়ায়। অবোধ শৈশবের দীনতায় জানতে চায় যে যার মায়ের কাছে, ছোটকির কি হয়েছে গো ?

কালুনাথ ছুটে আসে। কোচড়ের গামছায় কাঁচা ধানের পুঁটলি। গা পেটে কাঁচা ধানের ঘর্ষণ খস্ খস্ শব্দ। দু-হাতে ভিড় কাটিয়ে চার বছরের ছোট বোনটার মুখে চোখ রাখে। একেবারে কাহিল চেহারায় উঠোনে লম্বা। কালুনাথ জিজ্ঞাসা করে, কবার গো মা— ?

—দশ বারো বার তো বটে, বলতে বলতে মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে আঁতকে ওঠে, ওরে দেখরে—মেয়ের গা ঠাণ্ডা—

বাঁকা লাঠি হাতে বুড়িটা মেয়ের কপালে হাত ছুঁয়ে, পেটে কান পেতে বলে, তোরা যা না—। ওলাইচণ্ডীর থানের জল এনে দু ফোঁটা খাইয়ে দেনা।

এক বউ ছোটে। সঙ্গে যায় কটা খেলার সাথী বাচ্চারা।

কালুনাথ ছটপট করে। হঠাৎ বলে, ডাক্তার ওষুধ চাই যে !

এক বুড়ো বলে. চলো কাঁচা রাস্তায় হরিপদ কোবরেজের কাছে নে যাই। আর এক বুড়ি বলে, সে তো অনেক পথ। রোগির পেটে এক্ষুনি ওষুধ চাই।

মা শোনে। মেজোটা শোনে। কালুনাথ শোনে। ছোটটা বোবা হয়ে থাকে।

দুঃস্থ পরিবারে সুশ্রী চেহারার মেয়েটা বউ হয়ে এসেছিল। সংসারে চাঁদ মুখো সন্তান দিয়েছে। সেই বাচ্চাটা গায়ে লেপটে এখন ঝাঁটা কাঠি। বউটা সে রঙ সে চেহারা হারিয়ে চারখানা হাত পায়ে যেন ছাল চামড়া শুকোনো একটা পালা খোঁচা। ফর্সা লম্বাটে মুখে দু-চোখ ঢুকে কঙ্কালের ছায়া। সুশ্রী বউটার মুখে প্রথম কথা ফোটে, বোটঘাটার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওনা গো কালোভাই।

পরামর্শটায় অন্তর ঝরে পড়ে। কালুনাথ দু-হাতে বোনটাকে বুকে তুলে

নেয়, মা—আয়গো—

উনুনের জ্বালানি তেজ হারিয়েছে। আগুনের আলো নেই। শাকসব্জির তরকারি তখনও উনুনে। গোটা পরিবারে সারাদিনের প্রথম খাদ্য। দুপুরে খেলে তো রাতে খিদে জন্মাবে? সেটা মারতে দিনান্তে প্রথম সন্ধ্যাই উপাদেয় সময়।

আগে কালুনাথ, পিছনে মা। চারদিকে আঁধার। জাহাজটা আলো কমিয়ে গেরস্ত বাড়ি। বোটঘাটার দোকানপাটও তো প্রায় আলোহীন। দু-একটা ক্ষীণ বিচ্ছুরণ থেকে অনুমান করে ঘাটের অবস্থান।

মা উৎকণ্ঠায় বলে, ডাক্তার পাবো?

—আগে বোটঘাটায় যাই, হাঁটতে হাঁটতে কেঁপে যায় কালুর মুখের বাক্য। পুরুষের পায়ে দ্রুত গতি। কালোনাথ খানিকটা এগিয়ে। পাশে গাঙ নিথর। ছেলের বুকে নিথর ছোট্ট বোনটা। মা একটু পিছিয়ে পড়তেই আতঙ্ক। খানিক ছুটে পথ কমায়। মা ছেলের পাশাপাশি হয়ে বলে, হ্যারে—খুকিটা বাঁচবে···

মায়ের প্রশ্নে বুক আঁচড়ে যায়। বাপ তো নেই। ব্যাকুল হলেও পৌরুষ হারায় না। বরং মনে জোর এনে আশ্বাস দেয়, ওষুধটা পড়ুক—

ওষুধের বাক্সোর কাছেই দম কমানো বাতি। বাতিতে জোর দিয়ে বৃত্তান্ত শোনে কমল ডাক্তার। গম্ভীর হয়ে বলে, সেই আনলে। আর একটু আগে আনলে কি হত?

বাক্সো থেকে ওষুধটা খুঁজে ছিপির মুখ খোলে, গালটা টেনে হাঁ-করাও। শুকনো টাকরায় ওষুধের ফোঁটাটা পড়ে। চকিতে একটু গরম তরল। জিবে পড়লেও প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না বিপর্যস্ত স্নায়ু শিরা।

ডাক্তার ছ'পুরিরা ওষুধ তৈরি করে বলল, তিন ঘণ্টা অন্তর এক পুরিয়া খাওয়াবে। সকালে খবর দিও—

ডাক্তারের দোরগোড়ায় নুর আলি দাঁড়িয়ে। মা হাতে সরু সুতোর মতো রুপোর চুড়িটা কব্জি বেয়ে টানে। ক্যাকরা কাটা চুড়ির গায়ে কত গেরস্তালি গোবর মাটি লেগে বিবর্ণ। সেটা সামান্য ঠেলা দিতেই রোগা কব্জি হড়কে আর নিজের থাকে না। ডাক্তারবাবুর সামনে রেখে বলে, এটা নাও গো বাবা—

একজন রমণীর শেষ ধাতব সম্পত্তি। ডাক্তার বলে, কেন? দাম দাও—

দৃশ্যটা খবর হতেই হারুবাবু এগিয়ে যায়। মা, মেয়েকে আর ছোকরাটাকে দেখে। রোগার্ত শিশুকন্যাটাকে দেখে হারুবাবুর মনে হ'ল, আর কটা বছর গেলে মেয়েটা তো ঘর ন্যাতা দিতে পারত। গরু ছাগল চরাতে পারতো···! আমার উঠোন পরিষ্কার থাকতো···! সেই বিবেচনায় তাড়িত হয়ে বলে, ও মেয়েছেলে তোমার ওটা নিয়ে নাও।

মা অসহায় চোখে তাকিয়ে আবার ডাক্তারকে নিবেদন করে, না গো বাবু—এটা নিয়ে মেয়েটাকে বাঁচাও।

হারুবাবুর গলায় উষ্মা।—আমি কি তাই চাচ্ছিনি?

মেয়েটাকে তখনও তক্তাপোশে শোয়ানো। ছেঁড়া কাপড়ে ঘোমটা টেনে মা

বলে, বাবু কোন পাপে যে এইসব ঘটতেছে··· । যা আছে তাই নিয়ে ডাক্তারবাবু সন্তুষ্ট হোক—

ছোকরা কালুনাথের ভুবন ঘুরে যায় । ভাবে, পাপ···পাপ কে দেখতে তো হারুবাবু···পাপের রঙ তো ভদুনাথ··· !

মেয়েটাকে বুকে নিয়ে বাইরে আসে মা । মায়ের বুকে পেটের সন্তান । মায়ের সারা অঙ্গই তো ধারণ করে । বহন করে । আঁকড়ে থাকে বাছাকে··· !

নুর আলি কাছে এসে বলল, ও মেয়ে—বাচ্চাটাকে শহরে—হাজিপুরে নিয়ে যাও । হাসপাতালে অনেক ডাক্তার অনেক ওষুধ—

বাচ্চা বুকে মা ডাক্তারের দিকে তাকায় । ডাক্তার বলে, ভাল মনে করলে যাও । যা ওষুধ আছে বোটে খাওয়াবে খন—

নুর আলির বোটে খড়ের টাল । চালার এক ধারে মা বাচ্চা কোলে বসে । ছেলেটা বোটের ডালি হেলান দিয়ে আকাশ দেখে । জলস্রোতের শব্দ শোনে । যে স্রোত শহর ভু-খন্ড ছুঁতে চলেছে ।

মা কোলের বাচ্চা মেয়েটাকে হাত দিয়ে মৃদু জাগায়,···এই কেন গেলি ধানের ক্ষীর খেতে ! শাক পাতার সিদ্ধ যে করেছিলুম··· !

···তখন এ ভূখন্ডের গায়ে গা লাগিয়ে তো ভারতবর্ষ । আফগানিস্থান । কাজাকিস্তান । ভলগা, ডন, নীপার, নীস্টার নদী । ইউক্রেন লেনিনগ্রাদ তারপর তো লাডোগা হ্রদ । অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে অনাহারক্লিষ্ট ত্রিশ লক্ষ মানুষ । তার মধ্যে চার লক্ষ শিশু । মারা গেল দশ লক্ষ মানুষ । কত যে শিশু··· !

ভের

সকালের আগেই সকাল হয়ে যায় মেজোর চোখে । পাশে পাঁচ বছরের ভাই সেজোটাকে, এই—এই—, বলে ধাক্কা মেরে ডাকে ।

ঘুম চোখে বলে, কি—

—খাবি ?

কথাটা মুহূর্তে কান বিদ্ধ করে সেজোকে জাগিয়ে দেয় । আর তাকে ডাকতে হয় না । সে জানে, ইচ্ছা করলেই তো ঘুমুতে পাবে । চাইলেই তো খাদ্য সে পাবে না । সেজোটা খালি গায়ে ছেঁড়া চ্যাটাইয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিল । কোথা থেকে যে এত ঘুম এসেছিল ! দু-হাতের উল্টো পিঠে চোখ ডলেও ঘুম সরছে না । জোর করে তাকিয়ে বলে, কই ?

মেজোটা বলে, আয়—

শাক পাতার সঙ্গে প্রাণীটা সিদ্ধ করে পদার্থটুকু তৈরি হয়েছিল ; তা দিয়ে তো পেট ভরে খেতে পারেনি । রাতেই ফিরতে পারে মা দাদা ছোটকি বোন । রাত পার হয়ে গেছে এদেশ ছেড়ে যে কখন ! খাদ্য পদার্থটুকু তাদের মাথার কাছে । অন্নহীন জঠরে সামান্য খাদ্য পদার্থটুকু আর কতক্ষণ ? সারারাতে হজম হয়ে খিদে জন্মেছে । খাদ্যের পরিমাণের তুলনায় রাতের পরিমাণ কত যে

বেশি বড় !

ক্রমে ভোরের চরাচর থেকে রাত মুছে গেছে। মুছে গেছে সেজোর চোখ থেকে ঘুম। মেজোকে বলে, এই দাদা—দে

মাটির হাঁড়ির মধ্যে হাত ডোবায় অনেকটা। দ্রব্য তো অল্প। কচি হাতের ছোট্ট আঙুলও ডোবে না। মাটির আধারের পোড়া মাটিতে আঙ্গুলের ডগা লেগে খরখর করে। মেজো তোবড়ানো বাটিতে এক তাল বাসি তরকারি সিদ্ধ তুলে দেয়। এখন নিজের বাটিতে রাখতে মন চায় না। ভাইটা যে তার দায়িত্বে। মেজো বলল, এই আর নিবি ?

বয়েসে ছোট। অপেক্ষাকৃত বেশি শিশু সেজোটা। তার সামনে খাদ্য নিয়ে যাঁচাযাচি ! বলেই ফেলে, দে—

মেজোটার মন ভেঙে যায়। রাগ করে আর একতাল তুলে দিতে গিয়ে একটুখানি দেয় মাত্র। বলে, দিইয়ে—। খা—

হাঁড়ি চেঁচে নিজের টুকু বাটিতে রাখে মেজো। তুবড়ে বাঁকা। কতবার যে একদিক চেপে আর একদিক সমান করতে চেয়েছে। যে বাটিতে ভিখ মাগতো শহরের গলিতে, গৃহস্থের দরজায়, রাজপথে সে বাটিটাই ঘরে তৈরি খাদ্যটকু ভাগ করে খাওয়ার বাসন কোসন। ভিক্ষুক না হয়ে যারা ভিক্ষেয় বেরুলো পরে নিজ বাসে ফিরল এখনও তো তারা গার্হস্থ্য জীবনে পুরোপুরি ঢুকতে পারল না। একটু তছনছ হয়ে গেলেও সেই আকাশ, সেই মাটিময় জন্ম দেশ, শৈশবের পুকুরঘাট ধান বাদা প্রায় ঠিকই আছে। পুরোপুরি উল্টে গেছে, লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে যারা সেই মাটির উপর বসবাসী। অন্তত যারা বেশি মাটির কাছাকাছি।

ভাগ বাটোয়ারা করে গপ গপ খেয়ে নেয় তরকারিটুকু। প্রথম দু-এক গ্রাসে স্বাদ। তারপর শুধু তো পদার্থ। কোনো রহস্য নেই। রসনায় মনোরম স্বাদের ক্রিয়া নেই। শরীরের আধারটুকু দ্রুত ভরাট করার আপ্রাণ চেষ্টা। যদি কেউ এসে বকে, এই তোরা সব খেয়ে নিচ্ছিস ?

যদি মা দাদা ছোটকি এসে বলে, আমরা কি খাবো ?

যদি কোনো পড়শী খেলার সাথী এসে বলে, আমাকে দিবি ?

যদি আর কোনো বড় বয়েসী লোক কেড়ে নিয়ে বলে, একলা খাচ্ছিস তোরা ?

খাওয়া শেষ হতেই ঝটপট ডোবায় হাত ধুয়ে নেয়। কুলকুচো করে। একদম পরিষ্কার। ছেঁড়া গামছার টুকরো কোমরে বেঁধে দু-ভাই ছোটে। উঠোন, দশ কাঠার ভুমি পার হয়ে ধান বাদার পথে। নোনাপথ রোদ পেয়ে সাদাটে। মেটে পথ চিরে এ বাদার জল ও বাদায় গিয়েছে। এখনও সরু জলের রেখা। দু-ভাই লাফিয়ে পার হয়। আবার ছোটে। কেউ পেছনে তাড়া করছে না। তবুও ছোটে। একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ যেন তাদের পিছু নিয়েছে। বাস্তু উঠোন তাল-পাতার ছাউনি ঘেরা গৃহবাস থেকে। মাটির হাঁড়ির কোটর থেকে।

দমকা হাওয়া। সবুজ ধানচারা দোল খায়। পাতায় পাতা লেগে খস খস শব্দ। ভয় পেয়ে সেজোটা আরও জোরে ছোটে। মেজোর কাছাকাছি হয়ে বলে,

এই দাদা—কোথায় যাবি ?

—চল্‌না আমার সঙ্গে।

কতবার যে এপথে ছুটেছে, খেলেছে তবুও আতঙ্ক বিছিয়ে থাকে এঁকে বেঁকে পথের ধুলো মাটিতে। তখন আবার জোরে ছোটে।

সবুজ ধানচারার ঢেউয়ের বিস্তারের মাঝে মাঝে সবুজের স্তূপ। মানুষের বসবাস ঘিরে সে সবুজের আশ্রয়। তারপর বসবাসহীনতায় প্রান্তর। কিংবা প্রান্তরে ধান চাষ, মানুষের পেটের দানার আয়োজন পরবর্তী শস্য বৎসরের জন্যে।

মেজো সবুজের ফাঁক থেকে দেখতে পায় কাঁচা সড়কের দীর্ঘ রেখা। যার মধ্যে নগর কোলকাতার প্রবাহ ক্ষীণ ভাবে বয়ে আসে। দু-ভাই ছোটে। ক্রমশ ক্লান্ত। কোমরের ছেঁড়া গামছার বাঁধন আলগা হয়ে উলঙ্গ। আদিম অরণ্য কালের শিশুর মতো ছোটে। হাজির কাঁচা সড়কে। সড়ক মহকুমা শহর থেকে এগিয়ে এসেছে এতদূর। যাবে আরও দক্ষিণে। গাঙের দেশে। নোনা সমুদ্রের কাছাকাছি।

কালো ট্যাক্সিটা দাঁড়ায়। গায়ের কালো দরজা হাতল, বনেট্ ধুলো মেখে সাদা। ভিতরের যাত্রীদের চোখের পাতায়, ভ্রূ, মাথার চুলে নোনা ধুলোর আস্তর। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে মাথা ঝাড়ে। গায়ের জামা ঝাড়ে। বাতাসে ধুলোর কণা। দু-ভাই মানুষগুলোকে দেখে। চারটে চাকায় গাড়িটাকে দেখে। অবাক হয় না। তাদের শৈশব দ্রুত পরিণত। কলকাতার রাজপথ ধরে খালি বাটি নিয়ে তো ঘুরেছে। অনেকবার এমন গাড়ি দেখেছে। বিস্ময় তৈরি করতে পারে না।

খড়ের ছাউনি বেঁধে দোকান ঘর। মাটিতে খানিক পুতে জালা ভর্তি জল। কাঠের টেবিলে মালসায় টক দই। কলাপাতা চাপা দিয়ে ধুলো ঢাকে। বস্তা-খানেক চিড়ে মুড়ি। এক জগ জলের পাশে ক'খানা গেলাস। প্যাসেঞ্জার ক'জন দোকানের সামনে দাঁড়ায়। কেউ জল চায়। কেউ দই শরবৎ তারিয়ে তারিয়ে খায়। একজন কাঁচ কলাপাতায় চিড়ে দই মাখিয়ে দ্রুত জলযোগ সেরে নেয়। কাপড়ের গেঁট থেকে তামার পয়সা বের করে বলে, কত দাম গো দোকানি ?

মেজো লোকগুলোর খাওয়া দেখে। সেজো ভাবে, পকেটে পুইস্যা থাকলে খাদ্যের তাহলে কোনো অভাব নেই। কিন্তু মানুষগুলো অতো পুইস্যা পায় কোথ্‌থিকে ! তবে যে মা বলে, দেশে মানুষের খাদ্যে বড় টানাটানি !!

লোকগুলোর জল খাওয়া দেখে। চিড়ে দই খাওয়া দেখে। ক্রমশ তাদের গায়ের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়। শ্রী, সৌষ্ঠবহীন শিশু দুটো। একদম খেয়াল করে না। শুধু কৌতূহলে দোকানটা দেখে। দোকানের খদ্দেরগুলোকে দেখতে থাকে।

দোকানদার মানিক বাঁজ খা'র গলায় বেজে ওঠে কড়া ধমক, এই যা। দোকানের ভিতর কেনরে ?

ড্রাইভার লোকটা পাট করা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বলে, মানিকদা ধর।

—খবর কি গো ? কাগজটা হাতে নিয়ে জানতে চায় দোকানদার।

—শালার জার্মান খুব পেটান খাচ্ছে কমুনিস্ট্‌দের হাতে। কথাবার্তায় মারপিট ! ছেলে দুটো ভয়ে বাইরে আসে। তাকায় কাঁচা সড়কটার দিকে। কত চওড়া করে মাটি ফেলা। ধান বাদার তল থেকে অনেক উঁচু। গোটা গাঙ ঝাঁপিয়ে এলেও ডুবোতে পারবে না। মেজো সেজো একবার বাঁয়ে কাঁচা সড়কটা দেখে ডাইনে তাকায়। দু-দিকে যে কত দূর চলে গেছে পথটা ! কালো ট্যাক্সির মেসিন পত্তরের ঢাকনাটা খুলে দিয়েছে ড্রাইভার। দু-ভাই ছুটে যায় এবার মেসিনের কাছাকাছি দাঁড়াতেই গরম। তাদের রাতের উনুনের মতো।

সেজোটা চণ্ডমণ্ড করে জ্বলন্ত কিছু খোঁজে। দেখতে পায়না তেমন কিছু। মেজোকে শুধোয়, হ্যারে দাদা—খোঁচা পালা কই যে এত গরম··· ! মেজোর কাছে রীতিমতো সংকট। সেও খোঁজে তাদের উনুনের জ্বলন্ত কাঠকুটোর মতো কিছু। এত গরম কেন মেসিনের গায়ে !

দোকানের চিঁড়ে দই পাতায় খেতে খেতে লোকটা বলল, তোমাদের সে দোকান বোট ঘাটায় আছে ?

দোকানদার বলে, সেটা আর চলে কই ? আপনারা তো বোট ছেড়ে তাড়াতাড়ি পেঁাছবার জন্যে টেক্সি ধরেছেন। বোটে লোক কম—ঘাটে লোক তেমন লাবেনি। খাবে কে ?

খেতে খেতে খদ্দেরটি তাকায় দোকানির দিকে। একগাল চিড়ে-দই গিলে নিয়ে বলে, কেন ? বহু-বহু লোক তো বোট ধরে যাচ্ছে—। পা ছড়িয়ে বসার জায়গা মিলেনি ?

ছোকরা দোকানদার বলে, বাবু, যারা যায় তাদের ক'জন খাবার লোক ? বাবা বলছে যে, দোকান তুলে দুবো—

হাতের দই চাটতে চাটতে খদ্দের জানতে চায়, হুঁ। বোটঘাটার বাজারটা তাহলে এবার উঠে যাবে—

—এ রাস্তায় পিচ পড়ে আর একটু ভাল হলে সে আর বলতে হবে বাবু ?

খদ্দেরটার হাত-চাটা তখনও চলে।

দু-ভাই ট্যাক্সিটার অন্ধিসন্ধি খুঁজে একটাও জ্বলন্ত কাঠ, খড়কুটো পায় না। হতাশ হয়। আবার দোকানটার পাশে আসে। লোকটার অমন হাত চাটা দেখে তাদের শুকনো শরীরে টাকরা বেয়ে লালা আসে। দাঁড়িয়ে দেখে লোকটাকে। ছেলে দুটোর কোটরে ঢোকা চোখ, চিমসানো গাল। অমন দুর্লভ খাব্যদ্রব্যের পাশে দাঁড়িয়ে লালা নিঃসরণে গাল ভর্তি। কেমন বেয়াদবের মতো ঢোঁক গিলে নিজেদের লালসা দমন করে বাচ্চা দুটো।

খদ্দেরটা বলে, ও ছোকরা এদের সরাও না—

ছোকরা দোকানদার দই কাটানো হাতটা নিয়ে তেড়ে যায়। দু-ভাই ছুটে পালাতে গিয়ে দেখে হাতাটার গা-ময় কত যে দই লেগে। দু-চার ফোঁটা টপে পড়ে নিচের মাটি-ধুলোতে। দোকানি গলা হাঁকায়, তোরা এখেন থেকে যাবি কিনা বল ? এবার লাঠিপেটা করব—

মেজ সেজ পালায়। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। দোকানি ভেতরে ঢুকে যায়। খুব সন্তর্পণে দু-ভাই ধুলোমাটিতে দইয়ের ফোঁটার কাছে আসে। দেখে, মাটি সব দই শুষে নিয়েছে। খাদ্যদ্রব্যটা নেই। খাদ্যের দাগ আছে।

কাঁচা সড়কের দিকে পেছন ফিরলে, চোখ বরাবর তো আবার সেই ধান-বাদার মেটে পথ। মেজ আর সেজ তাকায় গাঙমুখো। দু-পাশে সেই ধান··· ধানের চারা। পরের জমি। নিজেদের ডেরা। সেটা তেমন করে টানে না। নিতান্ত অভ্যাসে কিংবা নিরুপায়ে আবার ফেরার পথে পা ফেলে। পাশে সানা-বাবুদের চৌ-চাকলা ঘর। দাওয়ায় ক'টা বাচ্চা ছেলেমেয়ে। তালপাতার আসন পেতে বসেছে পাশাপাশি। সামনে যে যার বই, শুকনো তালপাতার গোছা।

ছেলেমেয়ে ক'টা তালপাতার গায়ে কঞ্চির ছুঁচলো কলম ডগা দিয়ে আঁক কাটে। আর সুর করে বলে যায়।

সেজটা দেখে দাঁড়ায়।

মেজটাও হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ক'টা বাচ্চা ছেলের সামনে খালি গায়ে লোকটা বড় বড় কাগজ পেতে একমনে চুপচাপ পড়ে। নিজের মনে হাসে। রাগে। আবার বিড়বিড় করে। গতদিনের খবরের কাগজে খালি গায়ের মানুষটা কত যে মগ্ন। হঠাৎ বলে ওঠে, এবার জখম হবে ব্যাটারা। কিয়েভ থেকে হটতে আরম্ভ করেছে। আরও শীত পড়ুক—

সামনে কালির দোয়াত। পোড়া কাঠকয়লা ঘষে ঘষে একদম মিহি গুঁড়ো। সামান্য জল দিতে কুচকুচে কালো। ন্যাকড়ায় ছেঁকে একদম পরিষ্কার তরল। সেই তরলে কঞ্চির কলমের ডগা ডুবোয়। ফালি ফালি করে কাটা শুকনো তাল-পাতা। তার ওপর লেখে আর সুর করে বলে, এক কড়া; এক চোকে ইলেক দাও না। দু'কড়া; দু'চোকে ইলেক দাও না। তিন কড়া; তিন চোকে ইলেক দাও না— ; চার কড়ায় এক গণ্ডা। পাঁচ কড়া এক গণ্ডা এক কড়া—

মেজটা অবাক হয়ে শিশুপাঠ্যের সুর শোনে। সেজটা নিজের বয়সের সঙ্গে পড়ুয়া ছেলেটার বয়স মেলায়। সমবয়সীর টানে একটু একটু করে এগিয়ে পাঠশালার কাছে যায়। তখন সুর করে বলছে তারই বয়সী বাচ্চাগুলো, ছ'কড়ায়— এক গণ্ডা দু'কড়া—

মেজটা বলে—, এই পড়বি?

সেজটা ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়, হুঁ, ফিসফিস করে বলে, কে পড়াবে? বাবা কই?

মেজটা দাওয়ার ওপর পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের দিকে তাকায়। তাকিয়ে ভাবে, ওদের সকলের বাবা আছে···

নিজেদের পিতৃহীনতায় বুকের ভেতরটা ফাঁকা। তারা সীমিত বয়সের জ্ঞানে চারদিকের সংসারটা দেখে। হারানো পিতার আবছা চেহারা স্মরণে এনে মৃত চিত্রনাথকে সব কিছুর ত্রাণকর্তা ভেবে ফেলে। এ বিশ্ব ব্যবস্থায় তাদের চিত্র-নাথের মতো বাবা যে কতটুকু মানুষ···

বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর গলার স্বর থেমে যায়। হরনাথ পণ্ডিতের সর্বাঙ্গ

বাসি খবরের কাগজটায়। সবে তো ট্যাক্সি চালু হচ্ছে কাঁচা সড়কে। মহকুমা শহর থেকে কত ধাক্কা খেতে খেতে এই কাগজটা আসে। সুতরাং হরনাথ পণ্ডিতের দু'চোখে ডানজিয়ন করিডর, পোল্যাণ্ড বাল্টিকসাগর এস্তোনিয়া লাটভিয়া, কৃষ্ণসাগরের তীরে ক্রিমিয়া, কাস্পিয়ানসাগরে বাকু বন্দর, জেনারেল ভাতুতিন… নচ্ছার গোয়েবেলস, গোয়েরিং…ধুরন্ধর চার্চিল…গান্ধীজী মহম্মদ আলি জিন্না …বোম্বাই কলকাতা, আবুল কালাম আজাদ…চিয়াং কাইশেক…

চারপাশ থেকে হঠাৎ যেন সুর কেটে গেছে। মনের উত্তাপে কানের বাজনাটা বন্ধ। মুখ তুলতেই পড়িয়ে খাওয়া, থাকার বিনিময়ে সানা-বাবুদের ঘরের দেওয়াল দাওয়া। ধান-চালের ব্যবসায়ী বলাই সানার পরিবারের নাতিপুতি। পড়া ভুলে তারা সবাই চুপচাপ। তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। এই দুপুরে কেমন খেলতে বেরিয়েছে তাদের বয়সী দুটো ছেলে!

চোখে চাঁদির গোল চশমা নেই। মধ্যবয়সে বেশ নজর। মেদিনীপুরের গ্রাম ছেড়ে এখানে পরান্নভোজি। শুধু খবর জানতে চায়। রাখতে চায়।

পণ্ডিতমশায় বিশেষণে কী যে মোহ! হরনাথ পণ্ডিত পড়ুয়াদের মুখ-চোখ লক্ষ্য করে বাইরে তাকায়। দেখে, ছেলে দুটো দাঁড়িয়ে। ফট করে পড়ুয়াদের বলে, হ্যাঁরে বাপেরা—পড়া বন্ধ করলি?

পড়ুয়ারা সুর করে পড়ে। লেখে, সাত কড়ায়—এক গণ্ডা তিন কড়া। আট কড়ায়—দু'গণ্ডা…

গতি কেটে যায়। অন্যমনস্ক হয় ছেলেমেয়েগুলো। হরনাথ দাওয়া থেকে বেরোয়, এই তোদের…

মেজ সেজ দৌড় মারে। পণ্ডিতমশায় চেঁচায়, একদম মুখ ফেরাবি নি। যা গাঙধারে—বোটঘাটার দিকে—

আপদ…জঞ্জাল যেন দূরে সরিয়ে দিয়েছে কিংবা দিতে পারল এমন একটা তুষ্টিতে শান্ত হয় হরনাথ পণ্ডিত। বাচ্চারা আবার সুর করে পড়ে।

মেজ সেজ দৌড়য়। খানিক গিয়ে জিরোয়। হাড়-পাঁজরা বেরনো বুক-পেট। রুগ্ণ শরীরে খানিক দৌড়ে ঘন ঘন শ্বাস নেয়। চামড়া ছিঁড়ে বুকের খাঁচা বেরিয়ে আসতে চাইছে। ছোট্ট শরীরে অপুষ্টিতে হৃদ্‌পিণ্ড জোড়া শীর্ণ হতে চলেছে। তাই অনেক পথ আতঙ্কে দৌড়ে দম নিতে গিয়ে প্রচুর হাঁপায়। পৃথিবীর বাতাসেও যেন টানাটানি লেগেছে ভাত-রুটির সঙ্গে।

বার বার দম নিয়ে মেজ সেজ ধাতে আসে। ধান-বাদার হাওয়া তাদের গায়ে স্নেহের হাত বুলোয়। একটু একটু করে মনের কষ্ট চলে যায়। তারপর মেজ বলে,…এই, যাবি?

—কোথায় রে?

—মায়ের কাছে!

এতক্ষণে দাদার কথাটা মনে ধরেছে। মা হঠাৎ সন্তান দুটোর অঙ্গে আকুতি জাগায়। ওরা দু'জনে ছুটতে থাকে। ধানবাদা পেছনে ফেলে এগোয়। সোজা বোটঘাটায় এসে দম ফেলে।

ভরদুপুর। আকাশময় রোদ্দুর। বাঁধানো অশ্বত্থ গাছটার তলায় লোকজন। পাশবাড়ির লোক হাওয়ায় বসেছে। রোগা রোগা ক'টা ছেলেমেয়ে এক মা কোন গাঁ থেকে ভিক্ষেয় বেরিয়ে ক্লান্ত। গাছতলায় জিরিয়ে নিচ্ছে। মেজ সেজ গোটা গাছচত্বর এক পাক ঘুরে নেয়। দেখতে পায় না মাকে। বোন ছোটকিকে। কিংবা দাদাটাকে।

বাঁধের ঢালু বেয়ে ওপরে ওঠে। গাঙের ওপারে গাছপালা ভূমি নিয়ে অন্য জেলা। অচেনা ভূমি। মেজটা তাকিয়ে ওপারটা দেখে। বুকের ভেতর ধু-ধু শূন্যতা।

বোটঘাটার ঢালু মাটি বেয়ে নামতেই ডাইনে দোকান, চিড়ে-মুড়কি-বাতাসা। মেজ সেজ মুখ বাড়ায়। খোঁজে। চোখ ভর্তি হয়ে যায় বস্তা উপচোনো চিড়েয়। পাশে মুড়কির স্তূপ! কত খাদ্য! মেজ ভাবে, এত চিড়েয় মা, ছোটকি দাদা—সকলের খেলে পেট ভরে যেত!

দোকানি জগন্নাথ বাজখাঁ চেঁচায়, কী রে? কে তোরা— ?

—আমার মা—বোন ছোটকি ?

জগন্নাথ হিসেব কষতে কষতে বলে, ওদিকে দেখ—

পাশে মুদিখানা দোকানটায় কত মালপত্তর। তেল-নুন-লঙ্কা সব থরে থরে সাজানো। সেজটা ভাবে, শাক সিদ্ধে মা তো কক্ষুনো তেল-মশলা দেয়নি···! আপসোসে মায়ের জন্য আর্তিটা প্রবলতর হয়। মুদিখানা দোকানে মা বা ছোটকি নেই—এটা সাব্যস্ত করে তার শিশুমনে। তাই অন্য কোথাও খোঁজা উচিত এই বিধায় উল্টো দিকের দোকানে ঢোকে। তার সঙ্গে মেজও যায়।

মোটা মোটা তক্তায় দিশি গাছপালার কাঠ। বেশ ভারী তক্তাপোশের ওপর ওষুধের বাক্সটা খোলা। লোকটা কাচের শিশিতে গ্লোবিউলসে এক ফোঁটা ওষুধ ফেলে দু'হাতের চেটোয় শিশিটাকে পাকায়। ওষুধের তরলটুকু সাবুদানার মতো গ্লোবিউলসে মুড়কি মাখা হয়।

সেজ আচ্ছন্ন অনুমানে ডাক্তারখানা মনে করে দোরগোড়ায় হাজির। লোকটা কাচের শিশি হাতে রেখে জানতে চায়, কে রে? তোদের মা-বাপ সঙ্গে এসেছে?

সেজ অবাক হয়ে বলে, না!

শিশি হাতে লোকটা গজগজ করে, তবে এলি কেন?

—মা কোথায় গো··· ? মেজর গলা বুজে যায়।

—কী করে জানব? ওষুধের শিশি হাতে কমল ডাক্তার উত্তর দেয়।

—বোন ছোটকি? বলতে বলতে কাঠের বাক্সর ডালায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে সরু রুপোর চুড়িটা দেখতে পায়। রুগ্ণ মায়ের হাড়গিলে হাত গলে কতবার যে কাদায় গোবরে পড়ে গেছিল! পট করে ছুটে যায় শিশু সেজটা। খামচা মেরে বলে, এটা তো মায়ের—

বিস্মিত ডাক্তার শনাক্ত করে মানুষগুলোকে।—তা হলে তো বোটে···। যা বোট গোড়ায় দেখ গে—

মধ্য দুপুর। রোদ চিকমিকিয়ে গাঙের নোনা জল। ভাঁটায় জল নেমে গেছে

খোলে। ঘাট থেকে অনেকখানি কাদা। দু-চারখানা ডিঙি কাদায় নোঙর গেঁথে থাবড়ে বসে আছে। লোকজন ফাঁকা। পাশ গাঁয়ে খেতে গেছে। আর একটু কাদা মাড়িয়ে যায় দু-ভাই। ডিঙিটা পিঠ উল্টে বাঁশখুঁটি ঘেরা। তলার কাঠ পচে ফোঁপরা। সারাই হবার ব্যবস্থায় বাঁধা। নিচে জলের রেখায় বোটটা। মোটা কাছিতে বাঁধা বড় নোঙরের ফলা কাদা কামড়ে বোটটাকে ধরে রেখেছে। বোটের ওপর দাঁড়ি-মাঝি। মাটির হাঁড়ির পেটে কাদা লেপে তিউঁড়ি উনুন। কাঠ পালায় আগুন সয়ে কালো। তার পাশে সাদা ধবধবে কলাই-করা ডিশে ভাত বেড়েছে। পাশে বাটনা-লাগা কলাপাতা।

ছেলে দুটো বোট গোড়ায় আসে। নোনা ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে বোটের গায়ে ঝাপটা মারে। নোনা জল তাদের গালে জিবে লাগে। দাঁড়ি-ছোকরা চেঁচায়, কিব্যা তোদের ?

—মা আছে ? বলে মেজটা।

—ছোটকি ? চেঁচায় সেজটা।

দাঁড়ি-মাঝিদের ভাত ডিশে। গাঙের হাওয়ায় জুড়োয়। রোদ চকচকিয়ে মুঠো মুঠো সাদা মেঘ ডিশ ক'টায়। ছোকরা দাঁড়ি ধরতে না পেরে বলে, কে ? কারা ?

নূর আলি দাঁড়িকে ইঙ্গিতে থামায়, হয়ছে ? মানুষের ছানারা এবার হাতে-পায়ে মাঠ-ঘাট চরে বেড়াচ্ছে···বলতে বলতে জানায়, তারা তো ডাংডাহারবারে —হাজিপুরের হাসপাতালে—

দুই শিশুর কাছে এ-সংবাদ নিতান্ত দুর্বোধ্য। শুকনো তথ্য ছাড়া আর কী! নূর আলি ছেলে দুটোকে দেখে। মনমরা মুখ। কোটরবদ্ধ চোখ। পাঁজরা জিরজিরে বুক-পেট। নিরুপায় দাঁড়িয়ে নতমুখ দ্বিপদী প্রাণী। নূর আলি মমতায় ভেসে গিয়ে হঠাৎ বলে, এই—খাবি ?

ছেলে দুটো ঊর্ধ্বমুখে বোটের ডালিতে তাকায়। মানুষটাকে দেখে। মাথার ওপর সূর্যটা গোল হয়ে লাল। চরাচরে খাদ্য তৈরি করে বা প্রক্রিয়াতে ভীষণ জরুরি উপাদান। কিন্তু কোনোদিন তো মুখ ফুটে বলেনি। দু'চোখে আকুল চাহনি ছেলে দুটোর।

নূর আলি তাড়াতাড়ি নিজের কলাই-চটা ডিশ থেকে দু'মুঠো ভাত তোলে। পাতাটায় রেখে শাক-পাতার চচ্চড়ি একটু করে দেয়। ভাল করে মুড়ে বেঁধে নূর আলি বলে, ওই ছানাগুলো ধর—

মেজ সেজ বোটের গায়ে দাঁড়ায়। ডালি থেকে মুখ নামিয়ে হাত বাড়ায়। শিশু দুটোর কচি হাত পৌঁছয় না। নূর আলি আরও মুখ নামায়। দু'হাত ক্রমশ দীর্ঘ হয়। বাচ্চা দুটোর হাতের নাগালে পৌঁছে দেয়। তারা কচি হাতে আঁকড়ে ধরে ভাতের দানা ক'টা। দশ আঙুলের খাঁচায় যখন দ্রব্যটি বন্দী, নূর আলি বিড়বিড় করে, মানুষকে দিতেও কত কষ্ট··· !

বাচ্চাগুলো ভাতের পুঁটলিটা হাতে ধরে নিরাপত্তায় হাসে। কোটরের চোখ ঝিকোয়। শীর্ণমুখ ঝলমল করে। পাতার ভেতরে ভাত ক'টার সাদা রঙ ম্লান

হয়ে যায়।

নুর আলি মমতা মুছে ধমকায়, এই যা—তোরা শুকনো ডাঙায় খে গে যা—।

খড়ের চালায় ছায়া। ছায়ায় বসে দুটো বাচ্চা। কলাপাতার বাঁধন খোলে। ধীরে ধীরে পাতাটা মেলে। কচি মুঠোয় পরপর দু-তিন গাল খেয়ে মেজটা বলে, কাল ফের আসবি— ? সেজটা কতদিন পর ভাত পেয়ে ঢোক গেলে। সায় জানিয়ে বলে, হুঁ। পরক্ষণে নিজের চোখে সংশয়···রোজ দেবে··· !

আবার খেতে খেতে সেজটা বলে, মা—ছোটকি ?

মেজটার বুকে আশঙ্কা ! বলে, ছোটকি সঙ্গে এলে তো তিনজন ? বোটওলা আর দেবে··· !

চোদ্দ

হেমন্তের হিম ক্রমশ শিশির। ঘাসে, ধানের মাঠে। মাঝে মাঝে কুয়াশায় আঁধার আরও ঘন। ভোর বেশ ঝাপসা।

উনিশশো তেতাল্লিশের শেষ ভাগ। জার্মানবাহিনী কিয়েভের চারপাশের এলাকায় বিয়াল্লিশ দিন ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছিল এবং প্রচুর পরিমাণে রুশ জমি পুনর্দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু ডিসেম্বরে শীত জাঁকিয়ে পড়ছে। লাল ফৌজ অভিযান শুরু করল। দশ দিনের মধ্যে সমস্ত স্থান পুনরুদ্ধার করেছিল রাশিয়া। উনত্রিশে ডিসেম্বর জেনারেল ভাতুতিনের দু'নম্বর উইক্রেনীয় বাহিনী একশো পঁচাশি মাইল রণাঙ্গনে ব্যূহভেদ করল। আর সৃষ্টি করেছিল পৃথিবীব্যাপী বিস্ময়ের ইতিহাস ! ভাতুতিনের ইউক্রেনীয় বাহিনী জার্মানির বাইশ ডিভিসন সৈন্যবাহিনীকে প্রচণ্ড বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেছিল। ভাতুতিনের বাহিনী কিয়েভ এলাকার পশ্চিম দিক মুক্ত করে আরও আশি মাইল দূরে করোস্টেন ও ঝিটোমিরের রেলজংশন ও নিজেদের আয়ত্তে আনেন। কারণ জার্মান বাহিনী রুশ আক্রমণের জন্য একটা কৌশল নিয়েছিল যা 'রেল রোড স্ট্র্যাটেজি' নামে খ্যাত। যার ফলে হিটলারের বাহিনী ছাউনি পুঁতেছিল, ঘাঁটি গেড়েছিল তো রেলস্টেশন, জংশন ঘিরে।

জেনারেল ভাতুতিনের নেতৃত্বে রুশ বাহিনী প্রবল পরাক্রমে পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ থেকে ইউক্রেনের কিয়েভগামী রেলপথ জার্মানির অবরোধ থেকে উদ্ধার করে এবং উনিশশো চুয়াল্লিশের বারই জানুয়ারি রুশ বাহিনী শত্রুসৈন্যদের তাড়া করে একেবারে প্রিপেট জলাভূমির দিকে নিয়ে যায়। ফলে জার্মান বাহিনী দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জার্মানির উত্তর ও দক্ষিণ রণক্ষেত্রের সঙ্গে যোগা-যোগহীন অবস্থা। বড়ই বেকায়দায় হিটলারি বাহিনী। তখন ভাতুতিনের বাহিনী দক্ষিণে জেমিরিঙ্কোর দিকে অভিযান চালায়। পোল্যাণ্ডে লোও থেকে রেলপথ ওডেসা পর্যন্ত। জেমিরিঙ্কো হল জংশন। রুশ বাহিনী জানত যে এখানে যদি জার্মান বাহিনীর পতন ঘটে তো ইউক্রেনের নীপার নদীর বাঁকে

জার্মান সৈন্য ভয়ঙ্কর ফাঁদে পড়বে। জার্মান বাহিনীও এই অনুমানটা বুঝে ফেলেছিল। ফলে তারাও পুনরাক্রমণ চালিয়েছিল প্রচণ্ড শক্তিতে। মাসাধিককাল লাল ফৌজের গতি খানিক রুদ্ধ। এসময়ে পনের ডিভিসন নাৎসি সৈন্য রুশ বাহিনীকে চেপে ধরে। কিন্তু জেনারেল ভাতুতিনের এক নং ও জেনারেল কোনিয়েভের দু'নং ইউক্রেনীয় বাহিনী মাত্র চারদিনে পঞ্চাশ মাইল অগ্রসর হয়ে জার্মানির ছ'নং ও আট নং বাহিনীকে পেছন দিক থেকে ভেদ করে একেবারে কাঁকড়ার দুই দাঁড়ার মতো ঘিরে ধরেছিল। রুশ বাহিনীর এমন আচমকা দ্রুত অগ্রগতির রণকৌশলে সমগ্র জার্মান বাহিনী ও তাদের জেনারেল ম্যানস্টাইন বিস্ময়ে হতবাক!

ক্রমে ক্রমে মিত্রশক্তির জয় সূচিত হচ্ছে রণাঙ্গনে, রুশসৈন্যের সাফল্যে স্ট্যালিন অভিভূত। আমেরিকার রুজভেল্ট সমীহ পোষণ করেন। আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সাহেবের কাষ্ঠহাসি। লাল ফৌজের বিজয়ে বুকের ভেতর গোপন আতঙ্ক দাঁতে চেপে চুরুটের ধোঁয়ায় আড়াল করেন। তখন তো গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বাধীনতার আন্দোলন। গান্ধীজীর পাশাপাশি লিগের জিন্না, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বামপন্থীরাও তো ভারতের জনগণের মধ্যে মিশে আছে।

এইরকম উত্তপ্ত আন্তর্জাতিকতায়, দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অচলাবস্থা নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসের নেতা ভুলাভাই দেশাই ও লিগের সহকারী নেতা লিয়াকৎ আলি খাঁ উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের জানুয়ারিতে কেন্দ্রে কংগ্রেস ও লিগের সম্মিলিত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের এক ছক-এ সহমত হন। ছক অনুসারে ব্রিটিশ বড়লাটকে ও প্রধান সেনাপতিকে স্বীকার করে নিয়ে কেন্দ্রে ভারতীয়দের দ্বারা এক সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এই সরকারে শতকরা চল্লিশ ভাগ করে সদস্য হবে কংগ্রেস ও লিগের বাকি কুড়ি ভাগ হবে শিখ, তপসিলী সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ভেতর থেকে। ভুলাভাই দেশাই যদিও বড়লাট ওয়াভেলকে বলেছিলেন যে, গান্ধী ও জিন্না ইতিপূর্বে এ-প্রস্তাব সমর্থন করেছেন—!

মাত্র কয়েক মাস পরে এমন পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল যে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয় সংগঠনই ব্রিটিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

লেখাপড়া জানা মানুষদের মস্তিষ্কপ্রসূত প্রস্তাব। সেটা কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয়, ওদিকে গুজরাট বেলুচিস্তান থেকে নাগাল্যাণ্ড মণিপুরের মানুষজনের জন্য কাগজের পাতায় শুকোয়। জানুয়ারির শীতে আরও কুঞ্চিত হয়। বিস্তারিত মৃত্তিকাভূমি নিয়ে যে ভারতবর্ষ রোদ-বাতাস গায়ে মেখে তার সন্তান-সন্ততির জন্য বিছিয়ে থাকে।

বেলা গড়ায়। শীত জমতে থাকে। দুপুরের খন্দেরপাতি সেরে ইসলামিয়া হোটেলের মকবুল সাহেব সামান্য ভাত-ঘুমে পাশ ফেরে। খাওয়ার চাতাল-মাদুরে। হোটেলঘরের গা ধরে দু'দিকে ইট বসিয়ে সিমেন্ট মাজা। তার ওপর মাদুর বিছিয়ে খানা খাওয়ার ব্যবস্থা। মাঝখানের চাতালে মাছ-ডালের সিলভার

ডেকচিগুলো দেওয়ালের গায়ে ঠেকনো পেয়ে এক কাত। কয়লা-কাঠের ধোঁয়ায় গায়ে কালো কষ। এক দফে পাঁচ সের চাল সিদ্ধ ভাতের হাঁড়িটা গায়ে-পাছায় ভুষো মেখে কালো পাথরের মতো বসে। শুধু কাণ্টা ধরে নামাবার বেড়টায় বারবার হাতের ন্যাকড়া মোছায় চকচকে সিলভার।

যদিও শীতের আমেজ, দু-চারখানা মাছি তরকারির ডেকচি চেটে মকবুল সাহেবের পেটে-মুখে বসে। হাত ঝাপটায় সরিয়েও স্বস্তি নেই। বাধ্য হয়ে উঠে বসে চাতালে। ভাত খাওয়ার মাদুরে দু-একখানা গুঁড়ি পিঁপড়ে। মকবুল হাতে ছেনে পিঁপড়ে ক'খানাকে নিচে ফেলে। ঘুমটাও ছুটে যায়।

বড় করে হাই ওঠে। মকবুলের ফর্সা মুখে ফুটফুট ক'খানা দাগ। অতি-শিশুকালে শেষ ঋতু ক্ষত রেখে গেছে। আলস্যটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে লুঙির গেঁটে বিড়ি আর চীনে দেশলাই বের করে। ফটাস্ করে একটা ধরিয়ে টানে। বিড়ি পুড়ে খানিক ধোঁয়া।

বাইরে দিনের আলো আরও কমে গেছে। পিচ ঢালাই রোগা রাস্তাটায় খাবলা খাবলা খোয়া উঠে নিচের ব্রিক সোলিং দেখা যায়। একটা দুটো রিকশা যায়। রিকশায় বয়স্ক উকিল মোক্তার। গায়ে কালো কোট। উত্তরমুখো গতি। গলা অবধি বোতাম আঁটে।

বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে মকবুল একবার নিজের হোটেলটা দেখে। দেওয়ালের গায়ে সাদা কলি টানা। ইটের চাতাল ছিটেবেড়ার দেওয়াল ঘেঁষে। খদ্দের বসলেও মাথা-উচ্চতায় কালো রঙে সিট নম্বর লেখা, এক দুই তিন চার পাঁচ ···। শেষ হয়েছে নিজের পেছনের দেওয়ালে পনেরয়। পেছনে তাকাতেই কাগজের ক্যালেণ্ডার ছবিতে কাবা মসজিদের ওপর কাস্তে চাঁদ। আরবিতে ক'টা কথা। হুট করে মনে হল যেন মসজিদ চাতালে বসে ধূমপান করছে। একটা অশুচি···বে-পাক কর্ম করছে। অতএব নেমে পড়ে মকবুল। কর্মচারী ছোকরা সাম্মাদ তখনও ঘুমিয়ে। মকবুল ডাকে, ছাম্মাদ—ওঠ, ওঠ রে—

সাম্মাদ পাশ ফিরে বলে, উঁ!

—আলোগুলো সাফ কর—।

সাম্মাদ চোখ রগড়ে বলে, সন্ধে হয়ে গেছে?

—চোখ খুলে দেখ না? বলতে বলতে মকবুল একটু এগোয়। হঠাৎ চোখে পড়ে খড় ছাউনি দিয়ে পুরনো টিকিটঘর। স্টিমারের যাত্রীরা এখানে টিকিট কেটে জেটিতে যেত। তারপর তো দু'পাশে রেলিংঘেরা জেটিতে হেঁটে একদম জলের কাছে। টিকিটঘরটা এখন বাতিল। এগিয়ে গেছে আরও জেটির গায়ে।

পুরনো পুঁটলি খুলতেই পোকাটা ফরফর করে বেয়ে গেল জবারানীর শাঁখা-নোয়ার গাঁয়ে।

সদয়কুমার সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, এই—এই এ্যাঁশলা···

তৎক্ষণাৎ হাত ঝাড়তেই শাঁখা-চুড়ির ঝন্ঝন্। দশ হাত বাই পঁচিশ হাত ছিটেবেড়ার দেওয়াল টিন ছাউনির হোটেলঘরটা ঝম্ঝম্ বেজে ওঠে।

পুঁটলি ঘিরে দাঁড়িয়ে গুড়ে। পাঁচ বছর পার হয়ে ছ'য়ে পা দিয়েছে। ভুঁড়েটা

তিন বছর থেকে চারের দিকে। দুভাই এতক্ষণ আগ্রহে তাকিয়েছিল মা জবারানীর যত্নে রাখা পুঁটলিটায়। যতই খোলে ছেঁড়া জামা, ছেলে দুটোর দড়ি গলানো জীর্ণ প্যান্ট শীতের রঙ-চটা চাদর। একখানা বেগুনি রঙের মাফলার। ছিঁড়েকুটে কবে কার উল খসে গেছে। তার ওপর পোকামাকড়ের উৎপাত। ভাল অংশেও কয়েকটা ছিদ্র।

মা জবারানী মাফলারটা বের করে সদয় মুখুজ্জেকে বলে, এই নাও। কান-মাথা মুড়ি দিয়ে খদ্দের ডাকবে, বাইরে যা শীত—

ছেলে দুটো এখনও খালি গায়ে। শীতের গরম জামা-কাপড়ের বোঁচকাটা দেখতে দেখতে বলে, মা আমাদের ?

কালো রঙ বাটি মুখ মা। কপাল জুড়ে বড় মতো সিঁদুর টিপ। সাদা দাঁতে হেসে বলে, তোদের জন্যে তো—এত নাড়িভুঁড়ি ঘাঁটতেছি।

গুড়ে বলল, ওই তো আমাদের চাদর—

মা জবারানী দাঁতে দাঁত চেপে গলার স্বর কড়া করে, থাম না। জামা দুটো কোথায় ?

পুঁটলিটার মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়া, একটা জ্যালজেলে গামছা পুজোয় পাওয়া সেই শিবমন্দিরে। শিবের নামে জমি ছিল। বন্যার আগে থেকেই তো নিত্য সেবার চাল বন্ধ হয়ে গেছিল। একখানা লাল চেলি। শালগ্রাম শিলা বেঁধে গলার নলিতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেত সদয়কুমার সত্যপীরের সিরনি পুজোয়। হিন্দু-মুসলমানের দেবতার জন্য। জবারানী চেলিটা নিয়ে স্বামী সদয় মুখুজ্জেকে বলে, বার করে দেব—আমাদের ঠাকুরের জন্যে ?

—দাও। নারায়ণকে চান করিয়ে মুছতে মুছতে যে চেলিটা ফেঁসে গেছে—

প্রথম পুঁটলি খোঁজাখুঁজিতে ন্যাকড়া, পুরনো কাপড়চোপড়। গুড়ে পাশ কাটিয়ে পুরনো চাদরটা ধরে। রঙবেরঙের চৌকো ছককাটা চাদরটার জমিনে। সস্তা সুতি কাচাকুচিতে রঙ উঠে কত যে পেঁজে গেছে। জিনিসটার জন্য হাটের তোলা দোকান থেকে কতক্ষণ ধরে যে দরকষাকষি করেছিল বাপ সদয়কুমার। চাদরটা আছে। নতুনের সেই জেল্লাদার রঙ গুড়ের স্মৃতিতে মাত্র। বিবর্ণ দ্রব্যটা কী করে যে থরে থরে সব গুড়ের মনের মধ্যে এনে দিচ্ছে! ভুঁড়ে তো শিশু। আরও ছোট!

গুড়ের পাশে ভুঁড়ে গিয়ে দাঁড়ায়। নিজের চাদরটা ধরে টানে। আলগা গায়ে শীত লাগে। সামনে চাদর তবু গায়ে দিতে পারছে না। এ তো তার কাছে ভীষণ বিড়ম্বনা! ফট করে টেনে নেয়। গায়ে দেওয়ার উদ্যোগ একটু সামলে বলে, মা—নিই ?

—গরম জামা পরবি নি ? বলে পাশের বোঁচকাটার গিঁট খোলে। পুরনো লালপেড়ে শাড়ি, ছেঁড়া ধুতির ভাঁজে ভাঁজে আরশোলার নাদ ভর্তি। কতজনের কাছে এগুলো সংসারে নিতান্ত বাতিলযোগ্য, বর্জনীয় পোশাক! শ্বশুরের ভিটে ছাড়ার সময়ই তো আর পাঁচটা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরের সঙ্গে সমান গুরুত্বে মাথায় বয়ে এনেছে। সেজন্যই ছেলে দুটোর গরম জামা খুঁজতে নতুন

বোঁচকাটা হাঁটকায়। জবারানী জামা দুটোর জন্য ভীষণ উৎকণ্ঠায়। ঝটপট একটা ছেঁড়া কাপড় তোলে। কুল···আমড়ার ডাল ঝাড়া দেওয়ার মতো কাপড়টা নাড়ায়। যদি কাপড়ের ভাঁজ থেকে ঝরে পড়ে··· ! জবারানী হতাশ হয়। ভাবে, গেল কোথায় ছেলে দুটোর গরমের জামা জোড়া··· !

জবারানী পুরনো ছেঁড়া মশারির তালটা তোলে। সুতো দড়িতে জড়িয়ে জিনিসটা নিজেই একটা পুঁটলি হয়ে গেছে। জবারানী চাপা নিঃশ্বাস ফেলে। জামা দুটোর জন্য মনটাও ভারী। মশারিটার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে দুঃস্থ সংসারে প্রথম সহবাসের কত ঘনিষ্ঠ উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস ! দুই দেহে মিলেমিশে কিছু খুঁজতে চাওয়ার আকুল উত্তাপ। এখনও ছেলে দুটোর নিবিড় অপেক্ষ-মানতায় ছটফটিয়ে জোরে শ্বাস ফেলে। হঠাৎ মনে সংশয়, দেশ ছেড়ে চলে আসার সময় ওগুলোও আনা হয়েছিল··· ! চারদিকে তো তখন জল-কাদা আর হা-অন্ন হা-অন্ন ! আজ যে গরমের জামা দুটো খুব দরকার··· !

উঠে দাঁড়ায় জবারানী। বাতিল মশারিটা যত্নে ঝাড়া দেয়। পট করে দু'তাল ন্যাকড়া-চোপড়া মশারি থেকে খসে পড়ে। চেনা রঙ চটে গেলেও জবারানীর চোখে আটকে আছে পোশাকটির ক্ষয়িত বর্ণ। একটা প্রাপ্তির আনন্দে উত্তেজিত জবারানী, ডাক দেয়, কই রে নে— ?

রোঁয়া-ওঠা তুলোর অতি সস্তা জামা, এক দু'বার কাচাকুচিতে প্রাথমিকতা হারিয়ে দীন। দু'বছর আগে কেনা। গায়ে পরতে অনেক ছোট। জামার হাতাটা কব্জি ছাড়িয়ে কোনুই অবধি। ছেলে দুটো পুরনো জামায় কী পরিমাণ যে উল্লাস বোধ করল !

সদয় মুখুজ্জের কাঁধে ছেঁড়া মাফলারটা। সোডা-সাবান কাচা গন্ধের সঙ্গে জল বর্ষার পুঁটলিবদ্ধ ভ্যাপসানি। নাকে লাগলেও শীতের মাফলারটা একবার জোরে ঝেড়ে ধুলো আর কটু গন্ধ দূর করতে চায়। ঝপাট্ করে একটা শব্দ হয়। পরক্ষণেই বলে সদয়কুমার, তোমার হল ? ঝাঁটপাট দিয়ে দোকান খুলতে হবে নে ?

—দাও না সামনের তল। গোটা ঘর জুড়ে কি বসে আছি ? জবারানী মুখ করে। কতদিন পর গেরস্তালি মেলে ধরেছে নিজের সামনে। দেশের ভিটে ছেড়ে আসার পর রোজই তো খদ্দেরের আশায় ভাত রান্না আর থালা-বাসন ধোওয়া। এখন বোঁচকা-বুঁচকি দুটোয় শ্বশুরভিটের গন্ধ। সেই উঠোন দাওয়া পুকুর-পাড়। তাল-খেজুরের ছায়াময় আবাস। পাশ বাড়ির ঘোষাল মামীর ফর্সা মুখ। খনখনে গলায় ডাক, ও বউ—জবা রে ?

পুঁটলির মধ্যে কবেকার ছেঁড়া সায়া···কত দিন ঘ্যান ঘ্যান করার পর যে কোন হাটবারে কিনে দিয়েছিল পূজারী স্বামী। এখন হোটেলওলা রাঁধুনি। হাঁটকাতেই পেয়ে যায় একখানা নীলচে রঙের বক্ষ-বন্ধনী জামা। অব্যবহারে রঙ চটে সস্তা পোশাকটি শত কুঞ্চিত হয়ে ক'খানা নীল দড়ি। ন্যাকড়াকানি। মাত্র ন'বছর বয়সে বউ হয়ে পর সংসারে প্রবেশ। ক্রমশ ভরাট হয়ে যুবতী শরীর পেতে মা কিনে দিয়েছিল। ঝাঁপ চড়কে গাজনতলায় দু-একবার গায়ে পরেছিল।

পোশাকটা হাতে নিয়ে ভাবে জবারানী, সে চড়ক গাজনতলা কোথায় পড়ে রইল। পড়ে আছে তো সেখেনে সেই বয়েস। সেই শরীর। শ্বশুরভিটের চারপাশ ঘিরে গ্রাম-গাঁয়ের যজমানবাড়ির দু'মুঠো আতপচাল বাতাসা ফল মূলের দ্বারাই তো শরীরের যেটুকু গড়ে ওঠার গড়ে উঠেছিল। শত টানাটানিতে তৈরি শরীরটুকুর জন্য ভেতর-জামাটার যা প্রয়োজন ছিল সেখানেই শেষ হয়ে গেছে! তবুও অন্তর্বাসটা ধরে খোয়ানো শরীরটা নিজের চোখে এঁকে এঁকে ফুটিয়ে তোলে। ভাবে, ভাত-জল পেলে এই টাউনে আবার কী সেরকমটা ফেরত পাব!

ভেতর থেকে ঝাঁটাটা নিয়ে সদয়কুমার সবে দোকানে সম্মুখ ভাগে পা বাড়িয়েছে, মকবুল মিঞা হাঁকে, কই গো ঠাকুরদা—আছো?

সদয়কুমার ফট করে ঝাঁটাটা পাশে সরিয়ে ফেলে দেয়। ব্যস্ত হয়ে ডাকে, হ্যাঁ। দাদা—এসো এসো।

একেবারে নতুন হোটেল। গোছগাছ করতে ক'মাস পার হল। এখনও গত বানের তোড় গা থেকে যায়নি। চুপচাপ থাকলে সেই বাঁধভাঙা নোনা জলের সোঁ-সোঁ গর্জন কানে বাজে। হোটেলটা একটু জমে গেলে একটা বড় কাঠের বেঞ্চ করানো যে কী দরকার। যেহেতু সে ধরনের আসবাব নেই সদয়কুমার মকবুলের হাত ধরে টেনে আনে ভেতরে।

বাইরের মানুষ ভেতরে। চমকে হাতের অন্তর্বাসটা তাড়াতাড়ি বোঁচকার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। বোঁচকার চার খুঁট ধরে গিঁট বেঁধে লুকোয় নিজেকে।

মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ের ভেতরটা দেখে মকবুল মিঞা বলে, এত পোঁটলাপুটলি বাঁধাবাঁধি কেন আবার? কোথাও যাবে নাকি?

তালপাতার আসন দুটো পেতে দিতে দিতে সদয় মুখুজ্জে বলে, কোথায় যাব? আর যাবার জায়গা আছে?

—থামো না। ধীরে ধীরে সব হবে--।

আশ্বাসের মতো শোনায় মকবুলের কণ্ঠে। লুঙির গেঁট থেকে বিড়ির ডিবে চীনে দেশলাই বের করে সামনে রাখে। পায়ের ওপর পা চেপে বসতেই শুকনো পাতার মড়মড় শব্দ। তখন মকবুল মিঞা পরামর্শ দেয়, মোটা সুতোর আসন বেরিয়েছে। নণ্টুবাবুর মুদিখানায় বেচে—ডজন দরে কিনে আনো, সস্তায় হবে। বাবু খদ্দেরদের মন বসবে—

ইসলামিয়া হোটেলের পুরনো মালিক। ব্যবসা চালিয়ে চুল-দাড়িতে খানিক পাক ধরেছে। তার ব্যবসায়ী উপদেশ মন দিয়ে শোনে। উৎসাহী হয়ে বলে, হ্যাঁ বড় ভাই কত করে দর?

—যাও না নন্টুবাবুর কাছে। আমার তো লাগে নে--কিনি মাপসই ছোট মাদুর। তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে খানা খায় আমীর-ফকির সব খদ্দের—

পোঁটলা-পুটলি বেঁধে একটা একটা তুলছিল জবারানী। মনে ভাবে, চট কেটে দিলে আমি পাড় বসিয়ে সেলাই করে দিতে তো পারি···। ফট্ করে বলতে গিয়ে থামে। ক্রমে ক্রমে চেনা হলেও একেবারে হড়বড় করে কথা বলতে বাধে জবারানীর। বাপ-শ্বশুরঘরের কুটুম্বও নয়। তাই থমকায়। পরে মনে হয়,

মোল্লা-মৌলবী মানুষের সঙ্গে বেশি মুখ বাড়িয়ে কথা বলা কি ভাল হবে ?

বিকেলের ঘুম মুছে গেছে মকবুল মিঞার চোখমুখ থেকে। কথাটা শুরুর আগে আর একবার জোরে দম মারে। গাল থেকে ধোঁয়া উগরে মকবুল বলে, ও ঠাকুরদা, যাবে ?

চমকে ওঠে সদয় মুখুজ্জে। ভাবে, তেমন তো কোনো কথা হয়ইনি এ-ক' মাসে ! তবু জানতে চায়, কোথায় গো বড় ভাই ?

মকবুল সাহেব নিজের হোটেলের উদ্দেশে আঙুল দেখিয়ে বলে, আমাদের কোর্ট গোড়ার দিকে—

চোখ বড় বড় করে তাকায় সদয়কুমার। মকবুল তার বিস্ময় নিরসন করতে বলে, ওদিকেই তো অফিসকাছারি। বাজার—খদ্দেরপাতির সুবিধে—। বোট স্টীমারঘাটাটা কাছে—

একটা বাজার তৈরি হওয়ার উপাদান, পরিবহনের সুযোগ সব বোঝায়। মকবুল মিঞা দেখে, সদয়কুমারের দু'চোখের মণি থেকে বিস্ময় কেটে যাচ্ছে ! ক্রমে সদয়কুমার মননের মধ্যে ঢোকে। সামান্য ভেবে নিয়ে বলে, কিন্তু—

—সন্ধে হলে তো থানা পেরোলে এদিকে একদম ঝুপসি।

—তা বটে। সহমত জানায় সদয় মুখুজ্জে।

—কিন্তু ঘরটর পাব ? কথাটায় যেন ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা ফুটে ওঠে।

পোঁটলাপুঁটলির কাছে দাঁড়িয়েছিল জবারানী। জিনিসপত্তর রাখার এ-আড়ালটুকুর এককোণে তো শালগ্রাম শিলা…নারায়ণ। জবারানীর কানে কথাগুলো ঢুকতেই ছটফট করে। স্বামীর বিবেচনা ক্ষমতায় আস্থা রাখতে না পেরে ভাবে, কী বোকা লোক ! দাদার দেখতা যজমানবাড়ি ভিক্ষে ছেড়ে এই হোটেলে—একবার তার সঙ্গে পরামর্শ করুক না…। জবারানী যেন নতুন কোনো ঝড়-বন্যার মুখোমুখি হচ্ছে। তাই বিপর্যয়ের মুখে চুপচাপ থাকতে না পেরে হঠাৎ পোঁটলাপুঁটলি ফেলে ঠাকুরঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে আঁধার নামছে। হোটেলঘরের মধ্যে আবছা। শীতের সন্ধে। মশার পিনপিন শব্দ। বিড়ির আগুন শেষ। দু'হাতের তালুতে ফটাস্ ফটাস্ ক'টা মশা মারে মকবুল মিঞা। তারপর বলে, সে খোঁজখবর নিচ্ছি—।

দু'হাতে তাক করে আর একটা মশা মারে। বেশ বড়সড় চেহারা। হাত মেলে মকবুল মিঞা বলে, ও ঠাকুরদা—এ মশা, না ভোমরা গো ? বাইরে চোখ যেতে ধড়ফড় করে উঠে পড়ে। বলে, এই রে—ছাম্মাদটা আলো-ফালো ঠিক করল কিনা, কে জানে—

—তাই তো খেয়াল হয় নে, বলে সদয়কুমার উৎকণ্ঠায় পাক খায়।

—পরে কথা কইব, বলতে বলতে মকবুল লুঙির গেঁটে হাত ছোঁয়। আবার হাত সরিয়ে নেয়।

তাড়াতাড়ি পাশ থেকে ঝাঁটাটা নিয়ে সদয়কুমার হোটেলের সম্মুখে ঝাঁট দেয়। ধুলো ওড়ে। গুড়ে ভুঁড়ে তুলোর রোঁয়া ওঠা গরম জামা গায়ে তেমন শীত

বোধ করে না পিঠে-বুকে। শুধু ঠাণ্ডাটা কনুই থেকে কব্জি অবধি একটু নখ ফুটোয়। তারা এসে বলল, বাবা—আলো জ্বালবে নে—।

—হুঁ রে বাপ। বড্ড বিলম্ব হয়ে গেল—।

জবারানী একটু কাছে আসে। চটের ওপর পাড় বসিয়ে আসন তৈরির প্রসঙ্গ তুলবে, না দাদার পরামর্শ ছাড়া হোটেলপাতি নিয়ে অন্য জায়গায় যাবে, এটাই মুখপাত করবে? ঠিক করতে পারে না।

মাকে কাছে পেয়ে গুড়ে ভুঁড়ে বলে, চল না—আমরা আলোটা জ্বালি।

—হুঁ। ও আলো ধরাতে গে হাতমুখ পোড়াবি?

—উঁহু, বউয়ের উদ্দেশে বলে, ততক্ষণ আলোটা পেড়ে গা-টা মোছো—

দারুণ উৎসাহে দু'ভাই মায়ের পিছু নেয়। পেট্রোম্যাক্সটা বের করে। কেরোসিন তেলের কনটেনারটার গায়ে ন্যাকড়া ঘষে মোছে। ছেলে দুটো অবাক হয়ে ভাবে, সরু লোহাটা কী করে যে আলো দেয়! পিন করলে অমন সোঁ-সোঁ আওয়াজ…তারপর ফোকাস বাড়ে কী করে…!

সদয়কুমার এসে স্পিরিট ঢালে—ভেপারটার গা মোছে।

যখন হ্যাজাকটা জ্বলল, গুড়ে ভুঁড়ে তাকিয়ে থাকে। যেহেতু ক্রমে ক্রমে হ্যাজাকটার সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, আর অবাক হয় না। বরং খুঁটিয়ে দেখে জ্বলন্ত অবস্থায় আলোটার কর্মক্রিয়া।

দোকানের সম্মুখভাগের এককোণে দু'ভাই। খেঁজুর পাতায় বোনা চ্যাটাই পেতে বসে। মা ধুনাচি নেড়ে কালীমন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম সারে। হাতে ধুনাচির ধোঁয়া। গুগ্‌গুল পুড়ে চটপটি শব্দ। তারপর আবার ধোঁয়া। মায়ের মুখ তেমন স্পষ্ট নয়। মা জবারানী ধোঁয়ার মধ্যে মুখ ঝুঁকিয়ে বলে, বাইরে ঠাণ্ডা। এখেনে বস বাবা—খদ্দের এলে ডাকবি।

দশ বাই পঁচিশ হাত ঘরটার মুখ একদম খোলা। শুধু দু'খানা ঝাঁপ খুঁটি দিয়ে উঁচু করে তোলা। নতুন ঠাণ্ডা কনকনিয়ে ঢোকে। দেওয়ালের গা ধরে তালপাতার আসন। খদ্দেরের অপেক্ষায় পাতা। হ্যাজাকের আলোয় আসন-গুলো চকচক করে।

সদয় মুখবুজে ওবেলার বাড়তি ডাল-তরকারি একবার ফোটায়। নতুন করে আধ কড়া ঝোল তৈরির প্রস্তুতি নেয়। জবারানীকে বলে, একটু আদা বেটে দাও না গো—

বড় কড়ায় খুন্তি চালিয়ে গরম জলেই সেটাকে ধুয়ে নেয়। লোহার পাত্রে লোহার খুন্তি। নাড়াচাড়ায় ঠন্‌ঠন্‌ ধাতব শব্দ। গুড়ে বলল, ওই কে রাঁধতেছে বল দিখি?

এত দ্রুত পুরুষালি ক্ষিপ্রতায় খুন্তির আওয়াজ শুনে ভুঁড়ে বলে, বাবা—।

শীতের সন্ধ্যা। কোর্ট-কাছারিভিত্তিক ছোট্ট শহর। ভিড় ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যায়। সামনে রোগা পিচ খাবলা রাস্তাটাও তখন নিজের মতো শুয়ে থাকে। থানাঘরের দাওয়ায় পেটাই ঘড়িতে কাঠের হাতুড়ি মারে বন্দুক কাঁধে সেন্ট্রি!

প্রথমে একটা ঢং শব্দ হয়। পরে আর একটা—ঢং···। শীত-মাখা সন্ধ্যাটা কেঁপে ওঠে। পরপর সাতখানা ঢং···শব্দ। শীতের আস্তরণ কাঁপতে কাঁপতে চলে যায় বাঁয়ে কোর্টচত্বর ফেলে বোটঘাটা, হোরমিলার কোম্পানির স্টিমারঘাটার দিকে। শীতের রাত গাঙের জল ছুঁয়ে আরও তরঙ্গবাহী।

মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ে খদ্দেরহীন ফাঁকা সন্ধ্যায় ঘর জাগিয়ে হ্যাজাকটা জ্বলে। আলোর দিশা পেয়ে খদ্দের আসবে, সেই প্রতীক্ষা। ছেলে দুটো ঠাণ্ডায় বসে একটা নতুন খেলা খোঁজে। সে খেলায় মাঠ নেই। বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চা নেই। এমনকি অন্নসংস্থানের এই বাণিজ্যস্থানটুকু ত্যাগের স্পৃহা নেই। তাই দোকান ঘরটার অবস্থানে গুড়ে ভুঁড়ে খেলাটায় পরস্পর সহযোগিতায় মেতে ওঠে। ছোট ভাই ভুঁড়ে খুন্তির ঠং ঠন্ আওয়াজটাকে নির্দেশ করে বলে, কোন খুন্তির? ছোটটা না, বড়টা? গুড়ে কান খাড়া করে খুন্তির আওয়াজ শোনে, গায়ে রঙচটা চাদর জড়িয়ে জবুথবু বসে। কয়েক মুহূর্ত পরে বলে, ছোটটা—। দিদিমার দেওয়া খুন্তিটা।

—ওই ছেলেগুলো।

ডাক শুনে পেছনে তাকায়। দেখে, সেই রোগা ফর্সা নাক-মুখ। পানের কষে সরু সরু দাঁত কালচে পিচ-মাখা খোয়া। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি ধুতি। পায়ে চামড়ার নিউকাট জুতো। জামার বোতামঘরের নিচে পানের পিক ছিটিয়ে দু-তিনটে লালচে দাগ। পাতলা দু' ঠোঁট লাল। কামানো গালে বয়সের ক'খানা ভাঁজ। গা টলিয়ে সোজা দাঁড়ায়। মুখে কাঁচা মদের গন্ধ।

গুড়ে ভুঁড়ে ফিরে দাঁড়ায়।—তোদের বাপ কোথায় রে?

ছেলে দুটো বাড়িওলাকে সমঝে চলতে হয় শিখে ফেলেছে। তাই শান্ত গলায় বলে, রান্নাঘরে—

—ডাক।

গুড়ে যায়। পেছন পেছন ভুঁড়ে। লোকটা নেশার ঘোরে দোল খায় একবার সামনে। পরে আবার পেছনে। যেন প্রবল ঝড়ে রোগা নারকেল গাছটা একবার উত্তরে হেলে আবার দক্ষিণে নিজের অবস্থানে ফিরে আসছে।

—বাবা, গুড়ের ডাকে পেছনে তাকায় সদয়কুমার। কড়ার গরম তেলে পেঁয়াজ আদার বাটনা। চ্যাঁক-ছোঁক শব্দ করে ঝাঁঝ। গোটা রান্নাঘর ঝাল তেলের গন্ধে ভরপুর। নাক সিরসিরিয়ে হাঁচি লাগে।

—কিরে? খদ্দের—?

—না গো, জমিদারবাবু—

গুড়ের কথা ঢাকা দিতে ভুঁড়ে বলে, বাড়িওলাবাবু—

সদয়কুমার তেলমশলায় জল দিয়ে বলে, চল, যাচ্ছি।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ভুঁড়ে দেখে মানুষটাকে। এটুকু শৈশবে বুঝে গেছে, এ-দোকানঘরটায় মা-বাবা-ভাই মিলিয়ে থাকলেও, এটা তাদের নয়। পাশাপাশি যারা দোকান করে আছে···থাকলেও কি তাদের? তার ক্ষীণ স্মৃতিতে মনে পড়ে, বানের সময় সেই টিনের ছাউনি···উঠোন···পুকুর নিয়ে যে ঘরে থাকত—

সেটা তাহলে কার ? যারা ঘরে থাকে—ঘর তাদের নয় !

কাপড়ের ওপর কোমর ঘিরে গামছাটা পাট করে বাঁধা। হাতে তেলমশলার জল গামছায় মুছতে মুছতে সদয়কুমার দোকানের সামনে। বাড়িওয়ালা ধীরেন রায় সোজা দাঁড়িয়ে। পাতলা ঠোঁট পানের রসে টুকটুকে। রোগা শরীরে একটু কড়া কণ্ঠ, সদয়—

—আজ্ঞে বাবু, এই বিনয়টুকু রায়বাবুর কাছে অতি মহার্ঘ।

কাছাকাছি এসে বাড়িওয়ালা ধীরেন রায় বলে, আমার খাবার দিবিান ?

গুড়ে ভুঁড়ে খানিক অবাক ! জমিদারবাবু বাবার কাছ থেকে 'খাবার' চাইছে ! বাচ্চা বুকে সেই মা···তার কোলের মেয়ে আট বছরের ছেলেটা আর ন'দশ বছরের ছেঁড়া জামায় গা-পিঠ আলগা মেয়েটারা তো বাবার কাছে, মায়ের কাছে এসে খেতে চায়। ফ্যান চায়···এক-আধ মুঠো ভাত চায়। এ-বাবুটা··· বাড়িওলা···

জমিদারবাবু খাবার চায় ! সেটা পেটের জন্য···খিদের জন্য ?

বাড়িওলাবাবু বলে, সকালে তো দিসনি ? দে—

সদয়কুমার ভেতরে যায়। দুপুরে পান দোকান থেকে আনা ছোট্ট আট আনির মতো চ্যাপটা কৌটোটা ডান হাতের আঙুল ধরে বাঁহাত কনুইয়ে ছুঁয়ে দেব-দ্বিজকে কোনো কিছু নিবেদনের ভঙ্গিতে এগিয়ে দেয়, নিন গো বাবু—।

রায়বাবু একেবারে বিগলিত। ভূসম্পত্তি, অর্থ, অলঙ্কার সম্পদ—সব থাকলেও কি সুখ এনে দেয় ? চেনা মানুষগুলো, আশপাশের সব মানুষগুলো নির্বিবাদে যদি অবনত না হয়। এই নতিস্বীকারের জন্যই তো অর্থ বল··· লোকবল···স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ গড়ার ঘোড়দৌড়।

কৌটোটা নিয়ে বুড়ো আঙুলের চাপে খোলে। ভেতরটায় কালো মলমের মতো। কানা উপচে গিয়েও পড়ে না। ভুরভুর করে মিষ্টি গন্ধের মনোরম সুবাস। রায়বাবু কিমামের কৌটোটা পেয়ে, কষ-পড়া দাঁতে খিকখিক হাসে। সন্ধে মুখে মদের নেশায় শিশু হয়ে যায়। বলে, আর দু'দিন দিবি। যা তোর এ মাসকাবারি ভাড়া দিতে হবে নে—। শোধ।

পনের

নামতেই বাঁয়ে কালীমন্দির। চারদিকে ইটের দেওয়াল ঘিরে এক ঢালু টিনের ছাউনি। ঘেঁষ-চুনের গাঁথনিতে ইটের ধাপ ক্রমশ নেমেছে নিচে। কয়েক ধাপ উজোতেই একেবারে মন্দিরের গর্ভগৃহ। চার হাত, বড় জিভ সাদা পাথরের শিবের ওপর কালো কুচকুচে পাথরের মূর্তি। মাথায় ঝলমলে মুকুট। পাশের লোক উঠবার মুখে একবার কপালে হাত ঠেকায়। মকবুলের বাঁ হাতে ধামা। ডান হাতটা হঠাৎ কপালে উঠেই থমকে যায়। বিব্রত বোধে কুঁচকে থাকে নিজের কাছে। পাশাপাশি যাতায়াতে রীতির চল'য়ে ভেসে যাচ্ছিল। চণ্ডমণ্ডিয়ে তাকায় চারদিকে, কেউ দেখে নে তো ? ঠাট্টায় জেরবার করবে যে সামনে পাশের দোকানে

মণ্ডল, হালদাররা।

করোগেট টিনের ছাঁচতলায় কাঠের বড় ফ্রেমে চৌবন্দী। তার বিটের মধ্যে সাইজের তক্তা পরপর খোলা। তাই দোকানঘরটার ভেতর অবধি দৃশ্যমান। বস্তার পর বস্তা টাল দিয়ে ডাল, লঙ্কা, চিনি, আটা, সুজি। বাঁশের চ্যাঁচাড়ির খাঁচায় তেজপাতা ঠেসে ঠেসে ভরানো। শালপাতা কাঠি গেঁথে গোলাকার। গাছেরই ছালবাকল দিয়ে চার বেড়ে দড়ির মতো বাঁধা। লেচি লেচি নারকেল দড়ি ঝোলে একপাশে। তার গায়ে পাট পাকিয়ে সরু-মোটা স্তর ভেদে গরু-ছাগলের দড়ি। দরজার ফ্রেমে পেরেক গেঁথে টিনের মগ, কেরোসিনের কাঁপা সরু তারে গলে মালা হয়ে ঝোলে। হ্যারিকেনের কাচ দড়িতে। টিনের লম্ফোর আংটা তারের গায়ে গেঁথে ঝকমকিয়ে যেন ফুলের গোড়ে। মাঝারি সাইজের মাটির গামলায় ডাল, শুকনো লঙ্কা, ধনে, মৌরী, সরষে, ছোলা পরপর।

কাঠের খোপে রঙচঙে গণেশ। ধুনাচির ধোঁয়া সরু রেখায় তখনও। গামলা বোঝাই মালমশলার পর খানিকটা ফাঁক। একেবারে ছাউনির বাটাম কাঠ থেকে তার ঝুলিয়ে লোহার শিকে দাঁড়িপাল্লার আংটা ঝুলছে। এপাশে ছোট্ট তক্তাপোশে ক্যাশবাক্স জুড়ে নণ্টুবাবু। মস্ত ভুঁড়ি ঢলিয়ে লম্বা-চওড়া পুরুষ। বড়সড় মুখের গণ্ডে থলথলে মাংস। বাঁহাতে টিনের কৌটো থেকে সদ্য নেওয়া সিগারেটটা জ্বলছে। কড়া তামাকের গন্ধে ধুনোর গন্ধ চাপা পড়ে যায়।

খদ্দেরের ভিড়। সামনের লোকটার ফর্দ লেখে নণ্টুবাবু।—হুঁ, তিন পো ভেলিগুড়। তারপর ?

খদ্দেরটা বলে, দেড় পো খেসারি—

লালচে বালির কাগজে সরু ফর্দ। লেখা হলে বলে, হুঁ—

—এক ছটাক শুকনো লঙ্কা।

—তারপর ?

—এক সের লবণ—

—হুঁ।

—আড়াই ছটাক ধনে জিরে।

নণ্টুবাবু বিড়বিড় করে, ধনে জিরে, হুঁ—

—একপয়সার তেজপাতা।

—আর সরষের তেল-ফেল ? জানতে চায় নণ্টুবাবু। সেই ফাঁকে সিগারেটটা দমভর টানে। মোটা চেহারায় গাল ফুলে ওঠে, চোখ বড় বড় হয়।

ধামাটা পাশে রেখে মকবুল বলে, বড়বাবু এবার আমারটা—

নণ্টুবাবু বলে, কেন তোর লোক নেই ? সেটাকে পাঠা না—

—সে বাসন ডেকচি ধুচ্ছে।

—তবে ? এগুলো দিয়ে দিলে চাপাবি কিসে ? মাথায় ?

নণ্টুবাবুর কথায় দোকানসুদ্ধু সবাই হেসে ফেলে।

মাল মাপে নিশিকান্ত। কম পড়লে ধরে বয়ে এনে দেয় সন্ন্যাসী। নণ্টু হাতের ফর্দ সেরে বলে, মিঞা বল ভাই—

বোটটা এসে ঠেকে ঘাটে। পাড়ের গা ধরে বালি সিমেণ্ট-খোয়ার ঢালাই ফেলে চার কোনা ব্লক। পরপর সেঁটে একেবারে নিশ্ছিদ্র। গাঙের নোনা জল ছলাৎ ছলাৎ ছাট মারে পাড়ের জমাটির গায়ে। পাশে স্টিমারঘাটার বাঁধানো জেটি। লোক লাইন ধরে দাঁড়িয়ে। তালগাছটার গায়ে টিকিট গুমটি। টিনের ঘের দিয়ে টিনের ছাউনি। শুধু হাত গলানোর ফুটো। একজনই পয়সা দেয়। টিকিটও নেয়। পাশে সরে দাঁড়ায়।

জলে নেমে দাঁড়ি-ছোকরাটা কাছি নিয়ে বাঁধে জেটির তলায় রেলের লাইন কাটা লোহার খোঁটায়। তারপর কাছি বাঁধা নোঙরটা কাঁধে বয়ে নিয়ে যায় ওপরের দিকে। একটা ব্লকের জোড়মুখে নোঙরের ফলাটা গুঁজে দিতেই বোট আবার পাড়ের সংলগ্ন। গলুই ডগা থেকে পাতা কাঠ বেয়ে নামে অন্য প্যাসেঞ্জাররা। দোচালার বাইরে এসে দাঁড়ায় মানুষটা।

কোমরে সাদা কাপড়ের ফেত্তা দেওয়া লুঙি। সাদা ফতুয়ার সামনে দুটো বড় বড় পকেট। ডান দিকের বুকপকেটের নিচে আর একটা গোপন পকেট। বোতামঘরে রুপোর চেন বেঁধে গোলাকার পকেটঘড়ি। বুকের কাছে অনবরত টিকটিক কাঁপন। জামার নিচে দু'খানা ঝোলা পকেটে কত রকম যে কাগজ! কালির কলম। গোটা সুপুরি ক'খানা। গাঙের হাওয়ায় মাথার চুল ওড়ে। সামনের মানুষগুলো গায়ে এণ্ডিনের চাদর নয়ত বিছানার পাতনি। দুঃস্থ পরিবারে একই দ্রব্যে বিছানা ঢাকা, প্রয়োজনে শীতের পোশাক!

মানুষটা হাঁক দেয়, ও ধনা—ধনারাম—

—আজ্ঞে বাবু, চাদর লাঠি, পড়চার কাগজ, নকল-কপির ব্যাগটা গুছোতে গুছোতে সাড়া দেয়।

—নিয়ে আয় সব।

ধনারাম কাঁধ ছাড়িয়ে মাথা সমান লাঠি আর কাজ করা দামী শালটা আগে নিয়ে হাজির বাবুর সামনে, ধরুন—

ডান হাতে লাঠি বাঁ হাতে চাদরটা কাঁধে ফেলে নির্দেশ দেয়, মাঝিকে বল ভেতর থেকে সেটা বার করতে।

জায়গা-জমির কাগজপত্তরের ব্যাগটা বাঁ হাত গলিয়ে কাঁধে ঝোলায় ধনারাম। তারপর বোটের পেটের মধ্যে নামে। মাঝি বস্তাটা ধনার মাথায় তুলে বলে, পারবি তো ভাই—

—হুঁ-হুঁ। তুমি শুধু বয়ামটা পার করে ঘাটে ধরিয়ে দাও—

বাঁদিকের কাঁধে মোটা কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ ঢলঢল করে। বাবুর কত বিঘে আবাদি মাঠবাদা যে ওর মধ্যে! মাথার বস্তায় তিন-চার সের চেহারায় সাতখানা পোনা, ভেটকি। অতিসাবধানে কাঠের ওপর পা ফেলে ফেলে নামে ধনারাম। পেছনে মাঝি। মাঝির হাতে বয়ামে কলাপাতায় মুখ এঁটে বাঁধা সেরখানেক খাঁটি ঘি। বয়ামের গালাসিতে ঝোলানো দড়ি। দড়ির বাঁধনে বয়ামটা দোল খায়।

বাবু মানুষটা মুখ করে, ওরে ও মাঝি—পাতা গলে গড়াবে যে। ক্ষতি

হলে তুই দিবি ?

বাবুর ঝাঁঝানি শুনে বয়ামটা বুকে জাপটে ধরে মাঝি। ধনারাম পাড়ের বুকে দাঁড়িয়ে বাবুর নুনের মূল্য দিতে দাঁত খিঁচোয়, দুস্ বুড়া। আমি এত বোঝা নিয়ে কখন লাবলুম, উনি হামাগুড়ি দিচ্ছে—

বাপের বয়সী বুড়ো মাঝি বাবুর তুই-তোকারিতে মনখারাপ করে। বয়ামটা ধনার হাতে দিয়ে চাপা গলায় বলে, তুইও কি বাবুর মতো সাত-আটশো বিঘে জমিজমার মালিক হয়ে গেছিস…

মাঝির কথায় ধনারাম লজ্জা পায়। আস্তে করে বলে, মাইরি—দাদা চুপ যাও।

গাঙের ঢাল থেকে ক্রমে ক্রমে ওপরে ওঠে। বাবুমানুষটার পায়ে ফিতে বাঁধা সাদা কেডস। ডান হাতে লাঠি। লাঠির ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ খোয়া সিমেন্টের বুকে। কালো চেহারায় লম্বা স্বাস্থ্যবান মানুষটা যেন পাথর কেটে পাহাড়ের উচ্চতায় উঠছে। পেছনে মালপত্তর নিয়ে ধনারাম অভিযাত্রীর সঙ্গী।

স্টিমারঘাটার টিকিটমাস্টার লাঠি হাতে মানুষটাকে দেখে। যাত্রীর টিকিটের ভাড়াটা নিয়ে টিকিট দিতে ভুলে যায়। যাত্রীটা পেছনের লোকের মুখ শোনে, কই, হল আপনার ?

লাইনের ক'জন লোক মানুষটাকে দেখে অবাক! বলে, বাপরে! যেন মহিষাসুর যাচ্ছে—

আর একজন দ্বিধায় বলে, বুড়ো নয় তো! লাঠি হাতে কেন ?

টিকিটঘরের ভেতর থেকে অতুলমাস্টার বেরিয়ে আসে। চেঁচায়, মামাবাবু।

চেনা গলায় বেশ সম্ভ্রমের ডাক। লাঠি থাকলেও লাঠি-নির্ভর শরীর নয়। এক ঝটকায় ফিরে তাকায়, ও তুমি ? ভাল আছো— ?

—আজ্ঞে আছি।

—বড় ভাগ্নার বাড়ি যাব—, বলতে বলতে একেবারে ঢালের উচ্চভূমিতে। একটু শ্বাস নিয়ে মামাবাবু দাঁড়ায়। সামনে রোগা রাস্তাটা ডিঙোলেই বিশাল প্রাসাদ। বড় বড় থামের ওপর পেটাই ছাদ করে খিলান বারান্দা। ব্রিটিশ এস. ডি. ও.-র বাংলো পর্তুগিজের কোঠাদালানে। বাগানময় ঝাউ-দেওদার। বড় বড় ক'খানা তালগাছ। চওড়া পাতায় হাওয়া লেগে ঝিরঝির দাগ কাটে। একঝাঁক টিয়া লাল ঠোঁটে ঝাউশাখা বদল করে।

কালো ট্যাক্সি ক'টা দাঁড়িয়ে। ধুলোমাটির কাঁচা রাস্তাটায় তেল-কালি-জল পড়ে কালচে। হুট খুলে গাড়ির গা মুছছে ক্লিনার ছোকরা।

মাথায় অত বোঝার ভার। বাবুর মর্জিমাফিক দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট। তাই নিজ সিদ্ধান্তে এগিয়ে যায় ধনারাম। বাবুমানুষ ধমকায়, এই শালা! তুই কী জানিস…ভাগ্নের দোকানে না বাড়ি—কোথায় যাব ?

জনমজুরখাটা মাথায় এ-বিভাজনটা তো একদম আসেনি! তাই সংকোচে বলে, কোথায় নে যাব এগুলো ?

—তবে ? শালা গাধা চাকর। গাধা চুপ থাকবি—। যখন যা বলব তখন

তাই করবি।

ধনারাম মাথায় মাছের বস্তা, কাঁধে কাগজপত্তরের ব্যাগ ডান হাতে ঘিয়ের বয়াম নিয়ে এক ঠে দাঁড়িয়ে। এত ভার নিয়ে ভারবাহী পশুর মতো। দৃশ্যটায় এই ক্ষীণ মফস্বলীয় রাজপথে বাবুর খানিক সুখ। একটু পরেই তো নিজে জজ হাকিমদের সামনে জবুথবু মর্যাদাহীন প্রাণীর সামিল। তখন কোথায় যে চলে যায় অত মাঠের পর মাঠ, ধানজমি··· ! কত চাষা-মজুর এককথায় উঠবোস করে! কী থাকলে···কোন কৌশলে যে জজ হাকিম পুলিসকেও অমন সমীহ সম্ভ্রম আদায় করিয়ে নেওয়া যেত! বড় জোত-জমির মালিক মানুষটা খোদ মহকুমা শহরে এসে প্রত্যক্ষ প্রশাসনের মুখোমুখি। ফলত তার চিন্তাটা গাঙ, চাষের মাঠঘাট চাষী-মজুরদের নিংড়াবার অবস্থিতিকে বাঁচিয়ে রেখে কেমন করে যে ঔপনিবেশিক সুযোগ-সুবিধের মধ্যে ঢোকা যায়। বর্ষার বৃষ্টিতে মাঠ-আবাদ ভিজে গেলে হাল-লাঙলের পর বীজ ধান ছড়িয়ে দিলে যে স্বাভাবিক অঙ্কুরোদ্গম এবং ক'টা সপ্তাহ পরে বীজচারা পদ্ধতিমাফিক রুয়ে দিলে উৎপাদন —। তা তো খুব সরল মানসাঙ্ক। কিন্তু এইদেশ, শাসন···বা ব্যবস্থার কোথায় সংযোগ তৈরি করতে পারলে ধানচালের বাণিজ্য···চোট খাবে না। চাষী-মজুর, মণ্ডলপাড়ার মোল্লাদেরও দাবিয়ে রাখা যাবে।

বীভৎস মোটা খিরিস গাছটা ডালপালা মেলেছে বিস্তর। শত হাতে আকাশ আটকে ছায়া। লবণ আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো, বন্যার ঝড়-ঝঞ্ঝা, যুদ্ধের উড়োজাহাজ কাটিয়ে প্রশাসনের সামনে বাক্যহীন প্রাণ। দু-চারটা পাতা পড়ে আছে পথে। বাবু মানুষটা বলে, ধনা—চল।

ইটের ধাপ কেটে কেটে নামে বাবুমানুষটা। চওড়া পায়ে কেডস্য়ের শব্দ থপ্‌থপ্‌। নিত্য সরষের তেলে পরিচর্যা পেয়ে মজবুত লাঠিটাও ইট বাঁধানো ধাপে শব্দ তোলে ঠং ঠং···। পাশেই কালীমন্দিরের পাকা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে সে শব্দ কাঁপতে কাঁপতে আবার বাবু মানুষটার কানে। মন্দির লাগোয়া অশ্বত্থ-গাছটার পাতা তিরতির নাচে। সিঁড়ির নিচের ধাপ ছুঁয়ে গলিরাস্তাটা সোজা চলে গেছে পাঁচ বিঘের পুকুর বরাবর।

যেহেতু এই সিঁড়ি, এই রাস্তা জনমজুর খাটা মাথায় ধনারাম সিদ্ধান্ত নেয়, বাবু ভাগ্নের দোকানেই যাবে। তাই একটু জোরেই হাঁটে যতটা তাড়াতাড়ি বস্তার ভার, একটানা ঘিয়ের বয়াম ঝুলিয়ে কব্জির যন্ত্রণা লাঘব হয়। বড় বড় পায়ে এগোয় ধনা। নন্টুবাবুর মুদি দোকানের সামনে দাঁড়ায়। চেঁচায়, ও নিশিদা—একটু ধর রে দাদা। মালটা লাবাই—

ধামায় তেল ডাল তেজপাতা ভেলিগুড় নিয়ে পাশ কাটায় মকবুল। একে-বারে মুখোমুখি মানুষটার। মকবুল চমকে তাকায়! বলে, বাবু—ভাল আছেন? বাবুমানুষটা একপলক দেখে বলে, ভাল। তবে তুমি কেমন চালাচ্ছো মকবুল? বাঁ কাঁধে ধামাটা ঠেকনো রেখে বাঁ হাতে শক্ত করে ধরা। মকবুল বিনীত ভঙ্গিতে বলে, চালিয়ে দিচ্ছি বাবু—। একটু থেমে শুরু করে মকবুল,

ভাগ্নাবাবুর কাছে ? যান—বাবু ফর্দ, লিখতেছে—

বাবুমানুষটা মকবুলের দ্রুত পাশ কাটিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে বলে, শালা—

নন্টুবাবু ফর্দ লেখা বন্ধ করে দেয়। জোরে হাঁকে নণ্টুবাবু, এই নিশি—হারুমামাকে বড় টুলটা দে।

দোকানের খদ্দেররা তাকিয়ে থাকে বাবুমানুষটা অর্থাৎ হারুমামার দিকে।

নন্টুবাবু বলে, মামা—

—কি বলিস ?

—ওই বস্তা বয়াম টয়াম নিয়ে বাড়ি যেতে পারতে—

—দুস। দিদি খাইয়ে টাইয়ে ছাড়তে দেরি করে দেবে। আমাকে এখন উকিলের কাছে যেতে হবে—

নন্টু জানতে চায়, খাওয়া দাওয়া করবে তো ?

—এ্যাঁ ? খাওয়া—মাংস খাওয়াবি ? নিজেই যেন প্রস্তাবের সপক্ষে রায় জানতে চায়।

—খাওয়াবো।

—তবে তৈরি কর। কোর্ট সেরে দুপুরবেলা তোদের ঘরে যাবে—। পিস-গুলো বেশি ছোট করিসনি। হ্যাঁরে—

—বলো, নন্টুর মুখ প্রশ্নাকুল।

—আট দশ সেরের কচি খাসি মিলবে নে ? বড় মুখমণ্ডলীতে আনুপাতিক ভাবে মুখগহ্বর। টাকরা চিক্‌রিয়ে জিভে লালা।

—পাঠাচ্ছি বাজারে নিশিকে। দেখবে খোন তোমার মনের মতো যদি পাওয়া যায়।

মাছের বস্তা, ঘি পড়ে থাকে। ভার হালকা হয়ে ধনারাম বেশ প্রফুল্ল। কাঁধে শুধু দলিল পড়চার ব্যাগ। ধনরাম হারুবাবুর পাশে পাশে হাঁটে। কখনও দু-পা এগিয়ে যায়। একজন বছর মাইনে কাজের লোক ফাইফরমায়েস না খাটলে ঠিক আভিজাত্য থাকে কই ? তার মধ্যেও তো ব্যবস্থা থাকে নিরাপত্তার।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই মহকুমার রোগা রাস্তা। ওপাশে লাইন ধরে নিচু চালায় টিনের ঘর : বাইশখানা। এক ছাউনিতে একটানা। বায়রন সোডা কাঠের খোপে সাজানো। কাগজ পেনসিল, দোয়াত কালি হরেক রকম দ্রব্য। অতুল মাস্টারের মনোহারির পাশে, গামছা কাপড় সাজিয়ে পোশাকালয়। তার-পরেই কাঠের উপর সাজানো লুচি বোঁদে। টাটকা রসগোল্লা পানতুয়া। সামনে উনুনে ভাজা হচ্ছে লুচি। ঘিয়ের গন্ধ রোগা রাস্তা ডিঙিয়ে হারু চাউলের নাকে।

বেঁটে খাঁটো নাদুস নুদুস ভুঁড়ি। পানতুয়ার মতো পোড়া পোড়া রং ময়রা পরি হাজরার। হারুবাবুকে দেখতে পেয়ে আকুল কণ্ঠে ডাকে, বাবু-বাবু গরম গরম নুচি সকাল বেলা।

উকিল হয়তো তার সেরেস্তা ঘরে এখনও বসেনি। এই দোলাচলে রাস্তা

ডিঙোয় হারুবাবু। আর এক কড়া লুচি তখন ঘিয়ে ভাজা হচ্ছে। পাশে চুবড়িটায় ভাজা লুচির ঘি ঝরছে নিচে। সাদা ময়দার ফুলকো লুচি। সকালের পদ্ম পাপড়ির মতো মেলে আছে।

হারুবাবু দোকানে এসে বলল, হাজরা ডাকলি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এক্ষুণি দিতে পারবি?

—হ্যাঁ বাবু। বসুন না—

একখানা সিট বেঞ্চি। দু-পারে দু-পা ঝুলিয়ে বসে হারুবাবু। শালপাতা বেঞ্চির কাঠে। লাঠিটা পেছনে বেঞ্চির গায়ে ঠেকনো। হারুবাবু বলে, নি আয় নুচি—

পরি হাজরা চারটে করে গুণে শালপাতায় ঢেলে দেয় ছ'গণ্ডা অর্থাৎ চব্বিশটা। শালপাতা ভর্তি হয়ে যায়। মোটা মোটা আঙুল চওড়া চেটো। হারুবাবু লুচির উপর এক থাবড়া চাপ দিতেই ফোঁপরা লুচি চুপসে শালপাতায় এঁটে যায়। বলে, পরি—খাবো কি দিয়ে?

—আজ্ঞে?

—বোঁদে দে না সের খানেক।

আর একটা শালপাতায় বোঁদে সাজিয়ে দেয়। লুচির গায়ে বোঁদে সাপটিয়ে বলে, আরও ভাজ—

খান চারেক এক খাবলায় গালে পুরে ঢোঁক গিলে বলে, ধনাকে ওপাশে ব্যবস্থা করে দে। ওকে নুচি খাওয়া—

ময়রার লোক ঝটপট বেলে কড়ায় ফেলে। ধনা ওপাশের বেঞ্চিতে শালপাতা পেতে বসে। লুচির অপেক্ষায় থাকে। ঘিয়ে ভাসে। ভাজা হয় স্বপ্নের খাদ্য।

আর এক খোলা ভাজা হয়ে চুবড়িতে ফেলতেই হারুবাবুর পাতা ফাঁকা। চেঁচায়, কইরে নে আয়—

পরি হাজরা বিনয়ে বলে, বাবু—দু গণ্ডা। দুবো—এই আটখানা?

—তাই দে। আবার খোলা চাপা—

পরি হাজরা চুবড়ি ধরে নিয়ে যায় ধনারামের শূন্য শালপাতার সম্মুখ দিয়ে। ধনারাম বসে থাকে।

হারুবাবু দেখে, লুচির শালপাতা খানিক ভরেছে, বোঁদের শালপাতাটা ফাঁকা। আবার চেঁচায়, পরি—আর সের দুয়েক বোঁদে দে। বেশ স্বাদ আছে—

ধনারাম ফাঁকা শালপাতা ধরে বসে। ভাবে, বাবু সব বোঁদে খেয়ে নিলে দোকানদার আমাকে দিতে পারবে?

মাত্র দু-গণ্ডা লুচি। দু-গালে ফুরিয়ে আবার যেই কে সেই ময়দার তাল গালের মধ্যে। বোঁদের স্তূপ হারুবাবুর সামনে। লুচির অভাবে এক মুঠো বোঁদে নিয়ে হারুবাবু শাসায়, হ্যাঁরে ময়রা—পারবি নি যদি ডাকলি কেন?

কড়ায় একসঙ্গে অনেকগুলো লুচি ভাজে। কোনোটা ফুলেছে, কোনোটা

জড়িয়ে চ্যাপটা। ঝটপট ছেঁকে বাবুর পাতে দেয়। পরি হাজরা আন্দাজে গোনে, তিন গণ্ডা।

লুচির গায়ে গরম ভাপ। ঘি ঝরবার সময় নেই। পাতে ফেলতে হারুবাবুর মন শান্তি। কিন্তু বড্ড গরম। মুঠো মুঠো বোঁদে চিবোয়। ক্রমশ ঠাণ্ডা হলে লুচিটার গায়ে বোঁদে জাপটে হারুবাবু বলে, ময়রা হিসেব রাখিস রে—কতগুলো হল।

ধনারাম খালি শালপাতা নিয়ে বসে। দোকানে কতরকম খাবার! হারুবাবুও তার জন্যে স্বপ্নের খাদ্যের অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু পাতে পাচ্ছে কই? তাই তার মনে হল, দেশব্যাপী কি ও তাই···। খাদ্যের অনটন···, না বণ্টনের অব্যবস্থা···।

ধনারাম বাবুর লুচি খাওয়া দেখে। বোঁদে খাওয়া দেখে। পরি হাজরা আর তার লোক লুচি ভেজে কাঁড়ি করতে হিমসিম। মাত্র সকালের জলখাবারের যোগান এই দোকানটা দিতে পারছে না। ময়দা বেলা তারপর সেটা ভাজতে দেওয়া—এই দ্বিবিধ কাজের মধ্যে সময়ও অনেক যায়। সকালে খিদের মুখে এত খেপে খেপে খাওয়ার মধ্যে কোনো আরাম পায় না। লুচিগুলো ভাজা হয়ে উঠতেও দেরি। এতক্ষণ যা খেয়েছে—সেটুকু তো অত বড় পেটের তুলনায় যৎসামান্য। তার উপর আবার জিরিয়ে সিরিয়ে। মন ভরে না। পেটও নয়।

হারুবাবু হুট করে বলে, আর কি আছে রে ময়রা?

—আজ্ঞে বাবু। রসগোল্লা—সবে টাটকা।

—উম। গামলায় যা আছে গোন—

পরি হাজরা তারের চিমটেয় গোনে, এক দুই তিন চার···এক গণ্ডা। আবার গোনে···

—মোট দশ গণ্ডা।

—তবে দে।

পরি হাজরা খুশি হয়ে একটা কলাইয়ের সাদা প্লেটে খান আষ্টেক রসগোল্লা সাজায়। দু-একটা গড়িয়ে যায়। আবার সেটাকে চিমটেয় ধরে মিষ্টির প্লেটের ওপর রাখে। সেটাও গড়াবার উপক্রম।

হারুবাবু গাঙ, আবাদের মাঠঘাটে কাছারিবাড়িতে ইচ্ছে করলেই তো এমন খাদ্য পায় না। অনেক প্রস্তুতির দরকার হয়। তাই চোখের সামনে রসগোল্লা নিয়ে পরি হাজরার অমন বিপন্নতা দেখে হারুবাবু বলে, ও ময়রা—ওইটুকু ডিশে কি করতেছিস? গামলা ধরে নে আয়—

ময়রা যেন পরিত্রাণ পেল।

সাদা গামলায় রসগোল্লাগুলো রসে ভাসে। ভেসে যায় হারুবাবু গালের ভেতরে লালার ধারায়। শুধু খিদে নয়, খেতে পারে মানুষটা। সেজন্যেই খাদ্যের উৎপাদনে যাবতীয় জরুরি উপকরণগুলোও ধরে রাখতে চায়। চাষের মাঠ—মাটি। মাটির ওপর চাষা মজুরে মানুষগুলোকে। মানুষের গরু ছাগল, হাঁস মুরগি, মাটির বুকে ফলের বৃক্ষ, পুকুর খালের পোনা ভেটকি···সব।

একটু হটে বসতেই রসগোল্লার গামলাটা রাখার জায়গা হয় বেঞ্চিতে। বড় বড় আঙুলে দুটো একটা রসগোল্লা মুখে পোরে। এক ঢোঁকে ফুরিয়ে যায়। পরে এক মুঠোয় চার পাঁচটা একসঙ্গে গালে পোরে। বাবু মানুষের জলখাবার।

ঘিয়ের কড়ায় লুচি ভাজার গন্ধ। ধনারাম এখন কড়াটার দিকে তাকিয়ে। বাবুর জলখাবারের বাহাদুরি আর টানে না। এমন ভোজন কলাকৌশলে ধনা পরিচিত। ধনা আগ্রহে অপেক্ষা করে এক খোলা ভাজা লুচির জন্যে। দোকানের ছোকরাটাকে মিনতি জানায়, ও ভাই—সেই তো বোঁদে আনবে। দাও না থাবা খানেক এনে—

দু-চার জন লোক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। কেউ মজা পায়। কেউ অত মিষ্টি মিঠাই দেখে ক্ষুধাতুর হয়ে ওঠে। কেউ বলে, বাবু তো জমিদার লোক—অত খাবা খাবে নি ?

একজন বলে, বাবুর-খাবা দেখোছো কোথায় ? এতো সবে শুরু—

ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে হারুবাবুর ভোজনের গল্প। একটু একটু করে ভিড় বাড়ে। 'মহারানী হিন্দু ভোজনালয়'-এর সামনে গুড়ে ভুঁড়ে দাঁড়িয়ে। শীতের সকালে রঙচটা ছক আঁকা চাদর গায়ে। দু-ভাই মুখের হাঁ—খোলে। ভেতর থেকে গরম হাওয়া বাইরের ঠাণ্ডায় জমে ভাপ তৈরি করে। গুড়ে হাই তোলে। মুখের ধোঁয়া খানিক পাক খায়। ভুঁড়ে হাই তুলে গুড়েকে দেখায়। গুড়ে গপ্ করে ভাপ গিলে খায়।

পথচলতি লোকটা ছেলে দুটোর কাণ্ড দেখে নিজের শৈশবে দাঁড়ায়। বলে, এই তোরা হাওয়া গিলতেছিস ? যা না—ময়রা দোকানে এক রাক্ষস মণ্ডা মিঠাই গিলতেছে।

গুড়ে ভুঁড়ে থমকে যায়। তাদের খেলায় ছেদ।

সদয়কুমার বাইরে এসে বলে, কোথায় গো বাবু—

—ওই তো। ওই ময়রা দোকানটায়—

যজমান বাড়ি গিয়ে পুজো পাঠ সেরে আতপ চাল ফল বাতাসা সংগ্রহই ছিল নিত্য কাজ। সেই চাল বেটে জাউ করে ছেলে পুলে বাঁচানো। তারপর তো এই হোটেল ঘর দোকান। রান্না, বাসন ধুয়ে খদ্দের সেবায় নগদ পয়সা সংগ্রহ। প্রথম প্রথম হোটেলের জীবিকার নতুন স্বাদ। এখন তো নৈমিত্তিক পর্যায়। তার মধ্যে অমন পৌরাণিক পুরুষের আদলে কে সে—বাবু! চাক্ষুষ দেখতে শখ যায়। হোটেলের বাইরে থেকে সদয়কুমার চেঁচায়, ভাতটা দেখো গো—। আসতেছি—

পর পর তিন খোলায় অনেকগুলো লুচি। চুবড়ির ফাঁক গলে গরম ঘি ঝরে। হারুবাবু মুঠো ভর্তি রসগোল্লা চিবোয়।

ময়রা দোকানের ছেলেটা লুচির চুবড়ি নিয়ে ধনারামের শালপাতার সামনে দাঁড়ায়। দু-আঙুলে আলতো ধরে একটা লুচি ধনার পাতে দেয়। হারুবাবুর নজর পড়তেই গলা তাড়ে,—উঁহু আগে এখেনে নে আয়। আর এক খোলা লাবুক—দিবি।

দোকানের ছেলেটা চুবড়ি ধরে এক লহমা দাঁড়ায়। তারপর অনুমোদনকারীর নিজস্ব পাতের সামনে যায়। ছোকরাটা ভাবে, আদেশ অনুমোদন থাকলেও যে কত কষ্টের বিলম্ব চেপে বসে··· ! ওই জন্যে হামলে পড়ে সব উল্টে দিতে হয়। মানুষটা বাবু না, নেশাগ্রস্ত···ভোজন বিকারে রোগি··· !

চুবড়িটা উপুড় করে দেয় হারুবাবুর পাতে। পাত ভর্তি হয়ে লুচি উপচোয়। ধনারাম চুপচাপ। তার শালপাতা শুকনো রঙে কালচে। সাদা ফুলকো লুচিটা কালো আধারে জ্বলজ্বল করে। নির্বাক ধনারাম। শরীরের সঞ্চয় থেকে নোনাজল আঁচড়ে দু-চোখে জমা হয়। একক লুচির ছায়াপাতে সে জল টলমল করে।

গামলার মধ্যে চিনির রস। হারুবাবু আঙুল দিয়ে খোঁজে। শুধু রস। একটাও রসগোল্লা নেই। নেঙোর মধ্যে লুচিগুলো। হঠাৎ চেঁচায়, ও পরি কী দিয়ে খাব রে ?

—আজ্ঞে গোল্লা দিই ?

—দিবি ? দে—গামলায় রস রাখিস নি—

উনুনে ঘিয়ের কড়ায় চড়বড় শব্দ। লুচি বেলে ঘিয়ে ফেলল বুড়ো ময়রা। ধনারাম গভীর উৎকণ্ঠায় লুচিগুলো ফুলতে দেখে। ভাবে, অতো না ফুলিয়ে ত্যাবড়া বেঁকা করে যদি ভাজে বুড়োটা ! তবু···বাবুর অত পছন্দ···লোভ টোভ···

পরি হাজরা এক গামলা রসগোল্লা বেঞ্চিতে রাখে।

পর পর সাজানোয় সাদা স্তূপ। যেন পাহাড় চূড়ায় বরফ পড়েছে।

হারুবাবুর চোখ ভরে মনটা খুশি। গামলাটা পরম মমতায় কাছে টেনে নেয়। পরি হাজরার মুখ খুঁজে বলে, ওজন করেছিস ?

—আড়াই সের।

—কেন পুরোপুরি করতে পারলিনি ?

গুড়ে ভুঁড়ে অবাক হয়ে দেখে। তাদের সাম্প্রতিক শৈশবে তো এ মিষ্টি খায়নি ? পুজোর বাতাসা, হোটেলের গুড়ই মিষ্টত্বের ধারণা। জ্ঞানহীন শৈশবে কী খেয়েছে··· ! হাটের দোকানপাটে ! নিজেদের ক্ষীণ স্মৃতিতে দ্রব্যটির প্রত্যক্ষ স্বাদ ভাবতে পারে না। তাই তারা সদয়কুমারকে ফিসফিস করে বলে, বাবা লোকটা ওগুলো কী করবে গো ?

—খাবে।

—সব !

ভুঁড়েটা আগ্রহে বলে, কেমন খেতে গো···

সদয়কুমার বাচ্চাটাকে কাছে টেনে বলে, চুপ্‌। লোকে শুনবে—। সন্তানকে নিরস্ত করে ভাবে, একদিন তোদের কিনে দোব। খাবি ?

ভাষা ফুটিয়ে উত্তর দিতে ভুলে যায়। পাতলা ঠোঁট···কচি কচি চোখ চেয়ে হাসে।

ফৌজদারি কোর্টের পেয়াদা বাসুদেব বাজারের ব্যাগ হাতে। খবরটা যাচাই

করতে হাজরার দোকানের সামনে দাঁড়ায়। পাশে লুঙি সেঁটে মকবুল। হাতে বাটা পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ। চেনা সঙ্গী পেয়ে একটু ঠাট্টার সাহস পায়। চাপা গলায় বলে,…এখন যদি বক রাক্ষস গাছ উপড়ে নিয়ে পাশে দাঁড়ায়—

কথাটা কানে পেঁছিয়। হারুবাবু খান চারেক রসগোল্লা একসঙ্গে খেয়ে মুখ-গহ্বর ফাঁকা করে। পাশে তাকিয়ে বলে, কেরে বাপ্ মহাভারত— ? নজরে বাসুদেব আটকে যায়। —ও তুই বামুন পেয়াদা— ?

—হ্যাঁ মামাবাবু—

—তোদের হাকিম আজ কোর্টে বসবে ?

—বসবার কথা তো—

তথ্যটা শোনে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার সময় নেই। হারুবাবুর সামনে অতগুলো মিষ্টি। পর পর গালে তোলে। কোঁৎ কোঁৎ গেলে। নলির কাছটা ফুলে ওঠে। যেন সাপের টুঁটিতে ব্যাঙ গলছে। ভোজন কামে জারিত প্রাণী।

ষোল

বৈশাখ শেষের দুপুর।

মাঠঘাট শুকিয়ে ধুলো ফুটছে। গাছপালার পাতা ঝলসে কাহিল। খাল নালা খটখটে। পুকুরের জল শুষে তলদেশ পঙ্কময়। পাখপাখালি পাতার ছায়ায় বসে হাঁপায়। সূর্য আকাশ থেকে নেমে এসেছে মানুষের ঘরবাড়ির ছাউনি মটকায়।

ঘরের মানুষ দরদরিয়ে ঘামে। বাইরের মানুষ রোদে পোড়ে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। দোকানপাট খদ্দেরহীন। গিরিবাবু জামা খুলে খালি গায়ে। নন্টু-বাবুর লোকটা হাত পাখা টানে। ঘাম মুছে গামছা ভিজে। নন্টুবাবুর বুক পিঠে ঘাম শুকোয়। দোকানের লোক নিশিকান্ত তালপাতার পাখা টেনে ঘর্মাক্ত।

কোর্ট কাছারির কড়ি বরগা থেকে কাঠ ঝুলিয়ে জোড়া মাদুর সেলাই মেরে টানা পাখা। হাকিম ম্যাজিস্ট্রেটদের মাথার ওপর সে পাখা দড়ির টানে দোল খায়। পাংখা পুলার টান মারে দড়ি। নিজের তৈরি বাতাস বাবুদের গা-জুড়িয়ে ছিটেফোঁটা যা আসে তাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঝিমন্ত যতিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে টানে।

হোটেল ঘরে খদ্দের পাতি কখন চুকে গেছে। ভাত তরকারি মুখ খুলে রেখেছে। না হলে যে গরমে ভ্যাপসে টকে গেলে সব নষ্ট। তাই জবারানী মাঝে মাঝে দেখে আসে, বেড়াল ঢুকল, কি না ?

গুড়ে ভুঁড়ে খেজুর পাতার চ্যাটাই ছেড়ে মাটিতে গড়ায়। বার বার সকাড়ি কুড়িয়ে ন্যাতা পোছায় বেশ ঠাণ্ডা মেঝে। খালি গায়ে ঠাণ্ডার পরশে আরাম পায়।

জবারানী বলে, অত ভিজে মেঝেয় যাসনি সোনা—

ভুঁড়ে বলে, গেলে কি হয় ?

—বুকে পিঠে শেলেষ্যা লাগবে।

—লাগলে ? জানতে চায় গুড়েটা

—বুকে পিঠে দরদ। নিঃশ্বেস নিতে কষ্ট। ওষুধ ডাক্তার করতে কত খরচ···, বলতে বলতে মা জবারানীর গলা বুজে যায়। সারাদিন যজমানবাড়ি পুজো সেরে যেটুকু আতপ চাল তাই ফুটিয়ে বেটে জাউ পায়েস করে তো গোটা সংসারের পেট প্রতিপালন। পরের হাতে নিজের পেট! সে যে কী দীনতা! দীনতো এই দুঃসময়ে তারাও। দু-একজনের যদিও এসময়ে মওকা। বাকি তো হাত পা গুটিয়ে জড়ভরত। তাদের কাছ থেকে সরে এসে হোটেল করে তবু দু-বেলা ভাতের মুখ। তারমধ্যে যদি রোগ ব্যাধির উৎপাত ঘটে! শিউরে ওঠে জবারানী!

সদয়কুমার গিয়ে ডাকে, ও মকবুলদা—মকবুলদা।

অঘোরে ঘুমোয় ইসলামিয়া হোটেলের খিড়কি দোরগোড়ায়। দেড় ফুট চওড়া কাঠের ছাউনিতে পেরেক সেঁটে ছ'ফুটের বেঞ্চি। বেঞ্চিটা দরজা ফাঁকে পাতা। খিড়কি দরজার ওপাশ থেকে একদম ফাঁকা গাঙচর। চারদিকে হাওয়া কম হয়ে গুমোট এই বৈশাখ কিংবা মে-মাসের দুপুরে। কিন্তু অতি সহজে হাওয়া পায় মকবুল সাহেব। এক বেঞ্চিতে পাকশাল মুনে আরামে হাওয়ায় ঘুমোনো। আবার রাতে সামনে পেতে খদ্দের পাতি ডাকা। খালি গায়ে বসে হাওয়ায় গা জুড়োনোর দারুণ স্থানান্তরনীয় সরঞ্জাম।

আর একবার ডাকার উদ্যোগে হাত বাড়ায়। ছিটেবেড়া দেওয়ালের ওপারে কাঠের বুকে করাত চলে। চারকোণা কাঠে বাটালির কাজ হয়। নড়বড়ে চেয়ারে হাতুড়ির ঘায়ে পেরেক গেঁথে আপাত ব্যবহারযোগ্য করে তোলার শব্দ। হাতুড়ির ঘা একটু কমলে সদয়কুমার ডাকে,—ও মকবুলদা—

এক ডাকে মকবুল সাহেব জেগে ওঠে. কে ?

--আমি—

গলার স্বরে তড়াক করে উঠে বসে। চোখ রগড়ে হাই তোলে মকবুল।

—তোমার খিড়কিতে খুব হাওয়া। ওপাশটা ফাঁকা—

—ওইজন্যে বলছি তো এপাশে ঘর দেখে উঠে এসো

এ প্রস্তাবটা কদিন ভর তো মাথায় পাক খাচ্ছে। কিন্তু সবে হোটেল পেতে বসা। একটু কোমরে বল না বেঁধে দৌড়ই কি করে ? তাই চুপচাপ থাকে সদয়-কুমার।

—কই কাঠের দোকানে যাবে যে ? অনুরোধ জানায় ভিন জাতের সহ-ব্যবসায়ী সদয়।

—গেছিলে তুমি ?

—আমি একলা গেলে, কে চিনবে ?

রেঁদা চালিয়ে কাঠের ছালি। পাক খেয়ে স্প্রিংয়ের মতো। বাটালি করাত গজ ফুটের বাড়ি, ফিতে ছড়িয়ে। কাঠ কুঠো সাজানো।

মকবুল বলল, ওই ইয়ারনবী—কাল যে ব্যাঞ্চির কথা বললুম। ধরেছিস ?

—সেই নেবে যখন, নতুন কেন ? একটা তৈরি আছে নাও না—কমে হবে।

—কোনটা ?

কেঠো মিস্ত্রি ইয়ারনবী কানে পেনসিলটা গুঁজে আঙুলে দিশা দেখায়, ওই যে দেওয়াল ঘেঁষে—

একদম নতুন বেঞ্চটার গায়ে ধুলো। হুমড়ি খেয়ে সদয় সেখানে পৌঁছয়। হাতে ছুঁয়ে বলে, এইটা মিস্ত্রি ভাই ?

ধমকে ওঠে মকবুল, ভাই কি গো ঠাকুরদা ? নবী আমার চাচাতো ভায়ের ছেলে।

—ও। তাহলে তো ভাইপো ছেলে

—হুঁ

—বাবা দাম কত বল দিকি ? পারবো কি নিতে ? মিইয়ে যায় গলার স্বর। বাসনাটাও নিভতে থাকে।

মকবুল সদয় মানুষটার মুখের রঙ দেখে বলে, ও ঠাকুরদা—তুমি আজই নিতে চাও ?

ভ্যাবলা মেরে তাকিয়ে থাকে সহব্যবসায়ী সদয় মুখুজ্জে।

চাচার উপর কথা বলতে পারে না নবী। এই চাচাই তো খুঁজে পেতে দোকানঘরটা যোগাড় করে দিয়েছে। ব্যবসায় লাগিয়ে কাঁচা পয়সার মুখ দেখিয়েছে। বাধ্য হয়ে চুপচাপ ছোকরা ইয়ারনবী।

—যা। ঠাকুরদা পনের দিন অন্তর কিছু পয়সা দিয়ে যাবে। মকবুল সাহেব আরও আশ্বাস দেয় ভাইপো কে, ও যদি শোধ না করে আমি দেবো—

দ্রব্যটি দোকানদার ছোকরা ইয়ারনবীর। শ্রম তার। উপাদান ও উপকরণও তার। এবং খদ্দেরটির খুঁটিনাটি জানাও তার জরুরি। শুধু চাচা মকবুল এই সম্পর্কের ভিত দেখিয়ে কি একটা ব্যবসার ঝুঁকি নেওয়া যায় ? নবী দ্রব্যটি তার আওতার মধ্যে রেখে সদয় মুখুজ্জের কাছে আরও একটু জানতে চায়, আমি পনেরদিন অন্তর যাব ? নাকি সদয় কাকা তুমি দিয়ে যাবে ? প্রশ্নটার মধ্যে প্যাঁচ। সদয় মুখুজ্জে পরিষ্কার গলায় বলে, সে কি কথা ? আমি করব দেনা শোধ দিতে আমিই আসবো—

ছোকরা কেঠো মিস্ত্রি নবী পাশাপাশি দোকানদারদের দিকে লম্বা করে চোখ ফেলে। রেঁদাটা টুকরো কাঠ, কাঠের ভুষি ছালির মধ্যে পড়ে। হঠাৎ নিজের মনে···বুকে একপ্রস্ত রেঁদা চালিয়ে নেয়। পাশাপাশি বসবাসের নানা কুটিলতা তর্কাতর্কির ছালি ময়লা ঘষে তুলে ফেলে। একটু জোর এনে বলে, ওই হাজরার মিষ্টি দোকান চারখানা বেঞ্চি নিয়ে গেল। এখনও দুটোর দাম শোধ করে নে—। বছর ঘুরতে যায়। যখনই চাইতে যাই—বলে আগামী সপ্তায় কিছু পাবি— ।

বেঞ্চটা মুছে দিতেই একদম নতুন। কাঠ, ঝালর পায়া চকচকে মসৃণ। হোটেলের সামনে পেতে খদ্দের ডাকতে সুবিধে হবে। পথ হাঁটা খদ্দের দু-দণ্ড বসে কথা বলার মতো জায়গা পাবে। দোকানপাতি চালাতে এ জিনিসটার প্রয়োজনীয়তা কল্পনায় ভরিয়ে নেয় সদয়কুমার। বেঞ্চটার দিকে একবার চোখ

রাখে। ভাবে, জিনিসটি পাওয়া মোটেই সহজ নয়। নগদ টাকা তো একসঙ্গে এতগুলো সঞ্চয় হয়নি! মকবুলদা জামিনদার হলেও কত যে বক্তৃতা, শর্ত সন্ধি চুক্তির পর্ব আসছে··· ! দ্রব্যটি দ্রব্যের জায়গায় পড়ে আছে। এখনও পাওয়া যায়নি। টানাপোড়েন, প্রতিশ্রুতি রাখার বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বিধায় কটু গন্ধময় বারুদের হাওয়া এই তিন জনের মধ্যে।

সদয় মুখুজ্জে অনুকম্পা প্রার্থনার চোখে তাকায় মকবুলের দিকে। মকবুল বুঝেও নির্বাক। ভাইপো হলেও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যবসাদার।

সদয় মুখুজ্জের চোখের ভাষা পড়ে ফেলে ইয়ারনবী। যত সংশয়, বিশ্বাস অবিশ্বাসের গোলাগুলি ছুঁড়ছিল ছোকরা নবী হঠাৎ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সমর্পণ করে, ঠিক আছে—

সদয় মুখুজ্জে বেঞ্চ থেকে একটু সরে আসে। ইয়ারনবীর বাকি কথাটা মুখে ফোটে, চাচা যখন সঙ্গে থেকে কথা হচ্ছে—। নিয়ে যাও তবে—

এমন সমর্পণে অবাক সদয়কুমার।

তাড়াতাড়ি বেঞ্চটায় হাত বুলিয়ে কাঠের মসৃণতা পরখ করে। এক কোণে ধরে চাগিয়ে জিনিসটার ওজন আন্দাজ করে। এতক্ষণে সদয়কুমার বলে, কি কাঠ গো ভাইপো ?

উঁ। কাঠ ? সব শাল—পায়া কটা টুকরো সেগুনের—

নিতান্ত বাকির খদ্দের। বেশি জিজ্ঞেস করতে মনে জোর পায় না। তবু তো জিনিসটা নিজের হয়ে ওঠার পথে।

মকবুল সাহেব বলল, কি সদয়দা নিয়ে যাবে ?

উত্তরের ভাষা ফুটবার আগেই সদয়কুমারের মুখটা উজ্জ্বল। মকবুল বলে, ধরো—মাথায় তুলে দিই।

কাঠকুটোয় তৈরি জিনিসটা সদয়কুমারের মাথায়। বেশ ওজন। ঘাড়টা সোজা রাখতে হয়। গামছা কাপড় পাকিয়ে মাথার মধ্যিখানে আলটা করেনি সদয়কুমার। ফলে মাথার চুল ভেদ করে চামড়ায় মাঝে মাঝে চিনমিন জ্বালা। নিতান্ত আবেগে এই জিনিসটা মাথায়। আনন্দে পা ফেলে। একটা একটা দোকান পার হয়। ডাইনে কালীমন্দির···তারপর থানাবাড়ি। পিতলের পেটা ঘড়িতে কাঠের হাতুড়ির আঘাত। ঢং···। কাঁধে বন্দুক পুলিসটা হাতুড়ি মেরে যায়, ঢং-ঢং-ঢং।

অতুল মাস্টার দোকানের খুঁটিতে পেরেকে গোঁজা জামাটা গায়ে গলিয়ে তাড়াতাড়ি বেরোয়। ফর্সা মুখ। স্বল্প ভুঁড়ি। বেঞ্চ মাথায় লোকটাকে দেখে একটু নজর করে পাশ কাটায়। এখনই জেটিতে টিকিট ঘরে যেতে হবে। প্রফুল্লবাবুর ডিউটি আওয়ার শেষ।

কেঠো মিস্ত্রির দোকান থেকে মথোয় বেঞ্চ। প্রায় পাঁচ ছ'মিনিট। এতটুকু ভার লাগে না সদয়কুমারের। অথচ বন্যার পর ভিটে ছেড়ে মাত্র কটা বাসন, কাঁথাকানি, বালিশ পোঁটলা আর শালগ্রাম শিলা বস্তায় ঠেসে মাথায় করে আনতে কী যে কষ্ট হয়েছিল! কত পাহাড় ভার।

অত বড় বেঞ্চটার মাঝামাঝি মাথা। কোনদিকে নিচু হলে যে কোনদিকে ধরা সুবিধে ঠিক করতে পারে না সদয়কুমার। একটু কম বেশি হলে নতুন জিনিসটা একদম ভাঙচুর হওয়ার আশঙ্কা। তাই ডাকে সদয়কুমার, কই গো—কোথায় ? শোনো তো—

কোনো গোপন উৎকণ্ঠা নেই বরং চাপা আনন্দ সে ডাকের মধ্যে। ছেলে দুটো গরমে ছটফট করে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন। সদয়কুমারের ডাকে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। তারাই বিছানা ছেড়ে আগে উঠে আসে বাপের কাছে। আসবাবটি তাদের চেনা। একবার ভাবে গুড়েটা, কোন কোন দোকানে যেন এরকম বসার জায়গা দেখেছে ! সেই দোকানগুলো খুঁজে বের করার বদলে তার মাথায় ধাঁ করে প্রশ্নটা ঠোক্কর মারে, বাবা—এটা আমাদের ?

মাথায় ভার। চট করে বলে সদয়কুমার, হ্যাঁ—

এরকম বেঞ্চ তো কত লোকের দোকানে কত খানা যে দেখেছে ! গুড়েদের তো একটাও ওরকম নেই ! সদয়কুমারের মাথায় বেঞ্চটা যে ওদের, হঠাৎ এই প্রতীতি জন্মাতেই গুড়ে আহ্লাদে তাদের বাপকে জড়িয়ে ধরে।

বাচ্চাটার আচমকা এই উচ্ছ্বাস ! মাথায় অত বড় বেঞ্চ। সদয়ের কোমর মাথা দুলে উঠে। বেঞ্চটা টলমল করে কোনদিকে যে হেলে পড়ে। জবারানী গুড়েকে বকে সামলায়, ওরে বাপকে জড়াসনি। বেঞ্চি তোদের গায়েই পড়ে যাবে—

সদয়কুমার বহু কথাবার্তার পর জিনিসটা কেঠো মিস্ত্রির কারখানার বাইরে আনতে পেরেছে। একটা যেন জয়লাভ। তারপরেও বেঞ্চটা নামানোর দ্রুত উদ্যোগ নেই দেখে সদয় বেশ ধমকে উঠে, ধরো না এটা—

জবারানী হাত বাড়ায়। অতো উঁচুতে ঠাঁই পায় না।

যজমান বাড়ির পুজারি এখন হোটেলের রাঁধুনি-মালিক। এমুহূর্তে ভারী বেঞ্চ মাথায় অভ্যস্ত মুটে মজুরদের মতো ক্রমে ক্রমে বসে কোমর ঘাড় নোওয়ায়। জবারানীর ধরতে সুবিধে। বেঞ্চটা মাটিতে রেখে দম নেয় সদয়কুমার। চারদিকে তো মে মাসের গরম।

এই পৃথিবীর বড়ো ভূ-ভাগ জুড়ে তো গুলি বন্দুকের আগুন। চারদিকে দহন। কোঁচার খুঁটে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে সদয়কুমার বলে, সেই সব বোমা বারুদের মাল যাবে কোথায় ? এই আকাশমণ্ডলের মধ্যেই আছে।

বেঞ্চটা গুছিয়ে হোটেল ঘরের মধ্যে রেখে স্বামী স্ত্রী বসে। নতুন বেঞ্চে মসৃণতা। জবারানী তার নরম নারী হাতের চেটো বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে। শ্বশুর ভিটের রান্নাশালের গায়ে রোজ গোবর কাদা দিতে দিতে এমন তকতকে মসৃণতা। শাশুড়ি বলত, বউমা—এখেনে ভাত ফেলে ভাত খাওয়া যাবে। কাদাবালি লাগবেনি—।

ভুঁড়েটা ছুটে পর পর কটা দোকানের সামনে যায়। দেখে চারটে দোকানে চারখানা বেঞ্চ আছে। ফিরে এসে ভুঁড়ে বলল, মা—আমাদেরও একটা বেঞ্চি হল। গুড়েটা বাবার কাছ ঘেঁষে বলল, আর একটা আছে—

—কিরে ? বাবা জানতে চায়।

—লাইট ?

জবারানী সদয়কুমার ঋণে জড়িয়ে সাজ সরঞ্জামগুলো সংগ্রহ করছে। তবুও হাসি মুখময়। জিনিসগুলো তো কোন কালে তাদের ছিল না। আর এভাবে পেটের ভাত করতে গেলে তো এগুলো জরুরি। তাদের একটু একটু করে ধারণা গড়ে যে, ঋণ বা দেনা গ্রহণও করতে হয় সেটুকু যার ফলে প্রাপ্ত জিনিস বিনিয়োগ করে কতটা তার উপস্বত্ব আসছে সে পরিমাণটুকুর দ্বারা প্রকৃত লাভ না, লোকসান ? জবারানী বলে, বেঞ্চির জন্যে কত করে শোধ চায় ?

—দিন পনের যাক। মকবুলদা ঠিক করে দেবে—

সন্ধেয় হ্যাজাক লাইট জ্বলে। হ্যাজাকের আলো নতুন বেঞ্চের গায়ে, পায়ায় লেগে থাকে। সারাদিনে অসহ্য গরম। এখন সে উত্তাপ মুছে গিয়ে উপভোগ্য বাতাস। গুড়ে ভুঁড়ে বেঞ্চিতে বসে রোগা পথ দেখে। পথে দু-পাঁচজন মানুষ। বাচ্চা দুটো ক'বছর পার করে বেশ অভিজ্ঞ। তারা মানুষগুলোর চেহারা দেখে আন্দাজ করে, ওরা আমাদের হোটেলের খদ্দের নয়।

নতুন বেঞ্চে বসে গুড়ে ভুঁড়ে গায়ে বাতাস লাগায়। বাবা মা রান্নাঘরে ঝোল রাঁধে। ভাত বসায়।

নিত্য যাতায়াতে অনেকগুলো মুখ চিনে ফেলেছে গুড়ে ভুঁড়ে। তাদের শুধু দেখে। সদয়কুমার বলে দিয়েছে, ওদের ঘরবাড়ি এই কাছে। ওরা কখনও খায় ? ঘরে গিয়ে খাবে—এখেনে খেলে তো দাম দিতে হয়। পয়সা লাগে—।

যদিও সদয়কুমার গুঁড়ে ভুঁড়ের বয়েসে প্রথম পাঠ পেয়েছিল নিজের বাবার কাছ থেকে একেবারে পুঁথি পত্রের মাচার সামনে। বাপ হাতে ধরে প্রথম শিখিয়েছিল, পঞ্জিকা বইটা কেমন দেখতে ?

তারপর পরিচয় করে দিয়েছিল ছবিটার সঙ্গে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী মাথায় মুকুট পায়ের তলায় জলস্রোত···। বলেছিল, এটা নারায়ণ। বইটা—সত্যনারায়ণের পাঁচালি—। বাবা একবারও বলেনি সেই শিশুকালে, নারায়ণের পদতলে জলস্রোতই কাল হবে···ভিটে ছাড়া করবে।

গাছপালার ছায়া। দোকানপাটের আলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ফলে আবছায়ায় মফস্বলীয় রাজপথ। নিতান্ত রোগা। পথচলতি মানুষগুলোর মধ্যে জনা তিনেক লোক। বগলে পোটলা পুঁটলির ব্যাগ। তারমধ্যে ছাতার বাঁকা ডাঁপ গলানো। খালি পা। আধ ময়লা জামাকাপড়ে শরীর ঢাকা। এই তিনজনকে ভুঁড়ে অবাক হয়ে দেখে। ভাবে, এরা অনেক দূরপথ হেঁটে হেঁটে ঘরে যায়। না হলে এক ভাটা···দেড় ভাটা পথ বোটে ডিঙিতে নদী বাইতে হয়··· ! গাঙ পাড়ে নেমে কারুর আবার হাঁটতে হয়··· ! ভুঁড়ে আর একটু অনুমান করে,···লোক-গুলো বোট ডিঙি ফেল করেছে—না হয় সন্ধে মুখে পথ হাঁটলেও ফুরোতে পারবে না।

ঘর অনেক দূর !

তাই ভুঁড়ে ডাকে, আসুন বাবু, আসুন ? ভাল খাবার আছে।

লোকগুলো আসে। গুড়ে জোরে চেঁচায়, বাবা—

রান্নাঘরের দোরগোড়া থেকে মুখ বাড়ায়,—যাইরে—

লোক তিনজন ক্রমশ নতুন বেঞ্চের গায়ে দাঁড়ায়। কোন অমোঘ বিবেচনা বোধ নাকি বাণিজ্যিক আচরণ অর্জন থেকে প্রভাবিত হয়ে ওই শিশুবয়েসে সরে সরে বসে। খদ্দের তিনজন গায়ে গায়ে বেঞ্চে বসে বলে, খোকা তোমাদের হোটেল ?

—হুঁ, গুড়ে উত্তর দেয়।

ক্রমশ রাত গভীর। থানাঘরের উঁচু দাওয়ায় বন্দুক কাঁধে পুলিসটা বাঁ-হাতে খইনির দোক্তা রেখে ডান হাতে ঝাপট ঝাপট মারে। চুনগুঁড়ো ময়লা হাওয়ায় উড়ে যায়। ঠোঁটের খাঁজে খইনি চূর্ণ জমা করে। তাপর পেটা ঘড়িতে ক্রমানুসারে বারোখানা ঠোক্কর মারে। কাঠের হাতুড়ি···কম্পন তৈরি করে। রাতটাকে গভীরতার দিকে নিয়ে যায়।

গোটা মফঃস্বল শহরটা ঘুমোয়। রোগা রাস্তাটা নির্জন। থানা কোর্ট চত্বরে গুঞ্জন। ট্রেজারির সরকারি টাকা প্রহরা দেয় রাতের পুলিস। সামনে বট-গাছটা ছায়া বিছিয়ে আঁধারকে আরও ঘন করেছে। সিমেন্টের সরু খুঁটির উপর সিমেন্টের চৌখুপি বাক্স দুখানা। তারমধ্যে হ্যাজাক লাইট জ্বলে। ঝড় বৃষ্টিতে নেভে না। ভেজে না। কোষাগারটা দিনের বেলায় তো বটে রাতের আঁধারে কড়া নজরদারির জন্যে আলোর ব্যবস্থা।

দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ। সারাদিন অসহ্য গরম। এখন মাঝরাত। বাইরে সে দাহ নেই। ঘরের মধ্যে গুমোট। ছাউনির টিন ধীরে ধীরে শীতল হয়। জবারানী গুড়ে ভুঁড়েকে পাখা টেনে কব্জি দরদ। বাচ্চা দুটো ছটফট করে। জানালা দরজা তো ঝজু ঝজু করে বসবাসের ঘর নয়। নিতান্ত দোকানপাট করার ব্যবস্থা। চারদিকে ঘিরেঘারে পণ্যদ্রব্য আগলাতে পারলেই হল। তার মধ্যে জীবন্ত প্রাণীর বসবাস সে কী যে দুর্বিষহ !

নতুন বেঞ্চটা নিয়ে হোটেল ঘরের সম্মুখে বাইরে ঘুমোয়। দক্ষিণের ফাঁকা গাঙ ঘুমন্ত শহরের গা ছুঁয়ে। ফরফুরে হাওয়া মাঝে মাঝে দমকা দিয়ে রোগা রাস্তায় গড়ায়। নতুন বেঞ্চে পিঠ পেতে আরামে ঘুমোয় সদয়কুমার। তলিয়ে যায়।

কাঁধে বন্দুক হাতে চার ব্যাটারির টর্চ। পুলিস দু-জন গলি ঘুরে শহরের রোগা রাস্তায় পা দেয়। পেটা ঘড়িতে পর পর দুটো ঢং ঢং শোনে টহলদারি পুলিস। গোটা এলাকাটা এক পাক দিয়ে জিরোতে চায়। তখনই ঢং করে পেটা ঘড়ির শব্দ। টের পায় রাত আড়াইটা। ভাবে, আর ঘণ্টা দুয়েক গেলে তো ব্যারাকে ফেরা।

পুলিস দু-জন ক্লান্ত। ডিউটি খতম না করে থানা বা ব্যারাকে ফিরতে পারে না। তাই বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষায় এদিক ওদিক চায়। একজন টহলদার পুলিস দেখে, লোকটা বেঞ্চের উপর শুয়ে। কাছাকাছি যায়। অন্ধকারে চেহারাটা অস্পষ্ট। তখন পুলিসটা ঝাপ বন্ধ দোকানঘরগুলো লক্ষ্য করে। নিজের মনেই দোকানগুলোর ঝাঁপ খুলে দেয় রাত দুটো পঁয়ত্রিশে। দোকানঘরগুলো যে যার মতো নিঃশব্দে পড়ে থাকে। পুরনো পুলিসটা পর পর মেলায়। ওদিকের প্রথম

দোকানঘরটা তো হোমিওপ্যাথি ওষুধের। তার পাশেরটা তো বিড়ির পাতা-শুকোর ব্যবসা। পরেরটায় সিঁদুর, বাসতেল, ছাতা, হ্যারিকেন, সাবান স্নোর মনোহারি দোকান। গায়ে মাটির হাঁড়ি কলসি খুরি মালসার দোকান। আরও নিশ্চিত হয় সামনে পোকা ধরা তাল গাছটার পত্রহীন ঢ্যাঙা কাণ্ড কাঠটা দেখে। তারপরে ঘড়ি টর্চ সারাই দোকান। বেঞ্চ পেতে শুয়ে আছে, লোকটা কে? পুলিস দু-জন মুখ কাছে নিয়ে যায় ঘুমন্ত মানুষের মুখটা চিনবার তাগিদে। যেন নিজের লোক পেয়ে গেছে এই উল্লাসে খানিক জোরে বলে ফেলে, অরে এ তো হামারা হোটেলমালিক ভি আছে—। যেহেতু রোজ থানার আসামিদের জন্যে ডাল ভাত তরকারি মিলিয়ে এক ডিশ করে খাবার যোগান দেয় সদয়কুমার,—থানার পুলিসের নিজেদের হোটেল বা নিজেদের হোটেল-মালিক বলার সংগত কারণ আছে। সেজন্যেই দুই পুলিস খানিক স্বস্তি পেয়ে ডাকে, ও ঠাকুর—ঠাকুর মশায়—

গভীর ঘুম একটু ফেঁসে যায়। সদয়কুমার হকচকিয়ে বলে, কে?

ফুটো ফাটা মাটির দেওয়াল মেঝেয় দোকান ঘর আর সংসার। ছেলেপুলে নিয়ে রাত গভীর। কোন বিপদ আপদ হল কি না এই আতঙ্কে তড়াক করে বেঞ্চে বসে সদয়কুমার। ঘুমের প্রথম চটকা ভাঙলে সদয় বলে, কি বাবু?

—আমরা ফোর্স আছি।

সদয়কুমার চমকে ওঠে!

পুলিস দু-জন সদয়কুমারের তরফ থেকে আগ্রহ আর আতিথেয়তার কোন উত্তেজনা না দেখে আবার সরল করে দেয়, নাইট ডিউটির প্যাট্রল পুলিস—

সদয়কুমারের কাছে ফোর্স কথাটা একেবারে নতুন। থানার সামনেই হোটেল-ঘর। দিনে দশকথার মধ্যে দুবার অন্তত নাইট ডিউটি, প্যাট্রল পুলিস কথা-গুলো তো শোনে। ফলত কথাগুলোর মর্মে সেঁধোতে পারে। সে সঞ্চয় নিয়ে রাতের পুলিসদের সমীহ জানাতে বলে, বসুন বাবুরা।

সদ্য কাঁচা ঘুম। বড় করে হাই তোলে সদয়কুমার।

সদয়কুমার বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ায়। পুলিসরা বলে, চট থলিয়া চাটাই ফাটাই নাই?

—কেন গো বাবু?

—তুমি জমিনমে বিছিয়ে শো যাও। হামলোক থোড়া আরাম করনে চাই—

রাজক্ষমতা প্রয়োগ এবং পরিস্থিতি রক্ষার বড় বাহিনী তো এই পুলিস। সদয়কুমার বিগলিত হয়ে বলে, কিন্তু বাবু আমার যে আর বেঞ্চি নেই।

—ঠিক আছে। তুম শো যাও—

পুলিস দু-জন বিশ্রাম করার জন্যে লোহার খাটিয়ার বদলে একটা আসবাব পেল। নতুন বেঞ্চটা দখল করল। রাত তখন দুটো চল্লিশ। হিটলার আত্মহত্যার আগেই তো উইলের দ্বারা তৈরি করে দিয়ে গেছিলেন একটা গভর্নমেন্ট। যে গভর্নমেন্ট পরিচালনা করবে নাৎসী যুদ্ধ আর তার পার্লামেন্ট বা রাইখস্ট্যাগ। সেই গভর্নমেন্টের রাষ্ট্রপ্রধান ডোয়েনিৎস পশ্চিম রণাঙ্গনের আইজেনহাওয়ার

আর পূর্বদিকে রুশবাহিনীর প্রবল আক্রমণে খোদ বার্লিন ভূখণ্ডে বিপর্যস্ত।

উনিশ'শ পঁয়তাল্লিশের সাতই মে রাত দুটো একচল্লিশ মিনিটে জার্মান ডোয়েনিৎস সরকার প্রেরিত প্রতিনিধি—জার্মান নৌবহরের প্রধান সেনাপতি অ্যাডমিরাল ফ্রাইডবুর্গ, জার্মান ফিল্ড মার্শাল আলফ্রেড জড্‌ল ও তাঁর সহকারি মেজর জেনারেল উইলহেলম অক্সেনিয়াস কালো রঙের টেবিলটার এক পাশে বসলেন।

ফ্রান্সের রেইমস্‌ শহর। পশ্চিম রণাঙ্গনের সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ারের কার্যালয়।

কালো টেবিলটার বিপরীত দিকে বসলেন মিত্র পক্ষের ব্রিটেন প্রতিনিধি লেফটেনান্ট জেনারেল স্যার ফ্রেডরিক মরগ্যান, ফ্রান্সের জেনারেল ফ্রাঁকর সেভেজ, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম· বারোঘ, আইজেনহাওয়ারের প্রতিনিধি লেঃ জেনারেল বেডেল স্মিথ, মার্কিন বিমান বহরের জেনারেল কার্লস্পাজ এবং সোভিয়েট পক্ষের লেঃ জেনারেল আইভ্যান চেরমিয়েভ ও জেনারেল সুশলা-প্যারোভ।

ব্রিটেন, মার্কিন, ফ্রান্স ও রাশিয়া চার মিত্রশক্তির রচিত চারখানা দলিল সই হল মাত্র চার মিনিটে। পাঁচ বছরের অধিককাল ধরে যুদ্ধের বিরতি। তখন দখল পেল নিজ দেশের আক্রান্ত ভূমি, দখল পেল শত্রুভূমির আক্রমণ রচনার ঘাঁটি।

পুলিস দু-জন বেঞ্চটার মাঝামাঝি দু-দিক থেকে মাথা রাখে। উভয়ের কোমর থেকে ঊর্ধ্বভাগ বেঞ্চে, দু-জনের পা দু-দিকে। দমকা হাওয়া আর তেমন বারুদের গন্ধ নেই। জিরোয় দু-জন, নিরুপায় দু-জন। এই পৃথিবীর ভূমিতে। পরস্পর বিপরীতে।

সতের

ব্রিটিশ ক্যালেন্ডারের জুনের শেষ ভাগ! এদেশের আকাশে ঝম্‌ ঝম্‌ পায়েল বাজে আষাঢ়ের। হাঁসের পালকের মতো মেঘ। মস্ত আকাশ সাঁতরায়। আচমকা কুল কুল বৃষ্টি। খানিক দাপট কমলে, ঝিরঝির ধারায়।

গিরিবাবুর দোকানে নতুন পেট্রোম্যাক্স কাচের মধ্যে সাজানো। তিন কাঠির স্টোভ, সাইকেলের রিং টায়ার হরেক জিনিস। ঝাপটা আটকাতে টিনের ঝাঁপের খুঁটি নামিয়ে খানিক সামাল। বেলা দশটায় আলো রুদ্ধ হয়ে ভেতরটা আবছা অন্ধকার। টিনের চেয়ারে বাবু হয়ে বসে রোগা ফর্সা রায়বাবু। ফাইন ধুতি পাঞ্জাবিতে জমিদার। হাতে তখনও দিনের খবরের কাগজ। স্বল্প আলোতে পড়া যাচ্ছে না।

খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে একবার চোখের কাছে আনে রায়বাবু। আবার নামায় কোলের কাছে। টিনের ঝাঁপে বৃষ্টির সে চড়বড়ানি নেই। রায়বাবু বলে, ও গিরি—

—আজ্ঞে বড়দা ?

—এবার তো কমে গেছে। তুলে দে না—

রায়বাবুর কথায় একবার কানটা পাতে চারপাশে। বাইরের আবহাওয়া আন্দাজ করে বলে, ও কর্ণ দে তো ঝাঁপ কটা উঁচু করে—

মেঘলা আকাশে দিন। আলোর গতিকে রোধ করেছে। তবুও এক মুঠো আলো খবরের কাগজের হরফে। রায়বাবু মুখ ঝুঁকিয়ে কাগজে নিজেকে গাঁথে। কুচো কুচো বর্ণ অক্ষরের দেহ থেকে বেরিয়ে আসে পৃথিবী। নিজের দেশ ভারতবর্ষ। এ বঙ্গদেশ। এবং বাংলার মুসলিম লীগের কর্ণধার আবুল হাসেমের ইস্তেহার। আবুল হাসেম সাহেব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরছেন হিন্দু জমিদার ও কংগ্রেসি হিন্দু খবরদারি হীন এক স্বপ্নের পাক দুনিয়া… !

পুরনো হ্যাজাক লাইটের বার্নার, পাম্প ওয়াশার, পিনের রডটা খুলে মোছামুছি করে গিরিবাবু। পিনের নাটটায় ফুঁ দিয়ে হাওয়া পাস্ করছে কি না সোজাসোজি আঙুল রাখে। এপারে ফুঁ গিয়ে ওপারে চামড়ায় হালকা পরশ নেয়। অতএব কাজটা সফল। একটু আনন্দের আবেশ। খবর-কাগজের মগ্ন রায়বাবুকে বলে গিরি, ও বড়দা—

—থাম না সিমলায় কাণ্ডকারখানাটা পড়ি—

সিমলা… ! দার্জিলিং…শিলং কথাগুলো রায়বাবুর কাছে মাঝে মাঝে শোনা। গিরিবাবুর সারাই দোকান আর নতুন হ্যাজাক লাইট সাইকেল স্টোভের কারবারে সিমলা কথাটা অন্যরকম লাগে। নিজে তেমন পড়ে বুঝে উঠতে পারে না, তবু লোকে পড়ুক, জানুক। না হয় রোজ খবরের কাগজের দামটা খরচের খাতায়। রায়বাবু দশ-বারোখানা দোকান ঘরের মালিক। মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার তো কিছু সদর্থক মূল্যও আছে। এই মেলা-মেশায় মালিকের সঙ্গে ভাড়াটিয়ার যে দূরত্ব সে কবে মুছে যেতে যেতে এখন তো মাসান্তে মাত্র চার পাঁচ টাকার দেনাপাওনা। ফলে রায়বাবুকে নির্দ্বিধায় বলে, পান খাবেন না ?

—উঁ পান ? আন তবে—

—বড়দা—সিমলা তো পাহাড় টাহাড় বেড়াবার জায়গা ?

—কি হয়েছে বল ?

—এখন সেখেনে বর্ষা লেগেছে ?

রায়বাবু বোঝাতে চায়, কত সুন্দর জায়গা জানিস ? সাধে বড়লাট ওয়াভেল সেখেনে উঠেছে ?

—হ্যাঁ বড়দা—এখন ব্রিটিশদের গা থেকে যুদ্ধের জ্বর নামল। আর স্বাধীনতা দেবে আমাদের ? বরং কমুনিস্ট্‌রা তো ওদের বন্ধু বেশি ?

—দুস্‌। চার্চিল বড় ফাজিল। কমুনিস্ট্‌দের ভয় পায় ওদিকে জিন্নাকে হাত করেছে—। বড়লাটটা যা লোক না ?

গিরি আর বুঝতে পারে না। গোটা বিশ্ব রাজনীতি নিজের দেশ তার

মধ্যে এই মফস্বল শহরটুকু যেখানে রুজি রোজগার চার্চিল স্ট্যালিন ট্রুম্যান কতখানি জরুরি। বাক্য বন্ধ রেখে নিজের কাজে ঢোকে। রায়বাবু খবরের কাগজে কিংবা নিবন্ধে মন দেয়। রায়বাবু ক্রমে প্রবেশ করে—

"বিলাতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পর একটি প্রস্তাব বড়লাট ওয়াভেলকে দেওয়া হয় যে তিনি ভারতবর্ষের নেতাদের একটা সমঝোতায় আনার প্রয়াস শুরু করুন। অনুমোদিত প্রস্তাবটার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রধান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সংখ্যাসাম্য থাকবে এবং যুদ্ধ পরিচালনা ছাড়া আর সব বিভাগ ভারতীয়দের নিজহাতে থাকবে। প্রশাসন চলবে বিধিবদ্ধ সংবিধান অনুসারে।

এই মর্মে চোদ্দই জুন ওয়াভেল সাহেব এক ঘোষণায় বলেন যে, ভারতীয় নেতৃবর্গ যদি মিলে মিশে শাসন পরিষদের সদস্য মনোনীত করতে পারেন তো খুব ভাল। তা নাহলে তাঁরা তাঁদের পছন্দ মতো নামের তালিকা দিন যার থেকে মাননীয় বড়লাট বাছাই করে একটা তালিকা তৈরি করে দেবেন। আর তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে যেমন ব্যবস্থা চলছে তেমন চলবে।

ওদিকে বিশ্বযুদ্ধের অবস্থা মিত্রপক্ষের অনুকূলে। এদিকে উপরোক্ত ঘোষণার বাস্তবায়নে ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা কারাগার থেকে ছাড়া পেলেন। কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও লিগের সভাপতি জিন্না সাহেব সহ বাইশটি প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনার জন্য সিমলাই স্থান ঠিক হয় এবং দিন স্থির হয় পঁচিশে জুন। বড়লাট ওয়াভেল ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীকে সিমলা-আলোচনায় আমন্ত্রণ জানান। অবশ্য গান্ধীজী আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় যোগ দেননি।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিন জিন্না বললেন, পাকিস্তানের মৌলিক প্রশ্নের স্বীকৃতি ছাড়া কোনো সাংবিধানিক কাঠামো ও ব্যবস্থায় লিগ সম্মত হবে না। তবে বড়লাট ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পুরোপুরি আস্থা ও বিশ্বাস আছে বলে এধরনের সম্মেলনে যোগ দিয়েছি।

অনেক আলোচনার পরও প্রতিনিধিরা সর্বসম্মত ভাবে নামের তালিকা দিতে পারেননি। সেজন্যে বড়লাট উনত্রিশে জুন সব দলের নেতাদের শাসন পরিষদ গঠনের জন্যে যে যার নিজের দলের সদস্যদের নামের তালিকা দিতে নির্দেশ দেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য অনেক দলের নেতারা এই তালিকা দিতে রাজি হলেও মহম্মদ আলি জিন্না কিন্তু তাঁর লিগের ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন ছাড়া তালিকা দিতে সম্মত হলেন না। যদিও তাঁর লীগ তখন নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতভেদে আক্রান্ত। বিব্রত তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্বের অবস্থান নিয়ে।

অবশেষে এই সম্মেলন চোদ্দই জুলাই অব্দি স্থগিত ঘোষণা হল। সিমলা সম্মেলনে গান্ধীর অনুপস্থিতি এবং এই ভূমিকা জিন্নার দ্বারা প্রচণ্ড নিন্দিত হয়েছিল। ত্রিশে জুন সাংবাদিক সম্মেলনে জিন্না বলেছিলেন, মিস্টার গান্ধী

যদি পাকিস্তানের ভিত্তি স্বীকার করে নেন তাহলে এই সিমলা সম্মেলনের কোনো দরকারই থাকে না।…"

রোগা রাস্তাটায় লোকজন। উকিল মোক্তার মক্কেলরা ছাতা মাথায় হাঁটে। ঝিরঝির বৃষ্টিতে জলের কণা। দমকা বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে আবার রোদ। নতুন বেঞ্চিতে বসে গুড়ে ভুঁড়ে আনন্দে খদ্দের ডাকে, আসুন বাবা আসুন। ভাল খাবার—ভাল রান্না—

পাঁচ সাতজন খদ্দের একসঙ্গে খেতে বসেছে। সদয়কুমার দু-হাতে চারটে থালা ভর্তি ভাত চচ্চড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে খদ্দেরের আসনের সামনে। গুড়ে হঠাৎ অবাক হয়ে বলে, দেখ বাবার হাতের দিকে। ভুঁড়ে তাকায়। দু-চোখে দারুণ বিস্ময়!

সদয়কুমার দু-হাতের দু-তালুতে দুটো থালা রেখেও কব্জি থেকে কনুই অব্দি চ্যাটালো মাংস-পেশীর অবস্থানটুকুতে দু-খানা থালা ভর্তি ভাত তরকারি নিয়ে পেটের ছোঁয়া-ঠেকানোয় বাড়তি থালাদুটো আনছে। একসঙ্গে এতগুলো খদ্দের তো আসে না তাদের ভোজনালয়ে। তাই দ্রুত পরিবেশনের নতুন কৌশলটায় মুগ্ধ হয় দু-ভাই!

পথচলতি মানুষ রোগা রাস্তা পার হয়। খদ্দের ডাকতে ভুলে যায় ছেলে দুটো। কচি গলায় ডাক নেই। অনেকক্ষণ স্তব্ধ। রান্নাঘরে খাবার গুছোতে গুছোতে মা জবারানীর মন উসখুস করে। সাত বাটি ঝোল মাছ ভরে একটা থালায় সাজিয়ে দেয়। সদয়কুমারের হাতে ধরিয়ে মা উৎকণ্ঠায় মুখ বাড়ায়। রান্না ঘরেরদরজা থেকে গোটা দোকান রাস্তার খুঁটিনাটি দেখতে পায় জবারানী। ভাবে, যাক বাচ্চা দুটো গাড়ির রাস্তায় যায়নি তাহলে?

দু-পাশে খদ্দের খাচ্ছে। মাঝখানটুকুতে সাবধানে হেঁটে যায় জবারানী। এত লোক অচেনা। অজানা। মাথার কাপড় টেনে ঘোমটা দিতে গিয়ে ভাবে, যদি কারুর পাতে পা লেগে যায়! আর আসবে কখনও এ হোটেলে? থাক ঘোমটা। এলো মাথায় জবারানী এগোয়। সব খদ্দের মুখ তুলে তাকায়। মুখ নিচু জবারানীর।

দু-একজন খদ্দের খাওয়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, ঠাকুরমশাই?

—আজ্ঞে বাবু?

—কে? ইনি কি আমাদের বামুনদিদি?

সদয় হ্যাঁ কিংবা না বলে না। শুধু সহমতের হাসিতে মুখ ভরে যায়।

—ওনার হাতের রান্না তাহলে আমরা খাই?

আবার হাসে সদয়কুমার।

আর একজন খদ্দের খাওয়া থামিয়ে বলে, বউদির হাতের রান্না ভাল।

কথাগুলো জবারানীর কানে যায়। ফেলে আসা ভিটে গ্রাম-পড়শীর মানুষজন হলে একটু কথা ধরত। দুটো ঠাট্টায় হাসিয়ে দিত। বুকের ভেতর যে ইচ্ছে ধাক্কা মারে আবার আটকে নেয় নিজে। খদ্দের মানুষের সঙ্গে এই মজলিশে কী বলতে যদি কিছু বেমানান বলে ফেলে! তাই সঙ্কোচে গুটিয়ে

থাকে নিজের মধ্যে।

সদয়কুমার দু-একজনের পাতে ভাত ফুরিয়ে যেতে দেখে। তাড়াতাড়ি রান্না-ঘর থেকে ডিশে ভাত তুলতে তুলতে ভাবে,···দেশের যজমান বাড়ি হলে···হয়তো জবার পায়ে গড় করে বলত—মা তুমি কত পুণ্যময়ী। বামুনের ঘরে বউ হয়ে জন্মেছ—কত সুকর্মের ফল। তোমার হাতের ছোঁয়ায় রান্নার স্বাদ অমৃত হয়ে যায়। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা··· !

খদ্দেরটা বলে, কই ? দু-চামচ ভাত দাও—, সব সাজান ভাবনা ভেঙে যায়। সদয়কুমার লজ্জা পেয়ে বলে, আর কাকে দেব বাবু— ?

বাচ্চা দুটো নতুন বেঞ্চিতে চুপচাপ। জবারানী দুজনের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, তোদের খিদে পেয়েছে রে বাপেরা ? খাবি ?

—না, গুড়ে বলে।

ভুঁড়ের দিকে তাকাতেই বলে, না।

—তবে ! তোরা খদ্দের ডাকবিনি ?

মায়ের কথায় ছেলে দুটোর চমক ঝরে যায়। তৎক্ষণাৎ হাঁকে, আছুন বাবু আছুন—ভাল ভাল খাবার—

মা জবারানী দাঁড়িয়ে বাচ্চা দুটোর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কচি গলায় ডাক বেশ মধুর লাগে। দু-একজন পথচলতি মানুষ থমকে শোনে। কোর্ট চত্বরে সাবপোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে যায়। মনে মনে বলে, দুটো গুড়গুড়ে বাচ্চা বেশ তো বড়দের মতো খদ্দের ডাকতে শিখে গেছে ?

উড়কো বাতাসে দু-একটা জলকণা ছুটে এসে বাচ্চাদের গালে লাগে। মা আঁচলে মুছে দিয়ে বলে, খোকা—তোরা দু-জন ডাকাডাকি করিস। দু-চারটে খদ্দের পাতি আসে—। কেনা চাল কেনা মাছ বেচে দুটো একটা পয়সা দু-বেলা দু-মুঠো ভাতের মুখ দেখতেছি। দেশ ভিটেয় দু-দিন তিন দিন অন্নহীন—যা একবেলা জুটত তা তো আধপেটা— ! কী কষ্ট যে গেছে···, আঁৎকে ওঠে মা। আকুল হয়ে বলে, বাপ তোরা ডাক—খদ্দের ডাক রে-এ-

মায়ের কথায় পর পর মেলাবার মতো শৃঙ্খলাময় জ্ঞানে তারা প্রখর হয়ে ওঠেনি। তবে নিকট শৈশব থেকে জেগে ওঠে মায়ের কথায় সত্যতা। তারা চলতি মানুষ দেখে ডাকে, আছুন বাবু আছুন—

মা সাবধানে হেঁটে যায়। খদ্দেরদের ভোজ্য ভাত তরকারি ফুরিয়ে, খাওয়া শেষের দিকে। মা রান্নাঘরে ঢোকে।

আবার ঝিরঝির বৃষ্টি। আকাশে মেঘগুলো ঝাঁক বেঁধেছে গাঙের সোজা-সুজি। নোনা গাঙে মিষ্টি জলের ফোঁটা। শহরের রাস্তাটা ফাঁকা। লোকজন কম। গুড়ে ভুঁড়ে খদ্দের দেখতে পায় না। ডাক দেয় না। পেছনে তাকায় গুড়ে। ভুঁড়েকে বলে, ওই দেখ—

—কি ? বলে পিছনে চায়। বুঝতে পারে রোগা ফর্সা বাবুকে। বড় কাগজটা দু-হাতে গামছার মতো মেলে বাড়িওলা বাবুটা মুখ গুঁজে আছে ! বিড় বিড় করে বলে, রোজ ওই কাগজ ধরে কী দেখে বলত দাদা ?

গুড়ে দাদার মর্যাদার ভূষিত হয়ে জ্ঞান দেয়, বই—

কোনো কিছু অবতারণা না করে দু-ভাই গুটি গুটি লোকটার কাছে যায়। বাড়িওলাবাবু এক মনে কাগজটা দেখে।

রোগা ফর্সা বাবুটার দু-হাঁটু থেকে চামড়া কত ফর্সা। পাতলা কাপড়। সাদা জামার ভিতর থেকে পিঠের শিরদাঁড়া দেখা যায়। বাড়িওলা বাবু হঠাৎ মুখ তুলে বলে, ও গিরি লেগেছে ভাল।

—কি দাদা?

—দেশটা ভাগ হল বলে। জিন্না আর গান্ধীজীর মধ্যে যা বিরোধ—

—বেশ তো সব ছিল। যুদ্ধ টুদ্ধ থেমে গেছে—এবার স্বাধীন টাধিন হবে তো?

—থাম এখন। জল অনেক ঘোলা হোক—

গিরির ডান হাতের তর্জনী উদ্দিষ্ট কাগজটার দিকে তাকায় গুড়ে ভুঁড়ে। তারপর শুনতে পায় গিরিবাবুর গলায়, ও বড়দা—খবরের কাগজ কি বলছে? আরও বাধবে?

ফট করে দু-হাতে মেলে ধরা কাগজটা নাড়িয়েই বাড়িওলাবাবু বলে, খবরের কাগজ থেকেই তো বলছিরে তোকে। আমি কি লাটের জমিদারির গপ্পো ফেঁদে শোনাচ্ছি—?

গুড়ে ভুঁড়ে তাদের অক্ষর পরিচয়হীন শৈশবে জ্ঞান পেল গামছার মতো বড় কাগজটা বই নয় শুধু কাগজও নয়, খবরের কাগজ! শুনতে পেল গান্ধী আর জিন্না দুটো লোকের নাম।

গুড়ে হঠাৎ তাকায় ভুঁড়ের দিকে। ভুঁড়ের চোখে প্রবল জিজ্ঞাসা…দেশ? দেশ তো তাদের ফেলে আসা সেই উঠোন…পুকুরপাড়ে তাল গাছ কটা…সূর্য মাথায় টিনের ছাউনি ছায়ায় মেটে দাওয়া…

সদয়কুমার বাইরে এসে দেখে নতুন বেঞ্চ ফাঁকা। উদ্বেগে খোঁজে বাচ্চা দুটোকে। হাতের কাছে, চোখের মধ্যে না পেয়ে দারুণ জোরে হাঁকে,—ওরে ও গুড়ে-এ ভুঁড়ে-এ কোথায় গেলি?

বাপের গলায় আওয়াজ তাদের কানে যায়। গুড়ে ভুঁড়ে খবরের কাগজের কাছ থেকে সরে যায়। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। বৃষ্টির ফাঁক চিরে বাচ্চা দুটো ছুটে আসে।

তখন গাঙের উপর আকাশ কাটাকুটি হয়ে ঝির ঝির বর্ষা। সমুদ্রে নোনা জল চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ছোটে গাঙ বুকে। মিঠেন জলের টান খেতে?

আঠার

মহকুমা শহর থেকে কাঁচা সড়কটায় এতদিনে ব্রিক ব্যাটস্ পড়েছে। বড় বড় তিনখানা লোহার চাকায় রোলার। আধলা তিন পো আমা ঝামা ইট। তার উপর দিয়ে আটটোনি রোলার যখন যায় যেন পাহাড়। এখন কাঁচা মাটি ইটের

উপর ইটের স্তর পেয়ে শক্ত পাথর। দক্ষিণের কাঁচা সড়ক পাকা সড়কের বর্মে ঢেকেছে।

ঝির ঝির বৃষ্টি নতুন সড়ক ভিজোচ্ছে। ভিজছে চারখানা লোহার কাঠিতে এক চিলতে টিনের ছাউনিঘেরা রোলারটা।

গাঙের জলে ঢেউ। ক্রমাগত বর্ষণে নোনাখার ক্ষয়ে গাঙের স্রোতে দেশ মাটি জেলাগুলোর ধারানি। বঙ্গোপসাগরের পেট থেকে লাখে লাখে ইলিশের মাসি পিসিরা ঝাঁক ঝাঁক বাচ্চা নিয়ে দোল খেতে আসে মিঠেন জলের লোভে। কচি ইলিশের ঝাঁক টান খেতে খেতে গাঙের খোলে ঢোকে। ঢেউ পায়, মিঠেন জল খায়, উথালপাথালে তরতরিয়ে বড় হয়।

মাঝারি ফাঁসের মোটা সুতির জাল পেতে ডিঙিগুলো ভাসে। জালের শেষপ্রান্তে চারখানা টুকরো বাঁশ কাঠির এক কোমর বয়া। বয়া গাঙের ঢেউয়ে দোল খায়। বয়ার ডগায় একটুকরো সাদা কিংবা লাল কাপড় পত পত ওড়ে। যে যার জেলে ডিঙির জালের এরিয়া মার্কিং পতাকা। অতবড় গাঙ। মোহনা মুখ কত বড় চওড়া যে! মস্ত আকাশ ঢুকে গিয়েও জল শেষ হয় না। ফাঁস মুখে গালাসি আটকে রুপোলি প্রাণীগুলো বন্দী। চকচকে আঁশে মুক্তোর দ্যুতি। গায়ে সারা বছরের স্বাদ।

ঝিমকিনি দিয়ে বৃষ্টি। আঁচড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে বাতাস। ডুপ ডুপ বৃষ্টির ফোঁটা গাঙের পিঠে। জল ছিটকে কোটি কোটি শিমুল কাটার বুটি গাঙময়।

গড়বন্দী কাছারি বাড়ির উঠোনে জল। বৃষ্টির ঝাপটা পাকা দাওয়ায়। মায়ের সঙ্গে ছেলে মেয়েরা। বাপ মাঝারি লাঠিটার গায়ে সরষের তেল মাখাচ্ছিল। পাশে তখনও কটা পড়ে।

স্ত্রী কমলা বলল, আজ কি কি রান্না হবে?

চড়বড়িয়ে বৃষ্টি। আকাশ কালো হয়ে যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় জলের মিহি কণা। খালি গায়ে বেশ আরাম হারু চাউলের। বউকে দেখে আকাশে তাকায়।
—করো না গরম গরম খিচুড়ি

—আর?

বাচ্চা ছেলে মেয়েরা দোর জুড়ে দাঁড়ায়। বড় ছেলে লাঠিটায় হাত দেয়।

—ইলিশ মাছ ভাজা।

ছেলে মেয়ে কটা আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরে।

কমলারানী বলে, মাছ কই?

বড় মুখ। বড় বড় চোখ। বউ ছেলে মেয়ের সামনে বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, ধনা কোথায়?

—ও গোল ঘরের দিকে বড় নালাটা বাগিয়ে দিচ্ছে।

—ডাকো তাকে।

মা আট বছরের বড় মেয়েটাকে বলে, যা তো বিলাসী—ডেকে দে

আবার বৃষ্টির তোড়টা কমে যায়। আগের মতো ঝির ঝির। উঠোনে নতুন খড়গাদার মটকায় একটা কাক ভিজছে। সকালবেলায় খাবার জুটোতে পারেনি।

তাই বাবুদের কাছারি উঠোন মুনে বসে। যদি মুড়ি ভাত পড়ে খুঁটে খাবে।

কাদা ধুয়ে পায়ে জল ভর্তি। মাথা থেকে দু-একবার টপে পড়ে বাঁধান দাওয়ায়। বাবুদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ধনা বলে, আজ্ঞে ডেকেছো—

হারুবাবুর হাতে তেলে চুবোনো ন্যাকড়া। বাঁ-হাতে লাঠিটা। মুখ তুলে বলে, তুই এক্ষুণি গাঙ পাড়ে চলে যা—

—যেয়ে ?

—জেলে ডিঙি ধর। মাছ চাই—টাটকা ইলিশ--। যা—

ধনা দরজা ছেড়ে বড় দাওয়ায় পা দিয়েছে। হারুবাবু হেঁকে বলে, আমার নাম করবি—।

ধনা থমকে শুনে আবার পা ফেলে।

হারুবাবু নিশ্চিত হতে চেঁচায়, হ্যাঁরে মুখ্যু শুনতে পেলি ?

এবার ধনা গলা ছাড়ে, হ্যাগো বাবু পেয়েছি। তা নাহলে তো আবার জানতে যেতুম—

ধনার কথায় হারুবাবু মুখ ছড়িয়ে হাসে। বড় বড় দাঁত। টকটকে জিভ। গোলগাল কালো ভারী মুখ।

স্ত্রী কমলা বলল, কিছু খেতে দেব ?

—থামো না। ধনা ফিরুক—

বড় ছেলের হাতে তখনও লাঠিটা। মেজ ছেলে হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে। নাদুস নুদুস শরীর এইটুকু বয়সে চর্বি চাপে স্ফীত ভুঁড়ি। সেও একটা লাঠির বাসনায় ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে ; একটা ছোট লাঠি পেয়ে যায়।

মেয়ে দুটো আট সাতে মাথায় মাথায়। এই বয়েসে ছোট শাড়ি গায়ে জড়িয়ে গিন্নিবান্নির চেহারা। তারা তাদের মতো কিছু পায় না বাবার কাছে। তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাপের কাজ দেখে।

ছেলে দুটো লাঠি হাতে আস্তে আস্তে বেরয়। বড় দাওয়া। পাশেই ফাঁকা আকাশ কাছারি বাড়ির উঠোনে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট। বড়টা লাঠি উঁচিয়ে ধরে। ছোট ছেলেটা সে লাঠিতে মারে। দু-জনের দুটো লাঠিতে ঠক্ ঠক্ শব্দ হয়। লেঠেল বাপের কানে আসে সে আওয়াজ। ক্রমে মনে পুলক জাগায়। হারুবাবু বাইরে আসে। ছেলে দুটো ভয়ে লাঠি ফেলে দেয়। হারু বলে, নে লাঠি কুড়িয়ে নে—

বড়টা তুলে নেয়। ছোটটাও মহানন্দে পরিত্যক্ত লাঠিটা আবার হাতে নেয়।

হারুবাবু বলে, আয় তোরা আমার কাছে—

মেয়ে দুটো বাপের কাণ্ড দেখে।

হারু বড় ছেলের লাঠিটা মাঝখানে ধরে বলে, বাবা বিল্টু ধর আড়াআড়ি করে ঠিক মাথার উপর—

বিল্টু ধরে দু-হাতের মুঠিতে মাঝামাঝি।

বাবা হারু চাউলে পরামর্শ দেয়, বিল্টু জোরে ধরবি। যেন দোল না মারে—

ছোট ছেলে কৃষ্ণকে ডাকে, নে আয় তোর লাঠি

পরম উৎসাহে বাপের নির্দেশ মেনে কাছে আসে। তখন লাঠিটার নিম্নপ্রান্ত দু-হাতে ধরিয়ে বলে, কিষ্টো—তোর দাদার হাত মাথা বাদ দিয়ে দু-দিকে মার ধীরে ধীরে—

প্রথম আঘাতে বিষ্টুর লাঠি কেঁপে একদিকে টলে যায়। ঠক্ করে আওয়াজ। হারু চাউলে চেঁচায়, বিষ্টু ধর শক্ত করে। যেন একদিকও না নামে—

কৃষ্ণপদো আবার মারে।

বাপ চেঁচায়, বিষ্টু আরও শক্ত—আরও শক্ত করে ধর—

বড় আর মেজ মেয়ে উপেক্ষিতা। তারা তাদের বাপের কাছ থেকে কোনো খেলা পাচ্ছে না। মন মরা হয়ে দাঁড়ায় দেওয়াল ঠেসে!

বাপের নজর যেতেই বলে, মা তোরা দুটো লাঠি বার কর।

খুঁজে খুঁজে আনে পুরনো ধুলোপড়া লাঠি।

হারু চাউলে বলে, নে একজন ভাইয়ের মতো ধর।

দুই বোনে ভায়েদের মতো লাঠি ধরে। লাঠির উপর লাঠির আঘাত হানে। ঠকাঠক শব্দ হয়। নিজেদের শির বাঁচাতে শেখায়।

ঠকাঠক্ খটাখট্ শব্দে ঘর বারান্দা ভরে যায়। হারু চাউলে বলে, রোজ সকালে ভাইবোন আমার সঙ্গে উঠোনে এক ঝুল লাঠি খেলবি—

মেয়ে দুটোর চুড়ি ঝন্ ঝন্ বাজে। লাঠির খট্ খট্। বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ বাজনা। নিজের গৃহে অস্ত্রের বাজনায় ভরে যায়। ক্রমে নিজের দেশটাও তো একই বাজনায় মেতে উঠতে চলেছে! হুট করে বলে, জান জাত জমি বাঁচাতে গেলে তোদের শিখতে হবে রে—

ঝাঁকা মাথায় লোকটা। পাশে তালপাতার শার্সি মাথায় ধনা। কাছারির গেট খুলে চেঁচায়, বাবু ধরে এনেছি—

—নে আয় এখেনে, গড় কাঁপিয়ে উত্তরটা শোনায় হারুবাবু।

ঝাঁকা মাথায় লোকটা চমকে যায়। ভারি ঝাঁকাটা খানিক মাথা হড়কায়। হাঁটু অব্দি গাঙের নোনা পাঁক। ঝাঁকার জল টপে। খালি গা বেয়ে বৃষ্টি গড়ায়। একেবারে উঁচু দাওয়ায় ঝাঁকাটা রেখে দম ফেলে

একটানা ডিঙি থেকে বয়ে গাঙ পার হয়ে কাছারি বাড়ি। উপরে গাময় বৃষ্টির দরানি তার তলায় চামড়া ফুঁড়ে বিন্দু বিন্দু ঘামের ধারা।

চকে চকে ইলিশ। সদ্য গাঙ থেকে খুঁটে আনা রুপোলি শস্য। দু-চোখে দেখতে দেখতে লালসায় গাল ভর্তি হয়ে যায় হারুবাবুর। কড়া গলায় বলে, ধনু—বাছ বড় বড় গুলো।

প্রায় দেড় সের পোনে দু-সের এক একটা ইলিশ। ছোটগুলো ঝাঁকায় পড়ে থাকে। বাকিগুলো শান বাঁধানো দাওয়ায়। মেঘলা আকাশের আলোয় আঁশ-গুলো মুক্তোর স্তূপ। হারুবাবু বলে, ধনা গুনে নে—

ধনা গুনতে শুরু করে, রাম—দুই—তিন—চার···

বউ ছেলে মেয়েরা দাওয়া জুড়ে। রান্নার ঝি চাকর খাতা লেখা সরকারবাবু, খড়কাটা চাকর বাকর সব হাজির। গাঙ ধারে বসবাসী। মানুষগুলো নোনা-

জলের জীবন্ত সোনার টানে গায়ে গা ঠেসে দাঁড়ায়।

রিম ঝিম বৃষ্টিতে বাতাস ঠাণ্ডা। হারুবাবুর স্নায়ু শিরাও শান্ত। মনটা বিবেচনায় রসস্থ। হঠাৎ বলে, ও ধনু—যেন কাছারিসুদ্ধ সব লোকের পাতে পড়ে—।

ঝুল ঝুল করে বৃষ্টি নামে। ঝি চাকরানি বউ মেয়েগুলো খিল খিল হাসে। মাঠঘাট জলে টপটপে। বীজ ধানের চারা পাতা ছেড়ে বড় হয় অনেকখানি।

বৃষ্টির মধ্যেও ব্রিক ব্যাটস্ পিষ্ট নতুন সড়কে কালো ট্যাক্সি দাঁড়ায়। রোগা লম্বা মানুষটির পায়ে রবারের কালো গামবুট হাঁটু অব্দি। খুব দ্রুত রেন কোট গায়ে গলায়। মাথার টুপি ভাল করে বেঁধে ছাতিটা খাটায়। সঙ্গী লোকটাকে বলে, বিধু ভাল করে কাপড় সাঁট। জুতো কাঁধের ব্যাগে নে। ছাতা খোল—

নোনামাটির পথে বর্ষার ঝাপটা। কাদা, পা টিপে টিপে হাঁটে বিধু। ডান-হাতে বাঁশের ডাপের ছাতা। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট। সামলে হাঁটে। পাশের মানুষটার গামবুটের তলায় কাদা জমে ভারী। পথের ধারে ঘাস দেখে জুতো ঘষে হালকা করে নেয়।

কাঁচা ইলিশ সামান্য তেলে ফেলতেই রান্নাঘর মেতে ওঠে। মাছের গা নিংড়ে তেল চিয়োয়। কড়ায় কল কল শব্দ। ভাজা গন্ধ রান্নাঘর ছাপিয়ে হারুবাবুর দালানে। হাতের লাঠি পাশে সরিয়ে রেখে চেঁচায়, কই গো—আমাকে মুড়ি আর এক থালা ভাজা মাছ এক্ষুণি দাও। খিদে লেগেছে—

বড় বড় ক'খানা দাগায় দেড় দুসেরের ইলিশ শেষ। গরম ভাজা মাছগুলো থালা সাজাতেই চুড়ো। রান্নাশাল থেকে মাছের সুগন্ধ গোটা কাছারি বাড়ি জুড়ে। জলে বাতাস ভারী। সেই সুগন্ধ উঠোন দাওয়া চারিয়ে পাক মারে। মানুষের লালসা উসকে যায়।

একখাবলায় বড় দাগাটা নিয়ে গালে পোরে হারুবাবু। একপাক চিবিয়ে কাঁটা বাছে। পাশে মুড়ি পড়ে থাকে। থালার মাছই খায় হারুবাবু। একটা একটা মাছের দাগা শেষ হয় পাশে কাঁটা জমে। বড় কাঁসার থালায় মাছ কমে নীচের তেল চিকমিকোয়। হাতে খানিকটা তেল নিয়ে চাটে। হঠাৎ গলা ছেড়ে চেঁচায় হারুবাবু,—রান্নাঘরে কে আছিস রে-এ শুনে যা—

মাঝবয়েসী ঝিটার হাতে আঁশ লেগে। বলে, বাবু—

—তোদের গিন্নিমাকে খান চারেক গোটা ইলিশ ভেজে দিতে বল।

ঝিটা শুনে চলে যায় দ্রুত পায়ে। এখনও অনেকগুলো মাছ কাটা বাকি। হারুবাবু আবার গলা চড়ায়, এই মেয়ে—

পেছন ফেরে মাঝবয়েসী ঝিটা। —এজ্ঞে?

—পেটের তেল পোঁটা বের করে দিবি। ডিম থাকলে—সবসুদ্ধু ভেজে দিবি—, যা—।

বারান্দা ফাঁকা। ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরে কিলবিল করে। ফাঁকা ঘরে একলা মাছ চিবোয় হারুবাবু। কাঁটা বেছে মাছের শাঁস পরম সুখে গিলতে থাকে।

গায়ে রেনকোট ভারী লাগে। মাথায় ছাতি। ফাঁকা মাঠে দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে। রোগা ফর্সা মানুষটি গামবুট টেনে টেনে হাঁটে। দু-পাশে চাষের মাঠ। চাষি মজুররা জলে ভিজে কাজ করে। সবুজ ধান চারা রুয়ে যায়।

রেনকোট গায়ে রোগা ফর্সা মানুষটা বলে, ও বিধু ফেরি বোটে এলে বোধহয় ভাল হত?

—তা হত। তবে আর খানিকটা—। এসে তো গেছি—

পথের পাশে বিঘে খানিক জমিতে ঘন সবুজ। বীজ চারা মাথা তুলে বৃষ্টিতে ডগমগিয়ে ভিজছে। রেনকোটবাবু দাঁড়ায়। ভীষণ আপশোসে এদিক ওদিক তাকায়! চারদিকে মাঠে মাঠে জল জমে সাদা।

সঙ্গী লোক বিধু বলে, বাবু—মন খারাপ করবেননি। পাওয়া যাবে—

ঝকঝকে কাঁসার থালাটা দু-হাতে ধরে আনে স্ত্রী কমলা। গোটা গোটা চারখানা ইলিশের গা থেকে গরম ভাজা গন্ধ। মাছগুলো শুয়ে থাকে থালার খোলে।

কাছারি বাড়ির গেট গোড়ায় দাঁড়িয়ে রেনকোট গায়ে বাবু। পাশে ছাতা মাথায় সঙ্গী।

গড়ের বাগানে কাজের লোকটা বলে, কোথায় যাবে গো বাবু— ?

রেনকোট গায়ে ফর্সা মানুষটা বলে, তোমাদের বাবুর কাছে—। বাবু আছে— ?

—এজ্ঞে? আছে, বলে কাজের লোকটা পথ বরাবর উঠোন চিরে সোজা দালান কোঠার দিকে তাকায়।

কাজের লোকটার দ্বিধা দেখে রেনকোট গায়ে মানুষ বলে, আরে তোমার বাবু আমার মামা হয়—

—তবে যাও। দ্বিধা কাটল কাজের লোকটার।

খুব মন দিয়ে মাছের কাঁটা বাছে হারুবাবু। খুশিতে দু-চোখ সকালের প্রস্ফুটিত ফুল। গামবুটের শব্দ জোড়া ক্রমশ নিকটতর হয়। বৃষ্টির দমক কমেছে। শব্দ জোড়া কানে বাজতেই হারুবাবু ঘরের মেঝে থেকে দরজার দিকে তাকায়। চোখে পড়ে সিধে গেট অব্দি। থালায় ভাজা মাছ সামনে অমন রেনকোট, পায়ে গামবুটওয়ালা লোক। এক ঝলকে পুলিস দারোগা বলে ভ্রম জাগে! আবার নজর কয়ে হারুবাবু,···রেনকোট মানুষটার গামবুটের হাঁটুর কাছ থেকে পাতলা ফিনফিনে ধুতির পাড়। দারোগা পুলিস হলে তো খাকি পা প্যান্ট! সঙ্গী লোকটা অমন মজুর মুটে হবে কেন? এরকম ধারণা থেকে হারুবাবুর কণ্ঠে নির্দ্বিধা। খাবার সময় বাইরের লোক তাই বেশ কড়া গলায় বলে, কে তোমরা? কি চাই··· ?

কথা যখন হয়েছে এপক্ষের রোগা ফর্সা মানুষটা ঝটপট টুপি খোলে। কোটের বোতাম আলগা করে। একটু একটু এগিয়ে বারান্দার মধ্যে ঢোকে। ছাতা মুড়ে রাখতেই খানিক জলের দাগ। নমস্কার জানিয়ে বলে, মামা—আ-

চেনা গলা। চেনা চেহারা, সাদা ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি লাটখেয়ে অনেক

ভাঁজ। হারুবাবু চিনতে পেরে চেঁচায়, আরে রায় তুই অসময়ে···।

—তোমার কাছে আসতে বাধ্য হলুম।

—কি রকম?

—আমার পঁচিশ বিঘের চাষ একদম হেজে গেছে। বীজ চারা দিতে হবে—

—পঁচিশ বিঘে···!

—হ্যাঁ মামা। বড় ডিঙি নিয়ে তোমার কাছারির গাঙ পাড়ে ঠেকাব—এখেন থেকে আমার এই লোক নিয়ে একেবারে ঘুঘুডাঙার লাটে যাবে—

—তা এখন? এক্ষুণি?

—না মামা। খুব তাড়াতাড়ি যেদিন ব্যবস্থা করবে—।

—হবে। বোস। তোরা জলখাবার খা—, বলে জোরে হাঁক মারে হারুবাবু। মস্ত কাছারি বাড়ি দুলে ওঠে।

কাজের ঝি মেয়েটা দৌড়ে আসে, এজ্ঞে!

—ওই বাবুকে আমার পাশে জলখাবার দে। ওই লোককে ও বারান্দায় দিবি—

নির্দেশ পেয়ে ঝি চলে যায়। হারুবাবু গোটা মাছটাকে ধরে দাঁতে কাটে। রায়বাবু দেখে। সঙ্গী বিধুও দেখে। অমন কালো গোল মুখ। সাদা দাঁতে মস্ত ইলিশটাকে ধরে মাছ ছাড়ায়। বিধুর চকিতে মনে হ'ল, জলের মধ্যে ভোঁদড় মাছটাকে কামড়ে ধরেছে···।

থালায় পনের ষোলটা দাগা। গরম ভাজা গন্ধ। এক ধামা মুড়ি থেকে কাটিয়ে দেয় ঝিটা। রায়বাবু আঁৎকে ওঠে, ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌। মামা—মাছ মুড়ি তুলে নিয়ে যেতে বলো—।

—আরে থাক না। আমার পাশে বসেছো—খাও পেট ভরে। ভাত খেয়ে তবে বাড়ি যাবে—

—এর পর? একদম না মামা—

—ঠিক আছে খাও, বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, আমাকে খেতে দাও—

পরিবেশ আবার বদলে যায়। এক একটা দিন, দিনের মুহূর্তগুলো যেন মামার কাছে খাদ্য খাবার ভক্ষণের জন্য। সে কাজটি সারা হলে বাকি সময়টা অন্য কর্তব্যের জন্যে বরাদ্দ। মামা খায়। এতক্ষণ কথাবার্তায় যে সময়টুকু অপচয় হয়েছে উসুল করে নিতেই মনোযোগ দেয় থালার মাছে।

রায়বাবু সাবধানে কাঁটা বাছে। একটা পিস শেষ করতেই সময় যায়। মামা খান দুয়েক আস্ত মাছ শেষ করে বলে, হাজিপুরে হালদার ভাঁড়ারিরা করছে কী বলো দিখি?

—কেন মামা?

—এখেনে যে মোড়ল পাড়ার আরফৎ নেছাররা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। ইউনিয়ন বোর্ডের ভোট তাদের মনে আছে?

—কেন থাকবে না? তুমি যাও না একবার সব বলে এসো তাদের—

—হুঁ। দিন চারেক পরে মামলার ডেট। আমি কোর্ট সেরে সব কটার সঙ্গে

দেখা করে তবে ফিরব—। একটু থেমে রায়বাবুকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকে, হ্যাঁরে—খালের ওপারে কমুনিস্ট্‌দের সে অফিসঘর আছে ?

—বাব্‌বা। থাকবে না ? কটা নতুন ছোকরা তেলেভাজাওলা আর ঘোষ উকিল তো ভিটির ভিটির মিটিং করে—

—এত হিন্দু মুছুনমানে রেষারেষি কেন বল দিখি ভাগ্নে ?

মাছের কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে রায় বলে, শুধু তোমার এই লাটে ? দেশময় লেগেছে। একদিকে জিন্না আর একদিকে গান্ধী জহরলাল প্যাটেল ঠিক মধ্যিখানে বড়লাট তারপর তো লন্ডনের মন্ত্রীসভা আছে—

তিন নম্বর মাছটার শাঁস চুচে নিয়ে শুধু কাঁটার কঙ্কাল থালায় পড়ে। খাদ্যের লালসা খানিক কমেছে তাই হারু মামা জানতে চায়, কে ? চার্চিল ?

—ওর কোয়ালিশান মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেছে। শুধু ভোটের জন্যে ক'মাস দায়িত্ব নিয়ে আছে।

—তবে ? হারু মামার এই দূরে আবাদী লাটে বেশিসময় কাটে। দেশ ও বিশ্ব রাজনীতির নিত্য সংযোগ নেই। নিজেই যে গড় কেটে কাছারি বাড়ি ধান খড় পুকুর মাছ আগলাচ্ছে। গড়ের জল খাদ পার হয়ে খবর আসতে অনেক দেরি হয়ে যায়।

—আমাদের দোষও আছে।

রায়বাবুর কথায় হারু মামা বিস্মিত ! জানতে চায়, কি রকমরে ভাগ্নে— ?

—ফজলুল হক যখন আইন পরিষদে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী চাইল তখন তো মুসলমান সদস্যরা সমর্থন করল রায়ত প্রজা গরিবদের পক্ষে। প্রজা তো হিন্দু ছিল মুসলমানও ছিল। আর জমিদারদের পক্ষে তো সব হিন্দুসদস্য কংগ্রেসি জমিদাররা মত দেয়। মুসলমান প্রজাদের প্রতি অবিচারের রাগটা যাবে কোথায় ?

হারু মামা ফিস ফিস করে বলে, গরিব মজুর চাষি প্রজা তো ওরাই বেশি। সব জমিজমা ওদের বিলিয়ে দিতে হবে— ?

রায়বাবু চণ্ডমণ্ডিয়ে জানতে চায়, কেউ মুসলমান নেই তো ?

—না না, বেশ জোর ফলিয়ে আশ্বাস দেয়।

রায়বাবু ফিসফিস করে বলে, ওরা বেশি মুসলমান বললেই কি আর মুসলমান ছিল ? বিবেকানন্দ বক্তৃতায় বলেছে, যত উচ্চবর্ণীয় হিন্দু আর জমিদার অর্থবানদের চাপে পড়ে গরীব নিচু জাতের মানুষগুলো পরিত্রাণ পেতে মুসলমান হয়েছে। দোষ তো আমাদেরও আছে—

রাগে ফুঁসে ওঠে হারু মামা। চেঁচিয়ে দাঁত কিড়মিড়োয়, ওসব কৌপিনধারি সাধু ঋষিদের কথা বাদ দে তো। জপ তপে দিন কাটে। বিষয় সম্পত্তির কী বোঝে ? একটু থেমে লম্বা হাতটা বাড়িয়ে আতঙ্কগ্রস্ত ভাগ্নে অতিথির মনে জোর দিতে বলে, জমিদারি লাটদারি না আগলে রাখতে পারলে এইসব খাবার-দাবার কি ব্রিটিশ ঘর বয়ে এনে দেবে ? তোর ঘুঘুডাঙার লাট থাকত ? আর শোন—ওদেরও তো দু-চারজন বেশ বড় জোতদার লাটদার আছে—

রায়বাবু উত্তর জমাবার আগেই ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়ার দমকা। —কিন্তু মামা ?

হারুমামা হাত ঝাপটায় থামিয়ে দিয়ে বলে, ওসব হালদার, ভাঁড়ারি, গান্ধীর দ্বারা হবেনি। শ্যামাপ্রসাদের দরকার। দাঁড়াও আমিই কলকাতায় যাচ্ছি শরৎ বোসটাকে একবার বলি—

আকাশ কালো করে মেঘ ছেয়ে যায়। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ে। উঠোনময় বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। কাছারিবাড়িতে দিন দুপুরে আঁধার। পাশে গাঙ ঝাঁপিয়ে সাঁ সাঁ আওয়াজ। রায় ঘরের মধ্যে অন্ধকার দেখে। বলে, বাড়ি যাব কী করে ?

—একেবারে তো জলে পড়নি ? আগে মাছ কটা শেষ কর—

রায় চুপচাপ দেখে। ভাবে, মানুষটা এখন আর দেশপ্রেমিক নয় পুরোপুরি খাদ্যপ্রেমিক।

ঊনিশ

সকালবেলায় জবারানী থালা বাসন ধোয়।

সদয়কুমার আঁচ ধরিয়ে আনাজ কোটে। বঁটিটা বেশ বড়। প্রতিদিন আলু বেগুন কুমড়োর খোসা ছাড়িয়ে ক্রমশ ধারাল। একটা ঝড়ায় গোটা সব্জি আনাজ।

ধিকধিক করে উনুনে আগুন জমে। ধোঁয়া উগরোয় বড় বড় তিনখানা ঝিকের গোলগাল থেকে। ঘুঁটে কয়লার দাহিকা উসকে যায়। ধোঁয়া বলকে বলকে প্যাক খায়।

মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ের টিনের আচ্ছাদনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

সদয়কুমারের সামনে গুড়ে ভুঁড়ে বসে হাত লাগায়। কাটা আনাজগুলো ভাঙা থালে মাটির সরায় গুছিয়ে গুছিয়ে ভরায়।

কাপড় চোপড় ছেঁড়া, বিবর্ণ ফর্সা মুখে বিধবা মেয়েটা রুগ্ন কণ্ঠে বলে, মা —মা গো দুটো খেতে দিবি ?

গুড়ে পেছনে তাকায়। ভুঁড়েও ঘুরে বসে। সকালে মাটির মেঝে বেশ ঠাণ্ডা। সবে বর্ষা খানিক দমিত।

জবারানী থালা বাসন ধোয়া থামিয়ে দোকান ঘরের সামনে হাজির। বলে, কি রে মা ?

মা জবারানীর পিছনে গুড়ে ভুঁড়ে আসে। বিধবা মেয়েটা বলে, দুটে খেতে দিবি মা ?

—এই সকালে কোথায় পাবোরে জননী ? দুপুরবেলায় আসিস মা যদি কিছু পারি।

তবুও ফর্সা মুখ বিধবাটা বলে, মুঠো খানেক হবে নে— ?

—নারে মা।

বিধবাটা বাচ্চা দুটো দেখে চমকায় ! বুকের মধ্যে আঁচড়ে পিচড়ে ব্যথা। ফট করে জিজ্ঞেস করে জবারানীকে. ও দুটো তোর মা— ?

বিধবাটা মুহূর্তে একমুঠ ভাতের প্রার্থী থেকে কেমন বদলে যায়। আকুল চোখে গুড়ে ভুঁড়েকে দেখে ! সে চোখে হারিয়ে ফেলা রত্নের ক্ষতিপূরণের চাহনি। জবারানী ভয় পেয়ে বাচ্চা দুটোকে কাছে টানে।

বিধবা মেয়েটা বলে, তোমার ছেলেরা মা ?

মৃদু মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় জবারানী।

বিধবা কেমন আপশোসে আকাশে তাকায়। আকাশের তলায় মাটিতে কোন ডেরায় যে মেজো সেজোটা কোথায়···কেমন আছে··· ! বিধবা মায়ের মনও নারী হয়ে ভরে ওঠে। জবারানীর চোখে একটু প্রতিরোধের তেজ। বেশি কিছু না বলে বিধবাটা বলে, মা তোদের হোটেলে ঝিয়ের কাজ মিলবোনি— ?

এক চক্করে উত্তর দেয় জবারানী, ঝি রাখার মত হোটেল নয় রে মা। কত উকিল মোক্তার বাবুলোকের ঘর আছে—তারা কাজের মেয়ে রাখে সেখানে যাও—

বিধবাটা জবারানীর দিকে তাকিয়ে বাচ্চা দুটোর টানে চেয়ে চেয়ে পথ হাঁটে।

ঘরময় ধোঁয়া। দু-হাতে গুড়ে ভুঁড়েকে আগলে জবারানী থালা বাসনের কাছে যায়। ধোঁয়ায় জবারানীর চোখে জল। আঁচলে মুছে কাজে মন দেয়। শ্বশুরভিটে হলে প্রথম সকালে ঘর দাওয়া ন্যাতা পোছা, বাসন কোসন মাজা-মাজি। গোরু গোয়াল ঘর পরিষ্কার। তারপর ক'জন মানুষের জন্যে ভাত পানতার ব্যবস্থা। কিন্তু মহারানী ভোজনালয়ে ? ঘরের মানুষ তো উপলক্ষ্য মাত্র। আসল মানুষজন বাইরের। যারা খদ্দের হয়ে আসবে--তাদের পেট ভরিয়ে খাইয়ে দাইয়ে তুলতে পারলেই তো তবে নিজেদের পেটের ভাত জুটবে। একটা সংসার তো স্বনির্ভর নয়। বরং পরনির্ভর···কিংবা পরস্পর নির্ভর··· ! বাসনটা মাজতে মাজতে জবারানীর মনে হল, কোথায় আর দাঁড়াল সংসারটা !

বড্ড ধোঁয়া দোকানঘরটায়। গুড়ে ভুঁড়ে বাইরে আসে। বেশ হাওয়া। আর চোখ জ্বালা করে না। তারা দোকানগুলোর গা ধরে হাঁটতে থাকে। সেই মিষ্টি দোকানটা পায়। কত যে মিষ্টি মিঠাই সাজান। গুড়ে হঠাৎ দোকানের ভিতর মুখ বাড়ায়। ভুঁড়ে বলে, কিরে দাদা— ?

—সেই মোটা লোকটা···কত কত খায়···সে নেই ?

প্রবল আগ্রহে ভুঁড়েও মুখটা দোকানের ভিতরের দিকে ঢোকায়। তেমন কেউ নেই। আর একটু এগোতেই কাঠের দোকান। চেয়ার বেঞ্চি তৈরি হচ্ছে। কাঠের দোকানটা ফেলে এগোতেই চমকে যায় গুড়ে ভুঁড়ে ! মকবুল কাকা ডাকে, এই তোরা কোথায় যাবি ? আয়—

ইসলামিয়া হোটেলের বড় সিলভার হাঁড়ি। বড় বড় ক'খানা ডেকচি। আনাজ কুটে কুটে ডেকচিতে ফেলে মকবুল সাহেব। বলে, এদিকে বেড়াতে এয়েচিস ?

গুড়ের গলা জড়িয়ে যায়। ভুঁড়ে মাথা নেড়ে জানায়, হুঁ।

দু-ভাই গোটা ঘরটা দেখে। উঁচু চাতালে খাওয়ার জায়গা। বড় বড় প্লেট। কলাইয়ের উপর ফুল কাটা। দেওয়ালের গায়ে খানিক বাদে বাদে ক্রমিক নম্বরগুলো দু-ভাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ভাবে, আমাদের মাটির দেওয়ালে সাদা রঙ নেই। অমন মাথা ছাড় দিয়ে লেখাগুলো তো নেই··· ! গুড়ে ক্রমিক নম্বরের গায়ে আঙুল ঘষে ঘষে দেখে···। মকবুল সাহেব হাঁকে, ওদের দুটোকে দুটো বিস্কুট এনে দেতো ছামাদ—

বাচ্চা দুটো ইসলামিয়া হোটেলের রান্না ঘরে ঢোকে। নিজেদের রান্না ঘরের মতো দু-খানা বড় উনুন। কয়লার আগুন গন গনে। বড় ডেকচিতে ডাল ফুটছে। খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক ! সামান্য কাদা পাঁকের পরই গাঙ। ছোট বড় ঢেউ ভর্তি হয়ে জল ফুলে ফুলে উঠছে। নৌকো বোট বেয়ে যায়। ভয়ংকর দু-খানা বড় চাকায় গাঙের জল তোল পাড় করে কালো স্টিমার।

ছামাদ বিস্কুট আনে। মকবুল কাকা ডাকে, কইরে ছেলেরা নিবি আয়—

গুড়ে ভুঁড়ে বিস্কুট পেয়ে গালে এক কামড় দেয়। বলে, তোমাদের হোটেল গো ?

—তোদের কী মনে হয় ?

গুড়ে জানতে চায়, কী নাম ?

মকবুল বলে, তোদেরটার নাম ?

গুড়ে পট করে শোনায়, মহারানী হিন্দু ভোজনালয়।

মকবুল গুড়ের মুখস্ত কথাটা শুনে হাসে। পরে বলে, আমার হোটেলের নাম মনে রাখতে পারবি ? দু-ভাই একসঙ্গে বলে, হুঁ

মকবুল আর ছেলে দুটোকে বঞ্চিত করতে পারে না। বলে, ইসলামিয়া হোটেল—

গুড়ের কানে খট্ করে বাজে,···ইসলামিয়া হিন্দু···তারপর হোটেল কথাটা কেন যে সাজানো নেই··· !

হাতের বিস্কুট গালে। তখন বাপ সদয়কুমার চেঁচায়, এই-ই ও গুড়ে ভুঁড়েরে—এ-এ—

মাত্র সাত আটখানা দোকান পাটের দূরত্ব। বাপের মাঠ ডিঙোন চিৎকার মফস্বল শহরের রাজপথে। মকবুল বলে, ওই তোদের বাপ ডাকে। ছোট—ছোট—দৌড়ো—

তখন জার্মান দেশে ন'শ বছরের পুরনো শহর ন্যুরেম বার্গে মেটালড্ রোড কাঁপিয়ে ছুটছে কত মিলিটারি অফিসারদের গাড়ি। সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষক মানুষদের উৎসাহী ও উদ্বেগপূর্ণ মুখ। জার্মান যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার পর্ব শুরু হয়ে গেছে কয়েক মাস আগে থেকে। এখন এই মফস্বলে শীতের ছোঁয়া।

বিচারক মণ্ডলীতে আছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মেজর জেনারেল নিকিতাচেঙ্কো, লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ভোলকোভ আর ব্রিটিশের দিক থেকে আছেন উইলিয়াম নর্মাল রিবকেট, জিওফ্রে লরেন্স। ফ্রান্সিস্ বিডল্ ও

জন পার্কার আমেরিকার প্রতিনিধি বিচারক। দোনাদিউ দি ভাব্রিস এবং রবার্ট ফালকো ফ্রান্সের পক্ষ থেকে।

আর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব উকিল তো ছিলই। চার'শ তিনখানা অধিবেশনের মধ্যে কয়েক খানা পার হয়ে গেছে।

"জার্মান নাৎসি বাহিনীর সর্বোচ্চ শ্রমিক নেতা লে। রবার্ট লে বামপন্থী শ্রমিকদের গুপ্ত হত্যা জখমে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল জার্মান মাটিতে। হাজারে হাজারে শ্রমিক দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। রবার্ট লে'কে বন্দী সেলে ওয়ার্ডার জিজ্ঞেস করল, এত রাতেও আপনি ঘুমুচ্ছেন না কেন?

অক্টোবরের শীত লেগেছে ইউরোপের ভূগোলে।

"ওরা আমাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ বিদেশি শ্রমিক মুখের রুটি ফেলে পালিয়েছে।

ওহ্...ভগবান! লক্ষ লক্ষ ইহুদি খুন হয়ে গেছে...।"

ওয়ার্ডার ভাবে, মানুষের নেতা রবার্ট লে। কোন শ্রমিক-মানুষদের যে নেতা হতে চেয়েছিল লে' সাহেবটা!

বিচার পর্বের অধিবেশনে জার্মান নাৎসি তত্ত্বের উদ্গাতা আলফ্রেড রোজেন বার্গ অভিযোগের উত্তরে চিৎকার করে বলেছেন, "আমি দায়ী নই।" অথচ তাঁর পুস্তকে আর্য রক্তের শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার। তাঁর নির্দেশে গেস্টাপো বাহিনী এক পায়ে খাড়া। প্রস্তুত কুখ্যাত গ্যাস চেম্বার।

রোজেন বার্গ তাঁর চিকিৎসককে বলেছেন, "কি বলবেন চীনের বুকে মুক্ত দুয়ার নীতি নিয়ে যেখানে তিনকোটি মানুষকে আফিম খাইয়ে বুঁদ করে রাখল ব্রিটিশরা? আপনি কখনো আফিমখানায় গেছেন? কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চাইতেও ভয়ঙ্কর। আপনি জানেন না আমেরিকানরা কিভাবে রেড ইণ্ডিয়ানদের খুন করছে। জানেন কারা পৃথিবীতে প্রথম কনসেনট্রেশন ক্যাম্প চালু করেছিল? ব্রিটিশরা বুওর যুদ্ধের সময় যাতে আফ্রিকানরা অস্ত্র ত্যাগ করে।"

এরপর জাতিতত্ত্বের উদ্ভাবক হিসাবে রোজেন বার্গের নাম উচ্চারিত হলে তিনি প্রবল আপত্তি জানিয়ে তাঁর উকিলের মাধ্যমে আমেরিকান, ফরাসি ও ব্রিটিশ জাতিগত তাত্ত্বিকদের লেখা পড়ে শোনান। তিনি উল্লেখ করেন আমেরিকান জাতিবিদ্বেষী লেখক মেডিসন গ্রাটকে। যার লেখা বই "দি ডিক্লাইন অফ্ দি গ্রেট রেস" থেকে তো আইন তৈরি করেছে মার্কিন কংগ্রেস। যে আইনের উদ্দেশ্য হ'ল আমেরিকান রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা।

বিচারকদের অধিবেশনে জার্মান সৈন্যবাহিনীর সুপ্রিম কম্যাণ্ডারদের প্রধান কাই টেল বলেন, "আমি একজন সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। সর্ব বিষয়ে দায়ি হচ্ছেন তারা যারা বেঁচে নেই—সেই হিটলার হিমলার... !"

ট্রেবলিংকা, মাউথাউসেন, রিগা, ডাচাউ, আউৎস উইক ও মাজদানেক এক একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। আউৎস উইক নরকের সর্বময় কর্তা রুডলফ্ বিচারকদের সামনে হেসে হেসে গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, আমার ক্যাম্পে খুব উন্নতমানের চুল্লি ছিল। খুব সহজে সাইক্লোন-এ সাইক্লোন-বি গ্যাস প্রয়োগে

মুহূর্তে কয়েক হাজার মানুষকে মেরে ফেলা যেত। সে তুলনায় ট্রেবলিংকা অতি পুরনো টেকনোলজির। গ্যাস প্রয়োগে মানুষগুলো একটু একটু ছটপট করে যখন শেষ হয়ে যেত তাদের দেহ নিংড়ান চর্বি গলিয়ে সুগন্ধী সাবান হত। মেয়েদের মাথার চুল দিয়ে নরম গদি—সোফা সেট হত⋯।"

কাছারির উঠোনে রোদ। একটু একটু শীতের আমেজ। খাওয়া দাওয়ার পর বড় বেঞ্চে দু-পা গুটিয়ে বাবু হয়ে বসে আরাম পায় হারুবাবু। মাথায় রোদ বাতাসের হাওয়া। সকাল সকাল ইউনিয়ন বোর্ডের ভোট দিয়ে এসে অনেকটা পথ হেঁটেছে। তাই আরামে একটা বিড়ি ধরায় হারুবাবু।

খাতা লেখা সরকার বাবু কাছগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে, কে জিতবে? কামারবাবু না আরাফাৎ?

—কে আরাফাৎ? মাথা খারাপ—? এদিকে ক'ঘর মুছুনমান আছে বলে মুসলিম লিগ হয়ে গেল?

—আরাফাৎ তো তাই বলে বেড়াচ্ছে—।

—পাতের কাছে মাছি ভন্ ভন্ করলে তাড়িয়ে দিয়ে খেতে হয়। বুঝলে?

সরকার চুপ করে যায়।

হারুবাবু খড়ের গাদা কটা দেখতে দেখতে বলে, সরকার—খান তিনেক গাদা বেচে দেবার ব্যবস্থা কর—। গাঙে তো অনেকগুলো গাদা বোট সকালে যেতে দেখলুম—

—হুঁ। আজ আরও ভেতর লাট থেকে বোঝাই দিয়ে ওরা গেল বোধ হয়।

—এক কাজ করো।

—কি বাবু?

—এবার নতুন ধান উঠলে গাঙ-পাড় ঘেঁষে খড়ের গাদা দেবে। কটা গাছপালার ডাল কেটে ফাঁকা করে দিও। গাঙের খড় ব্যাপারিরা যেন চোখে দেখতে পায়—

বাবুর ব্যবসায়ি বুদ্ধিকে সমীহ জানায় কাছারির ম্যানেজার। গেটের কাছে কাজের লোকটা চেঁচায়, হাইতো বাবু বসে আছে ব্যাঞ্চিতে—

—কেরে? কার সঙ্গে কথা কইতিছিস?

জোরে হাঁক দেয় লোকটা, বাবু—উ-আমি খগেন।

—খবর কি রে? ভিত্‌রে আয়।

খগেন দৌড়ে আসে। অতোবড় উঠোন। কয়েক মুহূর্তে বাবুর কাছে হাজির। ছুটে ছুটে মাঠ ডিঙিয়ে হাঁপায়। একটু দম নিয়ে বলে, চল। বড্ড গোলমাল—

—বলবি তো কী?

—আরাফাৎ পথ আটকেছে। কামারের লোক ভোট দিতে যেতে পারছে নে—। খগেন বোঝায়।

—আরাফাৎয়ের লোক তারা যাচ্ছেনি?

—তাদের ক'খানা গেরামের ভোট ঝাঁটিয়ে দিয়ে এসেছে—

হারুবাবু বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ায়। বেশ উত্তপ্ত মনে হয়।

খগেন পরামর্শ দেয়, শুধু লাঠি নয়। চৌকি বল্লম নাও—

—সে কি রে!

—ঢোলা থেকে লেঠেল এনেছে, খগেন তথ্যটা জানিয়ে দেয়।

হারুবাবু চেয়ে থাকে খগেনের দিকে। সবে খেয়ে টেয়ে বিশ্রাম। —কোথায় গেলে সকলকে পাবোরে— ?

—নতুন হাটতলায়। মাইতিবাবু কামারের লোকজন সব আছে।

ডান হাতে পাঁচ দাড়ার চৌকি। লাঠির ডগায় ধারাল লোহার ফলা গেঁথে বল্লাম। বাঁ হাতে ঘন বুননের ঝড়া। খগেনের হাতে লাঠি। দুই মানুষ কাপড় সেঁটে দৌড়য়। মেটে পথ উজিয়ে একটানা অনেকখানি।

যেতে যেতে ঘেমে যায় হারুবাবু! বলে, আরাফাৎয়ের মেম্বার হওয়ার খুব শখ, না?

হাট পার হয়ে দলবল ছোটে। মস্ত চেহারায় হারুবাবু। লম্বা চওড়া মানুষ। মাথা ভর্তি কোঁকড়ান চুল। পাঁচ দাঁড়ার চৌকি হাতে যেন সাক্ষাৎ মহিষাসুর রণোন্মাদে ছুটছে। আরাফাৎ ভয়ে হাস খোঁয়াড়ে ঢোকে। সরু ফাটক। মানুষটা প্রাণভয়ে সেঁধিয়ে থাকে।

হারুবাবু হুঁকরে ওঠে, আয় শালা বেরিয়ে আয়—

বল্লাম হাতে খগেন চেঁচায়, হাই যে লেঠেলরা পাল্লাচ্ছে—

হারুবাবু চেঁচায়, খগেন হাসখোঁয়াড় পাহারা দে—। সে ব্যাটা কটাকে একবার জলখাইয়ে আসি—

সঙ্গে মাইতি কামারের লোক লাঠি বল্লাম হাতে। লেঠেলরা অমন দৈত্যাকার হারুবাবুকে দেখে পালায়। প্রাণভয়ে বড় তেঁতুল গাছটায় ক'জন উঠে পড়ে। লাঠি হাতে মানুষগুলো কাক বকের মতো ঝোলে।

গলা ফাটিয়ে হুঙ্কার দেয় হারুবাবু, লাব শালারা—লাব। চৌকি ছুঁড়লুম গাছে—

ধারাল ফলায় চৌকির তাক দেখে তিন চার জন লেঠেল তেঁতুল গাছ থেকে টপ টপ জলে পড়ে। পুকুরটায় জল কম। উল্টে লাঠির চোটে মাথা ফাটে। চৌকির দাঁড়ায় গায়ের মাংস ছিঁড়ে রক্ত ঝরে। জল লাল হয়ে যায়।

হাসখোঁয়াড় পাহারায় দাঁড়িয়ে খগেন। মাঝে মাঝে চেঁচায়, কই বারাবিনি?

হারুবাবু মেতে গেছে খেলায়। চৌকি হাতে খোঁয়াড়ের সামনে। —কই বার হ।

মেম্বর হবিরে—শালা—বাইরে আয়—

হারুবাবুর ফাই ফরমাস খাটা মুরসেদ বারবার হাত জোড় করে, বাবু— লোকটার প্রাণভিক্ষা দাও—

—থাম তুই! চুপ মার—, ধমকে দিয়ে চৌকি খোঁচায় খোঁয়াড়ের মধ্যে হারুবাবু।

আরাফাৎ খোঁয়াড়ের মধ্যে আক্রান্ত অসহায় প্রাণীর মতো কুঁকড়ে মিশে

থাকে।

মুরসেদ হারুবাবুর পা জড়িয়ে খোঁয়াড়ের মানুষটার প্রাণ চায়।

খগেন জ্বালাতনে রুষ্ট হয়ে চৌকি গাঁথে মুরসেদের পেটে!

হারু চেঁচিয়ে অবাক, এই শালার খগেন—একি করলি!

যন্ত্রণায় ছটপটায় মুরসেদ। ফাই ফরমায়েস খাটা প্রিয় মানুষটা জীবন্ত কাতরায়। চোখের সামনে সইতে না পেরে চৌকির ফলা বেগে গাঁথে। মুরসেদ শেষ। একটা অবাঞ্ছিত মৃত্যু মাতাল করে দিয়েছে হারুবাবুকে। চৌকির লোহার ফলা তখনও কাঁচা রক্তে লাল। খোঁয়াড়ের ছোট ফাটকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে উন্মাদ হারুবাবু।

আরাফাৎয়ের শেষ গোঁঙানি আর শোনা যায়নি!

লাটঘাট আবাদের প্রশাসন অনেক পরে খবর পেল। সরকারবাদী কেস। একজনও রাজসাক্ষী নেই। কোর্ট কাছারিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো উকিল মোক্তার দাঁড়ায়নি। আইন তখন শুকনো বাক্য সমষ্টি। প্রাণহীন।

পরের চৈত্রে গ্রাম্য শিল্পীর রচনায় গাজনের গাথা তৈরি হয়—

"আরাফাৎ'য়ের মৃত্যু শুনি
কাঁদে তার মা জননী।"

কুড়ি

উনিশশো পঁয়তাল্লিশের উনিশ থেকে সাতাশে সেপ্টেম্বর ট্রাম-শ্রমিকদের ধর্মঘট। কলকাতায়। বাংলা সরকারের কাছে পাঁচ দফা দাবি—১. ঈদ বা পুজোর বোনাস হিসেবে এক মাসের বেতন। ২. মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি। ৩. কোম্পানি, সরকার ও ইউনিয়নের প্রতিনিধি নিয়ে বেতনবোর্ড এবং দুর্ঘটনা তদন্ত কমিটি গঠন। ৪. অ্যাডজুডিকেশন অ্যাওয়ার্ডস রূপায়ণ। ৫. ট্রাম কোম্পানি কর্তৃক ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আইনগত স্বীকৃতি।

ধর্মঘট শুরুর দিন কর্পোরেশন বৈঠকে কাউন্সিলর হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি ট্রামকর্মীদের দাবির সমর্থনে বলেন, উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে ট্রাম কোম্পানি ত্রিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছিল। উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় চৌষট্টি লক্ষ টাকায়। শ্রমিকদের দাবি মানলে কোম্পানির খরচ বাড়বে দেড় লক্ষ টাকা আর ধর্মঘটের ফলে কোম্পানির প্রতিদিন ক্ষতি ষাট হাজার করে।

আঠাশে সেপ্টেম্বর ট্রাম চালু হল। সাফল্যে শ্রমিক এলাহি বক্সের চোখে জল। আবেগে বলল, 'যখন ট্রামের কাজে যোগ দিই তখন আমরা গোলাম। প্রথম প্রথম ইসমাইল সাহেবকে বিশ্বাস করতে পারিনি। তারপর তিনি আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করালেন।'

সালিশি বোর্ড গঠিত হল। ট্রাম কোম্পানির পক্ষে বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করেন এ. আর. সিদ্দিকী এবং বি. এম. বিড়লা।

ইউনিয়নের তরফে যে দু'জন বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের একজন

ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী।

পরাধীন ভারতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিশি বোর্ড গঠন তো নতুন যুগের সূচনা—এই কলকাতায়।

একুশে নভেম্বর, বুধবার।

"বেশ কিছুদিন পর আবার শুরু হল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচারের শুনানি। কিংবা বিচারের প্রহসন। আই. এন. এ. বন্দীমুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলন। কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘট। চিৎকার 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তি চাই। জয় হিন্দ্, নেতাজী জিন্দাবাদ। দিল্লি চলো। পুলিসি দমনপীড়ন বন্ধ করো। চলো ডালহৌসী স্কোয়ার—।"

কিন্তু পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায় পুলিসবাহিনী। লালমুখো ফিরিঙ্গি সার্জেন্টের দল। ভ্যানের ওপর লাঠিধারী পুলিস। পথে হাজার হাজার ছাত্র।

জমায়েত ক্রমশ অগ্নিতপ্ত। ঘাড়ির কাঁটা সাতটায়। লাঠিচার্জ শুরু। বন্যার মতো ছুটে এল অশ্বারোহী পুলিস। ঘোড়ার পায়ের ছাঁটে ছিটকে পড়ল জাতীয় পতাকা হাতে এক শিখ কিশোর।

ভ্যানের মধ্যে টেনে-হিঁচড়ে তুলেই শুরু করল ছাত্রদের প্রতি বুলেট বর্ষণ। আলো-আঁধারের কলকাতা। নির্মম গুলিবর্ষণ। গুলিতে শুয়ে পড়লেন উনিশ বছরের রামেশ্বর ব্যানার্জি। ক্যালকাটা টেকনিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। ছাত্রসংসদের সহ-সম্পাদক। একশো আটানব্বই বাই বি, হরিশ মুখার্জি রোডের বাসিন্দা।

অফিসফেরত কর্মচারী, কারখানার শিফট্ শেষ হওয়া মজুর, অলিগলির দোকানদার ছাত্রদের সঙ্গে পুলিসের মুখোমুখি অবস্থান। রাত আটটায় কিরণ-শঙ্কর রায় এলেন। বক্তৃতা দিলেন। ছাত্ররা নড়ল না। শরৎ বসু চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ জানালেন। ছাত্ররা পথ ছাড়ল না।

সেদিনকার কমিউনিষ্ট ছাত্রনেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'বসে আছি ছাত্রদের সঙ্গে ধর্মতলা স্ট্রিটের ওপর। একই আলোয়ানের ভেতর তিন-চারজন ছেলে—কেউ কাউকে চেনে না। হাফশার্ট গায়ে একটি স্কুলের ছেলে শীতে কাঁপছে আর মাঝে মাঝে উঠে স্লোগান দিচ্ছে। অন্ধকার রাত্রে গ্যাসের আলোয় ক্লান্ত মুখগুলোর দিকে চেয়ে দেখলাম—সেখানে 'চাঞ্চল্য নয়, জেগে রয়েছে অনমনীয় দৃঢ়তা।'

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এলেন গভর্নর কেসি। এলেন হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাধাবিনোদ পাল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে চাই। তা না হলে আমিও তোমাদের সঙ্গে সারা রাত বসে থাকব— ।'

ছাত্রদের মধ্যে তুমুল উল্লাস।

বন্ধ থাকবে শুক্রবার। গাড়িতে মাইক লাগিয়ে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে কমিউনিস্ট কর্মীরা প্রচার করছে 'পুলিসি জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ চাই'।

শুক্রবার বন্ধ। বৃহস্পতিবার বিকালে মহম্মদ আলি পার্কে জমায়েত। সভাপতি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য রণেন সেন। চল্লিশ হাজার মানুষ উপস্থিত। প্রস্তাব পাস হল, পুলিসি জুলুমের তদন্ত চাই। অপরাধীদের শাস্তি—ধৃতদের মুক্তি। সকল দলের মিলিত প্রতিবাদ কমিটি ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা চাই—।

তারপরে তো দুঃসংবাদ। দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপিকা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলির গাড়ি-সহ মিলিটারি ট্রাকের সংঘাত। শ্রীমতী গাঙ্গুলির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ—। উত্তাপ কলকাতায়। ব্রিটিশ ভীতি উপেক্ষা করে, কোনো জাতবিচার না করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছাত্রদের নতুন স্বপ্নের লক্ষ্য··· !

আতঙ্ক পিছু নিয়েছে। এতগুলো গ্রামবাসী মানুষ। হাটে-মাঠে দেখা হত তারা আর নেই ! ফাঁকা পথে সঙ্গী থাকলেও যেন পিছু নিয়েছে জ্যান্ত হয়ে সেই মানুষগুলো !

মাইতিবাবু গোপনে খবর দিল, হারু চলাফেরায় সাবধান। এতগুলো প্রাণ জ্যান্ত প্রাণ টানতে পারে। দশাসই, চেহারা, বিষয়-সম্পত্তি মাঠ-ঘাট ভর্তি। বইপত্তরের আইনকানুনে তবু যেন জোর পায় না মানুষটা।

কামারবাবু সংবাদ পাঠায়, হারু গুপ্তঘাতকের গন্ধ পাচ্ছি। সতর্ক থেকো।

ধনা আর কাছছাড়া হয় না। পথঘাটে দু-চার জন সঙ্গী কাছারিবাড়ি পেঁছে দেয়। পরামর্শ করে কামার আর মাইতিবাবু, কিছুদিন স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিলে তো হয়। হারুর কি থাকার জায়গার অভাব ?

নতুন ইংরেজি বছরের শীত কেটে বেলা ফেব্রুয়ারি মুখো। একটু একটু করে শীত কমছে। কাছারির উঠোনে আগড় পেতে ধান ঝাড়াই হয়। হিন্দু ছাড়া মুসলিম মজুর একদম নিষেধ। প্রতিরক্ষার প্রাচীর তৈরি এলাকাটায়। মানুষ মানুষ থাকে দিনযাপনে। হাওয়া-বাতাস বয়ে যায় মাঠে গাছপালায়। তবুও গ্রামের সীমানা, পাড়ার চৌহদ্দি মাটি ছাপিয়ে উঁচু হয়।

সন্ধের জোয়ারে হিন্দু দাঁড়ি-মাঝির ছোট বোট ঠেকে কাছারি লাগোয়া গাঙে। হারুবাবু মাঝি কংসকে বলে, চল হাজিপুরে। কাকপক্ষীও যেন পরে জানতে না পারে—

সে আর বলতে হবেনি, মাঝি চাপা গলায় জানায়।

—শোন, কাছে ডাকে হারুবাবু।

মাঝি কংসর হালের তাড়া ধরে আছে ছোকরা দাঁড়ি হরিপদ। একে জোয়ারের টান, তায় পালে হাওয়া লেগেছে। বোট তরতর করে এগোয়।

কংস হারুবাবুর পায়ে হাত দেয়। লোহার মতো শক্ত পেশী। বড় বড় আঙুল, চওড়া ধাঁচের পা। ডান হাত ছুঁয়ে বিনীত সমর্পণে বলে, একদম ফাঁস হবেনি।

—তোর দাঁড়ি বেটাদের সাবধান করে দিবি। মোল্লাপাড়ার কানে একটা কথা যদি যায়—, হারুবাবুর বড় বড় চোখ গোল হয়ে ওঠে।

দশই ফেব্রুয়ারি, উনিশশো ছেচল্লিশ, রবিবার। কলকাতা মুসলিম ছাত্র

লিগের সম্পাদক মোয়াজ্জেম আহমেদ চৌধুরী ও সিটি ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক গৌতম চট্টোপাধ্যায় একটি যৌথ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন—'আগামী ১১ ইং ফেব্রুয়ারি সোমবার কলিকাতায় আজদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন আবদুর রসিদ ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি করিয়া সভা ও শোভাযাত্রা হইবে। ছাত্রসাধারণের ঐ দিবস পালন করিতে অনুরোধ জানানো হইতেছে। ধর্মঘট করিয়া বেলা ১টার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বিরাট ছাত্রসভায় দলে দলে যোগ দিন।'

এর আগে পাঁচই ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সংবাদপত্রে প্রকাশ পেল—'বিচারের প্রহসন শেষে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলিকে সামরিক আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে এবং ভারতের বড়লাট তা কমিয়ে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান দিয়েছেন।'

সভায় প্রধান প্রস্তাব গৃহীত হবার পর লিগনেতা সুরাবর্দি সাহেব বলেন, 'আমার জীবনের একটা আশা আজ পূর্ণ হয়েছে—কংগ্রেস লিগ পতাকার নিচে হিন্দু মুসলমান ছাত্ররা এক হয়ে দাঁড়িয়েছে।' ছাত্রদের ডাক দিয়ে তিনি বলেন, 'পুলিস ডালহৌসিতে লাঠি চালিয়েছে, তার প্রতিবাদে সমস্ত কলকাতাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, এর জন্য আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে কাজে এগোতে হবে।'

'মঙ্গলবার দুপুরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমাবেশও জনসমুদ্র হয়ে ওঠে। স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে দলে দলে সভায় যোগ দেয়। প্রায় ২৫ হাজার মানুষের এই জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র লিগের সম্পাদক আজিজুর রহমান।'

ছাত্র-সভা শেষে কংগ্রেস, লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত সভা শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন সুরাবর্দি।

সভায় মুসলিম লিগের প্রাদেশিক সভাপতি মৌলানা আক্রম খাঁ বলেন, বিনা শর্তে ক্যাপ্টেন রসিদের মুক্তি, অত্যাচারীদের শাস্তি ও মৃতদের ক্ষতিপূরণ চাই। যদি এইসব দাবি মেনে নেওয়া না হয় তবে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য যে হিন্দু-মুসলমান আন্দোলন চালিয়েছিল সেরকম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

রাত আটটায় পুলিস কমিশনার আর. ই. এ. রায় ঘোষণা করলেন, 'শহরে সেনাবাহিনী নামছে। শহরে ১৮ তারিখ পর্যন্ত সেনা টহলদারি থাকছে।' রাত ন'টায় গভর্নর কেসি হুমকি দিলেন বেতার ভাষণে, 'শান্তিকামী নাগরিকদের ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে।'

'স্বাধীনতা' পত্রিকার প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, '…রাত্রি একটা পর্যন্ত খবর ১২৮ জন আহতকে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে আনা হয়েছে।…৬৩ জনকে ভর্তি করে নেওয়া হয়। নিহতের সংখ্যা ৮।…"স্টেটসম্যান"-এর হিসেবে নিহত ১৪।'

বৃহস্পতিবার ৪০, থিয়েটার রোডে সুরাবর্দি সাহেবের বাড়িতে সভা বসে।

উদ্দেশ্য শহরের পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্মিলিত কমিটি। কংগ্রেস নেতৃত্ব বৈঠকে আসেনি। কমিটির চেয়ারম্যান সুরাবর্দি। যুগ্ম সম্পাদক—সোমনাথ লাহিড়ী, ভূপেশ গুপ্ত, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন। সদস্য—আবুল হাশেম, জে. সি. গুপ্ত, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মৌলবী আবুল জব্বার, হবিবুল্লা বাহার, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি, নুরুল হুদা, স্নেহাংশু আচার্য।

ঝকঝকে কাঁসার বড় জামবাটি। বাটির গায়ে মাঝে মাঝে নিজের গোল ভারী মুখ ফুটে ওঠে। ভেতরভাগে ঝোলে-মাংসে তিন/সাড়ে তিন সের পরিমাণ। প্রথম বাটিটা খালি। দ্বিতীয় বাটির ঝোলে মাংসটা দু'আঙুল ধরতে গিয়ে গুলিয়ে যায় হারুবাবুর। ধরতে পারে না মনের মতো মাংসখণ্ডটি। বিপন্নতায় মনটা ভরে যায়। ভরে যাচ্ছে তো কাগজপত্রের খবর পড়ে, জেনে। কংগ্রেস, লিগ, কমিউনিস্টরা একসঙ্গে মিলেমিশে কলকাতার পথে মিটিং করছে। মিছিল করছে। তাহলে কেন যে রাগের মাথায় দেশের গ্রামবাসী আরফাৎটাকে··· মুরসেদটাকে···অমন চৌকি গেঁথে ফেললুম !···ভাবতে ভাবতে আঙুল ডুবে যায় ঝোল-মাংসের বড় জামবাটিতে।

মোটাসোটা বেঁটেখাটো দিদি। শান-বাঁধানো মেঝেয় ভারী পা ফেলে। থপ্‌থপ্‌ শব্দ। এক জামবাটি মাংস এনে বলে, হারু আর এট্টু খা—

গোল ছাঁদের মুখে ভাই বোন। ভাইটা বলে, দিদি—দেবে ? তা দাও—

ভাগ্না নন্টুর গেঞ্জি ফেঁপে ভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চায়। মামার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, ক'দিন আছো এখানে। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে কিনা কে জানে ! কলকাতায় গোলমাল। বড়বাজার থেকে দোকানের মালপত্তর ঠিকমতো আসছে নে। বোটে তেল-ডালগুলো আসার কথা।

—হ্যাঁ রে, কলকাতা থেকে লোক ফিরল ?

—তোমার জন্য খবর পাঠিয়েছি হিন্দু মহাসভার অফিসে—

—তারপর ! কেমন আর্তি হারু চাউলের গলায়।

নন্টু মনে জোর দিতে বলে, থাকো তো এখেনে দরকারমতো। কেউ তোমার গায়ে কুটি ছুঁতে পারবে নে। দারোগা উকিল মোক্তার সব আমার খদ্দের। বড় হাকিম তো মাঝে মাঝে দোকানে বাজার নিতে আসে। সাহেবের আর্দালি আমাদের দেশের লোক—

ভাগ্নের কথায় গোলাভর্তি আশ্বাস। খুশি হয়ে মাংস চিবোয়। পাতের পাশে চিবনো হাড়গোড়ের স্তূপ। এখনও শ'খানেক অনাহারী মানুষের খাদ্য।

হারুবাবু বলে, নন্টু ভাল কিনিছিলিস। কচি খাসির মাংস—কী যে স্বাদ··· !

নন্টু চেঁচায়, মা, মামাকে আর এক বাটি দাও না—

হারুমামা হাসে। দু'কষ, থুতনি বেয়ে তেল-ঝোল গড়ায়।

একুশ

ভোরের প্রথম ট্রাম ঘড়ঘড়িয়ে চলে যায়। ঘুম পুষোবার আগেই জেগে ওঠে হারুবাবু। হাঁড়ির মতো আর্মেচারের দাবনা পুচ্ছ থেকে তিনখানা আটচল্লিশ ইঞ্চি ব্লেডে মাঠের হাওয়া নেই। দক্ষিণের জানালা খুললেও বড় গাঙের নোনা বাতাস যে ক'কুড়ি মাইল দূরে! চারতলা কোঠাবাড়ির অত বড় কামরাটাও যেন দম আটকায় মানুষটার। বর্ষা লাগলেও গরম বোধ করে। ঘেমে ওঠে বিছানায়।

প্রাচীরঘেরা প্রাঙ্গণে ক'খানা পাম ট্রি। দু-একখানা রাধাচূড়া গাছ। ভোর ফুটবার আগেই কিচিরমিচির ডাকে ক'খানা পাখি। বাইরে পাকারাস্তায় ল্যাম্প-পোস্টে আলো। রাজপথ গলিপথে কেমন করে যে রাত মুছে যায় টের পায় না হারুবাবু। কাছারিবাড়ির উঠোনে দাঁড়ালে বাঁয়ে পৃথিবীব্যাপী ফাঁকা মাঠ··· কিংবা ধানচারার ওপর দিয়ে ধু-ধু আকাশ···। ফ্যাকাশে ভোর পরম সোহাগীর মতো রাত মুছে মুছে বিশ্বের কোন প্রান্তে সরিয়ে দিত! এখানে খানিক ফাঁকা আকাশের দিকে তাকালে তিন-চারতলা দালান কোঠায় ভয়ঙ্কর আড়াল।

বদ্ধ কোঠায় প্রাতঃকৃত্যের পর মাথা ডুবিয়ে স্নানের সেই ঘাট-বাঁধানো পুকুর কত মাইল দূরে! নিজের উঠোনে নিম, বাবলা কিংবা খেজুর ডগ ভেঙে মনের মতো দাঁতন···! প্রাচীরের ওপারে ওড়িয়া বা বিহারি মানুষের কাছ থেকে এক গণ্ডা নিমগাছের ডগে কাছারিবাড়ির সে গন্ধ নেই! নিরাপত্তার খোঁজে এসে যে কী মারাত্মক অবরোধ! হারুবাবু পুরনো লোহার রেলিংয়ে দু-কনুই ভর দিয়ে দাঁড়ায়। চোখ দূরের দিকে। ওপাশে সবুজ ঘাসে মস্ত মাঠ। বড় পাঁচিলে শক্ত প্রতিরোধ। ঘাসের রঙে তাঁবু ফেলে সেনাছাউনি। চকচকে রাইফেল কাঁধে ছাউনি টহলদার সৈনিক।

মেন রোডে দু-একখানা বাস যায়। রাজধানী জেগে উঠেছে। গলির ঘর-বাড়িতে জানালা খোলার শব্দ। নিজের কাছারিবাড়ির জানলার বড় বড় পাল্লা ছাড়া আর সব তো গরান কাঠের গরাদ দেওয়ালে গেঁথে আলো-হাওয়া ঢোকার ফটক। এখানে গৃহে জানালা খড়খড়ি ঠেললে তবে ভোর ঢোকে। কাছারি-বাড়িতে ভোর গড়ায়। কাক পাখি ঝাঁক বেঁধে গাঙ চরে খাদ্য খুঁটতে যায়। ক'মাসে খুঁটে খুঁটে আনে হারুবাবু নিজের আবাদ···কাছারিবাড়ি এই বারান্দার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে। হাতের নিমদাঁতনটা একপাক চিবোয়।

মস্ত বাড়ির দারোয়ান মালিরা ফাঁকা চৌবাচ্চার নতুন পাইপ জলে একপ্রস্থ চোখেমুখে জল দেয়। বাঁহাতে ঝকঝকে পিতল-কাঁসার লোটা। দাঁতনটার ডগা চিবিয়ে নরম করে ওপরে তাকায়। মোটা গোঁফ, বড় ভুঁড়ির ওপর সাদা পৈতেওয়ালা দারোয়ানটা চেঁচায়, বাবুজী—রাম রাম—

—রাম রাম জী, উত্তর দেয় হারুবাবু সুপ্রভাত বিনিময়ে।

কালই তো। মিটিং সেরে নামার সময় থমকে দাঁড়ালেন সর্বময় কর্তা মানুষটি। হাঁটু অবধি লং কোট···তার নিচে কাপড়···পা আঁটা পামসু। বড়

বড় গিট্রির বেতাম। গোল ছাঁদের ভারী মুখ। হঠাৎ বললেন, ডাকো তো আমার দক্ষিণের বীরকে—

অফিস দপ্তরের পিয়নটি বড় ঘরের দোরগড়ায় ডাকে, বাবু শ্যামাপ্রসাদজী বুলাতা হ্যায়।

হাজির হারুবাবু। নমস্কার জানিয়ে দাঁড়ায়। চকমকে জুতোয় সিঁড়ির ধাপে ধাপে খট্‌মট্ শব্দ। হারুবাবুর পিঠে হাত রেখে বলেন, কি—ঠিক আছো তো? কোনো অসুবিধে হচ্ছে?

—আজ্ঞে না।

উপস্থিত সব লোকজন সংঘ-সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, এর কোনো অসুবিধা হয় না যেন—।

ডাকসাইটে হারুবাবু শিশুর আনন্দে আত্মহারা, এরা সকলে ভাল।

—তাহলে তো চিন্তা নেই।

খট্‌মট্ শব্দ প্রতিটি ধাপ বেয়ে বেয়ে ক্রমে নিচে নামে। গেটের কাছে মোটরগাড়ি হুস করে বেরিয়ে যায়।

দারোয়ান দাঁতনে ঘষতে ঘষতে বলে, বাবুজী লতুন দাঁতন লিবেন?

উত্তরে হাত নেড়ে জানায়, না, আছে—।

নেতার প্রিয়ভাজন অতিথি এখানে অন্তরীণ। নিজেও একজন প্রচুর সম্পত্তির মালিক। দারোয়ানের মতো লোক তো প্রজা কিংবা চাকর বাকর কাছারিবাড়িতে। তাই মর্যাদা রক্ষার্থে নিজেকে গম্ভীর করে তোলে হারুবাবু। তাকায় ওপরে। জুন মাসের আকাশ। সকালেই কালো মেঘের আনাগোনা।

"১৯৪৬-এর ১২ জুন বড়লাট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য জিন্না এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে জহরলাল নেহরুকে আমন্ত্রণ জানালেন। জিন্না কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি ছিলেন না বলে এই ব্যবস্থা। কারণ জিন্নার মতে হিন্দুরা "শত্রু" কিন্তু মুসলিম লিগ বহির্ভূত মুসলমানরা "বিশ্বাসঘাতক" এবং তাই তাঁদের সঙ্গে কোনো কথা নয়।

একটা বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে গান্ধী কংগ্রেসকে প্রতিবাদ সহকারে এ-প্রস্তাব মেনে নিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জিন্না এই কারণে আলোচনায় যোগ দিলেন না যে সংখ্যা সাম্যের নীতি তখনও পর্যন্ত মেনে নেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে বড়লাট নেহরুর কাছে আবার প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী সরকারের তপসিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সহ হিন্দু-মুসলিম সংখ্যা সাম্যের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ১৩ ও ১৪ জুন আজাদ বড়লাটকে দুটি পত্রে জানালেন যে এই শর্তে (লিগ বহির্ভূত মুসলমান প্রতিনিধি থাকবে না জেনে) কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে ইচ্ছুক নয়। ১৫ জুন বড়লাট জানালেন যে প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিনিধিত্ব হবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়, রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে এবং মুসলিম লিগের ৫ জন প্রতিনিধি ও কংগ্রেসের ৬ জন প্রতিনিধি থাকবে বলে সংখ্যা সাম্যের কথা

ওঠে না।

আজাদ উত্তরে জানালেন যে বর্তমান প্রস্তাব ভিন্নরূপে প্রথম সিমলা সম্মেলনের প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি। তফাত কেবল এইটুকু যে তখন কংগ্রেস নিজের জন্য নির্ধারিত সংখ্যা থেকে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নিতে পারত, এখন সেটা নেই। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়।'

এরপর বড়লাট ওয়াভেল সাহেব বললেন, আগামীকাল একটি বিবৃতি জারি করা হবে।

'ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ জুনের ঘোষণায় জিন্না সহ ১৪ জন সদস্যবিশিষ্ট এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করার কথা ঘোষণা করা হল। এতে লিগের ৫ জন মুসলমান, কংগ্রেসের ৬ জন (১ জন তপসিল সম্প্রদায়ের সদস্য সহ) হিন্দু সদস্য ছাড়াও শিখ, পার্সি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এক-একজন সদস্যের নাম ছিল। সব দল চাইলে এই সরকার ২৬ জুন থেকে কাজ আরম্ভ করবে বলা হল এবং এও জানানো হল যে প্রদেশগুলির বিধানসভার অধিবেশনে অবিলম্বে আহ্বান করা হচ্ছে যাতে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং গণ-পরিষদ কাজ শুরু করতে পারে।···ঘোষণায় উল্লেখ ছিল যে, প্রধান দলের দুটি-ই···অথবা তাদের মধ্যে কোনো একটি যদি উপরোক্ত ধরনের কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে বড়লাটের অভিপ্রায় হল এই যে যাঁরা ১৬ মে তারিখে ঘোষণাকে মেনে নিয়েছেন তাঁদের প্রতিনিধিদের নিয়ে যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্বমূলক এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা।

অন্তর্বর্তী সরকারের জাকির হোসেনের নাম বাদ দিয়ে কংগ্রেসকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার না দেওয়ায়, বাস্তবে বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য মেনে নেওয়ায়, লিগ প্রদত্ত সদস্য তালিকা অপরিবর্তিত রেখে কেবল কংগ্রেসের তালিকায় রদবদল করায় (শরৎচন্দ্র বসুর স্থলে হরেকৃষ্ণ মহতাব), কোনো মহিলা সদস্যের নাম না রাখা (রাজকুমারী অমৃত কৌর যিনি আবারও খ্রিস্টান)···ইত্যাদি কারণে গান্ধী কংগ্রেসকে এ-প্রস্তাব গ্রহণ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কিন্তু নিজেদের জন্য নির্ধারিত সংখ্যার ভেতর একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নিয়ে এবং আরও কিছু আপস করে প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল।

কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে খবর পাওয়া গেল যে, জিন্নার এক পত্রের উত্তরে ২০ জুনের বড়লাট তাঁকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, দুটি প্রধান পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে নামের তালিকায় নীতিগতভাবে কোনো পরিবর্তন করা হবে না। এর অর্থ হল কংগ্রেস নিজের জন্য নির্বাচিত সংখ্যার ভেতরও মুসলমান সদস্য নিতে পারবে না এবং তপসিলী হিন্দু সহ যে কোনো সংখ্যালঘু সদস্যের স্থান রিক্ত হলে সে আসন পূর্ণ করার জন্য দুই প্রধান দলের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে। এর দ্বারা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে লিগকে ভেটো দেবার অধিকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট

কংগ্রেস সভাপতিকে প্রদত্ত তাঁর পূর্বতন প্রতিশ্রুতি—কংগ্রেস লিগ সংখ্যাসাম্য হচ্ছে না, কারণ কংগ্রেস তপসিলী-সহ ৬টি আসন পাচ্ছে—ভঙ্গ করে পেছনের দরজা দিয়ে সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর ওপর ২২ জুন বড়লাট কংগ্রেস সভাপতিকে লিখলেন যে কংগ্রেসের জন্য নির্ধারিত মন্ত্রী সংখ্যায় একজন মুসলমান সদস্য নেবার জন্য তাঁরা যেন আগ্রহ না করেন।…এছাড়া জিন্নাকে এ-প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় যে, প্রধান পক্ষ দুটির যে কোন একটির আপত্তি থাকলে অন্তর্বর্তী সরকার কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং কংগ্রেসের মতে গুরুত্বপূর্ণ এই নীতি আইনসভার দায়িত্বশীল কোনো সরকারের ক্ষেত্রে যদিও বা গ্রহণ করা যায়, অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষেত্রে তা গৃহীত হলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে। মিশনের সদস্যদের সঙ্গে গান্ধী-সহ কংগ্রেসের নেতাদের আরও অনেক আলাপ-আলোচনা ও পত্রবিনিময় হল। অবশেষে গান্ধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে মিশনের দীর্ঘমেয়াদী (গণপরিষদ) এবং স্বল্পমেয়াদী (অন্তর্বর্তী সরকার) কোনো প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে গান্ধী তাঁর পরামর্শ অনুসারে নয়, কংগ্রেস নেতাদের 'বিবেকের নির্দেশ' অনুসরণ করার পরামর্শ দিলেন। ২৫ জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিবাদাস্পদ অনুচ্ছেদগুলি তার নিজস্ব ব্যাখ্যা-সহ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (অর্থাৎ গণপরিষদ) গ্রহণ করল। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাতিল করল। আজাদ ওই দিনই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মিশনকে জানিয়ে দিলেন।

মিশন বিবাদাস্পদ অনুচ্ছেদগুলি সম্বন্ধে কংগ্রেসের ভাষ্য স্বীকার না করে নিজের ভাষ্যে অটল থাকলেও ২৭ জুন ঘোষণা করল যে দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব (গণপরিষদ) গ্রহণ করে কংগ্রেস ১৬ মে তারিখের ঘোষণাকে স্বীকার করে নিয়েছে বলে লিগের সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রতিষ্ঠানও অন্তর্বর্তী সরকারে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী।

ক্যাবিনেট মিশনের তরফ থেকে ২৭ জুনের ওই ঘোষণার পূর্বে ২৫শে সন্ধ্যায় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জানার পর বড়লাট মিশনের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার জন্য জিন্না আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে সম্মত না হওয়ায় কংগ্রেস বর্জিত ওই সরকারে তাঁর ও লিগের প্রাধান্য থাকবে। কিন্তু মিশন তাঁকে সেরকম কোনো আমন্ত্রণ না জানিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করল।…জিন্নার সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা হল।

ওইদিন বড়লাট এক 'অত্যন্ত গোপন' মেমোতে এ-ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করলেন, 'বলতে গেলে বুদ্ধির খেলায় আমরা কংগ্রেসের কাছে হেরে গেছি।' জিন্নার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা বড়লাটের মতো ছিল,…আমাদের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ ও কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণের অভিযোগ করলেন এবং বললেন যে তাঁকে সরকারে যোগদান করার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।'

ক'দিন বৃষ্টির পর আজ আকাশে খানিক রোদ।

ঠেলা রিকশাটা একবার ট্রামলাইনে নেচে ওঠে। মোটা চেহারার নন্টুবাবুই ভরিয়ে দিয়েছে দু-আড়াই ফুট সিটটা। ডান হাতে রিকশার হাতল ধরে টাল সামলায়। বাঁহাতে নতুন ঝোড়াটা সামলায়। পায়ের কাছে বস্তায় মালগুলো ঠোকাঠুকিতে শব্দ।

নন্টুবাবু বলে, ভাই, সাবধান। মালগুলো যে পড়ে যাবে—

—ঠিকসে পাকড়ো, বাবুজী! বলে ঠেলা রিকশাওয়ালা। হাতে বড় ঘুঙুর ঠুংঠুং বাজায়। বেলা ন'টার রোদে যেন সকালে গোচারণের শব্দ। সেটা মুহূর্তে মুছে যায় মোটরগাড়ির বীভৎস হর্নের আওয়াজে।

পাঁচিলে ঘেরা মেন গেটের কাছে রিকশা থামে। নন্টুবাবু দারোয়ানের কানে ফিসফিস করে বলে, হারুবাবু—

—কৌন? হারুবাবু? কেয়া মতলব?

হারুবাবু—। মামা—দক্ষিণের বীর—ভীমজী।

দারোয়ান খানিক সমঝে চুপ। নন্টুবাবু বলে, পেয়ারা অমরুত—নারিয়ল। হারুবাবুর বাগানের—অন্দরমে লেনা যাউঙ্গা—।

পেয়ারার ঝোড়া। নারকেলের বস্তা দেখে খুশি দারোয়ান। নারিয়ল বড় পবিত্র জিনিস। অনুমতি দেয়, রিকশা অন্দরমে লে যাও—

রিকশাওয়ালা বড় ঘুঙুর ঠোকে। ঠুং ঠুং বাজে। দেবমূর্তির সামনে ভোগ নিবেদনের আরতির মতো ঘণ্টা। হিন্দুর পবিত্র পূজাপাঠের বাজনা।

ঝোড়া ভর্তি পেয়ারা। বস্তার মুখ খুলতেই ছাড়ানো নারকেল। বড় বড় মালায় চেনা খোল। হারুবাবু বলে, নন্টু কিনে আনলি?

—দূস্, তোমার কাছারিবাড়ির।

ঝোড়ার পেয়ারা কাছে টেনে একটা তুলে নেয়। কাড়ুস-মাড়ুস চিবোয়। খানচারেক খেয়ে বলে, এটা নিশ্চয়ই বড় পুকুরপাড়ের গাছগুলোর?

—হুঁ।

ফট করে বাইরে আসে হারুবাবু। নিচের মালি, রাঁধুনি দারোয়ানদের ডাকে, এই মিশ্র—পাণ্ডে—অগ্রওয়ালা এসো এসো—ফল খাও।

মানুষগুলো আসে। উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর-প্রদেশের। তাদের হাতে মুঠো মুঠো পেয়ারা দেয়। গণ্ডা গণ্ডা নারকেল দেয়। বলে, আমার কাছারিবাগানের। খাও তোমরা—

খুশিতে হাসে মালি, রাঁধুনি, রাধাকৃষ্ণের পূজারী। হারুবাবু মস্ত ভারত-বর্ষের আধখানা মুখ দেখে।

বাইশ

৬ ও ৭ জুলাই সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হল। জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ওই সভাতেই মৌলানা আজাদের কাছ থেকে সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

এরপর বোম্বেতে মিস্টার জিন্না মানসিকভাবে আঘাতটা পেলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, '…সেই জাতীয় এক অতীব শোচনীয় ঘটনা ঘটল যা ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তিত করে দিয়ে থাকে। ১০ই জওহরলাল বোম্বাইয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করলেন এবং এক তাতে আশ্চর্যজনক বিবৃতি দিলেন। কোনো এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর কি কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারের গঠনপ্রণালী-সহ (মিশনের) পরিকল্পনাকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছে? উত্তরে জওহরলাল বলেছিলেন, কংগ্রেস কোনোরকম চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে যখন যেরকম অবস্থার সৃষ্টি হয় তার মোকাবিলা করার স্বাধীনতা নিয়ে গণপরিষদে যোগদান করবে।

সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন যে, এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার রদলবদল হতে পারে?

জওহরলাল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উত্তর দিলেন, কংগ্রেস কেবল গণপরিষদে যোগ দিতে রাজি হয়েছে এবং নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের পরিবর্তন বা রদবদল করার স্বাধীনতা তার আছে।

'মুসলিম লিগ চাপে পড়েই ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। স্বভাবতই শ্রীযুক্ত জিন্না এর জন্যে খুব খুশি ছিলেন না। লিগ কাউন্সিলের সভায় শ্রীযুক্ত জিন্না স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, এর চেয়ে ভাল আর কিছু পাওয়া সম্ভব নয় বলেই তিনি এ-প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সুপারিশ করছেন। তাঁর রাজনৈতিক পরামর্শদাতারা এই কথা বলে সমালোচনা করেছিলেন যে, তিনি নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছেন। তিনি স্বতন্ত্র ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের আদর্শ বর্জন করেছেন—এই মর্মে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছিল। সমালোচকরা এই বলে তাঁকে বিদ্রূপ করছিলেন যে লিগ যদি ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণই করবে, তাহলে কেন শ্রীযুক্ত জিন্না এতদিন এক স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য এত হইচই করলেন?'

'সুতরাং আলোচনার পরিণাম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জিন্না খুব খুশি ছিলেন না। …তিনি তাই লিয়াকৎ আলি খাঁ-কে লিগ কাউন্সিলের এক সভা আহ্বানের নির্দেশ দিয়ে এই ঘোষণা করলেন,…এখন যখন কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করেছেন যে গণপরিষদে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের বলে কংগ্রেস এই পরিকল্পনাকে পরিবর্তিত করতে পারে—এর অর্থ এই হয় যে সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুগ্রহ-নির্ভর হয়ে থাকতে হবে।'

'২৭ জুলাই বোম্বাইয়ে মুসলিম লিগের কাউন্সিল সভা হল। উদ্বোধনী সভায় জিন্না লিগের পক্ষে একমাত্র পন্থা পাকিস্তানের দাবির পুনরুচ্চারণ করলেন। তিনদিন আলোচনার পর কাউন্সিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করল। পাকিস্তান প্রাপ্তির জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্তও ওই সভায় গৃহীত হল।'

মৌলানা আজাদ আরও বলেছেন, 'ঘটনাপ্রবাহ এইভাবে নতুন মোড় নেওয়ায়

আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলাম। আমি দেখছিলাম যে, যে-পরিকল্পনার জন্য আমি এত পরিশ্রম করেছিলাম তা এইভাবে আমাদেরই কৃতকর্মের ফলে ধ্বংস হতে চলেছে। আমার মনে হল যে সমগ্র পরিস্থিতির পুনর্বিচারের জন্য অবিলম্বে ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভা হওয়া প্রয়োজন। জওহরলাল প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না কিন্তু আমি জোর করায় সম্মত হলেন। এইভাবে ৮ আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটির সেই সভা হল ও সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করল। আমি বললাম যে, আমরা যদি পরিস্থিতি রক্ষা করতে চাই তাহলে স্পষ্ট করে বলতে হবে যে, বোম্বাইয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতির বিবৃতি তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতের দ্যোতক এবং তা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের অনুযায়ী নয়।

…ওয়ার্কিং কমিটির মনে হচ্ছিল তার সামনে উভয় সংকট। একদিকে কংগ্রেস সভাপতির মান-মর্যাদার প্রশ্ন, অন্যদিকে এত পরিশ্রম করে আমরা যে বোঝাপড়ায় উপনীত হয়েছিলাম তার ভবিষ্যৎ বিপন্ন।…শেষ পর্যন্ত আমরা এমনভাবে প্রস্তাবের খসড়া রচনা করলাম যাতে জওহরলালের বিবৃতির উল্লেখ না করে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্তকে পুনঃস্বীকৃতি দেওয়া হল।…

আমরা আশা করেছিলাম যে ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবের ফলে শেষ-রক্ষা হবে।…মুসলিম লিগ যদি আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করত তাহলে তার মর্যাদাহানি ব্যতিরেকেই পুরাতন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারত। শ্রীযুক্ত জিন্না সেদিক দিয়ে গেলেন না। তিনি এই যুক্তিজাল বিস্তার করতে লাগলেন যে ইংরেজরা দেশে থাকাকালীনই এবং হাতে ক্ষমতা আসার পূর্বেই কংগ্রেস যদি এতবার তার ভূমিকা বদলাতে পারে, তাহলে একবার ইংরেজরা চলে গেলে কংগ্রেস যে আবার তার মত বদলাবে না এবং পুনর্বার জওহরলালের বিবৃতিতে ব্যক্ত ভূমিকা গ্রহণ করবে না, সে-ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের কাছে নিশ্চয়তা কোথায়?'

লিগ কাউন্সিলের ২৯ জুলাইয়ের সেই গুরুত্বপূর্ণ সভা ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তিক্ত ও ক্ষোভের পরিবেশে জিন্না প্রথমে নিজ কৃতকর্মের অর্থাৎ সার্বভৌম পাকিস্তানের বদলে সীমিতক্ষমতা সম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার এবং ছয়টি প্রদেশের দুটি গোষ্ঠীর সমর্থনে অকুণ্ঠ ভাষায় বলেন, 'আমরা স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তিনটি বিষয় তুলে দিতে চেয়েছিলাম এবং এই পরীক্ষানিরীক্ষা কেমন চলে তা দশ বছর দেখতে চেয়েছিলাম। আমাদের সিদ্ধান্তে কোনো ভুল ছিল না। এর দ্বারা মুসলিম লিগ উচ্চতম স্তরের রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিল।…আমাদের ভেতর সাহস ছিল। কেন্দ্রের হাতে ওই বিষয়গুলি সমর্পণ করায় ভুল হয়নি।'

'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'এর গুরুত্ব সম্পর্কে আর একটু বলা যায়, 'আপসরফা ও সাংবিধানিক উপায়ে ভারতের সমস্যার একটি শান্তপূর্ণ সমাধান খুঁজে বার করার মুসলিম ভারতের যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। কংগ্রেস ব্রিটিশের প্রচ্ছন্ন সম্মতিতে ভারতবর্ষে এক বর্ণহিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর।…অখিল ভারত মুসলিম লিগ বিশ্বাস করে যে পাকিস্তানপ্রাপ্তি, নিজেদের ন্যায়সঙ্গত

দাবি অর্জন, নিজেদের সম্মানরক্ষা এবং বর্তমানের ইংরেজের ও ভবিষ্যতের বর্ণহিন্দুদের দাসত্বের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মুসলমান জাতির তরফ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার সময় এখন এসে গেছে।'

প্রস্তাব গৃহীত হবার উপসংহার ভাষণে জিন্না বলেন, '…আজ আমাদের এমন অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার পেছনে কংগ্রেস ও ইংলন্ড উভয়েরই যোগাযোগ আছে।…এক দলের পেছনে ছিল ক্ষমতা ও মেসিনগান এবং অপর দল সর্বদা অসহযোগ ও গণ-আইন অমান্য করার শাসানি দিত। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। আমাদেরও এখন পিস্তল আছে।'

ভারতবর্ষের কোণে কোণে উত্তেজনা-সংঘাত-সংঘর্ষের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আহমেদাবাদ, বোম্বাই, ঢাকা, এলাহাবাদ প্রভৃতি জায়গায় অস্ত্রশস্ত্রের পুঁটলি আবিষ্কৃত হচ্ছে। পেথিক লরেন্সের পরামর্শ সত্ত্বেও ওয়াভেল লিগের জিন্নার সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় উদ্যোগী হলেন না। বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রশাসনের সংযোগ তৈরির প্রয়োজনীয়তায় ভারত-সচিবের অনুমোদন নিয়ে ৬ আগস্ট ওয়াভেল জওহরলালকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে আমন্ত্রণ জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-পরামর্শ দেওয়া হল সরকারের সদস্য-তালিকা স্থির করার পূর্বে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করে লিগ সহ কোয়ালিশন গঠন বাঞ্ছনীয়। নেহরু এ-দায়িত্ব নিয়ে ১৫ আগস্ট জিন্নার সঙ্গে লিগের সহযোগিতা পাবার আলোচনা করলেন। 'নেহরু জিন্নাকে আশ্বাস দিলেন, উভয় পক্ষের বোঝাপড়া ব্যতিরেকে গণ-পরিষদে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে না। যাবতীয় মতভেদ ফেডারেল আদালতে সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হবে। লিগ অন্তর্বর্তী সরকারে পাঁচটি আসন পাবে তবে মুসলমান-সদস্য মনোনয়ন ব্যাপারে একাধিপত্য দাবি করতে পারবে না। জিন্না সে-প্রস্তাব বাতিল করলেন।'

'অবশ্য আলোচনাকালে জিন্নার একমাত্র প্রস্তাব ছিল সরকার গঠন ব্যাপারে। ছ'মাস সবরকম কার্যকলাপ স্থগিত রাখা হোক।' মাত্র ছ'টা মাস অপেক্ষা করা। ছ'মাস তো দূরের কথা—কয়েক প্রহর বাদে ভারতে নতুন আগুন। অবিশ্বাস, অনুযোগ অভিমানের পাবক শিখা। ১৬ আগস্ট মুসলমানদের সাধারণ ধর্মঘট ডেকে দিয়েছিল উপসমিতি।

বঙ্গের লিগ সরকারের কর্ণধার ও প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি। প্রথম তিনদিন কলকাতা হঠাৎ আক্রমণে হতভম্ব। তারপর হিন্দুদের দ্বারা প্রতি-আক্রমণ। পরস্পর গুপ্তহত্যা, নিগ্রহ, সম্ভ্রমহানি সব মিলিয়ে মানবসভ্যতার পরাজয়। একই মাটিতে বসবাসকারী মানুষের বিবেকের যুগপৎ অধঃপতন। ঢেউ ছুটে যায় বোম্বাই, করাচি, সীমান্তপ্রদেশ নোয়াখালি, বিহার ও উত্তর ভারতে।

মানুষ ভুলে গেল ব্রিটিশ বিরোধ। প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারশ্রেণীর গোষ্ঠীস্বার্থের একতা—যা দরিদ্রের নিবিড় দারিদ্র্য রচনা করেছে। উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণে নিপীড়ন—সামাজিক নির্যাতন। ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নে উন্মাদ বিভাজিত মানুষ। খণ্ডিত ভূমির স্বাধীকার কল্পনা। ভূমি টুকরো কি পেরেছে

বাঁচার প্রয়োজনীয় উপাদান যোগাতে ?

কলকাতায় ক্যাম্পবেল হাসপাতালে প্রচুর আহত, রক্তাক্ত মানুষ আসছে চিকিৎসার জন্য। কেউ কাতরাচ্ছে। কেউ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে।

বঙ্কিম মুখার্জি, নীরোদ চক্রবর্তী, মোমিন সাহেব আটকে গেলেন ইসলামিয়া হাসপাতালের কাছে। একজন পুলিস অফিসার আর সিপাইয়ের উপস্থিতিতে দাঙ্গাবাজরা পালিয়ে গেল। স্নেহাংশু আচার্য হাতে রিভলভার নিয়ে উদ্ধার করছেন হিন্দুকে মুসলমানকে।

পি. সি. যোশীর পুস্তিকায় প্রস্তাব ছিল, 'গান্ধী ও জিন্না একসঙ্গে আলোচনায় বসে সব কিছু মিটিয়ে নিন।'

পাঁচ হাজার নরনারী শিশুর নিষ্ঠুর মৃত্যু। পনের হাজার আহত। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে লুণ্ঠন। অগ্নিসংযোগ আর ছাই। অনুৎপাদনশীল অপচয়।

[এবার কাহিনী নিজের পথে বাঁক নেবে।]

ক্রমে ক্রমে অবস্থা থিতোয়। বাস চলে, ট্রাম চলে। জোরে সিটি দিয়ে কয়লার ইঞ্জিনে রেলগাড়ি বালিগঞ্জ স্টেশন পার হয়। চারতলা অফিসঘরের দোতলায় রেলিংয়ে হেলান দিয়ে কাছারিবাড়ি দেখতে পায় হারুবাবু। কালো কাকটা কা-কা ডাকে। প্রাচীর প্রাঙ্গণে। কালো ঠোঁটের ভেতরে টাকরা লাল। কাছারিবাড়ির উঠোনে ডাকা কাকটার মতো অবিকল। সকালে তো আর লাঠি নিয়ে একপ্রস্ত কসরৎ হয় না! বাড়ি টানে। কর্মচারী ধনা ছোকরাটা এখানে আটকে গিয়ে ঘুমোয়। তার কাছে কলকাতার ফাঁকা বারান্দা আর কাছারিবাড়ির দালান যে কী করে এক হয়ে যায়! নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় ছোকরাটা। গভীর মগ্নতায়। পৃথিবীর মানুষ হয়ে।

রোগা রাস্তায় হিম। যেহেতু ভোরবেলা, মফস্বল শহরটা একটু একটু করে জাগে। বড় বড় খিরিশ গাছের ঝাঁকড়া মাথায় আকাশ। কোর্টচত্বরে পুরনো ঝাউ-দেওদারের কোটরে সবুজ টিয়া ঝাঁক বেঁধে বাংলোবাগান ডিঙোয়। কচি ডানায় আকাশ ঢাইয়ে গাঙমুখো। গঙ্গোত্রী হিমবাহের জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পাথর পাহাড়ের ঢাল খাঁজে পথ কেটে উত্তর ভারতের মানুষের বসবাসের গা বেয়ে গঙ্গা তো কলকাতা ছুঁয়ে এই মফস্বল শহরের পাশ দিয়ে মোহনামুখো। জাতধর্মে নিরাসক্ত গঙ্গা। ফসল ফলন পেটের দানা জুটিয়ে দিয়ে নিজের মতো বয়ে যায়। প্রজন্ম প্রবাহের কত আগে থেকে যে বহমান!

বাঁখারির গায়ে পেরেক মেরে বড় বড় চৌকো ফাঁকে কাঠবেড়া। ভেতর-বার স্পষ্ট দৃশ্যমান। শেষ আগস্টের রাতে হিম। তাই ইসলামিয়া হোটেলের কাঠ-বেড়ায় পাতলা চটের আবরণ।

কাক-পাখির ডাক। মকবুল সাহেবের ঘুম ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি বিছানার তলা থেকে বড় কাটারিটা গোপনে রান্নাঘরে কাজের জায়গায় রেখে আসে। পরে ডাক দেয়, ও ছামাদ—ছামাদ রে—এ ওঠ—

ছামাদ বড় করে হাই তোলে। গতদিনের শ্রম শরীর থেকে উবে যায়। ছেঁড়া

মাদুর-কাঁথার তলায় লুকনো বঁটিটা উঁচু। জিনিসটাকে সবজি-আনাজের ঝোড়ার কাছে রেখে আসে। চট-বাঁখারির আড়ালেও আতঙ্ক। বড় পলকা প্রতিরোধ। হাওয়ায় যে রক্তের গন্ধ।

হাতে এক গুলতি গুড়াখু তামাক নিয়ে বাইরে আসে মকবুল। বাঁহাতে চটের আবরণ তুলতে গুলতিটা ঠোঁটে রাখে। দু'হাতে চটটা পাকিয়ে বেঁধে দিতেই সকাল ঝপ্ করে ইসলামিয়া হোটেলে ঢোকে। বাঁখারিবেড়ার ওপার থেকে ভাতের বড় হাঁড়ি, ডাল-ঝোলের ডেকচি সব দেখা যায়।

ডানহাতে ঠোঁটের গুড়াখু গুলতিটা নিয়ে মকবুল চেঁচায়, ছামাদ ঝাঁটপাট দে—

দু-একটা রিকশা চলে যায়। লোহার নালে বাঁধানো খুর বলদ জোড়ার। খট্‌খট্ শব্দে চালের গাড়ি। বড় বড় দুটো কাঠের চাকায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ্ শব্দ। ছোকরা মুহুরি ক্রিং ক্রিং বেল বাজিয়ে গরুর গাড়ি পাশ কাটায়। গাড়োয়ান সপাং করে ছড়ি মারে গরুটার পাছায়। চেঁচায়, হ্যাট্-হ্যাট্-হুর-র

মকবুল আঙুলে তামাক নিয়ে একটা একটা দাঁতে ঘষে। লালচে লালা গড়ায় মাটিতে। প্রতিদিন একই জায়গায় বসে দাঁত মাজা। জায়গাটা একখাবলা লাল। পাশে এক গাড়ু জল।

পুচ্ করে থুতুটা ফেলতেই মুখ হালকা। পেছনে ফিরে রাস্তার দিকে তাকায়। খোঁজে, মতিলালের গো-গাড়ি কই? চাল সের দশেক আছে। এক বস্তা স্টক থাকলে যে বুক বাঁধা থাকে—

সোজা উঠে দাঁড়ায় মকবুল। গাড়ুর নলে জল গড়ায়। ভাল করে মুখ ধুয়ে চোখেমুখে দেয়। জল মাটিতে ছিটকে চেক লুঙির ঘের ভেজে। লুঙি সামলাতে উঁচু জায়গা বাছে। তখনই চোখে পড়ে, সদয় মুখুজ্জে। সদয়ের দু'হাত ধরে দু'দিকে দু'ভাই। বাঁয়ে গুড়ে, ডাইনে ভুঁড়ে।

মকবুলকে দেখে গুড়ে ভুঁড়ে থমকায়। বাপের দু'হাতে গতিরোধের ঝাঁকুনি। মকবুল বলে, আড়তে? দাঁড়াও আমি ব্যাগটা নিই—

দোকানপাটগুলো খুলেছে। পাশে কাঠের দোকানে ঝাঁপ তুলতেই নতুন চেয়ার আলমারি। আসবাব তৈরির কাটা কাঠ তক্তা। চুল-দাড়ি কাটার জন্য যদু মান্নার দোকান। কলা ন্যাসপাতির ঝাঁকা সাজিয়ে পোকাদার ফল দোকান। তারপর বোঁদে-রসগোল্লার ময়রা দোকান।

মকবুল লুঙির গেঁটে হাত বুলিয়ে বিড়ি-দেশলাইয়ের কৌটো সাব্যস্ত করে। খড়খড় শব্দ হতেই মনে জোর। রাস্তায় উঠে বলে, ঠাকুরদা—যদি দু'-এক জন মাছওলাকে ধরা যায় তাহলে একটু দামে পড়তা হয়—

—হুঁ, মাছের ওপর আড়তদারি কমিশনটা চাপে নে—

—ঠিক ধরেছিস ভাই। খুশিতে মকবুল হাসে। ক্ষয়াটে দাঁতে এনামেল চটে বিড়ির কষ।

গুড়ে সদয়কুমারকে বলে, বাবা—আড়ত কী গো?

সদয় পাশে তাকিয়ে ছেলের প্রশ্নে সানন্দে উত্তর দেয়, যে ঘর থেকে মাছ

আনি রে— ?

ভুঁড়ে হঠাৎ শুধোয়, বাবা—

—উঁ, ভুঁড়ের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে শুনতে চায়।

—পয়ছা দিতে হয়··· ?

দুই ব্যবসায়ী পাশাপাশি হাসে। সদ্য মাজা দাঁতে ঝকঝকে হাসি। সকালের থেকেও শুভ্র।

দুই ভাই ভ্যাবলা মেরে তাকায়। সদয়কুমার বলে, শহর জায়গা। বিনি পয়সায় কী কিছু পাওয়া যায় রে বাপ ?

ছেলে দুটোকে দেখতে দেখতে মনে হয় মকবুলের, আমার দুটো···মামুদ আর মনোয়ারা তার মার সঙ্গে যে কী করতেছে দাওয়া উঠোনে··· ।

তিনখানা টুকরো বাঁশে বড় ত্রিভুজ। বাঁশ তিনটের বাঁধন মুখ থেকে লোহার মোটা 'এস' যে দু'বাহু মেলে কাঁটা। চারকোনা কাঠের পিঁড়ি ফুটো করে চারটে মোটা দড়ির বন্ধনে ঝুলছে দু'খানা পাল্লা। ঝোড়া ভর্তি মাছ ওজন হয় ডাইনে —বাঁয়ে লোহার বাটখারায় এক মণ, আধ মণ, দশ সের, পাঁচ সের, এক সের, আধ সের, এক পোয়া, এক ছটাক, আধ ছটাক, কাঁচ্চা—পরিমাপের একক।

ইটের দেওয়াল দিয়ে এক ঢালু টিনের ছাউনি। মেঝেটা সিমেন্টের পাকা শান। অতো মাছ ঝোড়া ভর্তি। মেঝেয় পড়ে আছে মাঝের স্তূপ। গুড়ে-ভুঁড়ে অবাক হয়ে দেখে। ভাবে, উঠোন শেষে তালগাছের বড়পুকুরে খে-জাল ফেললে আর ক'টা মাছ উঠত ! পাড়ে জাল বাছলে মাছগুলোর গায়ে কাদা। এত মাছ··· গায়ে তো কাদা নেই ! একটু এগিয়ে যায় গুড়ে। মেঝেয় পা দিয়ে টের পায়, কত শক্ত। পরে উবু হয়ে বসে মেঝেয় হাত ঘষে। কী ঠাণ্ডা ! আঙুলে একটুও কাদা ওঠে না। ভাবে, আমাদের হোটেলঘরে তো এমন নেই ? বৃষ্টিতে টিন গলে জল পড়লে, গোটা ঘর কাদা।

সামনেই মাছভর্তি ঝোড়া। ক্যাশবাক্স আগলে বসে মোটা লোকটা। খালি গায়ে কত বড় ভুঁড়ি। মাথার কাছে দেওয়ালে মা-কালীর পট কাচে বাঁধাই। সকালের ধূপ তখনও জ্বলছে। সরু রেখায় ধোঁয়া। মোটা লোকটা কী লিখে একবার মুখ তোলে। সরু তক্তাপোশে ছোট্ট তোশক। তোশকে বসেই হাঁকড়ে ওঠে, এই ছেলেটা মাছ নিচ্ছিস—শালার বেটা শালা— ।

মোটাবাবু ফুকফুক বিড়ি টানে।

গুড়ে হচকচিয়ে বাপের মুখের দিকে তাকায়। সদয়কুমারের খেয়াল হতেই বলে, না বাবু—ওরা আমার ছেলে—

—হুম, একলা এলে হয় নে, সঙ্গে এনেছিস। দুটো-একটা সরানো শেখাবি ?

আড়তদারের কথা যে কত কর্কশ !

ধীরে ধীরে দুই বাচ্চাকে কাছে টেনে নিয়ে নির্বাক। একটু একটু করে আড়তের মেঝে ছাউনি থেকে সরে আসে। মোটা লোকটাকে পছন্দ হয় না। সদয়কুমার ভাবে, বেলা হয়ে যাচ্ছে। এখন কার কাছে যে মাছের জন্যে যাই— !

আড়তের সামনে খানিকটা চওড়া ঢাল, তারপর রোগা রাস্তা। সদয়কুমার

বাচ্চা দুটোর হাত ধরে এক পা দু'পা সরে সরে আসে।

মোটাবাবু খাতায় কলম ছুঁয়ে মাছমাপা কয়ালীকে শোনায়, কত বললি রে—

লেখাটা হয়ে যায়।

মকবুল অনুনয়ে বলে, বাবু আমাদের দেবেনি?

—থাম না এ-মাল ক'টা রিকশায় চাপিয়ে ইস্টাশনে পাঠাই। গাড়ির টাইম হয়ে গেছে—কলকাতায় যাবে।

যা কিছু ভাল সব কলকাতা টানবে? খাদ্য খাবার যাবতীয় সুযোগ সব সেখানে। কত বড় বাজার যে! একটু ভেবে মকবুল পাশে দেখে, সদয়কুমার মনমরা হয়ে অনেক দূরে।

আড়তদার মোটাবাবুর কাজ কমলে বলে, হ্যাঁ রে মকবুল—

—আজ্ঞে, বাবু?

—বামুনটা মহারানী হোটেলের, না?

—হ্যাঁ গো বাবু—।

—মাঝে মাঝে লগদা কেনে তো? ডাক—ডাক—

মকবুল হাঁক দেয়, ওই সদয়দা আয়। মাছ নিবি যে—

সকাল ক্রমশ কোর্ট-কাছারির টাইমমুখী। খুচরো ব্যাপারীরা বেরিয়ে গেছে। মাছটুকু না নিতে পারলে হোটেল জমবে না, প্রচণ্ড বেকায়দায় পড়ে নতমুখ মানুষটা। বাচ্চা দুটোর মুখ চুপসে বোঁটাভাঙা পাতা। ধীরপায়ে সদয় আড়তের কাছাকাছি। ক'বছর ব্যবসা চালিয়ে একটা বোধে নিজেকে ভরায় সদয় মুখবুজে,··পয়সা-কামুক এ-লোকগুলো মানুষকে হীন করতে সুখী, আবার পয়সা হাতছাড়া করতে ভয়ানক দুঃখী!

আড়ত আর গুড়ে ভুঁড়েকে টানে না। দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। মোটা মানুষটা কেমন আতঙ্কের। দাম মিটিয়ে সদয়কুমার দু'খানায় দু'সের পোনা মাছ কিনে বেরিয়ে আসে। নিজের বাবার হাতে মাছ দেখে বাচ্চা দুটোর বুক চলকায়। সদয় বলে, চল—

মকবুল ব্যাগে মাছ নিয়ে রাস্তায় ওঠে। হঠাৎ বলে, সদয়দা—লোকটার না মুখ বড্ড খারাপ—

ডান হাতের দু'আঙুল মাছ দুটোর গালাসিতে। সদয়কুমার এক হাতেই ঝুলিয়ে রাস্তা হাঁটে। আর বাপের দু'হাত দু'জনে ধরতে পারে না। হঠাৎ সদয় বলে, গুড়ে একটা নিবি?

গুড়ে হাত বাড়ায়। সদয় বাচ্চাটার কচি হাতের আঙুল মাছের কানকোর ফাঁকে ঢুকিয়ে বলে, নে চল—

ভুঁড়ে হাত বাড়াতেই সদয় হাসে।—তুই নিবি? নে—হাত ঢোকা!

রাস্তার পাশে দোকানপাটে দু-চার জন খদ্দের। রিক্‌শা-সাইকেলের ভিড় বেড়েছে। রোগা রাস্তার নিচ দিয়ে দু'ভাই হাঁটে। দু'জনের হাতে দুটো মাছ। হোটেলের জন্য বাজার।

মকবুল ঢুকে যায় ইসলামিয়া হোটেলে। ব্যাগের মাছ ঢেলে বলে, ছামাদ, আঁশ ছাড়া। আমি মুদিবাজার আনি—উনুনে ডাল বসিয়ে দে—।

দু'ভাই এগোয়। মনের ব্যথা মুছে যায়নি, মাছের আনন্দে ঢাকা পড়েছে মাত্র। সদয়কুমারের বুকে ভার! বাচ্চা দুটোর আনন্দে রোদ মেখে আলোময় একঝাপটা নতুন বাতাস।···

···সকাল আটটার ট্রেন ধরতে হারুবাবু বালিগঞ্জ স্টেশনে। অফিস-কাছারির যাত্রী-ভিড়। কাচা ধুতি ইস্ত্রি করা জামা। মাথা আঁচড়ে ধোপদুরস্ত মানুষ। লাঠিটা মাথা ছাপিয়ে খানিক উঁচু। পাশে মশারি বিছানার পুঁটলি মাথায় ধনা। হাতের ব্যাগে মুড়ি নারকেল নাড়ু।

ধোঁয়া উড়িয়ে কালো ইঞ্জিন। ডাবরা মুখ বয়লার। পাশে কয়লার কনটেনার। হুস হুস শব্দে চাকা ঘোরে। লাঠি সামলে ভেতরে দাঁড়ায়। জানালার দু'ধারে হোগলা বন, ছোট-বড় ডোবা। ক'টা স্টেশন পার হতে ধানের মাঠ। ডগ ছেড়ে সবুজে সবুজ। পরের স্টেশনে যাত্রীটি নামতেই হারুবাবু জানালা ঠেসে বসে। পাশে লাঠিটা ঠেকনো পেয়ে খানিক কাত।

প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে এক ছোকরা বলে, এই ডাকত রে—

মাঝবয়সী লোকটা ফিসফিসোয়, বড় জোতদার—

বুড়ো ফলব্যাপারী শিয়ালদার বাজার সেরে ফিরতিমুখো। পাশের লোককে বলে, দৈত্য-দানোব—

দুই বুড়োর পাকা দাড়ি। বলাবলি করে, এই সেই মানুষ-মারা লেঠেল। পয়লা নম্বর গেরামে—আরাফাৎ মুরসেদের খুনি—মার্ডার কারি—

এক-একজনের গল্প খানিক শুরু হয় নতুন স্টেশন আসে। হাওয়ায় কয়লার গুঁড়ো জানালা গলে সাদা জামায় পড়ে। মাঝে মাঝে রেলগাড়ি সিটি দিয়ে মাঠ-গাঁয়ের নীরব শান্ততা ফালা করে দেয়। কলকাতা থেকে তা গ্রামে ঢুকছে।

বাবুরহাট স্টেশন। ক'টা ছোকরা উসখুশ করে। হঠাৎ বলে, এই হালিম লাবাবি শালাকে— ?

—ও তো আমাদের দেখতে পারে নে।

—দিবি লোকটাকে শিক্ষা ?

ইসাক সাহস দেয়, ধর না, লাবাই ইস্টাশনে—তারপর যা হবার হবে—।

ফট করে লাঠিটা কেড়ে নেয় একজন। হারুবাবু চকিতে কবজকুণ্ডল হারা। চেঁচায়, কে রে আমার লাঠি নিলি— ?

গাড়িটা বাবুরহাট স্টেশনে দাঁড়াতেই ছোকরারা বলে, লাঠি নিতে গেলে নেমে এসো—

হারুবাবুর একহাতে রডের হাতল, অন্য হাতটা ধরে প্ল্যাটফর্মের লোকেরা টানাটানি করে! উত্তেজনায় স্টেশনচত্বরে ভিড়ে ভিড়। ড্রাইভার গার্ড গাড়ি ছাড়ে না।

ক'জন বুড়ো মুরুব্বি, মৌলবী মাঠ-কাদা ভেঙে ছুটে ছুটে আসে, ওরে তোরা করেছিস কী—আগে হারুবাবুকে ছাড়। ও লোক আমাব বাপ-কাকার

চেনা—ছাড় বলছি—

পক্ষে ক'জন বয়স্ক মানুষ ! হঠাৎ বুকের বিশ্বাসে ধাক্কা। এক পা ফুট বোর্ডে আর এক পা প্ল্যাটফর্মে। লাঠিহীন মানুষটা লাঠির অবলম্বন চাইছে। কিংবা লাঠির একটা পরিবর্ত দ্রব্য। বেশী উৎসাহী মানুষ ট্রেনটাকে ছাড়তে দেয় না। গার্ড ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে গণ্ডগোলটা বোঝার চেষ্টা করে।

পাকা নুর দাড়ি। চোখে গোল চাঁদির চশমা। সদ্য কাচা লুঙিটা পরে খালি গায়ে ছুটে আসে, ওরে পাগল উন্মাদরা—মানুষকে বাঁচতে দে। কোথাকার দিল্লী বোম্বে কোলকাতা এখেনে টেনে আনিসনি। ছোকরাদের সঙ্গে মাঝবয়েসী লোকটা বলে, মেজ সাহেব—

—হুঁ বল তোরা ?

—ইউনিয়ন বোডের ভোটে আমাদের বর্ণের কতগুলোর জান খতম করেছে। ভুলে গেছো— ?

—সে তো বছর কাবারি গপ্পো। ওসব তুলিসনি। তাহলে সুদের সুদ তস্য সুদ—রক্ত বইবে। ছাড় ও লোককে—

হারুবাবু অস্ত্রহীন। ভাবে, একখানা···মাত্র একখানা লাঠি হলে যে সব ছাটা মেরে মাঠ পার করে দিতুম ! যেই না ভাবা প্রবল উত্তেজনায় ডান হাতে রেলের কামরায় বড় রডের হাতলটা এক হেঁচকা টান মারে। স্ক্রু নাট সুদ্ধ উঠে আসে। লাঠি নেই তার বদলে হাত পাঁচেকের বাঁকা ব্রিটিশ কোম্পানির রড।

ধাতব সশস্ত্রতা। ভিড়টা নড়ে ওঠে। খবর পেয়ে ভদ্রলোক হাতের পেনসিল হাতে নিয়ে হারুবাবুর সামনে হাজির। বলে, চলুন আমার অফিস ঘরে বসবেন—

—তুমি কে ? বেশ জোরে হুঙ্কার।

—আমি স্টেশন মাস্টার।

বড় বড় চোখে খানিক সমীহ। রেল কর্মচারী। পাশেই গোলচাঁদির চশমা মুরুব্বি মানুষ। খালি গায়ে লুঙি নুর দাড়ি মানুষটা বলে, বাবু আপনি মাস্টারবাবুর আফিসে চলুন। আমি নে যাচ্ছি—। একবার চারপাশে জমাট লোকজনের উদ্দেশে শাসায় গোল চাঁদি চশমার মেজ সাহেব, এই খবরদার—। তোরা রাস্তা ছাড়—

রেল গাড়ি বন্ধ। মাটির উপর বড় বড় টুকরো খোয়া বিছিয়ে শাল সেগুনের স্লিপার। তার উপর ধাতব লাইন ফাঁকা মাঠ···গ্রাম জনবসত চিরে শহর ছুঁয়েছে। মানুষের কথা লাইন বেয়ে চলে যায় কতদূর। ঘরে ফিরে দু-পাঁচজন গেরস্ত গল্প করে গ্রামের পথে। মানুষের সামনে। সে গল্প বার্তা হয়ে ছুটে যায় পাশ গাঁয়ে। তারপরে ধানের মাঠ···জল কাদায় দূরত্ব গাছপালায় ঘেরা গ্রামটা। হিন্দু মুসলমানের বসবাস। হিন্দু পাড়ার ছোকরা, বুড়ো মাঝ-বয়েসীরা কোমর সোজা করে দাঁড়ায়, তাহলে এখন করণীয়।

মুসলমান পাড়ায় ছোকরা মাঝবয়েসীরা ফিসফাস কথা বলে, সব্বনাশ ! উপায় ? হিন্দু পাড়ার আমগাছ পাশের নারকেল গাছকে বলে, শুনেছো খবরটা ?

নারকেল গাছ বর্ষায় ফল ফলে পাতা ছড়িয়ে থোকা থোকা আমড়ার ভারে ডালপালাকে বলে, কিরে শুনলি খবরটা ?

ডানাবন্ধ করে শালিকটা সবে জিরোয় আমড়া ডালে। কথাবার্তা কনে যেতেই ডানা নেড়ে নেড়ে উড়ে যায় ছাতরা পাখির আড্ডায়। বলে, আয়। শুনবি তো কাণ্ড—

আমড়া গাছটার পাশে সরু খালে জল ভর্তি। সে খাল এঁকে বেঁকে চার পাঁচখানা গ্রামের বাড়তি জল টেনে টেনে নিয়ে যায় বড় খালে। দশ বারোটা গাঁয়ের জলচলাচলের ব্যবস্থা। সরু নালা খাল বড় খালকে বলে, গুরুতর ঘটনা গো—

সাত আটখানা মেটে পথে সাত আটখানা গ্রামের সদর। সব ছুঁয়েছে সকালের হাটে। খবরটা যেতেই ব্যাপারিরা আলু-বেগুন ঝাঁকায় তুলে নেয় চটপট। ফিতে সিঁদুর আলতা চুড়ি ব্যাপারি বড় সুটকেসে আবার সব গুটিয়ে নেয়। ডাল তেল লঙ্কার মুদিখানা ব্যাপারি বড় ঝাঁকা ভর্তি করে মাথায় তুলে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরমুখো। সকালে পাপড়ি মেলা বাজার হঠাৎ পাপড়ির মধ্যে ঢুকে বিবর্ণ। রুদ্ধ।

মাত্র দু-খানা মুরগির ডিম ন্যাকড়া পেতে মাটিতে রেখেছে পাঁচ ছ'বছরের হাসিনা আর মোমিনা। লোকের চোখে পড়বার জন্যে কচি হাতে ডিমের গা মুছে দেয়।

হাট সকালেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে দেখে হাসিনা বলে, চল। বেঁধে নে। ঘর যাই—

মোমিনা বলে, থাম না। কেউ যদি কিনে ?

এক ফেনা কাঁচা কলা নিয়ে বসেছে চার পাঁচ বছরের নিলু বিলু। এক আঁটি খড়ে পেতে রেখেছে পণ্যটি। নিলু বলে, এত সকালে হাট বন্ধ কেন রে···

বিলু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। শিশু প্রজন্ম অবোধ অজ্ঞতায় প্রাজ্ঞজনদের মুখ দেখে। কেমন পলাতক তাদের মুখচ্ছবি।

ফিতে চুড়ি আলতার ফেরিওলা পাঁচ গ্রাম পার হয়ে নিজের গৃহে ফেরে। মুখে মুখে ছড়িয়ে দেয়, লেগেছে। বড্ড লাগান লেগেছেরে মন্দরা—বোধহয় ধড় থেকে মুণ্ডু লাবিয়ে দেছে···

জল হাওয়া পাতায় পাতায় খবর ছড়ায়। মানুষ ছটফট করে। নিজের গ্রাম পুকুর জন্মভিটে যেন আতঙ্কের কূপ! মানুষের বসবাস যে কোন ভুবনে হওয়া নিরাপদ! ভুবন নিয়ে বিবাদ, না মানুষ নিয়ে!

রোগা রাস্তার মহকুমা শহর। সমস্ত শহর ছুটে যায় স্টেশনে। প্ল্যাটফর্ম ছাপিয়ে মানুষের ভিড় ফাঁকা রেল লাইনে। কালো মাথা পাকা মাথা গিজ গিজ করে। ভাগ্না নন্টু, হালদার বাবুরা স্টেশন মাস্টারের অফিসঘর জুড়ে দাঁড়ায়। নন্টুবাবু বলে, মাস্টার মশাই ফোন করে জানুন—হারুমামা বেঁচে আছে, না খতম ?

চাকতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যখন স্টেশন মাস্টার খবর পেলেন একটা চিরকুট লিখে পোর্টারকে থানায় পাঠায়। থানা গাড়ি নিয়ে ছোটে। গেঁয়ো মেঠো পথ ঘুরে যেতে যে কত দেরি!

মকবুল কাঁপে। ছামাদ কোমর সাঁটে। পাশে কাঠের মিস্ত্রিরা যন্ত্রপাতি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হাঁড়ি ডেকচি পড়ে থাকে। মকবুল অলিগলি দিয়ে ছাঁচ তলা নালা ডিঙিয়ে পালায়। খানিক গিয়ে দৌড়য়। মানুষের বসবাস ছেড়ে মানুষ ক'জন ছোটে। ঝোপ ঝাপ খোঁজে। ভাবতে পারে না, গাছপালা জঙ্গল নদী পাহাড় মানুষের গোপন আশ্রয়? না, মানুষের মধ্যেই মানুষের গোপন নিরাপত্তা! কোথায় আশ্রয় নিলে যে প্রাণে বাঁচা যায়। মকবুল ছামাদ লুকোয়···আবার হাঁটে···কখনও দৌড়য়। পৃথিবীর মাটি যেন শেষ হয় না। মাটির উপর ছড়ানো বিপদ ফুরোয় না···!

একদল ছেলে-ছোকরা কর্মচারী দোকানের হিন্দু মালিক রোগা রাস্তায় দৌড়য়। হাতে লাঠি কাটারি। সোজা ইসলামিয়া হোটেল।

ভাত তরকারি গুছিয়ে সদয়কুমার জবারানীকে বলে, এটু দেখো—এক্ষুণি আসতেছি।

বাপের পিছু নেয় গুড়ে ভুঁড়ে।

কাঠের দোকানে নতুন আসবাব তছনছ। কারুর হাতে আড়াই তিন ফুট পায়া কাঠ। খালি হাতে এখন অস্ত্র সজ্জা। মিস্ত্রিরা নেই। অভিযান ব্যর্থ! কেউ কেউ বিধান দিল, চল শালার মকবুল কে ধরি—

শুধু ছিটে বেড়ার দেওয়ালটুকু পার হতে যা সময়! ফাঁকা হোটেল ঘর। জলের গেলাস। থালা। খানা খাবার মাদুর। বড় ডেকচি ভর্তি ডাল। সকালে কেনা মাছের ঝোল। পেঁয়াজ, রসুনের কড়া গন্ধ। গরম তেলে একমুঠ চিনি কষতেই ঝোলের রঙ টকটকে লাল। একজন বলল, কোথায় শালার মকবুল? তার রক্ত দেখতে চাই—

পেটের খাদ্য ডেকচিতে গুছোনো। সে দ্রব্যের রঙে রক্তে এত উত্তেজনার উদ্রেক! রক্তের কোথায় যে লুকিয়ে থাকে এত প্রতিশোধ···!

স্টেশন চত্বরে মানুষের জমায়েত অধৈর্য। হালদারবাবু স্টেশন মাস্টারকে চাপ দেয়, কই খবরটা বলুন—

মাস্টারের দায়িত্বে রেলের সম্পত্তি। গত রাতের ক্যাশ। সাবধানে বলে, আপনাদের হারুবাবুকে জ্যান্ত এনে দিলে হবে তো?

নন্টুবাবু দাপায়, শুধু জ্যান্ত নয়। অক্ষত—

—একটু থামুন। দারোগার গাড়িটা আসতে দিন—।

তীব্র উল্লাসে ছোট্ট শেড কেঁপে ওঠে।

ইসলামিয়া হোটেলের উনুনে বড় হাঁড়ি। সাদা ভাত বুট বুট ফুটে ফ্যান গড়িয়েছে। হাঁড়ির গায়ে ঘন মাড়ের চাবড়া। ফ্যান চুঁইয়ে আগুন নিস্তেজ। হাঁড়ির তলায় ভাত জমে যায়। কান্টা টই টই সাদা ভাত।

নন্টুবাবুর শিক্ষক ভাই এসে বলে, মকবুল আছে?

দু-চারজন একসঙ্গে উত্তর করে, আর থাকে ?

—যাক। শালারা বেঁচেছে—

কেউ হাতে হাতে মাছ নেয়। বেজাতের মাছে অর্থে জাত যায় না, যায় শুধু অন্নে। ভিড় ফাঁকা হতে থাকে। একেবারে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় গুড়ে ভুঁড়ে। দু-ভাই।

গুড়ে বলে, বাবা—মকবুল কাকা নেই। ভাতের হাঁড়িটা নাবিয়ে দাও না—

এত লোকের সামনে শিশুর প্রাণের কথা যে মারাত্মক। সদয় দাবড়ি দেয়, চুপ মার—

ভুঁড়ে অবাক হয়ে বাবাকে দেখে!

গুড়ে বলে ভুঁড়েকে,…এই

—কী ?

—সেই বাচ্চা কোলে মা…কুটকুটে দাঁত কচি ছেলেটা, মেয়েগুলো যদি আসত! খেয়ে ফুরোতোনি…। নারে…!

যেহেতু গুড়ে একটু বড়। ভাতের অনটনে চালবাটা জাউ পুজোর বাতাসা ফুটিয়ে যে কী মহার্ঘ খাদ্য…। সে অভিজ্ঞতায় দু-চোখ ভরে নষ্ট ভাত দেখে। ভুঁড়ে দাদার মুখের দিকে চেয়ে আবার হাঁড়িটা দেখে।

মরা আগুনে ধিক ধিক তাপ। তলার ভাত পোড়ে। চুঁয়ে যায়। দুর্লভ খাদ্যকণায় গন্ধ!

সদয়কুমার লম্বা নাসার ডগা মোছে। ভাত আরও পুড়ে যায়। মকবুলের রান্নাঘরে সদয় ভাবে, চোঁয়া ভাতে যে মানুষ পোড়ার চেয়েও বিকট গন্ধ!

তেইশ

ভরা আষাঢ়ে আকাশ কদিন ঢেলে দিয়েছে সহস্র ধারায়। এখন সপ্তাহ খানেক জিরেন। রোদ ফুটেছে। বালিভাজা রোদ। টনকো হয়ে উঠছে সদ্য প্রসূতি পৃথিবী।

টিনের ছাউনির ফুটোফাটা দিয়ে জল ঢুকেছে। মাটির মেঝেয় কোথাও কোথাও রসে কাদা। চড়া রোদে সে কাদায় শুকনো সর। উপরে ছাউনির টিনের দিকে তাকিয়ে সদয়কুমার ভাবে, রায়বাবু—এত জমিদার মানুষ। তার ঘরে যে টিনগুলো এত লজঝড়—

সামনে দশ হাত চওড়া, লম্বায় পঁচিশ হাত টিনের ছাউনি। হোটেল ঘরটার চারদিকে দেখে জবারানী। কটা পুরনো শাল গরান খুঁটির উপর তো মস্ত কাঠামোটা দাঁড়িয়ে। তিন পাশে বাঁখারি, গাঙ পাড়ের ক্যাওড়া গেঁমুয়া গাছের ডালপালার জাঁক দিয়ে ছিটে বেড়া। তার উপর কাদা লেপে পাশের দোকানের সঙ্গে তাদের 'মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ে'র কামারটুকুর তলস্ত ভূমির বিভাগ। একই ছাদ ছাউনি তো টানা বারোখানা দোকান ঘরের। ভাবতে ভাবতে জবারানী স্বামী সদয়কুমারকে বলে, যদি মাটির দেওয়ালটা খসে ধসে যেত না-হয় আমি

কাদা গোবরে ন্যাতা পোছা দিয়ে সারিয়ে ফেলতুম।···ওই অত বড় টিনের ছাউনি ···আমরা পারব কি করে গো···

মাত্র চার পাঁচ বছর হল এই ঘরটুকু নিয়ে জীবিকা। এমন কিছু তো সঞ্চয়ও হয়নি। এত বড় টানা ঘরবাড়ি। দেশ গাঁয়ে যেটুকু টিনের ছাউনি ঘেরা ঘর ছিল সেটাও তো সারানো সাধ্যের বাইরে তখনও। গৃহও তো গেরস্তর সেবা-যত্ন চায়! তা নাহলে টেকে কী করে? দেশের বাড়িতে টিনের চালায় একটা বাঁশ কোথাও একটু তারের বাঁধন দিয়ে টেকানো হত! কিন্তু এখানে? এ যে গোটা রাস্তা জুড়ে দোকানঘর! কার সাধ্য যদি মালিক না সারায়? হুট করে হোটেল ঘরের বাইরে আসে সদয়কুমার। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাঁয়ে তাকায়। ইট খোয়ার উপর পিচ ঢালাই রাস্তাটা বাঁক নিয়ে রেল স্টেশন মুখো। ডাইনে তাকাতেই দেখে রাস্তাটা ঢেউ খেয়ে মহকুমার কোর্ট কাছারি বেড় দিয়ে সোজা গাঙ ছুঁয়ে ছুঁয়ে উধাও। নিজেদের বাড়িওয়ালা রায়বাবুর টানা বারো ঘরের ছাউনির পর ষোলোখানা দোকানঘর নিয়ে ধানকলের হালদারবাবুদের টিনের চালা। তারপর মিত্র উকিলদের খান আষ্টেকের কামরা। পাকা রাস্তা থেকে সোজা গাঙ চড়ার জঙ্গলে মাঠটার দিকে যেতে খানিক ফাঁক রেখে অতুল মাস্টারবাবুর বাইশখানা দোকানঘরের ছাউনি। ঢেউকাটা টিনে রোদ চকমকায়। মনে হল, নতুন টিনের ছাউনি। কদিনের বৃষ্টিতে একদম ঝকঝকে টিকিট মাস্টার অতুলবাবুর টিন। ও বাবুর ভাড়াটেদের গায়ে জল পড়েনি···।

সদয়কুমারের গায়ের কাছে পুরনো তালগাছটা। রাস্তা ছাড় দিয়ে মাটিতে যে কোন কাল থেকে দাঁড়িয়ে। গায়ের কোটরে দুটো টিয়ার বাসা। ওপরের পাতা ক্রমশ কমজোরি। একটু হাওয়া উঠতে পাতা সড় সড় বাজে। বাজে সদয়ের কানে মকবুলের পরামর্শ,···ওই কোর্ট কাছারির দিকে তো লাটঘাটের লোক সমাগম। মামলা মোকদ্দমা করতে এসে তোমাদের দোকানে ভাতমাছ খাবে। এতদূরে থাকলে বাজার পাবে?

উপরে নীলচে আকাশ। থোকা থোকা মেঘ। জল ঝরিয়ে ফ্যাকাশে। চরে বেড়াচ্ছে মস্ত শূন্যতায়। তার তলে তো এই শহরটুকু। কোর্টকাছারি। থানা রেলস্টেশন আর দোকানপাট। কত গ্রাম গঞ্জ। মানুষের আনাগোনা না থাকলে মানুষের তো চলে না, মানুষের কাছ থেকে পয়সা বের করে নেওয়াও যায় না। ধানের জমি বাস্তু পুকুর খাল গাছপালা নিয়ে তো নিত্য ঝামেলা। তার সুরাহা প্রার্থনায় মানুষগুলো আসে। সুতরাং ওই মানুষগুলোকে ধরতে হয়।

রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে কটা খিরিস গাছ। ঝাঁকড়া মাথায় ছায়া ফেলেছে নীচে। আটকে আছে ডালপালার বিস্তারে উপরে আকাশ। গাছটা দেখতে দেখতে বড় শাখা চোখে পড়ে। যেন রাস্তা আগলে রেখেছে ছায়া দিয়ে। খোঁচা-পালার পুঁটলিতে কাকের বাসাটা শাখার ডগায়। বাসা থেকে একমুঠো কালো হঠাৎ ছিটকে আকাশে ডানা মেলে দাগ কাটে। সদয়কুমারের মনে হল, ওই সোজা তো মকবুলদার ইসলামিয়া হোটেল···। অতুল মাস্টারের বাইশ কামরা!

জবারানী পিতলের লম্ফটার গায়ে ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে। গতরাতের ভুষো-

কালি মোছে। দু-আঙুলের ডগায় কালচে ন্যাকড়া। একটু করে চাপ দেয়, সারা শরীর ঝুঁকে থাকে। পিতলের জিনিসটায় সোনার রঙ ঝিকিয়ে ওঠে। জবারানীর বুকে ঝিলিক মারে মায়ের মুখ। ভাবে, কতদিন যে যাওয়া হয়নি বাপের ঘর…! নিজের মধ্যে কথাগুলো আকার পেতেই ভীষণ অন্যমনস্ক জবারানী। আপন রক্তের জনদের উপর নির্ভরতার আর্তি বুকে বাসা বাঁধে। পুরুষমানুষটা তো ভেবে পথ বাতলাতে না পেরে রাস্তার উপর। এখন চাপরাশি দাদার চলন বলন বড্ড চোখে ভাসে। পলতে মুখের নলটায় ভুষো কষ। ন্যাকড়া ঘষতেই প্যাঁচ কেটে নলটা নড়বড়ে। পরক্ষণেই মনে জাগল, আজ জ্বলবে তাই…। রান্নাশাল তো তাহলে অন্ধকার… !

শেষবেলায় ক্ষীণাভা ঘরের ভিতর। আবছা সব বোঝা যায়। দেখা যায় না খুঁটিনাটি। দোকানঘরের বাইরে দিনের আলো তেজ হারালেও বেশ স্পষ্ট। নিজের পুরুষমানুষটা অত দূরে। এদিকে লম্ফটা অকেজো। তাই সময় থাকতে জানান দিতে জবারানী হাঁকে, কই গো—এদিকে এসবে ? ঘাড় ফেরায় সদয়-কুমার। চোখ ফেলে হোটেল ঘরের অন্দরে। সব অস্পষ্ট। শুধু জবারানীর হাতে শাঁখা চুড়ির ঠুনঠান শব্দ। শব্দগুলো জুড়ে গেঁথে নারীটার ছায়ামূর্তি আন্দাজ করে। কাছে এসে বলে, কি গো ?

লম্ফটা বাড়িয়ে ধরে, এই দেখ না ক্ষেতি করে ফেলিছি…। কথার মধ্যে লজ্জার সুর। অসহায় অপরাধীর ব্যথাও বাজে।

—দেখি, একটু নেড়ে চেড়ে স্ত্রীর মনে জোর জোগায়, দুস্‌। একটু সাবান নি আয়—। ঠিক করে দিচ্ছি—

জবারানী রান্নাঘরের কোণে কাপড়কাচা গোল সাবানটা আনতে যায়। এখন সদয়কুমার জোরে বলে, হ্যাজাক লাইটটাও আনবি গো—

জবারানী খুশিতে নিজের মতো করে গোপনে হাসে। পিতলের লম্ফটা তো আর শ্বশুরঘরের পাওনা নয়। জবারানীর মায়ের দেওয়া। সুতরাং কতখানি আর বকতে ঝকতে পারে। এরকম যুক্তিতে জবারানী নিজেকে গুছিয়ে দাঁড় করায় স্বামীর সামনে। হাতে তখন হ্যাজাক লাইট। সরু হাতলে গোটা পেট্রোম্যাক্সটা দাঁড়ে পাখির মতো দোলে।

ক্রমে ক্রমে ঘরের মধ্যে আঁধার জমে। জবারানী ঘরময় চণ্ডমণ্ড করে। একবার দোকানঘরের পিছনের দিকে চলে যায়। পায় না। আবার বাইরে রাস্তায় আসে। চোখে পড়ে না ছেলে দুটোকে। সদয়কুমারের কাছে এসে জবারানী বলে, তারা দুটো গেল কোথায় ?

—তাই তো… !

সদয়কুমারের হাতে সাবানের গুলতি। পেট্রোম্যাক্স লাইটটার পাশে পিতলের লম্ফটা। মাটির ভিজে মেঝে সারাদিনের রোদে শুকিয়ে খানিক স্বাভাবিক। দোকানের বাইরে অন্ধকার নেমেছে। কিন্তু ছেলে দুটো…! দোকানঘরটা শূন্য। খুঁজতে, ডাকতে গেলেও তো সন্ধে মুখে সময় নষ্ট ! জবারানী বলে, তুমি আলো জ্বালাও। আমি তাদের দেখি—।

সবে মেঝে ছাপিয়ে রাস্তার দিকে পা ফেলেছে, গুড়ে ভুঁড়ে দু-ভাই ছুটে এসে মায়ের দু-হাত আঁকড়ে ধরে। হাঁপিয়ে বলে, কোথায় গো মা—

উত্তর না দিয়ে বরং শুধোয় বাচ্চা দুটিকে, তোরা কোথায় ছিলি— ?

দু-ভাই মায়ের দু-হাত টানতে টানতে বাপের কাছে হাজির। সদয়কুমার হ্যাজাকের মধ্যে কেরোসিন ঢেলে ছিপিটা আঁটছে। গুড়ে সদয়কুমারের সামনে দাঁড়ায়, আর বিস্কুট দেয় নে—

—কে ?

—মকবুল কাকা।

—উম্‌। রোজ রোজ কেউ দেয় ?

—এই বড় হাঁড়ি, হঠাৎ মুখ ফসকায় ভুঁড়ের।

—কোথায় রে ? জানতে চায় সদয় মুখুজ্জে।

—মকবুল কাকার হোটেলে। ঘর সাজাচ্ছে—। ···এই বড় বড় ডেকচি খুন্তি সব, দু-হাতের পরিমাপে দ্রব্যগুলির আকার বোঝাতেই পরের বাক্য হারিয়ে ফেলে ভুঁড়ে।

ছেলের কথায় বাপ সদয়কুমারের বিস্ময়! ছ-সাত মাস যে কেমন করে কেটে গেল। মানুষটা আবার ফিরে এসেছে! একবার সদয়কুমার জবারানীর দিকে অনুমতি আকাঙ্ক্ষায় তাকায়।

মানুষটার মনের কথা বুঝে বলে, কি গো—দেখা করতে যাবে ?

—যাওয়া···একবার গেলে হয় নে ?

—আলোটা জ্বালিয়ে তারপর যাও। আমি রান্নাঘর দেখিয়ে—

স্ত্রীর কথায় আশ্বাস। এই আশ্বাসটুকু দেওয়ার জন্যে তো যাওয়া দরকার। মকবুল লোকটার আসা যাওয়ায় তো মনে জোর এনে দিত। গ্রাম ছেড়ে এই শহরে যখন থই···তলহারা গেঁয়ো পুজারি, মানুষটাই এসেছে, ভাবতে ভাবতে হ্যাজাক লাইটের স্পিরিট বাটিটায় দেশলাই কাঠি পারে। দপ্‌ করে আগুন···।

···আগুন তো পাঞ্জাবে। অমৃতসরে। বহু গৃহ, অট্টালিকা পুড়ছে। বহু নরনারী শিশু কোলে পিঠে নিয়ে বসবাস ছেড়ে নিরাপদ আবাসের খোঁজে। রাওয়ালপিণ্ডিতে লুট···খুন! শিয়ালকোট জলন্ধরে হানাহানি। প্রচণ্ড উন্মত্ততা, ভয়ঙ্কর আতঙ্ক আর বুদ্ধিদীপ্ত অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের মধ্য দিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে হতাহত পাঁচ হাজার। পাঞ্জাবে মৃত পঁয়ত্রিশ জন। সবই হিন্দু, মুসলিম নয় শিখ। সাহেবরা পোড়ে কিংবা মরে কই···।

বার্মা শেলের লাল কেরোসিন হ্যাজাকের তৈলাধারে। স্পিরিট বাটির গায়ে চীনে দেশলাই কাঠিটা। ম্যান্টেল থেকে ক্রমশ সাদা আলোর দ্যুতি। চীনে কাঠিটা ধোঁয়া ছেড়ে ধিক ধিক আগুন পাকিয়ে লালচে রঙ ধরে। সদয় কাঠিটা পুড়তে দেখে! একটা ছোট্ট গাট্টা গোট্টা কাঠি আগুনের ফুলকি মারে। কাচের মতো স্বচ্ছতায় মাইকা টোপর। তার মধ্যে কাঠির আগুন। সদয়কুমারের মনে হল, দেশে তো সেই পাটকাঠির ডগায় তরল গন্ধক লাগিয়ে আগুন কাঠি। কিন্তু

এটা তো ঘষলেই আগুন। এ কাঠি কি আমাদের দেশে তৈরি হয় নে? চীন-এ কেন? চীন দেশটা তাহলে কোথায়··· ! কতদূর··· ! রায়বাবু···রায়বাবু জানে নিশ্চরই।

ঝম ঝম বৃষ্টি। উত্তর আগলানো মস্ত পর্বত ভিজছে। ভিজছে পাহাড়ের ওপারে জনভূমি। মাওয়ের গণ ফৌজ নগর গঞ্জ থেকে ঘাঁটি গাড়ছে গাঁয়ে। দেহাতে। সামনে তো মার্কিন সামরিক মিশনের আক্রমণ। একই জায়গায় না থেকে আরও সংহত হতে আপাত আশ্রয় বদলানো। চিয়াংকাইশেকের কুওমিণ্টাং সেনাদলকে পরিশ্রান্ত ও জেরবার করার জন্যে। গণফৌজ যেখানেই যায় ভূমি সংস্কার করে। পল্লী ঋণ মকুব করে। জমি বণ্টন করে। কুওমিন্টাং বাহিনীর সৈনিকের দুঃখী পরিবারও ভূমি পায়। মাও ও কমিউনিস্টদের উপর শ্রদ্ধা, মায়া জন্মায়। গণফৌজ মাটির ভালোবাসায় পুষ্ট হয়। মস্তিষ্কের আরও গভীরে শিকড় সেঁধোয়। সন্ধান চালায় প্রাণরসের। কুওমিন্টাং সেনাজীবন চিয়াংয়ের দোসরদের জন্যে···না সোনালি বালির নদী বা চিনশা নদীর দুকূলে বসবাসী আপনজনদের জন্যে··· !

দ্বিধান্বিত চাকুরিরত দেশবাসী ! বেদ পুরাণ মহাভারতের হিমালয়ের ওপারে দিনের আলোয় মানুষ খুঁজছে আপনজন। এপারে সূর্য উঠলেও দিন ফোটেনি।

ওয়াশার আঁটা রডটা ধরে পাম্প দেয় সদয়কুমার। মাঝে মাঝে পিন মারে। দপ্ দপ্ শব্দে ম্যাণ্টেলের গায়ে আলো খোলে। সাঁ সাঁ ডাক। লোহার শিক বাঁকানো আংটায় হ্যাজাক লাইটের হাতল ঝোলায়। যেহেতু প্রথম সন্ধে, এবেলার জন্যে তো আবার বিক্রিবাটার আয়োজন। যাতে খদ্দের পাতি আসে, দূরের কালীমন্দিরের উদ্দেশে দু-হাত জোড় করে দেবীকে প্রণাম জানায়। দেবী প্রসন্ন হোক···তৈরি ভাত মাছ সাপটে বিক্রি হয়ে যাক। তাই জোড় হাত একবার কপালে ঠুকে আবার ছোঁয়ায় সদয়কুমার। পাশে দাঁড়িয়ে গুড়ে ভুঁড়ে। নিজেদের কপালে কচি কচি হাতগুলো বাবার মতো করে একবার ছোঁয়ায়।

কাপড়ের ব্যাগ কাঁধে রোগা বেঁটেখাটো লোকটা এসে দাঁড়ায়। দু গাল মাড়ির মধ্যে ঢুকে খোদল। জাগ্রত দু-হনুর আড়ালে চোখ দুটো পিটপিটে। সিঁথি কেটে কাঁচা পাকা চুল !

সদয়কুমার বার চারেক কপালে জোড়হাত ছোঁয়। লোকটা অধৈর্যে ভাবে, বাপুরে। মা কালী না মানুষ···কে তোর খদ্দের রে? গড় যে শেষ হতে চাইছে নি—।

গুড়ে ভুঁড়ে লোকটাকে দেখে। কিছু কথা বলতে চায়, না খদ্দের হিসেবে হাজির। বেশ ধন্দ গুড়ের মধ্যে। ভুঁড়ে দাদার দিকে তাকিয়ে খানিক হিমসিম। তাদের হোটেলে খদ্দের হয়ে যারা আসে, মানুষগুলোর ময়লা জামাকাপড়। খালি পা। মাথার চুল দু-তিনবেলার রুখু। চটের বাজারি ব্যাগে পোটলা পুঁটলি। এ মানুষটি যে সেই ধাঁচের মধ্যে পড়ে না ! বাবার প্রণাম মগ্নতার অবসরটুকুতে দু-ভাই মানুষটার দিকে চেয়ে থাকে।

মুদিত চক্ষু সদয়কুমারের। দু-হাতে দু-কান, নাকটা একবার মলে নিজ

পাপ অন্যায়ের ক্ষমা চেয়ে আবার প্রণাম জানায়। স্বগত ভঙ্গিতে বলে, মা-মা-মা কালী মহাকালী মা গো—ও···

প্রবল আচ্ছন্নতায় দু-চোখে ঘোর। সদয় মানুষটাকে নজর করেনি। পিছন ফিরে রান্নাঘরের দিকে যেতে উদ্যোগী, মানুষটা বলে—, এই যে।

কাঠের বেঞ্চিটার গায়ে আলো। বার্নিশ হীনতায় ছাউনি কাঠের উপর তেল জলের আবছা দাগ। ফ্রেম পায়ার তলায় অন্ধকার। বেঞ্চি ঘেঁষে ছেলে দুটো দাঁড়িয়ে। সদয়কুমার ঘাড় ফেরায়। অচেনা মানুষটার প্রতি সম্ভ্রমে বলে, আজ্ঞে ?

—তুমি সদয় মুখুজ্জে ?

—হ্যাঁ বাবু।

—ব্রজেন ঘোষালদের কোর্টেই তো আমি কাজ করি—

মাটির মেঝে বেয়ে কথাটা সোজা রান্নাঘরে। জবারানীর কানে আচমকা ব্রজেন ঘোষাল! একেবারে আঁত মুচড়ে আবেগ। ত্রস্ত পায়ে রান্নাঘরের দোর-গোড়ায়। লাল পাড়ে পিতল লম্ফের পলতে ছিটকে আলো। কপালে সিঁদুর টিপের গুঁড়োয় পেট্রোম্যাক্সের সাদা আলো ঝলকায়। বুকের মধ্যে বাপের বাড়ি ঝাঁকুনি মারে।

—ও। আসুন বাবু—আসুন, বলতে বলতে কোচার কাপড় দিয়ে কাঠের বেঞ্চটা সাফ করে। গুড়ে ভুঁড়ে একটু তফাতে সরে যায়।

সদয় মুখুজ্জে বিনয়ী গলার বলে, বাবু আপনি···

মানুষটা ব্রজেন ঘোষালের ভগ্নিপতির আগ্রহেই শুরু করে, আমি—আমার তো দেওয়ানি কোর্টে চোদ্দ পনেরো বছরের প্র্যাকটিশ হয়ে গেল—

সদয়কুমারের কাছে কথাটা তত খোলসা নয়। কী যে বলতে চায় মানুষটা তার হোটেলে এসে! না বুঝতে পেরে সদয়কুমার আবার বলে, আজ্ঞে— ?

এ ধরনের লোকই মনে মনে চাইছিল হরিরামবাবু। তার কাপড়ের সাইড ব্যাগে কখানা ডেমি কাগজ, একটা খামের মধ্যে কোর্টফি, সদ্য শুনানি সারা দুটো কেসের কাগজ পত্তর।

—আমি—আমিই তো চার পাঁচটা উকিলকে চালাই। যত মক্কেল আসামি তদ্বিরকারি আসে তাদের বৃত্তান্ত শুনে বুঝে সেই মতো উকিল দিই। তোমার শালা ব্রজেনদা—আমাকে ভালো করে চেনে। চেনে এই শহরের বড় বড় বাবু—ব্যবসাদার—

মানুষটার মুখে যেন খই ফুটছে। চিমসানো চামড়ায় শক্ত চেহারা। লম্বা নাসিকা। হাওয়ায় গন্ধ পায়। তাই ফট করে বলে,—এ দিকে যতগুলো মালিকের ভাড়া ঘরের লাইন—সব আমি জানি। ওদের দলিল—লিজ চুক্তির নাড়ি-নক্ষত্র আমার কাছে—

রান্নাঘর অব্দি মানুষটার হাত নাড়া, মুখ নাড়ার ধাক্কা পৌঁছয়। বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে জবারানী। ভাবে, সব তো নিজের কথা! দাদার কথা কয় কই ?

বেঞ্চটায় নিজের পাশে মৃদু চাপড় মেরে সদয়কে ইঙ্গিতে বসতে বলে। একটু

সন্ত্রস্ত হয়ে বসে সদয় মুখুজ্জে।

হরিরামবাবু সদয়কে কাছে ডেকে বলে, তুমি—তুমি এই কোর্টের কাছাকাছি দোকানঘর খুঁজছিলে বলে খবর পেলুম—

—আজ্ঞে সে তো···, বলতে বলতে জবারানীর দিকে তাকিয়ে চুপ মেরে যায়। বরং ভাবে, মকবুলদা মাঝে মাঝে বলত বটে! সে তো মারামারি কাটা-কাটির দাঙ্গা হল্লায় কথা আর এগোলো কই? তার বদলে এই লোক যে কেন···!

বদলি তো হয়ে গেছেন বড়লাট ওয়াভেল সাহেব। ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীর পূর্ণ সমর্থনে পাঠানো হয়েছে লুই মাউন্টব্যাটেন আর তাঁর সুন্দরী স্ত্রী লুই এড্‌উইনাকে এদেশের মাটিতে। বাতিল হলেন ভারত সচিব পেথিক লরেন্স। এলেন তাঁর চেয়ারে স্টিলওয়েল।

উনিশ শো সাতচল্লিশের মার্চ মাসের খর দহন। সেই রোদ্দুরে নেমে কদিনেই তো মাউন্টব্যাটেন মধ্যস্থতা শুরু করে দিয়েছিলেন গান্ধী জহরলাল জিন্নাদের সঙ্গে। এটলি সাহেবের ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তখন বিরোধী নেতা চার্চিল। বিশে মে মাউন্টব্যাটেন চার্চিলের সঙ্গে কথাও বলেন। জিন্নাকে পরামর্শ বা চাপ দেওয়ার জন্যে চার্চিলের একখানা চিঠিও লিখিয়ে নেন নতুন বড়লাট। যার মধ্যে সারবস্তু ছিল, আপনি দু-হাতে প্রস্তাবটি গ্রহণ করুন। তা না হলে পাকিস্তানের বিষয়টা জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে।

তারপর মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা ব্রিটেনে এটলির মন্ত্রিসভা তেইশে মে অনুমোদন করলেন। বড়লাটের ব্যাগে সেই পরিকল্পনার কাগজ পত্তর। রোগা গলা সরু বেঁটে খাটো হরিরাম হালদার হাফশার্টের ঝুল পকেট হাতড়ায়। পায় না জিনিসটা। কাপড়ের ব্যাগটা খোলে। অনেক কাগজ পত্তর। ভেতর পর্যন্ত হাত চালায়। সদয়কুমার দেখে। দূরে রান্নাঘরের দোরগড়ায় জবারানী। দু-চোখে অপলক দৃষ্টি। খুঁটিয়ে লক্ষ রাখে সব কিছু।

হরিরাম ব্যাগ হাতড়ে কৌটোটা পায়। ঢাকনি খুলতেই বিড়ি। পাতার মোড়কে শুকনো মশলা। যেহেতু নিজেই পাকিয়ে সুতো বাঁধে, স্যাঁকা হয়নি। কাঁচা গন্ধ। একবার দু-আঙুলের চাপে সাইজ করে বিড়িটার সামনে পিছনে ফুঁ দেয়। আগুনের দরকার। মহারানী ভোজনালয়ের হ্যাজাক সাঁ সাঁ শব্দে জ্বলছে। লোহার আংটাটা যে অনেক উঁচু। মনে ভাবল, দেশলাই কাঠিটা বাঁচে ওই আলোটা যখন কাছেই। সুতরাং আঙুলে হ্যাজাকটা দেখিয়ে হরিরাম মুহুরি বলে, লাবাবে ওটা—একটু ধরিয়ে নিই?

চমকে ওঠে জবারানী! দোকানের বাইরে অন্ধকার বেশ ঘন। দু-একখানা তিন চাকা রিকশা। মাঝে মাঝে ঘণ্টি মেরে সাইকেল যায়। সবে সন্ধে মুখ। একজন খদ্দেরও এতক্ষণ ঢোকেনি। সে দোকানের প্রথম বাতিতে বিড়ি ধরিয়ে অপবিত্র করে দেবে, আজ এবেলাটা! কথাগুলো মনে হতেই জবারানী ধাঁ করে রান্নাঘরে ঢোকে। পিতলের লম্ফটা নিয়ে দোরগড়ায় দাঁড়ায়। হঠাৎ আগুনের শিখা! সদয়কুমারের চোখে লাগে। মুহূর্তেই স্বস্তি মুখ। ঝটপট লম্ফ নিতে যায়। বউ জবারানী বিড়বড় করে বলে, আমাকে না জানিয়ে বাবুটাকে কথা

দিওনি—

লম্ফটা ধরে হরিরামবাবুর সামনে দাঁড়ায় সদয় মুখুজ্জে।

বিড়িটায় আগুন লাগিয়ে টান দেয়। বার কয়েক দম মেরে বলে, তোমার এ ঘরে তো জল পড়ে?

—পড়ে।

—এখন তো সবে বর্ষার শুরু। আরও ঝেঁপে এলে মেঝেয় বসে খদ্দের খাবে কি গো? বরং কাদায় ধান রোয়া যাবে—

—কথাটা তো সত্যি। কিন্তু···, বলতে বলতে থেমে যায় সদর মুখুজ্জে।

হরিরাম মুহুরি যেন মক্কেলকে জেরা করে আর্জি লিখছে, কিন্তু···কি?

—রায়বাবুকে বলে দেখি, ছাউনির টিন দু-চারখানা যদি পাল্টে দেয়।

সরু নাসিকা, তীক্ষ্ন চোখ হরিরাম হালদারের। একটু ভাবতেই বুঝে ফেলে মালিক রায়বাবুর চেয়ে অতুল মাস্টারের তো ভাড়া ঘর অনেক বেশি। চলতি দোকান নিজেরই তিন খানা। স্টীমার ঘাটার টিকিট কাউন্টারেও বসলে মাইনে। সব মিলিয়ে অতুলবাবু অনেক বেশি ক্ষমতাবান। সে তুলনায় রায়বাবু? সে লোক তো শুধু লাটের জমির ধান বেচে ফড়ফড়ায়। তাই সদরকুমারকে বেশ গোটা গোটা অক্ষরে শোনায়, ধুস্ বাপু। রায়বাবু সারাবে তোমার টিন? তোমার একলার সারালেই হবে? আর ভাড়াটেরা চেপে ধরবেনি? বলবে, আমাদের ছাউনি যে ফুটো গো রায়বাবু—

মুহুরির কথা যুক্তিসংগত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কী যে করা উচিত,—ভাবতে গিয়ে সদয়কুমার নিতান্ত বিব্রত!

বিব্রত এসময়ে ভারতবর্ষের নেতারাও। মাউন্টব্যাটেন সাহেব প্রস্তাবটা ফেললেন জিন্না, লিয়াকাৎ আলি ও আব্দুর রব প্রমুখ লিগ নেতৃত্বের সামনে। ওপাশে জহরলাল। বল্লভভাই প্যাটেল ও কংগ্রেসের সভাপতি কৃপালনী। এ ছাড়া আকালীদের পক্ষ থেকে সর্দার বলদেব সিংও উপস্থিত। প্রস্তাবের মূল কথা ছিল,···পাঞ্জাব ও বঙ্গকে বিভাগ করে মুসলমান ও অমুসলমান ভিত্তিতে এক্ষুনি পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ নামে দুটো রাষ্ট্র তৈরি ও এই দুই নব রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা অর্পণ। কংগ্রেসের শাসনে আছে যে মুসলিম গরিষ্ঠ সীমান্ত প্রদেশগুলি আর আসামের শ্রীহট্ট জেলা কোন রাষ্ট্রে যোগ দিতে চায়—সেটা ঠিক হবে গণভোটের দ্বারা।

বিশাল ক্ষমতাপুষ্ট মাউন্টব্যাটেন জোর দিলেন, আজ এই দোসরা জুন মাঝরাতের মধ্যেই নেতাদের চূড়ান্ত মতামত জানাতে হবে··· ।

—কি তুমি রাজি তো সদয়বাবু? জানতে চায় হরিরাম হালদার। হাতের বিড়িটায় দম মেরে আগুন একেবারে সুতো অব্দি।

ভ্যাবলা চোখে তাকায় খানিক। পরক্ষণে সদয় ভাবে, মাত্র ক-বছর হল এই ব্যবসা। এখুনি স্থানান্তর যে কেমন হবে···

কংগ্রেস নেতারা জানতে চাইল মাউন্টব্যাটেনের কাছে, ভারত ও পাকিস্তান দুই ডমিনিয়নের একজন কমনওয়েলথ্ না ত্যাগ করলে আর একজন পারবে

কি না ?

উত্তর পেয়েই কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবে সম্মতি জানায়।

হঠাৎ বলে ফেলে সদয়কুমার, হ্যাঁ বাবু—মাস্টারবাবুর নতুন ঘরে ভাড়া টাড়া কেমন ? মাঝে মাঝে সারিয়ে দেবে ?

—উঁ ? কথাটা শুনেও তবু জানতে খানিক সময় নেয়। বেশি সময় নিজের জন্যে নষ্ট তো করবে না। নষ্ট করতে দেবেও না সদয়কুমারকে। তাই শুরু করে দেয় অতুল মাস্টারের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির দলিল—দস্তাবেজ সলেনামা ইত্যাদির মুসাবিদাকারি হরিরাম হালদার, —ভাড়া ?

সদয় মুখুজ্জের উৎকণ্ঠাময় মুখের দুচোখ সহমত জ্ঞাপন করে, হ্যাঁ গো—

—সে আমি বনিয়ে সনিয়ে করে দুবোখোন, আশ্বাস দেয় হরিরাম মুহুরি।

—আর…

—মাঝে মাঝে ঘর সারাই ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিনয়ে লতিয়ে পড়ে সদয়। কাজটা বাগিয়ে তুলতে পারলে অতুল মাস্টারের কাছে দস্তুরি তো হবে। এক শিশি বাস তেল না হয় একটা ধুতি। তাই ফিরিস্তি দিয়ে বোঝায়, এটা আর কি এমন। তার ঘর সে সারাবে না তো লন্ডন বোম্বের কোম্পানি এসে সারাবে ? জান তো…টিকিট মাস্টার-বাবুর বাইশ খানা ঘরের জন্যে যুদ্ধের বাজারে এক বাণ্ডিল কর্গেট টিন কেনা আছে। এই মোটা…পুরু সে টিন। ঢেউ খেলানো। জল পড়লে মাথায় তো চক্ষের নিমেষে তা গড়িয়ে একদম গাঙের চড়ায়… !

সদয় বৃত্তান্ত শুনে দ্বিধায়… !

জিন্না তো পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাজনের বিষয়ে লিগ ওয়ার্কিং কমিটির আপত্তি জানালেন। আরও বললেন যে, তাঁর কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া তিনি এই বিভাজনে মত দিতে অপারগ।

—কি গো ? এরপর মাথা ঠিক হল ? ও ঘরের জন্যে দু-একজন মুসলমান ঘোরাঘুরি করছে ভাড়া নেবার তরে—।

তথ্যটা সদয়কুমারের মনে খোঁচা দেয়। বলে, বাবু—আমরা একটু স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে দেখি—

—উঁ ! আবার পরামর্শ ? এত ভালো ঘর। একদম ফৌজদারি কোর্টের কাছ বরাবর। কত লোকজনের আনাগোনা সারাদিন—খাওয়ার খদ্দের তো সব ওখেনে। কজন খদ্দের আসবে তোমার এখেনে যদি নতুন ঘরে আর একটা হিন্দু হোটেল বসে ? শেষ বাক্যে হরিরামের গলায় বেশ জোর। যেন উকিলবাবুকে আসল পয়েন্ট ধরিয়ে দিল। আশঙ্কায় সদয়কুমারের মুখ ছোট ! এমনিতেই তো আটচলা বাজারে দু-একটা হোটেল আছেই। তার উপর আবার নতুন হোটেল ! বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ বাজনা। মাত্র কটা বছর যা ভাতের কষ্ট একটু কম। নতুন হোটেল হলে, আমারটা চলবে… ? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখ যায় জবারানীর দিকে। হরিরামের প্রতি ঘাড় ফিরিয়ে বলে, বাবু—এট্টুখানি বসুন। কথাটা কয়ে আসি—

মুহুরি হরিরাম হালদার দ্রুত কাজটা সারতে চায়। বেশি বিচার বিবেচনা করতে দিলে তো দেরি কিংবা জটিল হয়ে যাবে। তাই ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে বলে, আমার কিন্তু অনেক কাজ। এক্ষুনি আর এক উকিলবাবুর সঙ্গে আর্জি লিখতে বসব গিয়ে—

ছেলে দুটো রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। পাখি পক্ষীর মতো গন্ধ পায় আকাশ খারাপ। সদয়কুমার বউ জবারানীকে বলে, এবার কী করা যায়? সবই তো শুনতে পাচ্ছো—

ফিসফিস করে বলে, থাম না শহরের কান্ড তুমি কি সব বোঝ? আমি দাদাকে খবর দিই। দাদা আসুক—সামনা সামনি কথা হোক। নাতো কিসে যে কি হয়ে যায়…।

কথাটা খুব মনে ধরে সদয়কুমারের। বুকে বল পায়। ফিরে আসে হরিরাম হালদারের সামনে। ততক্ষণে হরিরাম নিজের দেশালাইয়ের কাঠিটা পুড়িয়ে বিড়ি ধরিয়েছে। লম্বা টান মেরে বিড়ির ডগায় আর একটু ছাই জন্ম দেয়। সেটা মৃদু ঠোক্করে ঝরিয়ে বলে হরিরাম,—কী ঠিক করলে গো সদয়বাবু?

—আজ্ঞে। আমার বড় সম্বন্ধীর সঙ্গে একটু কথা বলি। তার সামনেই সব হবে—

খানিক উল্লাসে মুহুরি হরিরাম বেঞ্চিটায় চাপড় মেরে সাফল্যের আওয়াজ তোলে। —ঠিকই তো? টিনের ফুটোয় জল…কোর্ট গোড়া থেকে কতদূর…এসব বিবেচনা করে তুমি রাজি?

সদয়কুমার একটু দমিত স্বরে বলে, হুঁ। আমি রাজি—নতুন ঘর কোর্টের কাছে হলে তো ভালো—।

মাউন্টব্যাটেন প্রখর ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে জিন্নার বিশ্লেষণীকে বিমূঢ় করতে বলে উঠলেন, আপনার মতামত কি? সম্মতি দিচ্ছেন তো?

জিন্না মাথা নেড়ে ব্যক্তিগত সম্মতি জানান। তবে আনুষ্ঠানিক নয়।

মাউন্টব্যাটেন ক্রমাগত বোঝাচ্ছেন,…আপনার মনোভঙ্গিটা বদলাতে হবে। তা না হলে আগামী কালের সভায় কংগ্রেস ও শিখ নেতৃত্ব এ প্রস্তাবে সহমত পোষণ করবে না। তার ফলে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। আর হয়তো চিরকালের জন্য পাকিস্তান হারাবেন।

লম্বাটে মুখ। দু-গাল সামান্য চাপা। বুদ্ধিদীপ্ত দু-চোখ। কামানো গাল। মাথায় কাঁচা পাকা চুল ওল্টানো। হঠাৎ দৃষ্টি কুঞ্চিত হয় মাউন্টব্যাটেনের সম্মুখীন মানুষটির। তখনই মাউন্টব্যাটেন শুরু করেন, মিস্টার জিন্না! প্রস্তাবটাকে এ অবস্থায় আনতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি। সে অবস্থাটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক সেটা আমার বাঞ্ছিত নয়। আর আমি সেটা হতে দিতেও পারি না।

একটানা কথা বলে একটু জিরিয়ে নেন। পর্যবেক্ষণ তো উদ্দিষ্ট মানুষটির প্রতি। পরক্ষণেই বলেন,…আপনি মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবে স্বীকার নন…তখন আমাকে তাদের হয়ে কথা বলতে হবে।…আমি একটাই

শর্ত রাখছি যে আগামী কালের সভায় বলব, মিস্টার জিন্না আমাকে 'প্রতিশ্রুতি' দিয়েছেন—সেটা আমি মেনে নিয়েছি ও তাতে আমি সন্তুষ্ট তখন আপনি একদম আপত্তি তুলবেন না। বরং যখন আপনার দিকে তাকাব, শুধু সহমত সূচক মাথাটা নাড়বেন ব্যাস। একটু ভাবা বা পুনর্বিবেচনার সময় হাতে দেওয় নেওয়া নয়। একেবারে তড়িঘড়ি।

মুহরি হরিরাম বলল, সদয়বাবু—আমি বুঝতে পেরেছি তোমার বাধাটা কোথায়? বউ আর সম্বন্ধী ছাড়া তোমার একলার কিছু করার নেই। ঠিক আছে তাইই হবে—

—কিন্তু বাবু

সদয়ের কণ্ঠে কথাগুলো শুনে একটু থমকে যায় মুহুরি হরিরাম হালদার। রোগা মুখে দু-চোখ কুঁচকে ছোট। পরমুহূর্তেই বলে, দেখ সদয়বাবু কিন্তু মিন্তু করোনি। আরও দ'-চারজন লোক ভাড়া নেবার জন্যে ছটপট করছে। মকবুলটা আছে, থাক। আর মুসলমান ভাড়াটে মালিক বসাতে চাইছেনি। দেশে যা হিন্দু মুসলমান বিবাদ লেগেছে—তাই তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণ মানুষ ভাড়াটে হলে বাবুর ভালো হয়। তানাহলে অন্য ভাড়াটে বসে যাবে। তখন কিন্তু ও ঘর হাতছাড়া হয়ে যাবে—

সদয়কুমার যেন হুমড়ি খায়, না বাবু—আমি ও ঘর চাই।

সদয়ের বিব্রত মুখ। তাতে বিপন্নতার আঁধার। রোগা গলা, চাপা চোয়াল মুহুরির। এরকম একটা পরিস্থিতি বানিয়ে তুলতে চেয়েছিল; অতএব দম ফেলে আরামের শ্বাস টানে। বলে, কাল সন্ধের একটু আগে অতুলবাবুর বড় মনোহারি দোকানের সামনে দাঁড়িও—।

সদয় মাথা নাড়ে।

—কাল পাকাপাকি হবে।

মুহুরির বাক্যে আশ্বাস নাকি নতুন কোনো আশঙ্কা ঠিক বুঝতে পারে না সদয়। রান্নাঘরের দোরগোড়ার জবারানী।

সাইড ব্যগ গুছিয়ে দাঁড়ায় মুহুরি হরিরাম হালদার, কাল সন্ধে মুখে তাহলে—।

চব্বিশ

শেষ রাতেই আকাশ ফালা করে আলোর চমক। পলকা টিনের ঝাঁপ। ফাঁক ফোকর গলে ধবধবে আলোর ঝলক মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ের অন্দরে। দেওয়াল ছাউনি ঘেরা আঁধার ছিঁড়ে কুটে যায় হঠাৎ হঠাৎ। গুম গুম বাজনা আকাশ ব্যেপে। সে বাজনা ছাউনির টিন গড়ায়। গোটা ঘর কেঁপে কেঁপে মস্ত চরাচরের ভ্রূকুটি সহ্য করে। কারণ মানুষের ঘরবাড়ি তো সেদিন কার!

ঝম ঝম বৃষ্টি। টিন বাজতে থাকে। সদয়কুমার জেগে উঠে বিছানায় বসে। সারাদিনের খাটাখাটনিতে কাহিল জবারানী। আচমকা ঘুম ভেঙে আবার

শোনে গর্জন। শুনতে পায় লক্ষ ফোঁটায় বৃষ্টিপাত। মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝাপটা। তখন ঢেউ কাটা টিনের ফুটো থেকে বৃষ্টির ঝারা। বিছানা কাঁথা টেনে জবারানী বলে, ছেলে দুটোকে যে শোয়াই কোথায়··· !

তন্দ্রা জড়িমা দু-চোখ। চকিত দুশ্চিন্তায় সে চোখ জোড়া ধুয়ে যায়। আজ রাত শেষ হওয়ার আগেই রাত ফুরোয়। সদয়কুমার ভাবে, সকাল পার হয়ে সন্ধেটা একবার লাগুক··· । আর দোনামোনা নয়—বড় সম্বন্ধী উপকার করেছে ···দুঃসময়ে পেটের ভাতের পথ দেখিয়েছে। তাই বলে নিজের রাস্তা নিজে চিনবোনি··· !

একটা স্বাধীন সত্তার জন্যে আকুতি পীড়া দেয় সদয়কুমারকে। সেরকম জিন্না সাহেবের ধন্দ, অখণ্ড পাঞ্জাব ও বঙ্গ থাকলেও তো সেই হিন্দু গরিষ্ঠের খেয়াল খুশির পুতুল হয়ে থাকা। বা গণপরিষদের মধ্যে গেলেও তো হিন্দুর সংখ্যাধিক্য।

জোরে হাওয়া বয়। টিনের ছাউনিতে চড়বড়িয়ে এক পশলা বৃষ্টি। জলের মেঘ ভাসতে ভাসতে আবার কোন মানুষদের ঘরবাড়ি ভিজোয়। পৃথিবীময় ভূমি সীমার উপর-আকাশ যে যার নজরদারিতে থাকলেও মেঘ পাখি রোদ্দুরকে তো শত্রু পক্ষীয় হানা বলে ধরা হয়নি !

খদ্দের পাতি খাইয়ে দামপত্তর আদায় নিতে বেলা আড়ইটে। চান সেরে নারায়ণ শিলাকে ফুলজল দেয় সদয়কুমার।

জবারানী খদ্দেরদের জন্যে এতক্ষণ ভাত তরকারি সাজিয়েছে। এবার থালা ধুয়ে ভাত বাড়ে, তরকারি সাজায়। দু-হাতে দু-থালা খাবার সারাদিন পর। সদয়কুমার সবে হাঁটু মুড়ে নারায়ণ শিলাকে গড় জানাতে উদ্যোগী, ডাকটা এলো—, কই গো ? খেতে বসবে নে ?'

স্নানের পরে ভিজে কাপড়ে দেব আরাধনায় সদয়কুমার। এই দেবতার কৃপায় তো খদ্দেরপাতি আর থালা সাজিয়ে লক্ষ্মীর দানা ! তাই খুবই নম্র স্বরে বলে, তুই খেতে বস। ঠাকুরের জল বাতাসা দিয়েই আমি যাচ্ছি—

জবারানী নারায়ণ শিলার দিকে তাকায়। খিদেয় ভেতরটা জ্বলে গেলেও থালার ভাতে হাত দেয় না। বরং ভাবে, সেই কখন সূয্যি উঠেছে···এখন তো বেলা যায় যায়··· ! সবই তো এই দানা কটার তরে ! মানুষটাকে ফেলে একলা মুখে রোচে··· !

ছেলে দুটো বেলে পাথরের সাদা মার্বেল গুলি নিয়ে খেলে। সামনে রাস্তায় দু-চারজন লোক। সাইকেল রিক্সা চলে যায়। বোটের বুড়ো মাঝি পা চালিয়ে এগোয়। পিছনে ছোকরা দাঁড়ির মাথায় মোটা জিন কাপড়ের পোঁটলা। বোটের পাল হবে—।

ছোকরা দাঁড়িকে মাঝি বলে, কষ্ট করে বয়ে নে চল। নতুন পালটা বারখা বাঁশ হানজা দড়িতে সাইজে এনে মাস্তুলে বাঁধলে—হাওয়ার পড়নে গোটা বোটটা সন্ সন্ করে জল ডিঙোবে। তোকে বেশি দাঁড় টানতে হবেনি।—শুধু ঘুমোবি···আর খাবি, কথাটা শেষ না করেই নিজের ঠোঁটের জ্বলন্ত বিড়ি

ছোকরা দাঁড়ির মুখে গুঁজে পরামর্শ দেয়,—জোরে দম মার।

দাঁড়ের ফলায় তো গাঙের জল ঘুলিয়ে পাক মারে। পাক মারে ছোকরা দাঁড়ির চোখের সামনেই বিড়ির ধোঁয়া খোয়া পিচের সরু রাস্তায়।

লম্বা চেহারা। ফরসা মুখ। দীর্ঘ নাসা সদয়কুমার কাচানো কাপড়টা পরেছে হাঁটু ডুবিয়ে। গায়ে ছ-পকেটের সাদা লংক্লথ ফতুয়া। পরিষ্কার কাপড় চোপড়ে একটু আলোয় বেরতে ইচ্ছে হয়। পাশাপাশি কত দোকান ঘর। ছোট বড় দোকান মালিক। হঠাৎ মনে হল সদয়কুমারের, হোক না ভাঙা ঝাঁঝরা ঘরে ভাতের দোকান··· ! মালিক তো আমি··· ! এই ভাবনাটুকু মস্তিষ্কে চারিয়ে যেতেই কত শত ক্ষুদ্র খণ্ড দীন সাংসারিকতার মধ্যে দিয়ে নড়বড়ে মেরুদণ্ডটা সোজা হতে চায়। একটা স্বকীয়তার গোপন টানে।

জবারানী এঁটো থালা বাসন মাজে। সদয়কুমার সোজা সেখানে হাজির। শুধোয়, হ্যাঁরে—ব্রজেন দা কখন আসবে বলেছে ?

বাসন মাজা থামিয়ে মুখটা তোলে জবারানী। ঘাড় পিঠ ছাপিয়ে সদ্য ভিজে চুলে বেলা শেষের রোদ বাতাস। ঝোপা ঝুরির মতো বড় বড় চুল। জবারানী সদয়ের কথা কটা শুনে বলে, সন্ধের আগেই এস্‌বে তো বলল—।

সদয়কুমার উপরে তাকায়। সূর্য হোটেল ঘরের ছাউনি ডিঙিয়ে অনেকখানি গাঙ মুখো। রোদ ঝিমিয়ে বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব। চারদিকে চঙমঙিয়ে সদয় ঘড়ির টাইমটা আন্দাজ করতে চায়। ভিজে চুলের ঝুরি থেকে জবারানী দেখে, লোকটা বড় ছটফট করছে !

বাসনগুলো মেজে ধুয়ে দাঁড়ায়। মাথার উপর আকাশ নীল। সাদা মেঘের স্তূপ। ওর মধ্যে জল কোথায় থাকে !

থালা বাসনগুলো গুছিয়ে রেখে শুকনো কাপড়টা টানে জবা। পাশে পুরনো কাপড় চোপড়ের পুটলি। নজর পড়তেই সন্দেহ ! তাড়াতাড়ি পুটলিটা ধরে তোলে জবারানী। চার খুঁটের জোড় গিঁটটার কাছে ভিজে দাগ। আকুল উৎকণ্ঠায় পুঁটলিটায় হাত ছোঁয়। হাতের শুকনো কনুইয়ে পরশ নেয়। পরে গাল পেতে ভিজেটা পরখ করে। নির্ঘাৎ ভিজে। ঝট্‌পট্ পোঁটলাটা নিয়ে আলোয় হাজির। গিঁট খুলে খিড়কি দোরে দাঁড়ায়।

দিন শেষ হয়ে রোদ ফুরোচ্ছে। খোলা গিঁটে ভিজে জামা, পুরনো শায়া মেলে দেয় জবারানী। দোকানঘরের পিছনে ঝোপ জঙ্গল। তারপর তো বিপুল ভূমি আর আকাশ নিয়ে গাঙ। মনে আপশোস,···যদি রোদ থাকতে থাকতে পুঁটলিটা চোখে পড়ত··· । তাহলে এতবেলা সব শুকিয়ে নিতে পারতুম গো···! মনের কথা মনে থাকে না। ঠোঁটে চেপে বিড়বিড় শব্দ। গায়ের কাছে তো কোনো সঙ্গী নেই যাকে দু-কথা বলে ক্ষোভ কমাবে ? পরক্ষণে বড় বড় পায়ে খিড়কি থেকে ঠাকুরের চৌকি অব্দি যায়। পুঁটলি রাখার জায়গাটায় চোখ বুলিয়ে সোজা উপরে তাকায়। উঁচুতে টিনের ছাউনি। ছাউনি টিনের ঢেউতে সিঁদুর টিপের মতো গোল ফুটো। মরা রোদ চিরে যাচ্ছে রেখা কেটে। চিরে যায় জবারানীর বুকের ভেতর,···এত করেও সুদিনের মুখ দেখতে পাবোনি ? একটু

থিতু হওয়ার মতো ঠাঁই··· ! বুকের ভেতরটা ফাঁকা। জবারানী খোঁজে সঙ্গীজন। সদয়কুমার তো গোটা দোকান ঘরটায় নেই! সঙ্গীজনহীনতার অবসরে মনে ঢুকে পড়ে আপনজন ! ব্রজেন ঘোষালের মুখ ! এখনই মনে হয় জবারানীর, দাদাটা যে—কোর্ট কাছারি সেরে কখন আসবে?

হাঁটতে হাঁটতে একেবারে অতুল মাস্টারের মনোহারি দোকান। ফরসা গোলমতো মুখ। কালো ফ্রেমের মোটা ডাঁটি। গোল গোল চোখে দোকানদারিতে হিসেব কষে। সামনে খদ্দেরটার হাতে অনেক জিনিসপত্তর। বাইরে থেকে চোখ চালায়। মুহুরি হরিরাম হালদার তো নেই! একটু এদিক ওদিকে দেখে ভাবে, ···অতুলবাবু স্টিমারের টিকিট বেচতে গেলনি যে?

সুতরাং একপাক ঘুরে অতুলবাবুর ক-খানা ভাড়াটিয়া দোকানঘর দেখে। সবই তো খোলা! আর একটু এগোয়। দেখে, ডাইনে দোকান ঘরটার ঝাঁপ বন্ধ। অতএব খুঁটিয়ে বুঝতে চায়, কেউ কি চলতি দোকান আজকের জন্যে বন্ধ রেখেছে? নাকি বন্ধ ঘরটার মধ্যে এখনও কোনো দোকান বসেনি। শুধু দোকান হওয়ার অপেক্ষায় চুপচাপ। বাইশখানা ভাড়া ঘরের এখনও ক-খানা তো বন্ধ। কোর্টমুখো, সদয় মুখুজ্জে সরু পাকা রাস্তা ধরে হাঁটে। মকবুলের ইসলামিয়া হোটেলের পাশ কামরাটার ঝাঁপ এখনও বন্ধ। মকবুল খানা খাওয়ার বাঁধানো চাতালে শুয়ে উসপাশ করে। সব ঝাঁপ বেড়া বন্ধ না করে ঘুমোতে আর জোর পায় না। মানুষটা শুয়ে থাকলেও যেন হাঁটছে। কিংবা বসে আছে। বা সব কিছু নজর রাখছে। ইসলামিয়া হোটেলে পা রাখতেই হুটপাট উঠে বসে মকবুল। চাতাল থেকেই প্রথমে খুঁজতে থাকে, আগন্তুক মানুষটি লুঙি পরিহিত ···না, দাড়ি গোঁফে সমধর্মীয় মানুষ! আগন্তুক ঘোরটুকু কাটিয়ে বলে, কে? চকিতে শুধরোয়, আরে—ঠাকুরদা! আয়রে ভাই আয়—

মকবুল বিড়ি ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ে।

সদয় মুখুজ্জে বলে, পাশের ঘরটা বন্ধ যে? মিস্ত্রি খোলেনি?

—মিস্ত্রি আর খুলবেইনি।

—কেন? জানতে চেয়েও সদয়ের বুকে আতঙ্ক! কিছু খবর হয়ে ওঠে কি না···কে জানে!

—মাল পত্তর যন্ত্রপাতি সব তছনছ। ইয়ারনবী আর এমুখো নয়—। মানুষটার চাপা বেদনায় প্রশ্ন খুঁড়তে বাধে। নিজেই চণ্ডমণ্ডিয়ে দেখে সদয়কুমার। ছোট্ট ঘর। লম্বা চওড়া মিলিয়ে ঘরের তলস্ত ভূমিটা তার ব্যবসারও উপযোগী নয়। এ ঘরটা যে তার জন্য বরাদ্দ হবে না, এটা নিশ্চিত। বরং একটা অপরাধ চকিতে জেগে ওঠে সদয়ের মনে। খুব মৃদু স্বরে বলে সদয়কুমার, মকবুল ভাই—

--উঁ!

—নবী সাহেব যে বেঞ্চিবাবদ বকেয়া আমার কাছে পায় কিছু···

—দিলে, আমাকে দিতে পারো। পাঠিয়ে দুবো—, বলে মকবুল। তার

পুরনো ইসলামিয়া হোটেল ঘরে বসে।

সদয় আবার বলে, মকবুল ভাই—

মকবুল তাকায় সদয়ের দিকে। বাক্য ফুটিয়ে কোনো প্রশ্ন করে না, তবে সাগ্রহ দৃষ্টি মানুষটার দু-চোখ জুড়ে। সেজন্যে সদয় আর এক প্রস্ত এগিয়ে জানতে চায়, তুমি যে আমার জন্যে নতুন ঘর দেখে দেবে বলেছিলে, সেটা কোন কামরা? পাশে কাঠের মিস্ত্রি ইয়ার নবীর বন্ধ ছুতোর কারখানা ঘরটা দেখিয়ে সদয় বলে, এটা—? মকবুল তেমন আগের মতো আতিশয্যে ভাসে না। যেন কত যুগের একটা স্মৃতি জাগছে মাত্র। তাই নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বাঁ-হাতটা তুলে বলে, উঁহু। ওদিকে—।

সদয়কুমার এত চেনা লোকটার এমন নিরুত্তাপ আচরণে কেমন জবুথবু। সদয়ের এই মুখ চোখ মকবুলের দৃষ্টিতে বেধে যায়। এই দৃশ্যটা মকবুলের মননে অন্য প্রতিঘাত তৈরি করে। সেইটুকু সময়ের মধ্যে ভেবে ফেলে, যেখেনে মুসলমান সংখ্যায় বেশি সেখানে সদয়ের মতো দু-একজন তো আমারই সমান মন মরা…উদ্যম হারা…! চকিতে তার নিজের উপর অমন জুলুমবাজীর যোগ্য শোধ উঠুক, এই যুক্তি সাজিয়ে সন্তোষ বোধ করে মকবুল। বিড়িটায় টান মারে জোরে। বড় করে আগুন ঝলকে নেশার জিনিসটা নিভে ছাই। আর মাদকতা থাকে না। উত্তাপ হারিয়ে যায়। নতুন বিড়ি ধরাতেও আগ্রহ বোধ করে না। তখন শূন্য আকাশ বুকের মধ্যে ঢুকে যায়। কী যে করা উচিত ভেবে পায় না!

সদয়কুমার কাচানো কাপড় ছ-পকেটি ফতুয়ায় হঠাৎ সেঁতিয়ে যায়। বলে, আসি গো মকবুল ভাই—

খানা খাওয়ার বাঁধানো চাতালে জীর্ণ মাদুর থেকে একটা কাঠি কুট করে ছিঁড়ে নেয় মকবুল। সেটা দিয়ে দাঁতের ফাঁকে বাসি খাদ্যকণা খুঁটে বের করে। দাঁতটা ফাঁকা হতেই স্বস্তি। বলে, হুঁ—যাও—

বাইরে রোদ মুছে গেছে। দিনের শেষে আলোটুকুর বাঁধের ওপারে দূরে আঁধার টলমল করে। সদয় মুখুজ্জে ঝটপট পা চালায়। চোখেই অতুল মাস্টারের মনোহারি দোকানটার দূরত্ব মাপে। এখান থেকে গ্রীবা উঁচু করে চেনার চেষ্টা, মনোহারি দোকানের সামনে লোকজনকে। কেউ তেমন চোখে পড়ে না। বিষাদে …উৎকণ্ঠায় সদয়ের মুখে এক পোঁচ আঁধার ছুটে আসে। ভাবে,…তাহলে কি হরিরামবাবু নতুন কোনো ভাড়াটিয়ার সঙ্গে কথা পাকা করে ফেলেছে? পাকা করতেই পারে। মালিক বাবুদের হিসেব মতো টাকা এলেই হল। জাতে, ধর্মে কী এসে যায়! খদ্দেরের ভিড় মনোহারি দোকানটায়। দোকানদারকে দেখা যায় না। মানুষকে ঘিরে তো মালিক মানুষের রোজগার! সদয়কুমার আর এক পা ফেলতে গিয়ে চমকায়! হরিরামের সঙ্গে কালো বাটি মুখ, চওড়া কপাল চাপরাশি শ্যালক ব্রজেন ঘোষাল।

সদয় মুখুজ্জে এগিয়ে যায়, আমি তো তোমার জন্যে ভেবে আকুল।

পাশে ব্যাগ কাঁধে মুহুরি হরিরাম ফিক ফিক হাসে।—আমিও তো। জবা বলল, তুমি এদিকেই আছ—,

ব্রজেন ঘোষালের কথায় সদয় আশ্বস্ত। তারপরেই মুহুরি হরিরামের উদ্দেশে বলে, যেটুকু বেলা আছে সে আলোয় একবার ঘরটা দেখলে হতুনি বাবু ?

হরিরাম সঙ্গে সঙ্গে রাজি, বটেই তো। চল—।

হরিরাম পাকা রাস্তা থেকে ডাইনে নামে। পাশ পকেট হাতড়ায়। সরু চাবিটা দু-আঙুলের ফাঁকে ছুঁয়ে আবার হড়কে যায়। সামনেই কাঠের ফ্রেমে পাতলা টিনের শিট মেরে ঝাঁপ। হাওয়ার উড়ুক্কু ধুলো চাপ বেধে আছে। কত দিন যে কেউ খোলেনি! টিনের ঝাঁপটা দেখিয়ে হরিরাম বলে, এটাই গো ব্রজেন দা—

গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে সদয় মুখুজ্জে। তাকে না বুঝিয়ে ব্রজেনকে সব বলা ! সদয়ের বুকে বড্ড লাগে। অমর্যদার ধুলো বালির দমকা তার মুখে। প্রিয় আত্মীয়ের এত নিকট উপস্থিতি আর মনোরম নয় !

তেরো চোদ্দো ফুট উঁচু শাল খুঁটির মাথা থেকে টিনের ছাউনি ক্রমশ পিছনের দিকে ঢালু। এখান থেকেই তো অতুলবাবুর বাইশখানা ভাড়াটিয়া কামরা শুরু। তার আগে মাত্র চারফুটের গলিপথ ফাঁক রেখে মিত্রদের বারো চোদ্দো খানা কামরা। দোকান ঘরের শেষ।

ব্রজেন ঘোষাল বন্ধ ঝাঁপটার খোপ থেকে দোকানঘরের সম্মুখস্থ পরিসর আন্দাজ করে। মনে মনে মাপে।

মুহুরি হরিরাম হালদার পকেটের চাবিটা ঝাঁপের সস্তা তালায় লাগায়। দুদিকে দুটো লোহার বালায় তালাটা। রোদ জলে মরচে ধরে লাল। চাবিটা পাক দেয়, ঘোরে না। আবার চাপ দেয় হরিরাম। ব্রজেন ঘোষাল বলে, ও মুহুরি ভাই ফ্রন্টটা তো মাত্র ছ-সাত হাত। বড্ড ছোট হয়ে যাবেনে ? সদয়কুমার হরিরামের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ব্রজেনের কথায় সদয়ের মুখময় উদ্বিগ্নতা। সদয় ভাবে, তাই তো ভিতরে লোকজনের খাওয়া দাওয়া, পথ চলতি লোক দেখতে না পেলে তার খাওয়ার ইচ্ছা জাগবে কী করে··· !

হরিরাম একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে সদয়কুমারের হাতে চিমটি কেটে ইঙ্গিত করে।

সদয় সম্বিৎ ফিরে মুহুরিকে দেখে।

মুহুরি সদয়ের ভাবান্তরে তেমন সময় না দিয়ে বোঝায়, ব্রজেনদা—তাতে কি হয়েছে ? ভেতর বাগে ঘরটা অনেক চওড়া আর বড়—। দেখে নাও তোমরা—

উঁচু ছাউনি ঢালু হতে হতে নিচু। হেঁতাল বাঁখারি খোঁচা পালার ছিটে বেড়ায় টানা দেওয়াল। বাইরের ক্ষীণ আঁধার ভেতরে ক্রমশ ঘনীভূত। ঝুল ঝালরে সে আঁধার আরও গভীর। সদয়কুমার মুখ উঁচিয়ে ছাউনির টিন দেখে। দিনের আলো নেই যে ফুটো ফাটা দিয়ে ভেতরে সেঁধোবে। একটু দ্বিধায় সদয়-কুমার পা ফেলে দেখে।

মুহুরি হরিরাম নোনা-গাঙ, কেঁর্টকি—ক্যাওড়ার জঙ্গুলে লাটঘাটের আবাদী মানুষদের কেস কাছারি দেখাশোনা করে। মক্কেলদের চোখ মুখ বুঝে উকিল-বাবুদের সঙ্গে তার শলা পরামর্শ। অতএব সদয় মুখুজ্জের হাত নাড়া পা ফেলা দেখে শুনতে পায় তার বুকের কথা। তখনই হরিরাম বাইরে রাস্তামুখো

চোখ ফেলে নিশ্চিত হতে চায়, আজ পক্ষটা কী ? শুক্ল না, কৃষ্ণ পক্ষ ? যেহেতু রাস্তার ওপারে বড় খিরিস গাছটার মাথায় অন্ধকার, হরিরাম মনে জোর পায়। চরাচর জুড়ে তো অমবস্যার আঁধার। চাঁদের আলো টিনের ফুটোয় গলার কোনো আশঙ্কা নেই। তাই কণ্ঠে জোর এনে বলে, ও সদয় ভাই—এ ঘর তোমার রায়বাবুর মতো লজঝড় মার্কা জালি কাটা টিনের নয়। আর একটু কাছে এসে সদয়ের কানে বলে, এ বাবুর কোমরে জোর আছে। মন লাগলেই মাটি-টিনের ঘর পাকা করতে কতক্ষণ ?

সদয় হাঁ-করে শোনে। পরক্ষণে বুকের ভেতরটায় কামড়ায়, জবাকে একবার দেখাতে পারলে হত ! দু-জনেই খেটে খুটে তো এ দোকানদানি··· ?

সন্ধ্যার আকাশে বিজলি হানা দেয়। আলোর আঘাতে মেঘ ছম্ ছম্ করে।

হরিরাম সামনে দাঁড়ায়।

ক্যাশ বাক্স থেকে বাকি পয়সা গুনে খদ্দের সামলে অতুলবাবু বলে, খবর কি হরিরাম ?

—আজ্ঞে এরা এসেছে, বলে কাচের আলমারির সামনে এগিয়ে যায়, এই যে ইনি ব্রজেনবাবু—

ছোট বেঞ্চিটা দেখিয়ে অতুল মাস্টার বলে, বসো গো তোমরা— ।

সদয় ব্রজেনের পিছনে।

পুরো আলোচনা সভাটা তখন বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের দিকে তাকিয়ে। জিন্নার সম্মতি পেয়েই বড়লাট দেশ বিভাগের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিলেন। পূর্বপ্রস্তুত দলিলটা ভারতীয় নেতাদের হাতে দিয়ে বললেন, আপনারা রাজি— ? ধন্যবাদ।

—হুম্। তাহলে ঘরটা তোমরা নিচ্ছ তো ? জানতে চাইল অতুলবাবু।

দড়ির টানে বড় ডে-লাইটটা দোকানের মধ্যিখানে ঝুলছে। চকচকে কাচের ঢাকনা ছিটকে আলো। সে আলো সদয়কুমারের মুখ চোখে। সেই চোখমুখের উজ্জ্বলতা দেখেই হরিরাম বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। মাসিক দশটাকায় ঠাকুরমশাই রাজি—। কি ? তাই না ?

সদয়কুমার এত বিত্তবান ক্ষমতাশালী অতুলবাবুর সামনে বলে, রাজি। তবে···দশটাকে যদি সাত করেন—

অতুল মাস্টারের ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হরিরাম বলে, তাই—তাই-ই হবে। তাহলে দু-মাসের ভাড়া অগ্রিম জমা রাখো—

তেসরা জুনের সন্ধ্যা। মহকুমা শহরটায় ক-খানা দোকানের হ্যাজাক, ডে-লাইট সরু নলের ডগায় কারবাইট গ্যাসের বাতিতে রাস্তাঘাট খানিক আলো-আঁধারি। দোকানের শো-কেসে বসানো চৌকো জাল সাঁটা কাঠের ছোট্ট বাক্স। দিল্লি বেতার কেন্দ্র মাধ্যমটায় প্রথম লর্ড মাউন্টব্যাটেন, নেহরু পরে জিন্না—বিশ্ববাসীকে জানালেন পাকিস্তান অর্জনের সংবাদ। কাঠের বাক্সর গোলাকার ঘন তারের জালটার দিকে সবাই তাকিয়ে।

চারদিকে গমগমে উত্তেজনা। কথাবার্তার ঝড়। পাথর বালি মাটি চিড় ধরে

ফাটল। সেই ফাঁকে বাতাস ঘুলিয়ে সাঁ সাঁ শব্দ। সদয়কুমার দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ে ঢোকে। বউ জবারানী বলে, খবর কি গো ?

—বন্দোবস্ত হয়ে গেল। এবার থেকে অতুলবাবুর মুদিখানা—মনোহারি দোকানের এদিকে ঘরটা সব আমাদের।

পঁচিশ

ঝম্ ঝম্ বেজে ওঠে মাটিতে শুয়ে থাকা রেললাইন। ভোর চারটের ট্রেন বেরিয়ে যায় শিয়ালদা ছেড়ে আরও উত্তরের ভূমিতে। মাদুরের মতো লম্বা চওড়া ধাতব শিট পোলটার উপর বিছনো। পাশে মোটা মোটা পাইপের রেলিং। পোলটাকে আমূল ঝাঁকিয়ে ট্রেনটা কালো জলের ক্যানাল ডিঙোয়। সারা রাতের আঁধারও ডিঙোয় তার সময় সীমাটুকু। ফলে গাঢ়ত্ব ফিকে হয়। দিনের আলোটুকু ধীরে ধীরে প্রবেশ করে মানুষের নগরে।

চাপা মুখ লম্বা চেহারার অর্জুন পাশ ফিরতেই দড়ির খাটিয়া নেচে ওঠে। রেল ব্রিজটার ঝাঁকুনি যেন এখানে। সুতরাং জেগে ওঠে। বড় করে হাই তোলে। ইটের মোটা মোটা দেওয়ালে রেল কোয়ার্টারের লালচে রঙ। শীত মাখা বাতাস বেয়ে ঘুমতাড়ানি হাই ভাপ দাগায় পাশেরই লালচে রঙে। একটা খোলা খিলেনের ওপারে তো অর্জুন বাড়ুজ্জের সকাল-সন্ধে কাজের জায়গা। ইট বালি দিয়ে পাকা গাঁথনির উনুন। এখন আগুন জুড়িয়ে ঝিমোচ্ছে গায়ে গায়ে জোড়া উনুন। পাশাপাশি একই সঙ্গে ভাত ডাল ফোটে। কিংবা এক উনুনে মাছ অন্য উনুনে সব্জি। যেহেতু রেল কোম্পানির রাঁধুনি, পা বাড়ালেই রানিং রুম। অর্জুন বাড়ুজ্জে পরিবারে এই প্রথম রেল বিভাগের কর্মী।

আকাশ থেকে রাত মুছে যায়। পৃথিবীতে দিন ফোটে। রেল কোয়ার্টারে মানুষ জাগে। ঝাঁকড়া নিম গাছটায় হরেক পাখির কিচিরমিচির ডাকে গোটা ভারতীয় স্বর।

দাঁতনটা হাতে নিয়ে বেরোয় অর্জুন। চোখের সামনে তো দেশবাড়ির মতো ধানের মাঠ···পঞ্চানন মন্দির···কিংবা খানিক হাঁটলে নোনা জলের হুগলি নদী নেই। নেই তো মায়ের তৈরি ঘুঁটের আগুনে পছন্দ সই ছাই। ছাই ঘষে ঘষে মাজলেই দু-সারি দাঁত একদম ঝকমকে। এখন ? বিছানা ছেড়ে পা বাড়ালেই লোহার বাতায় লোহার সুঁচলো ফলা সেঁটে বেড়া। বাঁশ বাঁখারির গেট-এর বদলে লোহার পাটি দিয়ে ঠেলা কেড়ো। বাবলা খেজুর গাছের গোড়ে সাজিয়ে পুকুর ঘাট নেই। বরং তার বদলে পাইপের জলে চান আর খাওয়া। দাঁতনটা চিবিয়ে চিবিয়ে নরম করে অর্জুন। একটা একটা দাঁতে ঘষে। মাঝে মাঝে পুচ্ করে গালের জল ফেলে দেয়। সহযোগী কর্মীরা তো কেউ বিহার যুক্ত প্রদেশ কিংবা উড়িষ্যার লোক। তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ধানবাদা আর পঞ্চানন মন্দির তলার অর্জুনও সকালে মুখ ধোওয়া ইত্যাদি ব্যক্তিগত দৈনন্দিন সুবিধের জন্যে একখানা লোটা কিনেছে। পেট ডাবরা ঘটির মতো লোটা। লোটা ভর্তি

জলের সামনে বসে দাঁতন চালায়। দেশ গাঁয়ের পুকুর ঘাট হলে শান্ত জলে নিজের বাউরি চুল, চওড়া কপাল আয়না কাটত। বাসি মুখে ঘুমে ফোলা চোখ দুটো দেখতে পেত নিজ চোখে। কিন্তু…, ভাবতে ভাবতে কখন যে কাঁসার লোটাটার গোল পেটানো কানা পরিসর জলে মুখ বাড়ায় অর্জুন মুখচ্ছবি দেখবার জন্যে… ! খেয়াল করে না। বরং লোহার ফলায় লোহার বেড়াটার খানিক ফুটে ওঠে। তার ওপারে তো পাথুরে খোয়ার উপর বিছোনো শাল সেগুনের স্লিপার। ঘুমন্ত কাঠগুলোর পিঠ বেয়ে রেললাইন বনগাঁ বারাসাত তারও পরে ডাইনে বাঁয়ে কত দূর যে চলে গেছে !

পাকা দেওয়াল, পাকা মেঝেয় রান্নাঘর। এক কোণে ইটের ঘেরিতে কয়লা। ছোট বড় চাঁইয়ে জানালা গলে সকালের রোদ। খালি গায়ে ভুসকো চেহারার বেঁটে খাটো গাসিরাম হাতুড়িটা নেয়। ফুট দেড়েক পরিমাণ বাতিল রেল লাইন টুকরোটা কয়লা গাদায়। কয়লার একটা চাঁই বাঁ-হাতে রেখে ইচ্ছে করেই শুধু রেলটুকুর উপর হাতুড়ি পেটায় একবার। খিলেন কাটা দরজা জানালা টপকে ধাতব শব্দটা মসৃণ বারান্দায়। তারপর তো ঘাস। ঘাসগুলো সকালেই কেঁপে ওঠে। এরপর টাইম শিডিয়ুল অনুযায়ী ট্রেন চলাচলে মেদিনী দুলিয়ে লোহা লক্কড়ের মুহুর্মুহু ঝংকার। গাসিরাম এটুকু করেই সকলের মনোযোগ টানে। পাশের ঘরে দারোয়ানজী প্রাতঃস্নান সেরে সবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে শুরু করেছে, ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং… । তখনই হাতুড়ির কান ঝাঁঝালো শব্দটায় দারোয়ানজী স্মৃতি হারিয়ে বোবা। জোড় খাওয়াতে খুঁজে পায় না পরবর্তী মন্ত্রাংশটি। দাঁতন থামিয়ে অর্জুন চেঁচায়, হেই গাসিরাম—তুই কি রেললাইন বসাচ্ছিস ?

গাসিরাম হাতুড়ি ধরে বলে, এক্ ঝড়া ভাঙাই করি ?

—আরে বুড়বাক লোহা, না কয়লা ? বেশ জোরেই হাঁক মারে অর্জুন। ভেতর থেকে উত্তর আসে, জরুর। কুইলা…

—তোর মুণ্ডুরে বুদ্ধু—, বলে পাশে তাকায় অর্জুন। দেখে, বাইশ চব্বিশের ছোকরাটার কোমরে খানিক বাঁক। ফলত মুখটা ঝুঁকেই হাঁটে। মাথাভর্তি অল্পবয়েসী চুল কুচকুচে কালো। অর্জুন আর একবার দেখে বলে, কিরে এত সকালবেলায় ? বলতে বলতে অর্জুনের নজর চলে যায় পাথুরে খোয়া, ঘাস, রেললাইনের ওপারে। বনতুলসি, ধুতরো ঝোপ রাঙচিত্রের ঝাড় ধরে আরও খানিকটা।

পথের ধুলো কাদা রোদ বৃষ্টির দাপট সয়ে মাথার উপর বিছানা-কাঁথার পুঁটলিগুলো নোংরা। কাঁধে পিঠে দু-চারখানা থালা বাসন। রুখু চুলে মা। আকাটা দাড়ি গোঁফে বাবা। ছেঁড়া কাপড় চোপড় বিবর্ণ। কোলে কাঁধে বাচ্চা। বাপের হাত ধরে গুড়গুড় করে হাঁটে অবোধ শিশুগুলো। দেশের নাগরিক হয়ে একদিন বিশ্ববাসীর পর্যায়ে উঠবে।

—হুঁ। তোর খবর কি ? বলে বকুলের মুখ চোখের দিকে তাকায়। হঠাৎ প্রতিচ্ছায়ার মতো মানুষের দলটা অর্জুনের চোখের আওতায়। দলটা ক্রমশ

ঢাল্ বেয়ে উপরে উঠছে। পথশ্রান্ত মা বাবা। শিশুগুলো কচি পায়ে দেশ ডিঙোয়। ভ্রমণ করতে নয়। শুধু আশ্রয়ের আকুলতায়।

—দাদা তোমার ডিপারমেন্টে কাজটা কবে হবে গো? জানতে চায় বকুল। সম্পর্কে তো এক রক্তের ভাই।

অর্জুন তখন বাচ্চা কোলে মা, মাথায় বিছানা কাঁথার পোঁটলা বাপের হাতে শিশুসন্তানের ভার টেনে টেনে হাঁটা পরিবারটা দেখে ভাবে, তবু তো আমি সরকারি রেল বিভাগে খাবার মতো উপার্জন করি···ভাই হলেও বকুলটা শিয়ালদার হোটেলে কাজ করে ভাত পয়সা দুই-ই পায়। মন গেলে রেলে চড়ে দেশ বাড়িতে পোঁছে পুকুর হাঁছিয়ে শোল ল্যাঠা ধরতে পারবে। মা ঠাকুমার পাশে দাওয়ায় বসে ডিশ ভর্তি ভাত পানতা চিবোতে চিবোতে পঞ্চাননতলার মন্দির···মন্দিরের পাশে বটগাছটা দেখতে পাবে। কিন্তু···ওই পোটলা পুঁটলি মাথায় মা, কোলে বাচ্চা, বাপের অসহায় রুগ্ন হাতে বংশের শিশু সন্তান—ওরা তো পুরনো ঘর দাওয়া, উঠোন বাগান আর ফিরে পাবে না! তাহলে মানুষের দেশ কিংবা দেশের মানুষ···কথাগুলো যে কত ফাঁকা বাক্য! আসলে মানুষ যেখানে খেতে, পরতে এবং আশ্রয় পায় সেখানে সেটাই তার দেশ। কিংবা আশ্রয় পেয়ে যেখানে খেতে পরতে সুবিধেটা বেশি সেটাহ ক্রমে ক্রমে তো দেশ হয়ে যায়। পর পর ক-পুরুষের হাড় মাংস পুড়ে ছাই হয়ে মাটিতে মিশে গেলে···বা পচে গেলে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে গেলে যে সে মাটি তাদের দেশ হয়ে ওঠে···। তার হিসেব কোন পুরাণে···পুঁথিতে।

—তুমি তাহলে তোমার সাহেবের সঙ্গে দেখা করনি? কাচু মাচু মুখে বলে ফেলে কথাটা বকুল। কোমরে লুঙি সেঁটে গেঞ্জিটায় যেন বকুল আরও বুক ঝুঁকে দাঁড়িয়ে।

গোল মুখে ওল্টানো চুল মাথা ভর্তি। ফোলা ফাঁপা কালো চুলে বেশ মানিয়ে যায় বকুলকে।

—কে বললে? বকুলের প্রশ্নকে খাটো করতে অর্জুন জবাবটা রাখে।

—তবে হচ্ছেটা কই? বেশ হতাশ বকুল। বয়সে বড়, সম্পর্কে দাদা অর্জুন। তাই নিক্ষিপ্ত অভিযোগটা হালকা করে দিতেই বকুল বাঁ-হাতের কব্জি ডান মুঠিতে চটকায়। বকুলের চোখে পড়ে বাঁ-হাতের চেটোয় আলপনা হোটেলে কড়ার তেলভুষোর চটচটে দাগ। গত রাতে বার দুয়েক ন্যাকড়া বোলানোর পরও মোছেনি।

অর্জুন ভাই বকুলকে আশ্বাস দেয়, আরে ডেপুটি সাহেবকে ধরেছি। বলেছে তো করে দুবো রানিং রুমে তোমার ভাইয়ের কুকম্যানের চাকরি। একটু ধৈর্য ধর। তারমধ্যে এই ওপার থেকে হাজার হাজার মানুষের ধাক্কা। সবাই তো রেল প্লাটফরম, নয়তো রেল লাইন ধারের মাঠে—। সাহেব এগুলোতেই হিমসিম···

অর্জুনের কথাটা তখনও শেষ হয়নি, বকুলের চোখ স্টেশন মুখি রেল-লাইনের দিকে। পুঁটলি মাথায় বাচ্চা কোলে মা, কাঁধে পিঠে থালাবাসন, হাতে

ধরা গুট গুট হাঁটা বাচ্চা কজন। তারা লাইনের গা বেয়ে ঘাস মাটি মাড়িয়ে হাঁটে। বিছনো খোয়ার ভিত ভূমি পরিসরের দমন ঠেলে সবুজ ঘাস ফ্যাকাশে রঙ নিয়ে উর্ধ্বমুখি। আলো খোঁজে। বাতাস চায়।

বকুলের মুখটা এই সকালে বিবর্ণ। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু অফিসার সাহেব যখন নিজেই উটকো ঝামেলা সামলাতে পারছে না, চাকরিটা ...বললেই কি আর এক্ষুনি হবে... ! সুতরাং ফেরার উদ্যোগে পা ফেলতে গিয়ে শুধোয় অর্জুনকে, তুমি কি এর মধ্যে বাড়ি যাবে ?

—ঠিক নেই। যদি যাই তোর হোটেলে দেখা করবোখন।

—তাই কোরো। মার জন্যে একটা চাদর কেনা আছে। তাহলে পাঠাব।

অর্জুন খুশি হয়ে বলে, বেশ মোটা সোটা ? তা নাহলে বুড়ির শীত যাবেনে—

মাথার উপর ফাঁকা আকাশ। শীত এখনও পড়েনি, তবে রোদ্দুরে তেমন তাপদাহের আয়োজন নেই। কয়লার ইঞ্জিনের ঘেঁসগুলো পায়ে পায়ে মাটিতে মিশে কালো আস্তর। তারপরেই তো সবুজ ঘাস চাপ বেঁধে দুপাশে। কচি ডগে ঘেঁসের গুঁড়ো জমে খানিক কালচে।

ক্রমশ ঢালু বেয়ে প্ল্যাটফরমে ওঠে বকুল। ছেঁড়া মাদুর কাঁথা বালিশ, চিড়ে গুড় জল ময়লার গন্ধ। মানুষগুলোর পাশ কাটাতেই গা মাথায় বোঁটকা ঝলক। অথচ সাফসুফ হওয়ার জল পুকুর রূপসা ধলেশ্বরী আড়িয়াল খাঁ নদী নালার দেশ ছেড়ে যে কোথায় ! প্ল্যাটফরমের সিমেন্ট মেঝেতে লাল পেড়ে নোংরা শাড়িতে বুড়িটা কাতরায়। রুখু কাঁচা পাকা সিঁথিতে সিঁদুর দাগ। বকুল বাড়ুজ্জে থমকে দাঁড়ায় ! দেখে, রোগা লম্বা কালো ধাঁচের বুড়িটা যাতনায় মাথার চুল ছিঁড়ছে।

বকুল আর দাঁড়ায় না। মানুষগুলোর গায়ে ইনজেকশানের গন্ধ। মানুষগুলো আর তাদের গায়ে ওষুধের গন্ধও উনচল্লিশ বাই ছত্রিশ স্কোয়ার ফুট চৌকো দড়ি খোপে বন্দি। মায়ের কোলে শিশুরা উঠোন পায় না। দড়ির ওপারে তো নিত্য যাত্রীদের আসা যাওয়া। দড়িটুকুর এপারে তারা গণ্ডিবদ্ধ। সরকারি ব্যবস্থাপনার আশ্বাস-গারদে কয়েদি।

বকুল স্টেশন চত্বর থেকে ডাইনে তালগাছটাকে পাশ কাটায়। মাথার উপর খোলা আকাশ। নতুন ঘর বাড়ি দোকানপাটের জঙ্গম তালগাছটা দাঁড়িয়ে নজর রাখে। গাছটার সোজাসুজি সূর্যটা এলে কথা হয়, কেমন লাগছে স্বাধীন দেশে ?

মৃদু হাওয়ায় খড় খড় শব্দে পাতাসুদ্ধ গা আড়মোড়া দেয় গাছটা। বলে, তোমার আর কি ? তুমি তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে—

—কেন ? জানতে চায় সকালের সূর্য।

—তোমার গায়ে তো র‍্যাডক্লিফ কাঁচি চালাতে পারেনি ?

—তা না পারুক। এবার তোমরা স্বাধীন কত্তা হয়ে চালাও দেখি আনন্দ করে—, তালগাছটা দমকা হাওয়ায় হেসে ওঠে।—বেশি কত্তামি থাকলে চালানো

যায়··· !

তখন কোলে মার্কেটের পাকা সিঁড়ি ধাপ কেটে কেটে ঊর্ধ্বমুখী। শত খোপ খুপরিতে ছ'তলা ঘরটার ওপাশে গির্জার ঘড়িতে সকাল সাতটা। ইট ঘেরা শুকনো চৌবাচ্চাটায় শাকসব্জির পাতা পচা আলু পেঁয়াজের খোসা। পুবের রোদে বাতাস মিশে খোসা দু-চারখানা উড়ে যায় ট্রাম লাইন ধরে। ডাফরিন হাসপাতাল শশীভূষণ দে স্ট্রিট রেখে আরও সোজা। তারপর তো আবার ডাইনে নির্মলচন্দ্র দে স্ট্রিট বাঁয়ে ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। যার স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায়। পেঁয়াজের খোসাটা পাক খেতে খেতে চোখের নজর থেকে হারিয়ে যায়। বকুল তো দাঁড়িয়ে রসুনের সাদা খোসার স্তূপের কুঁচো কুঁচো পাপড়ির মধ্যে।

ট্রামটা রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যায়। সাদা কুঁচো পাপড়িগুলো এলোমেলো। তার পেছনে বাসটা যেতেই রসুনের সাদা পাপড়ি ঘূর্ণি মেরে ঝরে পড়ে। যেন দমকা হাওয়ায় বাসি ফুল গাছ থেকে খসে পড়ল। এখন এমন হাওয়ায় তো বকুলের দেশ বাড়ির কাদা মাঠের আলপথে, ঝোপ জঙ্গলে ভূমিতে লম্বা ডাঁটার শিসে কাশ গুচ্ছ দোল খাচ্ছে। সাদা শিসের ঝাপটায় রোদ ঝলকাচ্ছে।

হঠাৎ সিটি দিয়ে কয়লার ইঞ্জিনের শব্দ পেছনে। চমকে তাকায় বকুল বাড়ুজ্জে ! একটু দূরে তো রেল স্টেশন চত্বর। কয়লার, ইঞ্জিন, কয়লার খোপ, বেলচা, বড় বড় চাকায় সবে গতি যোজনা করে সামনের পথকে জানিয়ে দিচ্ছে গাড়ির আগমন সঙ্কেত। তখন বকুল ইঞ্জিন ছাপিয়ে আন্দাজ পায় রেল লাইন। পাশে খোয়া পাথর, কাঁচা ঘাস জল জমা ডোবায় হোগলা চেঁচকো ঝোপ। মাটির পাড় ঘেঁষে কত শত যে কাশ ফুলের ঝাড়। আবাদি মাঠ ঘাট, গ্রাম মফস্বল থেকে শহর ঘিরতে আসছে। তখন মাওয়ের গণবাহিনী গ্রামের ঘাঁটিতে তাগদ সঞ্চয় করে ক্রমে নগরমুখী। চিয়াং কাইশেকের মার্কিন সাহায্যপুষ্ট কুওমিনতাঙ বাহিনীকে দমন করে গণফৌজ এগিয়েছে শাংহাই বেজিংয়ে।

মানুষটার দু-হাতে দুটো প্রমাণ চেহারার মাছ। ডান হাতেরটা সের তিনেকের কাতলা। বাঁ-হাতেরটা সের আড়াইয়েকের রুই। পাকা মাছের লালচে কানকো। রোদ পড়তেই আঁশের গায়ে লালচে আভা। থ্যাবড়া মুখে কাতলাটার গালাসি বেয়ে নস্করদের ভেড়ির জল। হাঁটুর উপর কাপড় বাগিয়েও মাছ দুটো ঝুলিয়ে আনতে হিমসিম। গায়ে ফতুয়ার পকেটে তেল মশলার ফর্দ। সরু পাটের দড়িতে মাছ দুটোর গালাসি গলিয়ে বাঁধা। দু-হাতের তিন তিন ছ-আঙুলে যন্ত্রণা। দু-কব্জি কনুইয়ে ভার। একবার পাশে পিছনে তাকায় মানুষটা। খোঁজে কর্মচারী ছোকরাটাকে। তার মাথায় বস্তাতে যে আলু পেঁয়াজ বাঁধাকপি কাঁচা লঙ্কার বাজার। তাকে হাতের কাছে পেলেও একটা মাছ বস্তায় ঢুকিয়ে দেওয়া যেত। তাই ডাকে, হেই—ও জলধর—জলধররে—এ

সকালবেলার বাজার।

অফিসবাবুরা ছোট ব্যাগে মাছ বড় ব্যাগে শাকসব্জি কিনে তড়িঘড়ি পা ফেলে। ঘর মুখো। দু-একজন থমকে দাঁড়িয়ে বলে, কী হল মনোময়বাবু ?

গাঁয়ের হাটের মতো হাঁক দিচ্ছেন ?

—আমার হোটেলে জলপাতা দেয় যে ছোকরা বয়টা—তাকে খুঁজছি।

চেনা ভদ্রলোকটি অবাক হয়ে বলে, খুঁজতে হবে চাকরবাকরকে ?

—খুঁজেও পাচ্ছি কই ? বেশ রসিয়ে বলে মনোময়বাবু।

—ওসব ফাঁকিবাজদের ছাড়িয়ে দিন। বরং স্টেশনে যান বিনা পয়সায় বিশ পঁচিশখানা ছোকরা চাকর আর গা হাত টিপে দেবার জন্যে দু-দশখানা পছন্দ-সই চাকরানিও মিলে যাবে—

বাজারে হাজার কথাবার্তার গুঞ্জন। তার মধ্যে ভদ্রলোকের কথায় ঠাট্টা না ঠোক্কর বুঝতে পারে না। নিজে একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মাত্র। অফিস কাছারির লেখাপড়া জানা লোকের কথার মারপ্যাঁচে ঠিক অভ্যস্ত নয়। তাই বলে, সত্যি। দেশ ছেড়ে এসে তো মানুষগুলোর বড্ড কষ্ট।

—শুধু ওদের কষ্ট ? আমাদের তো উপদ্রব বাড়াল—

জলধর বস্তা মাথায় কাছে এসে মনোময়কে বলে, বাবু—হুই যে বকুল ঠাকুর দাঁড়িয়ে—

দু-হাতে ঝুলন্ত মাছ দুটোর একটা জলধরের বস্তায় ঢুকিয়ে দিতে ভুলে যায়। বরং বলে, উঁ। তাই নাকি ?

কাশ ফুল, রসুনের সাদা পাপড়ির স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে তন্ময় বকুল। উড়ুক্কু পেঁয়াজ রসুনের খোসার পিছনে মন ছুটে যায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সামনে। মনে ভাবে, রেল কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজারের কাছে তো এখনও কাজে কোনো সুযোগ দাদাটা করতে পারলোনি। তার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দোরগোড়ায় হত্যে দিয়ে পড়লে অফিসে টপিসে কোনো একটা কাজ মিলবেনি ? কত দিন আর আগুন তাতে খুন্তি ঠেলে জীবন কাটাই ?

মনোময় ডান হাতের মাছ বাঁ হাতে, বাঁ-হাতের মাছ ডান হাতে পাল্টাই করে খানিক আরাম পায়। বলে, জোরে চল দিকি বকুলটারে ধরি।

পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। নিচে ওষুধ দোকান, পাশের কামরায় মনোহারি দ্রব্য সাজিয়ে বিকি কিনি। বড় সাইজের খিলেন গেটের মধ্যে ঢুকলে ছোট্টখাটো উঠোন। সামনে কাঠের ফ্রেমে টিনের সাইনবোর্ড, "এখানে টাইপ, রেডিও মেরামতি, টেলিফোন অপারেটিং শেখানো ও সার্টিফেকেট দেওয়া হয়।"

উঠোন ফুঁড়ে সিঁড়িটা মাঝখানে রেস্টিং স্পেস দিয়ে দু-ভাঁজে 'দ' হয়ে উপরে উঠে গেছে। বড় কাতলাটা বকুলের হাতে সবে মাত্র। সুতরাং ধাপ কেটে তরতর উঠে যায় আগে আগে। বড় বড় দরজা জানালায় দো-তলা ঘরটা অনেকখানি। সরু ফালি বারান্দার বাঁয়ে রান্নাঘর। বড় উনুনের তাপে রান্না-ঘরের মেঝে ফেটে চাকলা চাকলা। গায়ে ধোঁয়ার কষ জমে ক-খানা কাণ্টা তোবড়ানো বড় ডেকচি। বড় কড়া ধুয়ে হাতা ডাবু ডোবানো।

মালিক মনোময়বাবু গায়ের জামা খুলে বলে, তোরা আনাজগুলো কেটে ফেল।

দেওয়ালের সুইচ বোর্ড টিপতেই বড় ব্লেডের পাখাটা ঘড়ঘড় শব্দে পাক মারে। আর্মেচার কয়েলকে সিসের বড় হাঁড়ি যেন পেটের মধ্যে আগলে রেখেছে।

ছাদের সিলিং থেকে লোহার আংটায় পাখাটা ঘোরে। ছাদ কাঁপায়। মেঝে প্রবল হাওয়াময়। কাজের লোকগুলো ঝপাঝপ আলু কুটে বড় ডেকচিতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভরে দেয়। দু-একবার জল ছিটকোয়। খদ্দেরের এঁটো থালা পাতা তোলা বুড়োটা ধমকায়, এই ছেলে তোর না হয় বয়েস কম। শেষ রাত থেকে ঠান্ডার চাপ বুঝিসনি? একে উপরে পাখা আবার গায়ে জল—শীত লাগে নে?

ছোকরা জলধর বুড়ো সহকর্মীর মুখটার ভাঙচুর দেখে হঠাৎ দেওয়ালের দিকে তাকায়। পাকা দেওয়ালের গায়ে এক দুই তিন এইভাবে পর পর কুড়ি অব্দি লেখা। তার উপর মাথা ছাড়িয়ে সিমেন্টের র‍্যাক। বালিশ মশারি পাতনি গুটিয়ে চটের মোড়কে ক-খানা বেডিং পর পর। জলধর বলল, ও মোড়লদা—

—কি হল?

—আজ বাবুর কাছে ছুটি করে দেশে যাও।

এদিকে গরম কড়ায় ভাজা ডালে এক মগ জল ঢালে পালান রাঁধুনি। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক শব্দে দাহ ছুটে আসে। চটে ওঠে বুড়ো মোড়লদা, কেনরে?

—ঘর থেকে লেপ কাঁথা নিয়ে এস। কাল থেকে গায়ে দিবে—

জলধরের কথায় মোড়লবুড়ো গুমসে যায়। উপরে ফ্যান ঘোরে। বাইরে বেলা এগিয়ে রোদ বাড়ে। বাস ট্রাম টানা রিক্সা ছোটে। ট্রেন প্ল্যাটফরমে ঢুকলে এক ঝলকে হাজার হাজার মানুষ। রাজপথে গলিতে নানা কাজে, সওদায়। এই নগর ক্রমে এদেশের মানুষের হয়ে ওঠে। প্ল্যাটফরমে তখন চালচুলোহীন দেশচ্যুত মানুষগুলো। ঘেরা দড়ির ওপাশ দিয়ে চলমান যাত্রী মানুষদের স্রোত। দড়ি বন্দি গেরস্তগুলো ত্রস্ত মানুষদের দিকে তাকিয়ে গত দিনের বিলোনো সরকারি চিড়ের অবশিষ্টাংশ এক আধ মুঠো চিবোয়। ভাবে,...ওনাদের মতো তো আমাগো একটা ঘর আছিল...! ঘর বাঁধনের মাটি ছিল...।

গির্জার চূড়োয় গোল ঘড়িটায় এখন বেলা নটা। সকালের সূর্য দালান কোঠার ছাদ কিংবা গাছগাছালির পাতার গা থেকে তিরিশে সেপ্টেম্বরের বাসি হিম দাগ মুছে দিয়েছে। একেবারে নতুন মাসের নতুন দিন। ক্যাম্বেল হাসপাতালের পুকুরপাড়ে কচি এক গুচ্ছ কাশ, রেললাইনের পড়ো জলায় ঘন কাশের জঙ্গলে নরম থিকথিকে শিস ডগে বেলা নটার রোদ মেখে ঝিলমিল। ভুবনময় অক্টোবরের দ্যুতি।

একটানা মাছগুলো ভেজে কড়ায় ঝোল চাপিয়ে বেরোয় বকুল। রোগা শরীরে বুকের খাঁচায় ঘাম। উল্টোনো ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের কাছে ঝুলে। হাত লাগিয়ে চুলের গোড়ায় ঘাম মুছতে স্বস্তি। আর একটু হাওয়ার আশায় রাস্তামুখো ঝুল বারান্দায় বকুল।

সাফ করা পাকা রাস্তার পিচ-খোয়ার ঢালাই চিরে ট্রাম লাইনের ধাতব মসৃণতায় রোদের চমক গড়িয়ে যায়। লাইট পোস্টে দু-একটা কাক-পাখি। তাদের ডানায় বড়বাজার ধর্মতলার গন্ধ। তে-মাথানির মোড় থেকে ডাইনে বাঁয়ে বাস ট্রাম বাঁক নেয়। বাঁক নেয় পথচারি মানুষজনও। গোলমুখ ফরসা

চেহারায় বেঁটে খাঁটো মানুষটা এগিয়ে আসে। পাতলা ভ্রূ। পিঠে কালো কাপড়ের বড় থলিতে জুতো সুদ্ধ বাক্সর স্তূপ। বোঝাটাকে শরীরের বহনের সমঝোতায় রাখতে মাঝে মাঝে গোল মুখটা সম্মুখে বিস্তারিত সড়ক পথটার দিকে ঝুঁকে থাকে। বকুল বাড়ুজ্জে লোকটাকে দেখে ডাকে, ওই জলা দেখবি আয় তোর চিনা সাহেব—

খদ্দের ভিড় সামলাবার জন্যে অগ্রিম পাতা মুছে গ্লাস ধুয়ে রাখছিল জলধর। হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি বারান্দায় দাঁড়ায়। বলে, কই গো আমার চুংসাহেব ?

—তোর তো বন্ধু ?

—মাইরি বকুলদা, রোজ বিকেলবেলায় বুড়োর দোকানে কলাপাতা আনতে যাব আর ও এসে পাশের দোকানটায় চা খাবে—

—খেলেই বা ?

—ফিক ফিক হেসে কী সব টুংটাং চিং কথা বলে। হাতের কাপ বাড়িয়ে ধরে খেতেও বলে—

পিঠে জুতোর বোঝা নিয়ে মানুষটা হাঁটে। ফর্সা শরীরে কালো কাপড়ের থলি। কত যে শোক ভার নিয়ে চিনা ছোকরাটা হাঁটছে। সামনে পাশে শত শত মানুষ। কোটি কোটি মানুষের জীবনের ভার নিয়ে যেন খরস্রোতা উকিয়াং নদী পার হয়ে সুনয়ীতে পা রাখছে। ন'দিন ন'রাত্রি ধরে সোনালি বালির নদী পার হচ্ছে। পৃথিবীর ভয়ঙ্কর তাতু নদী। তারপরে বরফাচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে মাওকংয়ে পৌঁছনোর শ্রম এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে মানুষটা। কিংবা মানুষটার প্রজন্ম প্রবাহ। মাত্র তো চোদ্দো বছর আগে দীর্ঘ পদযাত্রা অভিযান পর্ব! তা না হলে আশি লাখ কুওমিনটাং সৈন্যকে অকেজো করে চুয়ান্ন হাজার গোলন্দাজ উপকরণ, তিন লাখ উনিশ হাজার মেশিনগান আর অসংখ্য রাইফেল দেশবাসীর হাতে হাতে আসবেই বা কেমন করে ?

দেশটার বিস্তীর্ণ এলাকায় ভূস্বামীদের দর্পচূর্ণ। ভূমিসংস্কারের পটভূমি তৈরি হল। শহরগুলো মুক্ত হয়ে আমলা ও পুঁজিবাদের হাত থেকে ব্যাঙ্ক, কারখানা বাণিজ্য পদ্ধতি ক্রমে তো ভূমিবাসীদের দশ আঙুলের আওতায় আসতে চলেছে!…এ অতীত কিংবা পরম্পরা তো বকুলের অজানা। তবুও কেমন আগ্রহ নিয়ে তাকায় বকুল নিত্যকার ভার বহনকারী চিনা মানুষটার দিকে। হঠাৎ বলে ফেলে, জলোরে—

—উঁ।

—দেয় যখন খেতে পারিস।

—দুস্! লোকটার ভাষা বোঝা যায় নে, বলে আবার তাকায় চিনাটার দিকে। মানুষটা হাঁটতে হাঁটতে এগোয়। ক্রমশ কাছাকাছি হয়। থলির মধ্যে জিনিসগুলোর অবস্থান প্রায় স্পষ্ট। একেবারে এপারের সোজাসুজি ওপার।

বকুল বলে, না রে, ভাষা নয়, ও কী যে বলতে চায় সেটাই ধরতে কষ্ট। বেয়ে বেয়ে উঠতে হয়—, বকুলের মুখের ভাষা চেনা। কিন্তু কথাটা যে দুর্বোধ্য! তাই ঘাড় ফিরিয়ে জলো তাকাতে যাবে তখনই একমুঠো আবির! আচমকা

লালের ঝাপটা। ফর্সা নাক গাল কপালের ঘামে জাপটে যায়। পাজামা-শার্ট পরা যুবকটা চাপা গলায় বলে, কমরেড··· !

যুবকের কণ্ঠস্বরে সহযোগিতার স্বর। আত্মীয় অনুভবের দোলা মানুষটার বুকে। চকিতে পিঠের ভার দমন করে একটু একটু সোজা হয়। দেখতে পায় যুবকটি দৌড়ে নয় বরং দ্রুত পায়ে হাঁটে। মানুষের ভিড়ে হারিয়ে মানুষের আবাসে আত্মগোপন করতে। সেই সময়ে তো এ-বঙ্গে ওই যুবকগুলো বেআইনি ঘোষিত !

কালো থলের ভারকে অবহেলা করে মানুষটা সোজা, খানিকক্ষণ নিজের চারপাশকে দেখে। উনিশশো উনপঞ্চাশের ১ অক্টোবর। মাঠ-ঘাট পাহাড়-নদী, নগরব্যাপী রোদ্দুর। ফর্সা মুখের আবিবে রোদ পড়ে লালচে।

তখন পেছনে আটচালা ছাঁদে প্যাগোডা। প্রাচীর ছুঁয়ে তিয়েন আন মেন ময়দান। অসংখ্য দেশবাসীর সমাবেশ। গলবন্ধ কোট গায়ে ভারি গাল। পোড়-খাওয়া মুখ। প্রশস্ত কপাল। দুচোখে বিশ্বদৃষ্টি নিয়ে চেয়ারম্যান মাও ঘোষণা করলেন, 'চিনের জনগণ উঠে দাঁড়িয়েছেন।'

সে কণ্ঠস্বর হাওয়ায় মেঘে ছড়িয়ে যায় পূব-দক্ষিণের মাটিতে। আকাশে।

বকুল ডাকে, এই জলো—

জলের ড্রাম, মুখ ধোয়ার বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে জলধর জানতে চায়, কী গো ?

—খদ্দেরের জল পাতা সাইজ কর। অফিস টাইম লেগেছে—।

ছাব্বিশ

হ্যাজাকের আলোয় গোটা ঘর ভর্তি। 'দ' মতো ভাঁজ খেয়ে ঘরটার ভেতর খোলে অনেকখানি জায়গা। সম্মুখভাগে গা ঘেঁষে মালির মনোহরি দোকানে আলতা-সিঁদুরের বড় মজুত। যেহেতু 'দ' আকার পরিসরে ঘরটা, হাঁটুর নিচ থেকে গা ঘেঁষে মালিক অতুলবাবুর ভুষিমালের ডাল চিনির বস্তা টাল দেওয়া। ছিটে-বেড়ার এপারে সদয়কুমারের নারায়ণশিলা, মাটির লক্ষ্মীঠাকুর একখানা নড়বড়ে কেঠো জলচৌকির ওপর।

জবারানী মাটির প্রদীপে সরষের তেল ঢেলে সলতেয় আগুন ছোঁয়। হ্যাজাকের আলো এত অন্দরে বড্ড ক্ষীণ। তেল ভেজা সলতের ডগ একটু একটু পুড়ে জ্বলে ওঠে। না পুড়লে কি আর আগুন তৈরি হয় ? আলো ফোটে ?

নতুন ঘরে পুরনো ঘটে নতুন আমশার। মাত্র কদিন আগের সিঁদুর কাঁচা পাতায় টাটকা। প্রদীপের স্বল্প আলোয় টকটকে আভা। ছিটেবেড়ার গায়ে মাটির প্রলেপ। সেই লেপা মাটির আস্তরে সদয়কুমারের সিঁদুরগোলা আঙুল মোছার কখানা দাগ। পুরাতন হোটেলঘর ছেড়ে অতুলবাবুর এ-ঘর ভাড়া নিয়ে তো নারায়ণের সিন্নি মা লক্ষ্মীর আরাধনা করেই প্রবেশ। পেটের ছেলেপুলে, কখানা থালাবাসন পিতলের লম্ফ হ্যাজাকের মতো তো আপন এই নারায়ণ-

শিলা! কিংবা এই নারায়ণশিলার অনুগ্রহেই ওই ছেলে দুটোকে আর সাংসারিক দ্রব্যগুলি রক্ষা করা কিংবা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। একমাত্র ত্রাতা ওই নারায়ণশিলা! মানুষের মধ্যে তো শুধু দাদা ব্রজেন ঘোষাল। যদি দু-পাঁচ জন তেমন আত্মীয়-কুটুম্ব বা মনের মতো আত্মজন থাকত! যেহেতু নেই, জবারানী আরও যত্নে ভরসা প্রার্থনায় প্রদীপ গুছিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম জানায় জলচৌকির দেবতাদের উদ্দেশে। সান্ধ্যপ্রণাম, সমীহজ্ঞাপন কিংবা কৃতজ্ঞতা। যেহেতু জবারানীর আওতার মধ্যে সমীহ বা কৃতজ্ঞতা জানাবার মতো মানুষের অভাব, প্রাণপণে কপাল ঠোকে শিলাখণ্ড বা দেবীমূর্তির সামনে। কিছুক্ষণ! বহু শত যুগের প্রবহমানতার কিছুক্ষণ।

ধুনোচিতে ঘুঁটে পুড়ে আগুন। ধুনোর গুঁড়ো দিতেই সুগন্ধী ধোঁয়া। জবারানী ধুনোচিটা নিয়ে হোটেল ঘরের সামনে আসতেই মহকুমা সড়ক। রাস্তাটুকুর ওপারে কালীমন্দিরের দেওয়াল। আর তো তাকে সেই থানাঘরের ওখান থেকে মন্দির খুঁজতে নজর চালাতে হবে না। এখন এই নতুন ঘরের সামনে রাস্তার ওপারেই তো কালীমন্দির। দেওয়াল চৌহদ্দির ভেতর শিব-বক্ষে আচমকা পা ফেলে লোলজিহ্বায় মহামায়া কালী। কালীর উদ্দেশে ধুনোর ধোঁয়া নিবেদন করে জবারানী। এত কাছে দেবীমূর্তি। প্রসন্ন মনে সুগন্ধী ধোঁয়ায় হোটেলঘর ভরিয়ে দেয়, সন্ধ্যাবেলায় সুবাণিজ্য কামনায়।

বৈশাখ মাসের সারা দিন অসহ্য গুমোট ছড়িয়েছে। এখন সন্ধে মুখে বাতাস খানিক ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে দমক। প্রায় সাত হাত সম্মুখভাগে রাস্তা গড়ানো বাতাস ঝাপটা মেরে ঢোকে। কাঠের বেঞ্চে গুড়ে ভুঁড়ে দু-ভাই। খালি গায়ে দুটো অবুঝ শিশু। তাদের মাথার ওপর রডের 'এস' আংটায় হ্যাজাক আলোটা ঝোলে। হ্যাজাকের ভেতর ম্যান্টেলটা আলো ছড়িয়ে সাদা, কাঠের কাঁচি বাটামের ওপর করোগেট টিন মেরে উঁচু থেকে ক্রমশ ঢালু বেয়ে নিচু ছাউনি। হ্যাজাকের আলো ছাউনির টিনের গায়ে। গুড়েটা হঠাৎ লক্ষ করে ছাউনি টিনের গায়ে আলো লেগে চকমকি। তখন পাশের করোগেট শিটটাও দেখে। ধাতব ঢেউ বেয়ে চকচকে আলোর স্রোত। দারুণ এক মুগ্ধতায় গুড়ে বলে, এই—

ভুঁড়ে জানতে চায়, কী রে দাদা?

—সে-ঘরের চেয়ে এ-ঘর আরও ভালো, তাই না?

গুড়ের কথায় ভুঁড়ে গোটা হোটেল ঘরটার চারদিকে তাকায়। দেওয়ালটা তো ছিটেবেড়ায় মাটির জাব লাগানো। নীচে মেঝেটাও মাটির। ওপরে টিনের ছাউনি। এগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে ভুঁড়ে ভাবে, রায়বাবুর ঘরও তো এরকম ছিল! তাহলে? এটুকু ভাবনা নিজের মনে সাব্যস্ত করে ভুঁড়ে তার দাদাকে বলে, কেন রে?

দমকা হাওয়ায় গুড়ের বইয়ের পাতা ফরফর শব্দে বদলে যায়। পাশে স্লেট-পেন্সিল পড়ে। গুড়ে হাওয়ার দমক সামলাতে ডান হাতে বই চেপে, বাঁ হাত তুলে ওপরে কাঠের ফ্রেমে ছাউনিটা দেখায়—টিনগুলো বেশ নতুন, না?

ভুঁড়ে তো আর নতুন টিনের বাণ্ডিল দেখেনি। তাই মেনে নিয়ে বলে, হুঁ।

রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে সদয়কুমার বলে, হ্যাঁ রে বাপ গুড়ে—ও গৌরব পড়ছিস তো ?

—হুঁ। দেখ না ভুঁড়েটা কী বলতেছে—

ভুঁড়ের দিকে তাকাতেই স্লেট হাতে রান্নাঘরের দরজায় ছুটে যায়, না গো বাবা—

আগুনে বসানো কড়া। গরম তেলে বাটা লঙ্কা হলুদ ঢেলে খুন্তি চালাচ্ছে জবারানী। পিতলের লম্ফয় মোটা পলতে। পলতের আলোয় জবারানীর শাড়ির পাড়ে লাল রঙ জমাট বাঁধে। মশলার তালটা খুন্তি দিয়ে এদিক ওদিক নেড়ে-চেড়ে ডাকে সদয়কুমারকে, কই গো—। কতটা জল দেব, ঢেলে দাও এবার—

রান্নাঘরে পাক মেরে মশলার ঝাঁঝ দোরগোড়ায়। ভুঁড়ের কচি নাক সড়সড়িয়ে হাঁচি আসে, সারা শরীর ঝাঁকিয়ে সে-হাঁচি। ফিরে যায় বেঞ্চের দিকে। হোটেল-ঘরের মাটির মেঝেয় দেওয়াল ঘেঁষে দুলাইন করে তালপাতার আসন পাতা। ভুঁড়ে হাঁচির চোটে তাল রাখতে পারে না। বে-খেয়ালে আসনে পা পড়ে। মড়মড় শব্দ হয়। কখানা কাচের বাটিতে খদ্দেরের জন্য লবণ রাখা। মা জবারানী বেরিয়ে এসে বলে, হ্যাঁ বাপ ভুঁড়ে—আসন মাড়াসনি। খদ্দের খেতে বসবে। পা লাগলে মা লক্ষ্মী—বাবা নারায়ণ রাগ করবে রে বাপ—

ভুঁড়ে অত হাঁচির মধ্যে পা সামলে নেয়। ঠাকুর রাগ করলে খদ্দের হবে না। খদ্দের না হলে চলবে কী করে! বেয়াদপি করার মতো স্বাধীনতা কোথায়!

হ্যাজাকের আলোয় মা, বেঞ্চে বসে গুড়ে সব দেখে। রান্নাঘরে জ্বলন্ত উনুনের তাপে মুখে কপালে ঘাম। একটু হাওয়ার আশায় সামনে যায়। লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া ক্রমশ কমছে! বৈশাখের মাটি ধীরে ধীরে জুড়োয়। হাওয়ায় একঝলক শীতলতা। উনুনের তাপ চকিতে গা-বুক থেকে মুছে যায়। আঁচলের খুঁট দিয়ে কপাল-মুখ মোছে জবারানী। সিঁদুরের টিপটা লেপটে কপালময়। হ্যাজাকের আলোয় গুড়ে দেখতে পেয়ে বলে, মা তোমার সিঁদুর ঘেঁটে গেল—

—এই রে···। বলে জবারানি পাশে তাকায়। যেন শাশুড়ি কিংবা শ্বশুর কাছে কোথাও দাঁড়িয়ে ঘরদাওয়ায়। এই সন্ধেয় এমন ঘটা এয়োস্ত্রীর পক্ষে তো বেমানান। তাই তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে নিজেকে আড়াল করে জবারানী। যদিও শ্বশুর-শাশুড়ি গায়ের কাছে নেই। সাংসারিক মঙ্গল-অমঙ্গলের দুছত্র কথা শুনতে হবে না। এ যে ঘরদাওয়া গোলাবাড়ি তুলসীতলাহীন সাংসারি-কতা। একেবারে শহরের মধ্যিখানে পেটের ভাতের জন্য নিত্য হাট বসান! হঠাৎ বুড়ো শ্বশুর বুড়ি শাশুড়ির জন্য মনটা ভারি হয়ে যায়। তারা তো এখনও বাপের বাড়ি, মা-দাদাদের কাছে, গোটা পাড়ায় পুজো-আচ্চা করে কাটায়। যেটুকু চাল-তেল পাঠানো হয়, তাতেই চালিয়ে নিচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে, দাদা যে মান্নাদের পাঁচ কাঠা পোড়ো ডাঙাটা কিনে দেবে বলেছিল ? সেটা কদ্দুর ?

পরের গলগ্রহ বুড়োবুড়ি দুটো। আবার পরের করুণায় তো বসবাসের জন্য

বাস্তু সংস্থান ! সুতরাং মনের জাগরণ মনেই ঘুমিয়ে পড়ে। হাওয়ার দমক কমে এখন বেশ ফুরফুরে। মোলায়েম বাতাস। শরীরে জুত আসে জবারানীর। মায়ের এমন চুপচাপ অবস্থানে গুড়ে বইয়ের বর্ণগুলো পড়ে। স্বরে জড়তা।

ভুঁড়ে স্লেটটায় আঁক কষে।

পরের ঘর বারবার ভাড়া নিয়ে এই দোকান চালানো। কতদিনে যে অবস্থা ফিরবে ! ছেলে দুটোর সামনে বই-স্লেট দেখে হঠাৎ বলে, হ্যাঁ বাপ তোরা একটু ভালো করে লেখাপড়া শেখ দিনি—

কখানা রিক্শা সাইকেল নিজ নিজ আওয়াজ জানিয়ে এদিক-ওদিক চলে যায়। কালীমন্দিরে ঝাঁঝ ঘণ্টা বেজে ওঠে। নিত্য পূজারী শ্যামঠাকুর পঞ্চ-প্রদীপ নাচিয়ে আরতি করে। প্রদীপের সলতেয় আগুন। দেবীমুখে আলোর আভা। গুড়ে ভুঁড়ে নড়ে ওঠে। গুড়ে তাকায় পেছনে। মন্দিরের বারান্দায় দৃশ্যগুলো আন্দাজ করে ভুঁড়ের দিকে নজর ফেলে, কি রে যাবি ?

—থাম না, সবে তো পুজো ধরেছে। বাজনা শেষ হোক—

ভুঁড়ের কথায় গৌরব অর্থাৎ গুড়ে বেশ প্রীত। বাজনা শেষ হওয়ার খানিক পরে তো প্রসাদ বিলি।

ভরাটি কালো মুখ। কপাল থেকে ব্রহ্মতালু ছাপিয়ে কেশহীন চকচকে মাথা। শুধু শেষদিকে দুগুছি চুলে দুথাক ভাঁজ। আকাশি রঙের হাফহাতা জামা। হাতে একখানা দু-ব্যাটারি টর্চ। ব্যবহারে পেতলের বডি চকচকে সোনা।

সদয়কুমার সবে রান্না গুছিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। টর্চ হাতে কালো চেহারার মানুষটাকে দেখে আপ্যায়নে অধীর, এসো গো দেবেনদা।

কাঁচা-পাকায় ছাঁটা গোঁফ। সিভিল কোর্টের মুহুরি। কথায় কথায় পান চিবোয়। বিড়ি টানে। ধোঁয়া আর চুন-খয়েরে লালচে কষ দাঁতগুলোয়। সামনের পাটির দু-একখানা ক্ষয়ে গেছে। মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ে প্রথম খদ্দের। প্রথম দিন থেকে। সদয়ের আতিথেয়তায় ফিকফিক হাসে দেবেন মুহুরি। বলে, কেমন চলছে গো ঠাকুরভাই ? নতুন ঘরে জমেছে ?

জবারানী পরপুরুষের সামনে, অযথা দাঁড়িয়ে থাকার লজ্জা কাটাতে হোটেল ঘরের অন্তরালে যাওয়ায় উদ্যোগী। পরক্ষণে থমকে যায়। ভাবে,··· কীসের পরপুরুষ ? পর মানুষ ? এ তো তবু নিত্য খেতে বসতে দিয়ে জানা-শোনা। এমন মানুষদের আশায় তো রান্নাবান্না করে থালা-বাসন ধুয়ে বসে থাকা। এরা না এলে দোকান বাঁচে ? পেট চলবে ! দেশ-গাঁয়ের বাড়িতে এমন রাতদুপুরে আত্মকুটুম্ব বা চেনাপরিচিতি মানুষ এলে তো বুক কাঁপত। তাদের জন্য পুজোয় পাওয়া আলোচাল থাকে তো তেল-মশলার বাজারহাট কিচ্ছু নেই। সে যে কী দুর্বিষহ যন্ত্রণা ! কত যে খরচের ধকল ! নিজেরা শুকিয়ে থেকে অতিথিকুটুম্ব সামলান। আর এখন— ? দু-চারজন কেন এমন খদ্দের বিশ-চল্লিশ জন যত আসে তাতে তো উপকার। পয়সার মুখ। রাত জেগে খাটতে, আগুন মাখতে কোনো কষ্ট নেই। সুতরাং জবারানী অন্তরালবাসিনী

না হয়ে বরং গায়ের কাপড় টেনেটুনে দাঁড়ায়। দেবেন মুহুরির চোখ-মুখ বিধ্বস্ত দেখে বলে, মুহুরিবাবু যে বড্ড ঘেমে গেছ।

ডান হাতের টর্চ বাঁ হাতে নিয়ে দেবেন মুহুরি উত্তর দেয়, ঘামবনি? সারাদিন কোর্টময় ছুটোছুটি কম?

—আমার দাদার সঙ্গে দেখা হয়? জানতে চায় জবারানী।

—কেন হবেনি? বেশ সরলভাবে বাক্যবিনিময় চলে। এক পুরুষের সঙ্গে। যে আত্মীয় ভগ্নীপতি ভাইঝি জামাই নয়। কিংবা ফেলে আসা দেশ-গাঁয়ের পড়শি কুটুম্ব তো নয়ই। একেবারে খদ্দের। যার কাছে রান্না ভাত-মাছ বেচে কাঁচা পয়সা। ছেলে দুটো বই খুলে বাপ-মায়ের সঙ্গে খদ্দেরের কথাবার্তা শোনে। বইয়ে ছাপা বর্ণ অক্ষরে ঢুকতে পারে না। কথা যখন থামে ছেলে দুটোর কানে সেঁধোয় পেট্রোম্যাক্স লাইটটার সাঁ-সাঁ শব্দ।

—তোমাদের হোটেলঘরটা আর একটু গোছাতে হবে—, বলে সবে তাকায় দেবেন মুহুরি। রোগা চিমসানো শরীরে তিন জন মেয়ে। কোলে কাঁখে বাচ্চা। আকাটা বড় বড় রুখু চুল মাথাভর্তি বাচ্চাগুলোর। মাটি জলে কালো কুচকুচে চামড়া। থ্যাবড়া নাক-মুখে পিটপিটে চোখ জোড়া। হঠাৎ এমন হ্যাজাকের আলোয় শিশুটা অবাক! সঙ্গের লোক চারজন জানতে চায়, হ্যাঁ গো বাবু—এই হোটেল আপনার? পরিষ্কার ধুতি কাচা শার্টে মুহুরিকে মালিক ঠাওরায়।

দেবেন মুহুরি সদয় মুখুজ্জেকে দেখিয়ে বলে, ওই বাবুর দোকান—

লোক চারজনের পেছনে বউ তিনটে দাঁড়িয়ে। দু-জনের কোলেরটা ছাড়াও, দু-জনের হাত ধরে পাঁচ-ছ'বছরের দুটো মেয়ে। খালি গায়ে দড়ি গলানো ছেঁড়া ইজের। তাদের গায়ে বৈশাখের নোনা মাটি নোনা ঘাম ফুটে সাদা। কচি কব্জিতে কাচের সরু চুড়ি কখানা। তারা যে কন্যাসন্তান তাদের হাত নাড়া-চাড়ায় ক্ষীণভাবে বাজে। ফাঁকা আকাশতলে ধু-ধু আবাদি মাঠে রোদে পোড়া মানুষ। গায়ের চামড়ায় রোম জ্বলে তামাটে। কালো বুকে-পিঠে ঘাম শুকিয়ে আঁকাবাঁকা রেখা। তারা তো লাটদার জোতদারদের এক লপ্তে দুশো-পাঁচশো হাজার বিঘের ধানজমি মেছো ঘেরি ভূমি দেশের মজুর। কিংবা ভাগচাষি। তাদের গায়ে বুকে মোজা মানচিত্রে এক-এক মালিকের জোতে খাটা-খাটুনির দাগ খতিয়ান এঁকেবেঁকে ফুটে আছে। আটহাতি জালি কাপড়ে নোনা মাটি জলের লালচে কষ।

শুকনো ভুঁড়ি গোলমুখে কালো লোকটা সদয়ের কাছে এসে বলে, হ্যাঁ বাবু আমানকে পুরুষগুলা বাহারে শুই যাবো। মেয়েগুলান এই ঘরে শুতে জায়গা পাইবে নি—?

সদয়কুমার লোকটার কথা বুঝেও চুপচাপ। এখনও তো তারা খাবার কথা বলছে না। শুধু শোওয়া…! বিদেশের মানুষ। এখনও তাদের গায়ে কদিন ধরে বোটের গন্ধ। আশ্রয় চাইছে কটা মেয়ে আর বাচ্চার জন্যে…! একেবারে হটিয়ে দিতে যে বাধে! তবুও জানতে চায়, আপনারা কি বাইরে রান্না করে খাবেন?

শুকনো ভুঁড়ি কালো লোকটা সদয়ের কথায় খানিক বিব্রত! তাই তো পরামর্শটা মন্দ নয়। রেঁধেবেড়ে খাইলে খরচ কম হইত…। কিন্তু হাঁড়ি-কড়া কাঁই? সব ভেবেচিন্তে শুকনো ভুঁড়ি কালো লোকটা বলে, না গো বাবু, না, আমরা তোমানকে দোকানে খাবি লুবো সকলকে—পুরুষমানুষ চারটে আর মেয়েরা তো তিন জন। কোলে-কাঁখে পাঁচটা ছানাপোনা নিয়ে তিনজনের খোরাক। মোট দশ জনের মতো খদ্দের। কথা কটা ভেবে শুকনো ভুঁড়ি গোল মুখ কালো লোকটার দিকে তাকাতেই, দুপা এগিয়ে আসে সদয়কুমায়ের একদম কাছে। সদয়ের হাত দুটো ধরে বলে, বাবাঠাকুর—আমরা খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছকে আসছি—

এমন অনুনয় জানাল যে মানুষ সদয়ের কাছে কতদিন পরে! চমকে গিয়েও ভালো লাগে সদয়কুমারের। সেই দুর্ভিক্ষের পর দেশ ছেড়ে পুজো-অর্চনা ত্যাগ দিয়ে ভাতের ব্যবসা করতে এসে নিজে তো কত মানুষের কাছে এমন দীনতা জানিয়েছে! তখন যে কত হীন লেগেছে বুকে! অথচ গ্রামদেশে গলায় গামছার পুঁটলিতে শালগ্রাম শিলা ঝুলিয়ে যজমান বাড়ি ঘুরেছে। একটার পর একটা পুজো সেরেছে। ধনী নির্ধন গরিব—জোতদার সবাই মাথা হেঁট হয়ে গড় জানিয়েছে। শত অন্ন-কষ্টেও যে মাননীয় সুখ ছিল। সেসব যে বেয়াল্লিশের বান তেতাল্লিশের মন্বন্তর কোথায় ভাসিয়ে পচিয়ে শেষ করে দিয়েছে…! লোকটার কথায় সদয়কুমার সোজা দাঁড়ায়। নিজের অজ্ঞাতে পৈতেয় হাত চলে যায়। চাষি-মজুর মানুষ শুকনো ভুঁড়ি কালো লোকটা। জল বর্ষায় মালিকের ধানচারা রুয়ে দেয়। শ্রাবণ-ভাদ্রে চারার ডগ দেখে টের পায় ফলন মুখ। নয়তো আগাছা কিংবা পোকামাকড়ের উপদ্রব। অত কচি মনের চারার অন্তর ধরতে দক্ষ। সদয় মানুষটার মনের গতি কি আর বুঝতে কষ্ট? সুতরাং দু-হাত ধরে বলে, আমানকে জোর করি মামলায় ফেলছে দেশের বাবু মালিকরা—আমানকে পুইস্যা নাই। ভিখারি—দাম কম লিবেন।

কোর্টের মুহুরি কথার স্বরে গন্ধ পায়। লোক চারটে আর মেয়েগুলোকে দেখে দেবেন। মুহুরি বলে, তোমাদের কী কেস গো?

গোলমুখ কালো লোকটা ঘাড় ফেরায়। মুহুরিকে বলে, আজ্ঞে! কাছারি জবালাই রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র—

দু-চোখে ভয়ঙ্কর বিস্ময়! গলা নরম করে মুহুরি জানতে চায়, তাহলে তোমরা এখানে!

কালো লোকটা বলে, বাবু—আমাদের বুড়া বুড়া বাপ কাকা ছোকরা ভাই ভাইপোদের ধরি লিছে পুলিশ মিলিটারি—। তানকে তো জামিনে ছাড়াইবার লিয়া পার্টির উকিল চক্রবর্তীবাবুকে যাইব। বাবুর বাসায় রাতে কেস লিখব—

—তোমরা তাহলে ভাগচাষি?

চার মানুষে একযোগে যেন স্লোগান দেয়, হুঁ বাবু হুঁ—

মথুরাপুরে নিজের জমিতে তিনটে চাষি যে মাঝেমাঝে এমন উৎপাত বাধায়।

নেহাৎ কোর্টের মুহুরি, তাই তারা কায়দা করতে পারে না। নিজের চাষি তিনটের ওপর রাগে জানতে চায় কালো লোকটাকে, তোমরা লাটের কমনিস্ট ?

যদিও সব তছনছ। কংসারি হালদার-অশোক বসুরা স্থানান্তরে। গোপন সাংগঠনিকতার পরম গৌরবে বলে কালো লোকটা, হুঁ। পরক্ষণে শুধরে নিতে আকুল, না গো বাবু, না। আমানকে ছোকরা হুজুগে ভাই ভাইপোরা—

যত দিন গাঙ নদী জঙ্গল ঘেরা দ্বীপগুলোর মধ্যে চলাফেরা ছুটোছুটি করেছে, মনে হয়েছিল সকলেই তাদের সঙ্গী। বোটঘাটে আসা-যাওয়া করে, কোর্ট-কাছারি অফিস-আদালত ঘুরে ধারণা পোক্ত,···দেশসুদ্ধ তো কমনিস্ট হইছেনি···। অতএব অচেনা অজানা মানুষ···বিদেশের পথঘাটে এমন ফটাস করে সব কথা বলা ভালো নয়। কোথায় কোন জন ওঁত পেতে তো থাকতে পারে।

শাঁখা হাতে রোগা বউটা দাঁত খাপটিয়ে ইঙ্গিত করে। যার মর্ম দাঁড়ায়, সব কথা সব জায়গায় ফাঁস কেন বাপু ? বউটা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির গোপন সদস্য। গজেন মালির বিশ্বস্ত সঙ্গী বিজয় মণ্ডলের মা রেণু মণ্ডল যে সমিতির সম্পাদিকা। মা রেণু মণ্ডল তো ছেলে বিজয়কে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিত গেরিলা আক্রমণ রচনা করতে। শুকনো ভুঁড়ি গোল মুখ কালো লোকটা সদয়কুমারকে বলে, বাবু—পুজারি বাবু—আমরা মাছ তরকারি লুবনি। শুধু ডাল আর ভাত দিবেন। ফুরান—পেট ফুরানে কত লিবেন ? আমাদের মেয়েরা আর টোকাগুলা অখন বুসবে। আমরা উকিলবাবুর কাছকে ঘুর‍্যা আইঠি—

—আসুন না আপনারা। রাতে থাকবেন যখন আর কি ?

সদয় মুখুজ্জের কথায় আশ্বাস পায় লোক কজন। মেয়েরা মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ের ভেতরে বসে। শুধু মাটিরই ওপর থাপড়ে। একই কাপড়-চোপড়ে কদিন ধরে যে বেরিয়েছে। সুদূর দক্ষিণে সুন্দরবনের নোনা জল জঙ্গলের মাটি থেকে। গায়ে ঘাম। নুন বালির পরত জমে।

গুড়ে বাপের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, কমনিস্ট কি গো বাবা ?

ছেলের প্রশ্নে বাবা অসহায়। বলে, মুহুরিদাকে জিজ্ঞেস করি থাম—

দেবেন মুহুরি মাটির মেঝেয় বিছানো তালপাতার আসনে বসে। কাচের বাটিতে লবণ। সেটা কাছে টেনে জলের গেলাসটা ঠিক করে বসায়। বারবার সকড়ি মুছে একটু-আধটু উঁচু-নিচু। গেলাসটা একবার সামনে. পরে পেছনে সরিয়ে জুতসই ঠাঁই পায়। এই মাটির ওপর তো ঠিক ঠাঁই গাড়তে শতেক ঝামেলা। তা না হল দেশের এম. ই. ইস্কুলে ষষ্ঠ মান অবধি পড়ে তো হাটে দোকান করে দিয়েছিল বাবাটা। সে দোকান অচল। তারপর দেশের হৃষিকেশ বাঁড়ুজ্জে উকিলবাবুর খাতা ব্রিফ বয়ে বয়ে এখন মুহুরি। দেশ ছেড়ে···না হোক গ্রাম থানা থেকে হড়কে এসে তো সিভিল কোর্টে মুহুরিগিরি ! মানুষ··· মানুষের তাহলে দেশ কোথায় ? জন্মস্থান, না, অন্নস্থান ? কথাটা ভাবতে ভাবতে একবার তাকায় কটা বউ-বাচ্চাদের দিকে। ভাতভর্তি থালাটা দেবেন

মুহুরির সামনে রাখতেই ঠকাস শব্দ।

বউ, বাচ্চাগুলো পাশে তাকায়। চোখের সামনে ভাত।

দেবেন মুহুরি কয়েক গ্রাস মুখে পুরে খিদে খানিক দমায়। তারপর মনে হয়, এই…এদেরই চাষ করা ধান। হয়তো সেই ধানেরই চাল—এই ভাত। ভাতের জন্যেই তো ওরা ভাগচাষি, তে-ভাগা আন্দোলনকারী। ওদের নেতারা কলকাতার জেলখানায়। ওদের লোকগুলো হয়তো মহকুমার সাবজেলে।

এসময়ে হায়দ্রাবাদের কাছে শিবরামপল্লিতে তৃতীয় বার্ষিকী 'সর্বোদয় সম্মেলন'। আচার্য বিনোবা ভাবে তিনশো মাইল পথ হেঁটে এখানে পৌঁছলেন। তিনি জানালেন, '…সর্বোদয় বলিতে সবাইকে বুঝায় ; অতএব কমিউনিস্টরাও আমার চিন্তার বহির্ভূত নয়।'

তাই তিনি প্রথমে হায়দ্রাবাদ জেলে তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলনে আটক কমিউনিস্ট বন্দিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং দু-তিন ঘণ্টা তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চলে। আচার্য বিনোবা ভাবে বলেন, '…কমিউনিস্ট ভাইদেব বিচার-ধারা কী তাহা জানিবার ও বুঝিবার জন্য আমি জেলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।'

এর কদিন পর বিনোবাজী নলগুণ্ডা জেলার পচমপল্লিতে হাজির। সেখান থেকে তো দণ্ডকারণ্যের শুরু। নলগুণ্ডা আর ওয়ারেঙ্গল জেলা কমিউনিস্ট প্রভাবিত। নলগুণ্ডা কমিউনিস্টদের শক্ত ঘাঁটি। দু'বচ্ছরে বেশ কিছু পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে। বিনোবাজী হাঁটছেন। প্রায় নগ্ন ফকির বেশে। তিনি হরিজনপল্লির ভেতর দিয়ে এগোচ্ছেন। অনাহারক্লিষ্ট নরনারী। রুগ্ন শিশু কোলে মায়েদের ভিড়। তারা বিনোবাজীকে দেখে মনে করে, মহাত্মা গান্ধীর মতো কোনো মহামানব এসেছেন। দীন মজুর হরিজনরা অবাক চোখে মানুষটাকে দেখে। ভূমিবানদের জমিতে সারাদিন সারাবছর মজুর খেটে তো পেত মোট উৎপন্ন ফসলের কুড়ি ভাগের এক ভাগ মাত্র। একটা কম্বল। এটাই তাদের বছরে পারিশ্রমিক পাওনা। তারা ভাবল, এই মহাপুরুষটির কাছে যদি অভাবের কথা জানাই তাহলে একটা কিছু ব্যবস্থা হবে—।

হরিজন মানুষরা বিনোবাজীর কাছে জমি চাইল। লম্বাটে সুশ্রী মুখে সাদা গোঁফ, গোল চশমা, গাল থুতনি থেকে সাদা শমশ্রু ঝুলে আর্য দৃষ্টি। বললেন, তোমাদের কতটা জমি হলে চলবে বাবা ?

তারা বলল, চল্লিশ একর নিচু জমি আর চল্লিশ একর উঁচু জমি—

—মোট আশি একর জমি পেলে তোমরা মিলিতভাবে চাষাবাদ করবে ? জানতে চাইলেন আচার্য।

মানুষগুলো পরম উৎসাহে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সারে। তাদের নায়ক বলল, হ্যাঁ মহাত্মন, আমরা মিলেমিশে চাষে রাজি—

—তাহলে একটা দরখাস্ত আমাকে দাও। কথাটা বলে বিনোবাজী ভাবছেন দরখাস্তটা নিয়ে সরকারের কাছে জমি চাইবেন। ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকে সেখানে উপস্থিত। বিনোবাজী সমবেত মানুষদের সামনে আবেদন রাখলেন,

সরকারের কাছ থেকে জমি পাওয়া না যায় বা অযথা দেরি হয় তাহলে আপনাদের মধ্যে কেউ এই গরিবদের জন্যে কিছু জমি দিতে পারার মতো নেই··· ?

উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডি এগিয়ে যান, মহাত্মন আমি ও আমার পাঁচ ভাইয়ের পক্ষ থেকে পঞ্চাশ একর উঁচু আর পঞ্চাশ একর নিচু জমি আমার গরিব ভাইদের জন্যে দিতে রাজি—

প্রেরণা আর উদ্যমে বেলা কাটে। আবেগে সন্ধ্যা আসে। ওই সন্ধ্যায় প্রার্থনাসভাতে আচার্য বিনোবাভাবে ঘোষণা করলেন প্রাপ্ত ভূমিদানের কথা। বিস্ময়ে মুগ্ধ দুঃস্থ হরিজনেরা। তারা মহামানুষটির যাদু ব্যক্তিত্বে বিভোর। পিঠ মেরুদণ্ড বিভঙ্গে নতমস্তক। তারা গড় জানায়। ভূদান যজ্ঞের জন্ম হয়।

এরপর তেলেঙ্গানা পরিভ্রমণকাল। উনিশশো একান্নর ছাব্বিশে মে। হায়দরাবাদের বারাঙ্গল এলাকায় বিনোবাজী তাঁর প্রবচনে বলেন, '···গান্ধীজীর তিরোভাবের পর আমি চিন্তা করিতেছিলাম—এখন আমার কী করা আবশ্যক। ···কিন্তু তেলেঙ্গানার কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আমি বরাবর চিন্তা করিতেছিলাম। এখানকার হত্যা ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে আমি সব সংবাদ পাইতেছিলাম। তাহা সত্ত্বেও আমার অন্তরে কোনোরূপ নিরুৎসাহের ভাব আসে নাই। কেন না মানবজীবনের বিকাশের ধারা সম্পর্কে কিছু ধারণা আমার আছে। তাই আমি বলিতেছি—যে যে-সময় মানবজীবন নূতন সংস্কৃতি লাভ করে, সেই সেই সময়ে কিছু কিছু সংঘর্ষ ঘটিয়া থাকে, রক্তের ধারাও বহিয়া যায়। এইজন্য নিরুৎসাহিত না হইয়া শান্ত মনে চিন্তা করিতে হইবে এবং শান্তিপূর্ণ পথের সন্ধান করিতে হইবে। এখানে শান্তিস্থাপনের জন্য সরকার পুলিশ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পুলিশ বিচারক নহে। পুলিশ শস্ত্রধারী এবং অস্ত্রবলই তাহার একমাত্র উপায়। তাই জঙ্গলে ব্যাঘ্রের উপদ্রব প্রতিকারের জন্য পুলিশকে পাঠানো উচিত এবং পুলিশ ব্যাঘ্র শিকার করিয়া আমাদিগকে ব্যাঘ্রের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু কমিউনিস্টদের উপদ্রব ব্যাঘ্রের উপদ্রব নহে—উহা মানুষের উপদ্রব। উহাদের কার্যপন্থা যতই ভ্রান্ত হউক না কেন উহাদের জীবনে কিছু না কিছু বিচারধারা আছে। সেক্ষেত্রে মাত্র পুলিশ পাঠাইয়া প্রতিকার হওয়া সম্ভব নহে। সরকারের একথা অজানা নাই। তাহা সত্ত্বেও নিজের কর্তব্য বিবেচনা করিয়া সরকার পুলিশ পাঠাইয়াছেন। সেজন্য সরকারকে আমি দোষ দিতেছি না।'

কোলের বাচ্চাগুলো কাঁদে। পাঁচ-ছ'বছরের মেয়ে দুটো মুহুরির থালায় আরও দু'হাতা ভাত দেখে কান্নার বেগ বাড়ায়। মায়েরা বাচ্চাদের মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার সাইকেল-রিকশা দেখায়। নজরে মন বসে না। ভাতের গন্ধে খিদে তীব্র হয়।

থালার ভাত সাফ হলে দেবেন মুহুরি বলে, হ্যাঁ গো মেয়েরা—

মুহুরির দিকে ঘাড় ফেরায় বউগুলো।

মুহুরি কথা চালায়, তোমাদের লাটে মালিকবাবুরা দু-চার বিঘেও তোমাদের জন্যে দান করে নে ?

কাদা-গোবরে জেল্লা হারানো শাঁখা হাতে রোগা বউটা বলে, হুঁ। পাইলে বাবুরা আরও ল্যায়—

—কেন গো বাবুরা ইস্কুল-পাঠশালার জন্যে জমি দান করেছে, বলে মুহুরি।

রোগা হাতে বিবর্ণ শাঁখায় বউটা ক্ষীণ স্বরে জোর আনতে চায়, হাঁ, ধান ভাগের সময়কে বাবুদের নায়েব-গোমস্তা যাত্রা পুতুলনাচের জন্যি এক ধামা ধান লিতো। পাঠশালার জন্যি আর এক ধামা কাটিয়ে লিতে নিয়ম করলি—

মুহুরির মুখ ভোঁতা। বাচ্চা কজন তখনও কাঁদে। অভিজ্ঞ মুহুরির লেখা আর্জি। সিনিয়র উকিলবাবু নজর বোলাতেই যেন ত্রুটি ধরে ফেলল। মক্কেলের সামনে মর্যাদাহানি। সেটা কাটিয়ে উঠতে দেবেন মুহুরি বলে, ওরা কাঁদছে কেন?

—সারা দিনে তো খাদ্য-খাবার কচিগুলোর পেটে পড়ছে নি···, পাশের বউটার গলা জড়িয়ে কথা কখানা কাঁটা খোঁচার মতো মুহুরির কানে লাগে। হোটেলঘরে চণ্ডমণ্ডিয়ে মুহুরি ডাকে, ও ঠাকুরমশায়—

সদয় মুখুজ্জে রান্নাঘর থেকে বড় বড় পায়ে সামনে আসে, কী গো বাবু?

—বাচ্চা কটাকে এক থাল ভাত দাও তো।

সদয় দাঁড়িয়ে থাকে।

—আরে দাও না। আমি দাম দোব—। মুহুরি সম্বিত হারিয়ে বলে ফেলে।

থালা ভর্তি সাদা ভাত। ছেলে-মেয়ে পাঁচ জন থালাটাকে এক ঝাঁক পাখির মতো ঘিরে বসে। কালো কালো চেহারার সামনে ধবধবে ভাত। কোলের বাচ্চা তিনটে কচি আঙুলে এক মুঠি ভাত আঁকড়ায়। গালে তোলে। ওদের মায়েদের খাইয়ে দিতে হয় না। শৈশব থেকে খুঁটে খায়!

হাজার বছর ধরে পৃথিবীর মাটিতে খুঁটে খাওয়া প্রজন্ম!

সাতাশ

বড় বঁটিটার গায়ে ধাতব চিকমিকি। প্রতিদিন আলু-কুমড়ো কাটাকুটিতে বঁটির প্রান্তভাগ ভীষণ ধারাল। কাঠের ডাঁপে বসে সদয়কুমার আনাজ কোটে। বড় বড় পেঁয়াজ কয়েক ফালা করতেই ঝাঁঝ। পাঁজা মাস্টার হোটেলঘরে ঢুকেই হাঁক দেয়, কইরে—এ তোরা বসিস নি?

ছেলে দুটো তাড়াতাড়ি চ্যাটাই পাতে।

লম্বাটে ফর্সা মুখে আ-কামানো পাকা দাড়ি খোঁচা খোঁচা। গায়ে হলুদ রঙের মোটা খদ্দরের ফুলশার্ট। পরনে সাদা খদ্দর ধুতি। পায়ে চটি জোড়া ঝাঁপিয়ে পাঁচ বাড়ির পথের ধুলো। ছেলে দুটোকে বইখাতা আনতে দেখে বলে, হ্যাঁরে—, আমি এলে তবে তোরা বসবি?

চোখ জ্বালিয়ে জল। ঝাঁঝের ধাক্কা সামলে সদয়কুমার বলে, মাস্টারমশাই, ওদের মানুষ করার দায় আপনার। শুধু হাড়গুলো আমার, মাস আপনার—

ছেলেদের বাপের কথায় বিনয় মাস্টার খুশি। ডান বাহুটা উঁচিয়ে হাতের মুদ্রায় আশ্বাসের বাণী। পাঁজা মাস্টারের কড়ে আঙুলের সঙ্গে অনামিকার মাংস মিশে জন্ম থেকে জোড়া। তাই হাতের চেটো থ্যাবড়া।

পাঁজা মাস্টার বলে, ঠাকুরমশাই—আমার এই থ্যাবড়া হাতের চাপ্পড় যে কটার পিঠে পড়েছে—তারা অফিস-কাছারি নয় কলকাতার কারখানায় পেটের ভাত করে খাচ্ছে—

ভুঁড়ে মাস্টারমশাইয়ের কথায় খানিক অবাক হয়ে ভাবে, ভাত… ! সে তো হোটেলে। অফিস-কাছারি কলকাতা কেন… !

ছাত্রের অবাকপনায় পাঁজা মাস্টার ধমকায়, এই ভৈরব স্লেট ধরেছিস ?

গুড়ে অর্থাৎ গৌরব লালাভ সাদা খাতায় মার্জিন টানে। স্কুলের অঙ্ক কষবে।

ভৈরব তখন কালো স্লেটে লেখে, অ'য়ে অজগর আ'য়ে আম—

ইটের দেওয়াল গেঁথে লম্বা করে অ্যাজবেস্টারের ছাউনি। বড় বড় জানালা দরজা। বালি-সিমেন্টের পলেস্তারায় হলুদ রঙ। ভেতরে কোয়ার্টার ঘিরে পাঁচিল। পাঁচিল কেটে কচিপাতা রঙের খিড়কি দরজা। বড় নিমগাছটার গায়ে এবড়ো খেবড়ো বাকল। দিনরাত নিমফল পড়ে খিড়কির দরজা চাতালে। নিমগাছটার মগডাল ছাড়িয়ে কখানা লোহার ধ্বজা বেয়ে সরু সরু তার। তারগুলো অ্যাজবেস্টার ঘরটার জানালা গলে ভেতরে। আকাশ·· মহাকাশ থেকে কী সব ছেনে আঁকড়ে আনে টেবিলের ওপর যন্ত্রপাতিতে। কোণের দিকে আরও যন্ত্র বসানো। লোকটার মাথা চেপে দু-কানে হেড ফোন। রাত দিন টরে টক্কা শব্দ করে কত কী কথা বলে ভেতরের লোকটা। দরকারে খাতা পেন্সিলে লেখে। বাইরে কলতলায় ঘরটার ভেতর থেকে ভেসে আসে গোঁ-গোঁ-গোঁ আওয়াজ। মোটা নিমগাছটার ডালপালায় ছায়া। নীচে টিউকল। হীরু ভারী কলের হ্যাণ্ডেল টেপে। সামনে কজন আধা-বুড়ি বিধবা মাটির কলসি কাঁখে দাঁড়িয়ে।

হীরু ভারী কালো চেহারার লম্বা প্রমাণ। হ্যাণ্ডেলটা নামিয়ে আবার যখন তোলে আধ-বুড়িটার চোখে চোখ পড়ে। বুড়িটা বলে, নে না তাড়াতাড়ি, আমার রান্না বসাতে হবে—

—থামো না, আমার আর এক টিন তো বাকি—, হীরু ভারী গলায় বেশ জোর ঢালে। যদিও থানা এরিয়ার টিউকল, হীরুর দাপট তো কম নয়। সে বড় দারোগা মেজ দারোগাদের বাড়ি চান চৌবাচ্চার জলের মাসকাবারি জোগানদার। দারোগাবাবুরা তো চেনে, চেনে সাহেবদের বিবি-বাচ্চারাও।

ভারীর কথায় বুড়িটা মুখ বাঁকায়। ভর্তি টিনটা সরিয়ে খালি টিন কলের মুখে রাখে হীরু ভারী। পরনের কাপড়টা কাছা মেরে কপাকে কোমর পাছাকে ঢেকে তার ওপর গামছার পাট আঁটোসাটো। আবার হ্যাণ্ডেল ধরে ভারী বলে, কাদের জল গো বুড়িদি ? বাজারপটির আহ্লাদি মেয়েগুলোর—

—জানিস তো সব। শুধু মুখ নোংরা করতেছিস—

বুড়িদির কথায় খানিক খোঁচা। তাই হীরুভারী উল্টো ঝাপটা মারতে শোনায়, তোমার ও-পটির পরীদের পাঁচ আইন পুকুরে পানি খেতে বল—

বুড়ি মুখ কুঁচকে বলে, এ্যাঁ মা গো ও-পুকুরের জল খাবার যোগ্যি। লোক চান করে, সাবান কাচে—মানুষের গু গোপর সব—, যেন বুড়ির মুখে কালমেঘ পাতা কিংবা মাছের পিত্তি।

কলের মুখ থেকে জল পড়ে। টিনের অর্ধেক ভর্তি। জলের ছলাক ছলাক শব্দ। ভারী বুড়ির দিকে মুখ বাগিয়ে তাকায়,—অমন করলে ? ও-পুকরের জল খেয়ে তো এদেশের মানুষ বাঁচল। কল তো সবে ক'বছর। তখন ও-পুকুরের চার দিক কাঁটাতার ঘিরে বেড়া। পুলিশ মোনানি ছিল। কলসি ডুবোতে গিয়ে উপায় ছিল কারুর ওই পাকা ঘাটে পা ভিজোবার—? একেবারে থানার হাজতে—। তারপর হাকিমের বিচারে জেল, নয় ফাইন—

ভারীর টিন ভরে গিয়ে জল উপচোয়। অ্যাজবেস্টার ঘরের জানালা গড়িয়ে বাক্যগুলো কলতলা কাঁপায়, ও. কে.। পুলিশ স্টেশন। স্টার্ট...

বাঁক কাঁধে নিয়ে দু-ভার জলের টিন ঝাঁকিয়ে তোলে ভারী। ধীরে ধীরে ভিজে চাতালে পা ফেলে। পাশের বউটা বে-খেয়ালে জানালার দিকে তাকিয়ে। হীরুভারী বাঁক কাঁধে চেঁচায়, কই গো পাশ দেবে নে ? শুধু অরলেস বাবুর বাজনা শুনলে হবে ?

বাঁয়ে শান-বাঁধানো থানার পুকুর। গুঁড়ো ইট ঘেঁষে বিছানো রাস্তা। ঢালু বেয়ে পাকা রাস্তায় ওঠে ভারি। একতালা পাকা ঘর। বারান্দায় টিনের ছাউনি। সামনে তালগাছটার শুকনো পাতা হাওয়ায় খড়খড় নড়ে। হীরুভারী মেজ দারোগার কোয়ার্টার ফেলে এগোয়।

স্লেট ভর্তি করে অ আ লিখেছে ভৈরব অর্থাৎ ভুঁড়ে। গোটা গোটা হাতের লেখায় বর্ণগুলো চেয়ে থাকে।

বিনয় মাস্টার ভৈরবের হাতটা ধরে বসে, দেখি তোর বুড়ো আঙুল—। পরে তর্জনী আর মধ্যমার ডগ দুটো টিপে টিপে দেখে আন্দাজ করে কঞ্চির কলমের কঠিনতা। আঙুলের চামড়ায় সামান্য কড়া। এদিক চেয়ে বলে, তোর তালপাতার তাড়িগুলো আছে ?

—হুঁ।

—নিয়ে আয়।

পরম খুশিতে ভৈরব শুকনো তালপাতার 'পাততাড়ি'গুলো পাড়ে। কাঁচা বেলায় গুন সুচে কুঁদে কুঁদে ফোটানো বর্ণ। কঞ্চির কলম কালিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে কোঁদা বর্ণের ওপর তো বোলানো। পাততাড়ি বগলে নিতেই খড়খড় শব্দ। বর্ণগুলো প্রাণের আওয়াজে বাজে।

—ভৈরব—বাবা ভুঁড়ে রোজ দুপুরবেলা একবার করে পাতায় কলম বোলাবি। তোর হস্তাক্ষর ভালো হবে। চল তোকে একটা দ্বিতীয় ভাগ এনে দি—

সবে চটি গলিয়ে বিনয় মাস্টার এগোবে, দু-টিন জলের ভার নিয়ে

হীরুভারী মুখোমুখি। ভারী ডাক দেয়, মাস্টারবাবু—সামলে।

সম্মুখে মহকুমার নতুন পাকা রাস্তা। সেটা পার হয়ে আবার প্রান্তভাগ নিচু। সিঁড়ির ধাপ কাটা। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ভৈরব। পুস্তক বিক্রেতা অধিকারীবাবু খালি গায়ে। অল্প ভুঁড়ির ওপর সাদা পৈতে। কাঠের চৌ-বন্দিতে লোহার রড গলিয়ে সম্মুখভাগ। দোকানের যাবতীয় বই আলমারিতে দৃশ্যমান। রডের পাল্লা দুটো খোলা।

বিনয় পাঁজা বলে, অধিকারীদা—দাও তো বর্ণ-পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ। ছেলেটাকে যুক্ত বানান শেখাতে হবে—

গোলাপি রঙের পাতলা কাগজে মলাট। সামনে কাঠের ব্লকে ছাপা, দৃপ্ত দৃষ্টিতে বড় বড় দু-চোখ। সংযত অথচ সুগভীর চিন্তাপ্রসূত বাক্য ব্যবহারের দৃঢ় ঠোঁট। কেশহীন গোল মুখে আবক্ষ ছবি। ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আর ভাবে—এ কে! এ লোকটা কে? এমন চেয়ে আছে ছেলেদের দিকে…

শুধু কি ছেলে? মেয়েদের দিকেও। একটা জাতির অখণ্ড শৈশব ও প্রজন্মের দিকে। অভ্যাস ও অর্জনের দ্বারা পুনর্গঠন এবং উত্থানের স্বপ্নে। নতুন বই এনে বসতেই গৌরব বলে, বিদ্যাসাগরের বই।

ভৈরবের সন্দেহ। এ-লোকটার ছবি তার কাছে তো অপরিচিত। দাদার প্রথম ভাগের মলাট কবে ছিঁড়ে জঞ্জাল হয়ে গেছে। বইটা তো শুধু সুচ সুতোয় বেঁধে জখম সামলানো। ফলে এমন টাটকা বইয়ের মলাটে ছবিটা যে কী জীবন্ত! তাই জানতে বিনয় মাস্টারের কাছে দাঁড়ায়।

নারে, ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা, বলে বিনয় মাস্টার আবার বোঝায়, বিদ্যাসাগর মশাই রে—

মহারানী হিন্দু ভোজনালয় পরিবারে একটু একটু করে বিদ্যাসাগরমশাই ঢুকছেন। সদয়কুমার তো ভাতের জন্য বসবাসের গ্রাম ছেড়ে এই মহকুমা শহরে হাজির। তখন এ-বঙ্গে কত পরিবারে যে বিদ্যাসাগরের প্রবেশ সুকঠিন! ও-বঙ্গের ঢাকায় ছেলেমেয়েরা পথে পথে, গান গাইছে, গুলি চলছে, রক্ত ঝরছে। বিদ্যাসাগরের বর্ণকে ভালোবেসে।

বেলা বাড়ে। সামনের পাকা রাস্তায় রিকশা সাইকেলের ভিড়। বিহারি শর্মাবাবুর কালো অস্টিন ট্যাক্সিটা মাঝে মাঝে ঘোরে। যুদ্ধফেরত শর্মাবাবু তার মাছের আড়তে কাচ লাগান বড় ছবিটা দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। কড়া মাড়ে নিভাঁজ ধুতি আর সাদা হাফশার্ট পরে হেঁটে যায়। কর্মচারী ব্যাগ টর্চ বয়ে পেছন পেছন হাঁটে। যুদ্ধে একদা ক্যাপ্টেন সাহেব। কত রাইফেল পিস্তল-ধারী রক্ষী তো থাকত! তার বদলে মোটা ধুতি মালকোছা মেরে গায়ে একটা পপলিন শার্ট চড়িয়ে সর্বক্ষণের ফায়ফরমায়েস খাটা কর্মচারী।

বিনয় মাস্টার চ্যাটাই ছেড়ে উঠতেই জবারানীর নজরে ধাক্কা। রাস্তার দিকে তাকায়। ওপারে রাস্তার ঢালে খড়-টালির ছাউনি তলায় সারি সারি মাটির হাঁড়ি-কলসি, সরা-মালসা-মেজলার দোকান। বুড়ো যতীশ বেঞ্চের ওপর কাঠের ক্যাশ বাক্স বসিয়ে দোকানদারি চালায়। রাস্তার ঢালে মোটা খিরিশ গাছটা

ডালপালা ছড়িয়েছে বিস্তর। যতীশ বুড়োর হাঁড়ি-কলসি দোকানের খড়-টালি ছাউনির ওপর মস্ত খিরিশের ছায়া। নং নং করে পাকা খিরিশ ফল পড়ে। খড়ে গুঁজে যায়। টালিতে শব্দ হয় ঠকাস ঠকাস। খদ্দের পোড়া হাঁড়ির গায়ে টোকা মারে। মাটির হাঁড়ি আওয়াজ করে খন···খন···খন···

হোটেলঘরের সম্মুখ ভূমিটা সামান্য ঝাঁটায় জবারানী। জল ছড়া দেয়। উনুনে পোড়া ঘুঁটে মাটির ধুনুচিতে সাজিয়ে একটু ধুনোর গুঁড়ো দেয়। সুগন্ধি ধোঁয়া। একদম সামনে মা কালীর মন্দির। জল ধুনোয় পবিত্র দোকান-ঘর। খদ্দেরপাতির জন্য আয়োজন। মা কালীর করুণায় আজ বাজারটা ফলদায়ক হোক, এটাই জবারানীর প্রার্থনা। দুহাতের মুঠিতে গরম ধুনোচি। উচ্চ মুঠিতে ধুনোচির তলস্ত বেড়টা বারবার কপালে ঠেকে। মহাশক্তিময়ী কালী খদ্দের পাঠাক, খদ্দেররা পেট ভরে খাক, সানন্দে দাম মিটিয়ে যাক। এই লেনদেনে মহারানী হিন্দু ভোজনালয় বেঁচে থাকুক।

কিন্তু এই লেনদেনের কাঠামো মা কালীর মন্দির থেকে কত···কত হাজার মাইল দূরে তৈরি হচ্ছে যে! যোজনা পর্ষদ গ্রহণ করেছে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। তারই খাল-নালা বেয়ে যেমন আসবে এই দূর দক্ষিণের নোনা বঙ্গে তেমন তো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে জবারানীর খদ্দেরপাতির মধ্যে! তাই কাঠামো, পুঁজি, বিনিয়োগ উৎপাদন—কিচ্ছু নয়। মানুষ···খদ্দের রূপ মানুষের আশায় আকুল মিনতি জানায় দেওয়ালের ওপারে কালী ঠাকুরকে। মুদিত চোখ খুলে দেখে, কত মানুষজন রাস্তায় বেরিয়েছে। ভাবে, ওই মানুষ-গুলোর পাঁচ-দশজন কি খদ্দের হয়ে এ-হোটেলে ঢুকবে না···। কালীমন্দির বাঁয়ে ছুঁয়ে তো পাকা রাস্তাটা কোর্টমুখে। টিনের দেওয়াল টিনের ছাউনি ঘিরে চণ্ডী ডাক্তারের ডিসপেনসারি। বেলা ন'টার রোদ নতুন টিনের গায়ে।

চণ্ডী ডাক্তারের ডিসপেনসারির পাশে গড়ানো জায়গাটায় যে কত বড় ঘর। সেই ঘরে উড়িষ্যাবাসী মহানন্দের 'গন্ধেশ্বরী ভোজনালয়'। দেশ ছেড়ে কলকাতা ঘুরে দুর্গাবতীকে জুটিয়ে এনে হোটেল খোলা। লম্বা চেহারায় কালো গা গতরে দুর্গাবতী। এক ডিবে পান সেজে এনে মহানন্দর টেবিলে রাখে। স্কেল আর পেন্সিল দিয়ে ঘর কেটে খাতা সাইজ করে। এইটুকু পারে বলেই তো এই লোকটাকে নিয়ে কলকাতার খুপরি ঘরে ছোট বিছানা···ছোট মেজলায় সাফা হওয়ার জল···ভালো না লাগলেও দু-তিন পাঁইট মদ গেলার যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। মানুষটাকে যত্নে একটা পান দিয়ে বলে. কই গো কাজের ছোকরাটাকে বল না খদ্দের ডাকতে। ডিবে থেকে দোক্তাপান একটা নিয়ে মহানন্দ হাঁকে, এ বঙ্কিমো—আরে খরিদ্দার ডাকিব নি---?

বঙ্কিম গন্ধেশ্বরী ভোজনালয় থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়ায়। পথচলতি মানুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেঁচায়, আসুন বাবু—আসুন গরম ডাল তরকারি মাছ ভাত--। খাওয়া, বিশ্রামের সুব্যবস্থা আছে--আসুন—।

সদয় মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ের সাইন বোর্ডটা দেখে, সামনে মা কালীর মন্দির উদ্দেশে জোড়হস্তে প্রণতি জানায়। তারপর শুরু করে, আসুন বাবু

আসুন—টাটকা ঝোল ভাত—

সদয় মুখুজ্জের গলা পেঁছয় বঙ্কিমের কানে। বঙ্কিমের হাঁক ডাক পেঁছয় সদয়ের কানে। ছোকরা বঙ্কিমের অঙ্গভঙ্গিতে পথচলতি দু-একজন দাঁড়ায়। বঙ্কিম হাত দিয়ে গন্ধেশ্বরী ভোজনালয়ের ভেতরটা দেখায়। সদয়ের বুকটায় ব্যথা লাগে। মুখটা অনুজ্জ্বল। তবুও গলায় জোর এনে সদয় চেঁচায়—, আসুন বাবুরা আসুন। সৎ ব্রাহ্মণের হিন্দু হোটেল—

এখনও স্কুল যেতে দেরি। গুড়ে ভুঁড়ে বাপের এমন নতুন বাক্য যোজনায় খানিক অবাক! কিন্তু বাপের চোখ মুখে কেমন গ্লানি। গুড়ে হঠাৎ চেঁচায়, আসুন বাবু আসুন—

সঙ্গে দোহারকি দেয় ভৈরব, একদম টাটকা মাছ ভাত—আসুন বাবুরা—

সকাল সাড়ে নটার নিত্য পথিক বুড়ো লোকটা থমকে দাঁড়ায়। সাদা ফতুয়া পরনে সাদা খাটো ধুতি। হাতে পায়ে তেল চকচকে মসৃণ চামড়া। বগলে ছাতা। ডান হাতে সাদা ক্যাম্বিস কাপড়ের ব্যাগ। পাশে তাকিয়ে লোকটা ফিরে আসে সদয় মুখুজ্জের কাছে। সদয়কুমার একটু বিগলিত হয়ে বলে, আসুন গো পোস্টোমাস্টার বাবু—

ব্যাগহাতে ছাতা বগলে পোস্টমাস্টার বলে, বেশ। খুব ভালো—তিন বাপ বেটায় লেগেছ—

আচমকা বঙ্কিম গলা ছাড়িয়ে ডাকে—, আসুন সুব্যবস্থা আছে এখানে—।

মানুষ টানা না, খদ্দের টানা? নাকি বাজারে পাল্লা দেওয়া, ঠিক বোঝে না গৌরব ভৈরব। তারাও গলা চিরে ডাকে—, আসুন বাবুরা টাটকা ঝোল ভাত—!

দুই সন্তানকে সঙ্গী পায় সদয়কুমার। মরীয়া হয়ে ডাকে, আসুন বাবুরা আসুন। টাটকা ঝোল ভাত—

আঠাশ

দু-পাল্লা কাঠের দরজাটা খুলে দিতেই এক ঝলক হাওয়া।

বৈশাখের রোদ্দুরে টিনের ছাউনিতে। বাঁধানো শানের ঘাট ছুঁয়ে বড় পুকুরের জল। দু-চারখানা লোহার খুঁটি এখনও পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ওপার দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। স্টেশনে বগি দাঁড়িয়ে থাকে। কয়লার ইঞ্জিন কালো বয়লার টেনে এগিয়ে যায় ওই লাইনে। শেড ঘরে কয়লা নেয়। কখানা লোহার বড় খুঁটির রেল পোলের উপর তিনখানা ট্যাঙ্ক বসানো। ইঞ্জিন পেট ভরে জল নেয়। কয়লা নেয়। তারপর গোল করে বালি সিমেন্ট বাঁধানো কুয়ো। কুয়োর মাঝখানে লোহালক্কড় রেলিং দিয়ে সাঁকো। লোকো টার্নার। যম-মুখ-চেহারার কুচকুচে কালো ইঞ্জিনের আস্ত দেহটা ঘুরিয়ে দেয় রেল কোম্পানির লোকজন। ঢলকা বেগুনি রঙের ডাঙরি জামা-প্যান্ট গায়ে ড্রাইভার ঝিক ঝিক শব্দে ইঞ্জিন নিয়ে আবার স্টেশনের পথে। ভয়ঙ্কর কু শব্দে সিটি

দিয়ে রেললাইন ঝাঁকিয়ে ইঞ্জিনটা যায়।

ফাঁকা দুপুর বিদীর্ণ। বড় পাঁচ আইন পুকুরের জল শত ভাঁজে কেঁপে ওঠে। গুমোট হাওয়া খানিক ভিজে যায়। সেই হাওয়া ইটের আধলা খোয়া পিটোনো সরু রাস্তা বেয়ে পিয়ারির দরজায়। ফরসা গা গতরে ভরাট পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের পিয়ারি। লম্বাটে ভারি মুখ। কুচকুচে কালো চুল কোমর ছাপিয়ে গা সিরসিরিয়ে দেয় এই গরমে। তাই বিরক্ত হয়ে ক'পাকে বেড় মেরে মাথায় স্তূপ। গা গলার ফরসা চামড়া ঘাড়ের ওল্টানো চুলের অবসরে একটু হাওয়া পায়। পাঁচ আইন পুকুরসিক্ত হাওয়া।

খোয়া পিটোনো রাস্তাটার দু-লাইন জুড়ে গায়ে গায়ে যে কতগুলো ঘর। খড় টালি টিন সাজিয়ে রোদ আটকায়। বৃষ্টি সামলায়। নীচে সংসার। বসবাস। ঘরে ঘরে মেয়েগুলোর সস্তা তক্তাপোশ। দেওয়াল আয়না। দাওয়া মেঝে নিকিয়ে তকতকে। দাওয়ার এক কোণে মাটি খুঁড়ে ছোট্ট তিন ঝিঁকের উনুন। এই দুপুরে পোড়া উনুনও ঠাণ্ডা হতে সময় নেয়। সবাই খুপরি ঘরে আই-ঢাই।

পিয়ারি ফাটা সিমেন্টের মেঝেতে জল ঢালে। বেশ সপসপে। শুধু কোমরে শায়াটুকু নিয়ে মেঝেয় গড়ায়। ফরসা চামড়া—নারী অঙ্গ খানিক শীতল। এমন গরমে তো বিহারের রুক্ষ পাথুরে মাটিতে লু বইত। নাক জ্বালা করত ···! হরি সিংয়ের গলায় মালা দিয়ে বঙ্গালে এল। পায়ে রুপোর মল। ফরসা মনিবন্ধে রুপোর বালা। ব্যারাকপুর বজবজ থানায় ক'বছর ঝমঝম কাটিয়ে তো ফলতার বড় গাঙ পাড়। কত বড় গাঙ। কত জল যে··· ! পিয়ারি সপসপে ভিজে মেঝেয় উপুড় হয়ে শোয়। পুরনো সিমেন্টের মেঝে নিত্য মোছামুছি হলেও কালো আভা। ফরসা পিয়ারি উদোম গা পিঠে শুয়ে। গায়ে গাঙ পাড়ে ভোরের হিমেল পরশ পায় মেঝের শীতলতায়। একেবারে গাঙ পাড়ের বাঁধানো পাড় ঘেঁষে থানা।

ইট বালি সিমেন্টে মোটা মোটা দেওয়াল ঘিরে টালি ছাউনি। বড় কাঠের ফ্রেম। যেন এই মাত্র জঙ্গল থেকে আস্ত শালের গুঁড়ি বিছিয়ে কাঠামোয় ঘন আলকাতরা মারা। এর মধ্যে অফিস ঘর। হাজত। পিছনে পুরনো আমলের বড় বড় গাছ। ডালপালা ছড়িয়ে ঝাঁকড়া। থানার বড় দারোগা হরিশ সিংকে ডেকে বলে, কোন কনস্টেবলের সন্ধ্যায় ডিউটি নেই— ? খোঁজ নাও—

হরিশ ব্যারাক ঘরে এসে বলে, জী। হামার তো মর্নিং হয়ে গেছে। অখন অফ আছি—

—এই মেসেজ নিয়ে এক্ষুনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বারকে ডেকে আন।

হরিশ সিং ভীষণ সংকটে। ভাড়া ঘরে বউ একলা। ফিরতে রাত। আবার বড়বাবুর খানা তৈরি করে থানায় গুছিয়ে দিয়ে আসা ···। বেশ দ্বিধায় পড়ে বাছতে থাকে কোনটা দিয়ে শুরু করবে কনস্টেবল হরিশ সিং। ফট করে বলে, সাহাব—হামি যদি যাবে—তো আপনার রাতের নাস্তা উস্তা কে পৌঁছিয়ে দিবে ? বড় দারোগা খাঁন সাহেব উপলব্ধি করেই আশ্বাস দিল, এ তো এস. পির

অর্ডার। আমার ক্ষমতা নেই হরিশজী—। ঠিক হ্যায় তোমার বিবিকে বল, আমি চাপাটি সব্জি তোমার ঘরমে খেয়ে নেব—

—সার ! সাহাব···আপনি হামারা ডেরা মে যাবেন !

খানিক মুগ্ধ বিস্ময়ে থ ! তার বড়বাবু ! মাইনে দেয়, ডিউটি অ্যালট করে। সেই অফিসার ! পরে সঙ্কোচ জানিয়ে হরিশ বলেছিল, বাবু—ও যে খুপড়ি আছে। মিট্টিকা ঘর। চেয়ার ভি নাই টেবিল ভি নাই—

—বসবার আসন আছে ? ওতেই হবে। যাও। মেম্বার সাহেবকে ধরে আনবে। কাল ভোরে— সুবে মে ওই মেম্বার সাহাব আমার সঙ্গে লঞ্চে কলকাতা যাবে—

কাজটা যে গুরুত্বপূর্ণ কনস্টেবল হরিশ সিং সমঝাতে পারল। কিন্তু··· !

বউকে বৃত্তান্ত বলে কাঁধে বন্দুক হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ নিয়ে হাঁটে। এখানে কোনো পাহাড় টিলা নেই। শুধু ধানের মাঠ। কুয়া নেই। লোকের বাড়ির উঠোনে দড়িতে বোনা খাটিয়া নেই। গেঁহুকা খেতি নেই ! শুধু ভাত মাছের দেশ। কোনো ভৈসা নেই টাট্টু নেই। দেশ হলেও আপন নয়। আপনজন তো ছাপড়া মজফফরপুর। এ তো কলকাতার ছোঁয়া পেয়ে নোনা বঙ্গভূমি মুখি দেশ··· !

প্রথম সন্ধ্যায় রসুইখানার কাজ শেষ। জলের ঝাপটায় ঘামে নোংরা মুখ চোখ ধোয় হরিশের বউ। হাত আয়না ধরে চোখ মুখ মোছে। চিরুনি টেনে চুলগুলো বাগে আনে। সিঁদুর টিপ পরে। ফরসা কপালে সকালের সূর্যের মতো ঝলমলে লাগে।

গামছায় ঘষে ঘষে হাতে রুপোর বালা চকচকে। পায়ের মল সামান্য মুছতেই হ্যারিকেনের আলোয় চমকায়। কাপড় বদলে কাচা কাপড় পরে। থানার বড়বাবু খেতে আসবে তার অধস্তন কর্মীর বাড়ি। বড় ধরনের মেহমানকে যে কেমন করে আতিথেয়তা জানানো যায় ! আসন বিছিয়ে জলের গেলাস ঢাকে। ভাবে, এত বড় দারোগা বাবুকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তো স্বামীর উপর কৃপা দৃষ্টি পড়বে।

কানে মস মস জুতোর শব্দ। ঘাস থেঁতলে কাহিল। দু-একটা শামুক ব্যাঙও মুচড়ে মাটিতে মিশে যায়।

বাড়িটার সামনে গিয়ে হরিশ বলে, নিশিকান্ত তুং মশাই আছেন ?

ডাইনে পুকুর। চওড়া পাড়টাই বাস্তুতে ঢোকার পথ। সামনে বড় উঠোনে ধানের গাদি। ওপাশে তুলসী মঞ্চ। খোপের মধ্যে সন্ধ্যা প্রদীপ তখনও জ্বলছে।

বাড়ির মেয়েরা পুলিশ দেখে অবাক নয়। অবাক এত রাতে কেন ! তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ গৃহকর্তা নিশিকান্তবাবুকে বলে, যাও আবার কী কাণ্ড বেধেছে।

থালার রুটি প্রায় শেষ। দু-খানা গরম রুটি আর সব্জি নিয়ে হরিশের বউ বলে, বাবুজী—একটু লিন ?

—না, বলে নিষেধের মুদ্রায় প্রতিরোধ করতে গিয়ে থমকায় খান সাহেব।

বউটার নাকে নোলক। লালচে পাথর সেটে হ্যারিকেনের আলোয় ভীষণ দীপ্তি। চওড়া কপাল মুখ সিঁদুর ফুটে লাল। বড় দারোগার বাঁ-হাত তখন বউটার রুপোর বালার ধাতবে ঠেকে। দারোগা খান সাহেব বলে, রান্না করে আমার জন্যে খানা গড়ে দিতে তোমার বড় তকলিফ হয় তো?

—কভি নেহি, একেবারে উড়িয়ে দিতে চায় কনস্টেবলের বউ।

অনেক ক্ষমতাবান দারোগা। ইচ্ছে করলেই বন্দুক দিয়ে মারতে পারে। হ্যান্ডকাপ পরিয়ে হাজত দিতে পারে। তার হাতের নিষেধ যে কত পলকা সেটা নারী চোখে বুঝে নেয় হরিশ সিংয়ের বউ। বলে, এ দুঠো লিজিয়ে সাহাব—

চুপ করে সয়ে নেয় খান সাহেব। নিজের বিবি বাচ্চা তো মুর্শিদাবাদে। এখান থেকে কতদূর যে! মাঝরাতে কোয়ার্টার ছেড়ে গাঙ পাড়ে দাঁড়ালে, দেশবাড়ির গঙ্গার স্রোত এ নোনা গাঙে টের পায় খান সাহেব। বিবির গায়ের গন্ধ ভেসে আসে। শাড়ি বোরখার খস খস শব্দ ফলতার গাঙের ঢেউ পরতে ভেঙে ভেঙে বাজে। মন খারাপ হয়ে যায়। গাঙপাড়ে একলা ভারি মনের মুখচ্ছবি হরিশের বউয়ের চোখে আঁচড়ায়। হঠাৎ বলে, বাবুজী মেমসাহেবকে আনা যায় না?

বড় দারোগা মুখ তুলে তাকায়, কেন? তাহলে রান্নার লোক হয়ে যায়, না?

—অহি বাতি নাহি বাবুজী, বলে লজ্জায় মল ঝমঝমিয়ে ভেতরে ঢোকে। পরক্ষণেই সমস্ত নারী অহং ঘুচিয়ে আঁচল জড়িয়ে দেবতার কাছে ত্রুটি স্বীকারের ভঙ্গিতে মাথা নত করে মাটিতে. মাপ কিজিয়ে সাহাব।

নারী অবনত হলে তো পুরুষের মন ভাল হয়। খান সাহেব বলে, তোমার কিচ্ছু গলদ হয়নি।

মুখ তোলে বউটা। শাড়ির ঝলক মুচকে গেছে।

দারোগা বলে, তোমার এখানে খেয়ে গেলেও তো আর রাতে খাবার পাঠাতে হয় না! তোমার কষ্ট কমে। খেয়েই যাবো— ?

—সে ভি আপনার কিরপা।

দারোগা আগ্রহে চুপচাপ। তখন হরিশের বউ হ্যারিকেনের বাতি জোর দিয়ে বলে, যতক্ষণ ভি না আসবেন হ্যাম ঠিক জেগে থাকবো—

শেষ কথাটায় দারোগার বুকে উসকানো পলতের আগুন লাগে। তাপে ভেতর পোড়ে। একজন দায়িত্বশীল পদের মানুষ। সুতরাং টর্চ জেবলে ঘরের বাইরে নামে। থানা এরিয়ার প্রান্তে এই ভাড়া বাড়ি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু-একখানা দোকান। তিন ঘর মানুষের বসবাস। দূরতম মফস্বলের রাত্রি। দোকানপাট সন্ধে মুখে নিভে যায়। শুধু থানা ঘরে বড় লণ্ঠন জবলে। থানার বাগানে কুপকুপে আঁধার। তারপর তো গাঙ। জলের সঙ্গে আঁধার মিশে কলকল বয়ে যায় কত ভূগোল কেটে···কত জেলার মাটি ধুয়ে।

দাওয়ায় বসানো হ্যারিকেন। অতিথি বিদায়ের প্রথায় এক পা এগিয়েও থমকে যায় হরিশের বউ। আত্মীয়জনের মতো অতি সরল সম্পর্ক তো নয়। তাই ঠায় দাঁড়িয়ে জুতোর শব্দ শোনে। ঘাস বন পাড়িয়ে গাম বুট হাঁটে।

বউটা আলোর দ্যুতিতে দৃশ্যমান। দারোগার টর্চ নেভে। জুতোর শব্দ মাটির মতো থির। বেশ কয়েক মুহূর্ত পৃথিবী নড়ে না। গাঙের স্রোত বহে না। অন্ধকার চিরে দারোগার দৃষ্টি বউটার বুকে গাঁথে। গাঁথে বলেই যাতনা। শরীর কাঁপে। পা নড়তে চায়। মন ছুটে যায়। অতি সাবধানে ঘাস বনে পা ফেলে। কচি ঘাস পা আগলে ধরে মলের বাজনা আটকায়। অন্ধকারে দেহটা দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি হতে বাতাসে নিশ্বাসের গন্ধ। ঘাসের গোড়া ভিজিয়ে চাপা ঝিনিক বাজনা। গায়ের কাছে এসে বউটা বলে, সাহেব—

দারোগা দু-বাহুতে আঁকড়ে বলে, কি···।

বউটার কথা শুকোয়।

অন্ধকারে পৃথিবী প্রকৃতি হয়ে ওঠে। দারোগা খোলস হারিয়ে পুরুষ। বউটা আবরণ খসিয়ে নারী। বউটা নিজের দেহ, রূপে আত্মবিশ্বাসী হয়।

এবার পাশ ফেরে পিয়ারী। অনেকক্ষণ তো উপুড় হয়ে।

লোকজন সাক্ষাৎ করতে আসে দারোগার সঙ্গে। আসামির পক্ষ তদ্বিরে আসে। পুকুরের বড় মাছ ঘরের মোরগ ভেট দেয়। সব চলে যায় হরিশ সিংয়ের ডেরায়। বউটা জমিয়ে রান্না করে। সুখে খাওয়া দাওয়া হয়। দেহে চিকন ফেরে। রূপ ফেটে পড়ে। দেশের পাহাড়টার পাথরের মতো দুমড়ে শুকোয় হরিশ। এক বিকেলে দরখাস্ত নিয়ে বড় দারোগার টেবিলে রাখে। বলে, সার এটা পাঠিয়ে দিবেন?

এক নজরে দরখাস্তটা পড়ে দারোগা বলে, তোমার বদলির দরখাস্ত ফরওয়ার্ড করি কী করে? এখন যে থানায় ফোর্স কম—

হরিশের মন খারাপ। গাঙ পাড়ে বসে হাওয়া খায়। ঢেউ দেখে।

•

সে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পব চুকেছে। অতিথিকে এক ঝলক আদর পর্বও সমাপ্ত। অতিথি কোয়ার্টারে ফিরে গেছে। তখনও হরিশ ঘরে ঢোকেনি। গাঙ পাড়ে বসে হাওয়া খায়। থানা ঘরে লণ্ঠন পোড়ে। হরিশ সিং গাঙের জল দেখে ভাবে, এই দরিয়াতে যদি ভাসি···ভাসতে ভাসতে কি ফিরে যেতে পারব আমার বিহারের মণিহারি ঘাট···মুঙ্গের···পাটনা···দানাপুর···ছাপরা···বারানসী··· এলাহাবাদ ···। আর ভাবতে পারে না হরিশ কিন্তু বুকের ভিতর প্রবল প্রবাহ নিজের দেশের মাটি ঠাঁইয়ের জন্যে। হঠাৎ মন মুষড়ে নদীটাকে বলে, এ গঙ্গা মাইয়া তুই আমাকে বদলি করে দেনা মাইয়া···।

যদিও রাত, ছট পুজোর দিন এমনি করে ছাপড়ার মাঠ পার হয়ে তো গঙ্গার কাছে দাঁড়িয়ে সূর্যকে শত প্রণামের মধ্যে হাজার প্রার্থনা জানিয়েছে সেই বচপন বেলা থেকে···।

বউটা খুঁজে পেয়ে বলে, ঘর মে চল—

—নেহি, রেণ্ডি কাঁহেকো—

—আর তুম? ভেড়ুয়াভি আছ—

—কিঁউ। প্রচণ্ড বিস্ময়ে তাকায় হরিশ সিং বউয়ের দিকে। অন্ধকারে গাঙ

দেখতে পায়, নিজের বউয়ের মুখ পরিষ্কার বুঝতে পারে না। খানিক বাক্য-হীনতায় নদীটা ঢেউ ভেঙে বয়ে যায়।

—বাবুলোককে ঘর মে ডেকে হররোজ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে?

হরিশ সিং গুলিয়ে ফেলে। সে নিজে থেকে ব্যবস্থা করেছে—না, ব্যবস্থাটা ঘটে গেছে। তবে আপন অন্তরে এটুকু সাব্যস্ত করে যে একটা গলতি হয়ে গেছে। অমন সুন্দরী বউটা হাত ধরে টানে। হরিশ দেশ ছাড়া: গাঁও…গাঁও কি স্বজন হারা। তাই এত দূর দেশে…দেশওয়ালি আওরত…নিজের বউয়ের হাতে হাত রেখে বাগানের অন্ধকার কেটে ডেরায় ফেরে। ঘাস গাছ পালা রাতের তারা চুপচাপ দেখে, বউটা কত মায়াময়ী!

ডাক ফাইলে অনেক চিঠিপত্তর। প্রতিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে বড় দারোগা। একটা চিঠি হাতে নিয়ে হাঁকে খান সাহেব, সেণ্ট্রি?

কাঁধের বন্দুক নামিয়ে স্যালুট জানায় টহলরত পুলিশটি, সার—

—মেজবাবুকে ডাক তো।

পরের চিঠিটা খুলে খানিক পড়ে খান সাহেব। মনটা আঁকপাক করে। পরক্ষণে ভাবে, যাক। অনেক দিন হয়ে গেল। বড্ড কানাঘুষো হচ্ছে। অতএব মনস্থির করেই হাঁকডাকে থানা ভরিয়ে দেয়, হরিশ সিং কো বোলাও। নিজের মনেই বিড়বিড়োয়, হটে যা। সাব ডিভিসনে পোস্টিং পাচ্ছিস—সেখেনে বউ সামলাতে পারবি তো…!

ভাড়া ঘরের বিছানা খাটিয়া, থালা বাসন বালতি-উনুন জলের কলসি সব বোটে তুলে হরিশ সিং থানায় হাত জোড় করে বলে, সাহাব আমি যাচ্ছি। হামার কুছ অন্যায়…ভুল থাকলে মাফ করবেন।

বোটের উপর দাঁড়িয়ে বউটা। মাথায় ঘোমটা। নাকে নোলক, পায়ে মল। হাওয়ায় কাপড় গা সাপটে কোমর বুকের ভাঁজে আটকে। কেউ আসে না বিদায় জানাতে। চুপ করে থানা ঘর দেখে বউ। টালির চালে রোদ। রোদে থানার আম বকুলের সবুজ পাতা গাঢ় হয়। গাঢ় হয় বুকের মধ্যে টুকরো টুকরো স্মৃতি।

হরিশকে এগিয়ে দেয় তার এক সহ পুলিশ কর্মী। বলে, হরিশ সাবধানে যাবি—বউদি সাবধানে যাবে—

স্বামীর সহকর্মী। ছোট ভাইয়ের মতো। এখানে থেকে সম্পর্কটার ভাষা শিখে ফেলেছে। তাই দুম করে বলে, ঠাকুরপো—। তারপর যে কী বলবে বাক্য পায় না। বরং এখানে যার কাছে নিজেকে নগ্ন করেছে…অনেক মুহূর্তে কামনা ছাপিয়ে যে ভালবাসা জানিয়ে দীন হয়ে গেছে সেই বাবুটা…দারোগা সাহেবটার বুকে কি একবারও ব্যথা জাগে না! নিতান্ত উঁচুতলার বড় মানুষ! তাই নিজের এমন হারানো ভূমিতে ঠাঁই পেতে হরিশের সহকর্মীকে আর একবার বলে, ঠাকুরপো হাম যাঁতি হো—

নতুন থানার ব্যারাকটা সিমেন্ট বাঁধানো উঁচু দাওয়ার উপর। ক-খানা মোটা

পিলারের মাথায় খিলান কাটা ছাদ। পলেস্তারাহীন ইটের গায়ে লাল রঙ মারা। সামনে রান্নাঘর। আরও ওপাশে পাকা দেওয়ালের মাথায় করোগেট টিন চাপিয়ে খাটা পায়খানা।

স্বামী স্ত্রীর হাতে পোঁটলা পুঁটলি। গোটা সংসার। পুলিশদের রাঁধুনি বুড়ি মাসি হুটপাট করে কড়া চাপিয়ে বাইরে আসে। থানা ব্যারাকে কে, কোন কুটুম্ব কার এল ?

উল্টো হাওয়ায় পুকুরের জল ছুঁয়ে বাঁকা তাল গাছের পাতা খড় খড় নড়ে। কাক উড়ে পালায়। পুকুর ডিঙিয়ে ওপারে থানার টালি মটকায় বসে। বড় নিম গাছটার মগডালে বাঁধা অয়ারলেসের খুঁটি বেয়ে সরু তার ক-গাছি। তারের গায়ে রোদ গড়ায়।

থানায় জয়েন করে এসে হরিশ সিং আবার ব্যারাকের দাওয়ায়।

একটা লোহার খাটিয়া বারান্দায়। পাতিলেবুর আচার শিশিতে রোদ পায়।

টাঙানো দড়িতে লুঙি গামছা সাদা ল্যাঙট শুকোয়। ভেতরে গামছা পরে ঘুমোচ্ছে এক কনস্টেবল। জানালা গলে হাওয়া তার উঁচু ভুঁড়ি বুকের লোমে। কথাবার্তায় ঘুম ভাঙে। চেঁচায়, কে ? কোন ?

—ফোর্স।

আলগা ছালগা গামছায় বিরাট বপু আগলানো দায়। পায়ের চাপে মেঝের ধপ্ ধপ্ আওয়াজ। সঙ্গে আওরত দেখে সঙ্কোচে ঘরে ঢোকে। গামছাটা বাগে এনে বাইরে দাঁড়ায়, ফলতা ?

—জী। হরিশ উত্তর দেয়।

—মুলুক ?

—ছাপড়া।

—আরে হামতো পাটনা।

—নমস্তে। হরিশ সিং দেশের লোক পায়। ফরসা মুখ নাকে নোলক, কপালে সিঁদুর বউটার ঘোমটা বেয়ে খুশি বেরোয়। হাত নাড়ে—রুপোর বালা বাজে। পা নড়ে—মল ঝমঝমায়।

পাটনাবাসী মানুষটা দেশের বাইরে দেশের গন্ধ পায়। গলার দমক নত হয়। বিছানা তলার চটটা এনে বলে, বৈঠো। আরাম সে বৈঠো—

হরিশ সিং বলে, একটা কুঠি উঠি ভাড়ায় মিলবে না ?

রাঁধুনি বুড়ি আশ্বাস দেয়, হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওই তো বোস পাড়ায় ওরা ভাড়া দেয়। কত পুলিশ থেকে গেল—

থানার পিলার ঘেঁষে বাটামে ঝোলানো ধাতব পেটাই ঘণ্টাটার পাশে কাঠের হাতুড়ি গোঁজা। বন্দুক কাঁধে পুলিশ চারদিকের বারান্দা ঘুরে দেওয়ালে গোল ঘড়িটার দিকে তাকায়। দুটো কাঁটা গায়ে গায়ে এক হয়ে একটি রেখা। সেন্ট্রিটা কাঁধের বন্দুক নীচে নামায়। নলটা বাঁ-হাতে ধরে ডান হাতে হাতুড়ি। কাঠের হাতুড়ি ধাতব ঘণ্টায় প্রথম ঘা দেয়। ঢং আওয়াজ। আওয়াজটা কাঁপে। আবার মারে। ঢং···।

বোসেদের পাড়ায় নতুন ভাড়াটে। থানার ঘণ্টা পাড়ার পুকুর কাঁপিয়ে কানে আসে। হরিশের বউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে শোনে। চাউল সব্জি রেঁধে তো সব ঢাকা। তাড়াতাড়ি জুতো পরে কোমরের চওড়া বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বলে গেল, আসামী ক-জনকে কোর্টের হাকিমের সামনে হাজির করে ফিরবো—থানা চত্বর ঝাঁকিয়ে তৃতীয় আওয়াজ বউটার কানে। বুকের ভেতর গুমোট ধাক্কা। বেলা দু-ফার। খাবে কখন লোকটা!

এক সন্ধ্যায় হরিশকে ডেকে পাঠায় ছোটবাবু। হরিশ হাজির হলে বলে, তোমাকে এস. ডি. পিওর বাংলোয় নাইট করতে হবে—

হরিশ অনুরোধ জানায়, সাহাব—হামার আওরত একলা থাকবে যে।

—ঠিক আছে আমি ফোর্স পাঠিয়ে তোমার স্ত্রীর খোঁজ নোবো। কাজে যাও সাহেব রাগ করবে—।

মধ্যবয়েসী ছোটবাবু মানুষটির কথায় হরিশ ভরসা পায়। ডিউটি শেষে নিজের কোয়ার্টারে ফেরার মুখে সেন্ট্রিকে বলে, কাউকে পাঠিয়ে হরিশের বাড়ি একবার খোঁজ নিতে বলো তো—

কোয়ার্টারে বউ ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেতে বসে ছোটবাবু। কালোর উপর গোলমুখ। সারাদিনের পোশাক খুলতেই ছেলেমেয়েদের বাবা। স্ত্রীর স্বামী। কোমরে পিস্তল হাতে রুল বাড়ির কোনো অনুষঙ্গ নেই।

হরিশ বউকে নিয়ে আটা ছোলার ডাল ছাতু কিনতে যায় মুদি দোকানে। দোকানদার চমকে ভাবে, এই পুলিশের অমন রূপসী বউ!

এস. ডি. পি'ওর অর্ডারে পর পর সাতটা নাইট বাংলো টহল। পোশাক জুতো পরে মেজবাবুর সামনে দাঁড়ায়, সার। আমার আর্মস—?

খাতা পত্তরে নম্বর টুকে বন্দুক দেয় মেজবাবু। তবুও হরিশ যায় না। মেজবাবু বলে, যাও। সাহেব খুব কড়া লোক। রিলিভার যদি রিপোর্ট করে তুমি হাজির হওনি—তোমার চাকরি থাকবে—?

—সার আমার ঘরে যে আওরত?

—ঠিক আছে—আমি লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছি। যাও—

কাঁটা তার ঘিরে বড় প্রান্তর। মাঝখানে দেড়তলা বিল্ডিং। সামনে খেলার মাঠ। হু হু হাওয়া। রাতের আকাশে তারা ভর্তি। অযত্নে কটা খেজুর গাছ ডাগর। খেজুর কাঁটায় হাওয়া ছিঁড়ে যায়। ছিঁড়ে যায় বুকের ভিতর! একলা ঘরে একলা বউটা! পুলিশ ছোকরা লুঙির উপর শার্ট চড়িয়ে হাতে বেতের লাঠি। ভাড়া বাড়ির সামনে দাঁড়ায়, বউদি—কোনো অসুবিধে নেই তো?

আধখানা দরজা খুলে ফরসা মুখ। সিঁদুর ঘেঁটে কপাল লাল। মিষ্টি হেসে বলে, ঠাকুরপো আপনারা এত খোঁজ লিচ্ছেন—আমার ভয় কীসের—

হাসির টানে ছোকরা পুলিশ এগোয়। দরজা বন্ধ হয় না। পথ আটকায় না বউটা। আধখোলা দরজায় আধখানা দেহ। গা বুক আধ চেরা। ছোকরা পুলিশ

বলে, এক লোটা পানি মিলবে ?

ফরসা মুখ মিষ্টি হাসি বলে, জরুর। আইয়ে গোছানো বিছানা। পাশে দাঁড়িয়ে ঢক ঢক জল খেয়ে লোটা ফাঁকা।

ছোকরা পুলিশ তাকায়।

বউটা বলে, পিয়াস মিটল ?

—না, বলেই বউটার পিঠে হাত দেয়। কোনো প্রতিরোধ নেই। আবজানো দরজায় ছোট্ট আলো। ঝকমকে দাঁতের হাসিতে নোলক দোল খেয়ে ডাকে। দু-বাহুতে জড়াতে ছোকরার তৃষ্ণা বাড়ে। তৃষ্ণিত বউটা।

খানিক পরে বউটা আশরীর বিবশতায় কানে মুখ দেয়, ঠাকুরপো এবার ব্যারাকে যাও—।

মুদিখানা দোকানে ছোকরা পুলিশের মাসকাবারি বাজার। ডিউটি শেষে আড্ডা। সন্ধের খদ্দেরপাতি কমলে, ছোকরা পুলিশ বন্ধু বৃত্তান্ত বলে। সমবয়সী দোকানদার খুশ মেজাজে প্রস্তাব দেয়, আরে ইয়ার নিয়ে এস। ওর ডাল আটা ঘি ফ্রি—। উৎফুল্ল হয়ে ছোকরা বন্ধুকে দোকানদার স্মরণ করিয়ে দেয়, তোমার কী লাগবে নিয়ে যাও। খাতায় লিখতে হবে না—। মনে ভাবে, একজন পুলিশ হাতে থাকলে কত সুবিধে যে।

খদ্দেরের ফাঁকে ফাঁকে বউটা আসে। ব্যাগ ভর্তি বাজার নিয়ে যায়। তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। দোকানদার মাঝে মাঝে কর্মচারীর হাতে দোকান রেখে ঘণ্টা তিনেক বেরোয়। সারাদিনের হিসেবনিকেশের ক্লান্তি কাটে। একই বেনে মশলার গন্ধ গা থেকে খানিক ধুয়ে যায়। নিজেকে পুরুষ মালুম হয়। অর্থবান পুরুষ।

এক দুপুরে খদ্দেরপাতি ফাঁকা। বউটা ক্যাশ বাক্সের পাশে বসে বলে, আপনার পুলিশের তো বদলির অর্ডার এসেছে—

—আসুক। তুমি কী করবে ? চলে যাবে ?

—তবে···

—তোমার ঘর ভাড়া—ঘি আটা কাপড় চোপড় সব আমি দোবো—

খুশি হয়ে ফাঁকা দোকানে গা ঘেঁষে বসে। বস্তাবস্তা ডাল চিনি টিনের ঘি সাজানো। কর্মচারী দু-জন ভাত ঘুমে ঝিমোয়। বুড়ো কর্মচারী মুখ ঘুরিয়ে লজ্জা ঢাকে।

রিলিজ অর্ডার হাতে নিয়ে ঘরে ফেরে। সকাল দশটার ট্রেন ধরতে পারলে বিকেলে পৌঁছনো যাবে। তাই পুলিশ বলে বউকে, নাও জলদি। বসিরহাট পোস্টিং !

শুধু তাকিয়ে থাকে বউটা। কোনো উৎকণ্ঠা নেই।

পুলিশ বলে, তুমি যাবে না ?

—না।

—কেন !

—বসিরহাটেও তো নাইট ডিউটি ? অতো নাইটের নকরি করলে ঘরে নারী থাকে ? আওরতের মরদ চাই। মরদের আওরত চাই—, কথার ভাঁজে রুপোর বালা নেচে নেচে ওঠে। —তোমার প্যায়ারে নোকরের গন্ধা। আমার প্যায়ারে ফুল ফোটে···ঘরমে সুখের জিনিস ছুটে ছুটে আসে—

হরিশ সিং বড় বড় চোখে তাকায়। হাতে রিলিজ অর্ডার। বলে, তুই আওরত বঁহু নয়···প্যায়ারের আওরত আছিস···। পিয়ারি···।

গোটা সংসার ফেলে লুঙি গামছা বিছানার বাণ্ডিলে। একটা পালা সিলভারের মগটাও কাঁধে। লাল সবুজে ছক কাটা সতরঞ মোড়া বেডিং কাঁধে হরিশ স্টেশনের পথ ধরে।

বউটা তো সেই থেকে পিয়ারি। পিয়ারি বাঁ-হাতের কনুইকে বালিশ করে এতক্ষণ এক কাত মেরে ছিল। কখন যে মেঝের ঠাণ্ডায় গা শুকিয়ে চোখের কোণে জল ! রোগা লম্বাটে কালচে মুখে মোটা গোঁফের মানুষটা এখনও বেডিং বেঁধে হাঁটে···! মনটা ভীষণ মুচড়ে বুকে কষ্ট। ফট করে উঠে বসে। পরনে শায়াটুকু। বুকে ভিজে গামছা ঢেকে ঘর থেকে বেরোয়। ওপাশে প্রতুলের চায়ের দোকান ফাঁকা। বেঞ্চিতে শুয়ে লম্বা। গা ঠেলা দিয়ে বলে, এক পাঁইট মাল দেতো দাদা—

তন্দ্রাচ্ছন্নতায় হাত বাড়ায় প্রতুল, দাম—

—দেনা। আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি— ?

ওপাশে কটা মেয়ে আলগা পিঠে ভিজে চুল শুকোয়। দুটো মেয়ে বগল কাটা ব্লাউজে আঁচলহীন। নির্দ্বিধায় গায়ে হাওয়া লাগায়। গেলাসের কোনো বালাই নেই। বোতলের ছিপি খুলেই পিয়ারি গলায় ঢালে। এক ঢোক গিলতেই ভেতর বুক খানিক জ্বলে। সেই মৌতাতে ঘরে ঢুকে মেঝেয় থপ করে বসে। গায়ের গামছা হটিয়ে একদম নিজের মতো। নিজের মতো চলতে গিয়েই তো পুরনো বুকে আজ হঠাৎ নতুন করে ব্যথা ! বোসবাবুর পাড়ায় সে ভাড়াটে ঘর আজ কই ! বড় পুকুরের বদলে সামনে পাঁচ আইন পুকুর। খোয়া পিটানো রাস্তাটার দু-ধারে তো একই জীবিকার সহ প্রতিদ্বন্দ্বী।

বোতল শেষ হয়। চোখ ঢুলে আসে। ঠাণ্ডা মেঝেয় আলুথালু শোয়। ফরসা গা বুক এলিয়ে পিয়ারি নারী-ভূমি।

গোটা মহকুমা শহরের আকাশে সূর্যের শরীরে ঝিম ধরে। ক্রমে রোদ মুছে যায় পশ্চিম দিগন্তে। পুবের আকাশ গড়িয়ে আঁধার নামে চরাচরে। ইটের দেওয়ালে এক ঢালু টিনের চালায় কালীমন্দির। মন্দিরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায় বাসঘরি মান্নাবাবু। নিচের উঠোনে চারকোনা মৃত্তিকা ভূমি বাদ রেখে সবটুকু তো বালি সিমেন্টে বাঁধানো। উঠোনের প্রান্ত ছুঁয়ে ইটের গাঁথনি করে অশ্বত্থ গাছটা ডালে পাতায় সতেজ। তারই বিশাল কাণ্ডের এক-গা ঘিরে টালির ছাউনির মধ্যে বাসঘরি মান্নাবাবুর বাতাসা চিনির খোয়া সন্দেশ মুড়ি মুড়কির দোকান। ওই উপকরণে তো মন্দিরের নৈবেদ্য। মন্দিরের সন্ধ্যা প্রদীপের আলো

দরজা কেটে বাইরে। হাওয়ায় শুকনো অশ্বত্থ পাতাটা ঝরে পড়ে চারকোনা হাড়ি কাষ্ঠভূমিতে। প্রদীপ ছিটকানো আলো পাতাটার গায়ে। তখন গোটা শহরের দোকানপাটে হ্যাজাক, ডে-লাইট, কারবাইট ডুবিয়ে সরু নলে গ্যাস লাইট, লম্ফ জ্বলে। নিতাই মালি মনেহোরি দোকানে ছোটো হ্যাজাকটা জ্বালিয়ে রডের আঙটায় ঝোলায়। দোকানের ভিতর মাটির পুতুলে সিদ্ধিদাতা গণেশ। গণেশের উদ্দেশে প্রণাম জানায় নিতাই মালি। চোখ খুলতেই গোল চৌকো ছোট হাত আয়নায় আলোর ফিনিক। আয়নায় ফুটে উঠেছে স্নো পাউডার, মাদুলি লাল কালো কার, মাথার কাঁটা, চুল বাঁধা ফিতে, শাঁখা হরেক রঙের কাচের চুড়ি। জরির ফিতের ঝিলমিলি লাগে নেল-প্যালিশ শিশির গায়ে। পাশে তো লিপস্টিক আর গা মাতানো সেন্ট। গোটা দোকানঘর আলোয় ঝকমক করে। নিতাই মালি এবার সম্মুখ ফিরে পাকারাস্তার ওপারে কালী মন্দিরের দিকে জোড় হস্তে প্রণাম জানায়।

গায়ের কাছেই তো মহারানি হিন্দুভোজনালয়। মাত্র একটা ছিটেবেড়ার দেওয়ালের এপার ওপার। উঁচু টিনের ছাউনির বাটাম কাঠ থেকে ঝোলানো রডের 'এস'এ হ্যাজাকটা। সাঁ সাঁ শব্দে আলো ঢেউ খেলে। কাঠের বেঞ্চিতে গৌরব আর ভৈরব বই স্লেট নিয়ে বসে। গৌরব বই পড়ে। ভৈরব স্লেটে জল ন্যাকড়া ঘষে।

ফরসা শরীরে গোলাপি শাড়ির আঁচলটা খানিক আলগা। মন্দিরের সম্মুখ থেকে রাস্তায় ওঠার সিঁড়ির ধাপ। আর দু-ধাপ উঠতেই পাকা রাস্তা। পা টলমলায় দু-একবার। শুধু চিরুনির আঁচড়ে আলগা চুল পিঠে। পিয়ারির ফরসা মুখে ঘামের প্রলেপ। হ্যাজাক আর আয়নাগুলোর ছিটকানো আলোয় পিয়ারির ফরসা মুখ জ্বলে ওঠে। পট করে আলগা চুলগুলো বুকের উপর বিছিয়ে বলে, এই নিতাইদা—কালো ফিতে দেতো। চুল বাঁধব—

দোকানের সামনে ছোট্ট তক্তাপোশে কাচের গেলাস কাচের প্লেট কাপ ডিশ খদ্দেরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সাজানো। পিয়ারির টলমলে হাঁটুর ধাক্কায় তক্তাপোশটা নড়ে ওঠে। কাচের জিনিসগুলো ঠংঠন্ কাঁপে। নিতাই সামলাতে আকুল। দু-হাত বাড়িয়ে দ্রব্যগুলির পতন রুখতে গিয়ে বলে, একটু সাবধানে পিয়ারি ভাই—

গৌরব ভৈরব পড়া ফেলে মালির দোকানে দাঁড়ায়।

পিয়ারি ধাতে ফিরে বলে, এই ছেলেগুলো তোরা লিখাপড়ায় বস—

পিয়ারি ক্রমে ভিতরে ঢুকে যায়। নিতাইয়ের ক্যাশবাক্সের গায়ে পিয়ারির এলোথেলো আঁচল নোতয়ে। নিতাই কুণ্ঠিত গলায় বলে, এ পিয়ারি দিদি অপরিষ্কার দেহে মালক্ষ্মীর ক্যাশবাক্স ছুঁয়োনি—

পিয়ারির মুখে দিশি মদের গন্ধ। আঁচলটা খানিক তুলে নিতাইয়ের দাবনা ধরে বলে, মাইরি ভাই আমি পরিষ্কার। আজ খদ্দের নিতে মন চায় নে—

মন্দিরে আরতি শুরু হতেই ঝাঁজ ঘণ্টার বাজনা। পিতলের ঘণ্টায় কেঠো হাতুড়ির বাড়ি মারে রোগা চেহারার পচা। ঢং ঢং শব্দ। আশপাশ কেঁপে

দোকানদারদের কানে লাগে। তখন খদ্দেরের পছন্দসই মাল দেখাতে দেখাতে কিংবা দামের বাকি খুচরো পয়সা গোনা থামিয়ে একবার দু-হাত জোড়বদ্ধ মাথা নত করে।

গাট্টা গোট্টা মতো ছেলেটা রোজ ঝাঁজ বাজায়। তার হাতে হেঁতালের ছোট্ট বাড়ি। জোরে জোরে ক-ঘা ধাতু বস্তুটির গায়ে পড়তেই ঝম ঝম ঝন্ ঝন্ বাজে। ভৈরব ঘাড় ফিরিয়ে ঝাঁজের বাদ্যিতে ঝাঁকিয়ে ওঠে। সে বলে, দাদা যাবি— ? নিজেই বেঞ্চ থেকে লাফিয়ে ক-পায়ে রাস্তার ওপার। প্রচণ্ড বাজনার মধ্যে জোরে জোরে সিঁড়ি ধাপ কেটে মন্দির উঠোনে। হাড়িকাষ্ঠ ভূমিতে পা পড়ে। একটা ছোট ছেলে বলে, উঁহু। ঠাকুর—পা সরাও। পাপ হবে—

তিড়িং করে পা সরিয়ে পাশে দাঁড়ায় ভৈরব। জোরে জোরে তিনখানা ঘণ্টার পর সব বাজনা স্তব্ধ। গৌরব এসে ভৈরবের কানে কানে বলে, কিরে দিচ্ছে ?

—থাম না। বামুন ঠাকুর লম্বা গড়টা সারুক—

বাসঘরি মান্নাবাবু নিজেও কালীমূর্তির সামনে বার কয়েক মা—মাহ—মা বলে আকুল কণ্ঠ। পরে একটা বড় তামার রেকাবে একগাদা ভিজে ছোলা আর মুঠোখানেক বাতাসা। বাসঘরি একবার ডাক দেয়, এবার মায়ের প্রসাদ নেবেন আসুন—

দু-চারজন ভক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাকি তো সব বাচ্চা কাচ্চা আর বাজনদার দুটো ছেলে। একজন বাচ্চা হাত বাড়ায়। তার দু-মুঠিতে ভিজে ছোলা উপচিয়ে বাতাসাটা পতনগামী। ছোলার মুঠি পেটের কাছে এনে বাতাসা রক্ষে করে।

গৌরব হাত বাড়ায়। তাকে ডিঙিয়ে পিতলের ঘণ্টা বাদক রোগা পচা হাত বাড়ায়। তাকে দু-মুঠো ভর্তি করে ভিজে ছোলা আর দুটো বাতাসা গুঁজে দেয়। এবার গৌরব হাত বাড়াতে এক মুঠো ছোলা আর একটা ভাঙা বাতাসা।

অন্য বাচ্চারাও এক মুঠো করে ছোলা কারও আধখানা বা আস্ত বাতাসা। ভৈরব ছোলা বাতাসা পেয়েই এক খাবলা মুখে পুরে চিবোয়। পরক্ষণে মায়ের কথা মনে হতেই আর চিবোয় না। গৌরব পচার হাতের দিকে তাকিয়ে নিজের ছোলাগুলো চিবোয়। বাতাসাটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে খায়। পচার হাতে তখনও দুটো বাতাসা। ভাবে, ওই পিতলের পেটা ঘণ্টাটা যদি বাজাতে পেতুম…

মন্দিরের সামনে ঢালু বেয়ে ইট বসানো সিঁড়িটা ধাপে ধাপে। গোলাপি শাড়ি কাঁধ থেকে খসে গেছে। পিয়ারি চটি পায়ে খট খট শব্দে খানিক নামে। আর ফরসা নিটোল বাহু নাড়িয়ে বলে, এই সরে যাও। পিয়ারি পাতালে নামছে —নরকে নামছে

গলি পথে অশ্বত্থ গাছের ডালপালা ঝুলে। দমকা হাওয়ায় পাতাগুলো সিরসির বাজনা তোলে। এক পায়ের মলটা ঘরে পড়ে আছে। আর এক পায়ে বাঁধা। সিঁড়ির ধাপে একলা মল পাতার সঙ্গে ঝিনিক বোল তোলে। ঊর্ধ্ব-গমনের একটা ছন্দ আছে। অধঃগমনেরও কম কোথায় !

ভৈরব পিয়ারিকে দেখে। অতবড় মেয়ে টলমল পায়ে হাঁটে কেন ! মন্দির উঠোন থেকে মুখ বাড়ায় বাঁ-দিকের গলিপথে। ক্রমশ ঘন অন্ধকার। দু-চারটে

হ্যারিকেন লম্ফ টিপ টিপ জ্বলে।

মেয়েগুলোর নাকছাবি কপাল ঝুলিয়ে টিকলিগুলো জ্বলে।

গৌরব বলে, কী দেখ্‌তিছিস ? ওটা খারাপ জায়গা—

রাস্তা পার হয়ে হোটেল ঘরে ঢোকে দু-ভাই। ভৈরবের হাতে খানিক ভিজে ছোলা আর বাতাসাটা। শত চেষ্টা করেও আস্ত রাখতে পারেনি। ছোলার জলে রসে বাতাসার খানিক ক্ষয়ে গেছে। সেই শুদ্ধু মাকে বলে, নাও—খাবে ?

—কিরে প্রসাদ ?

মাথা নেড়ে সায় দেয় ভৈরব। জবারানী মুখ বাড়িয়ে গৌরবের হাতের দিকে তাকায়। লজ্জা পেয়ে গৌরব ফাঁকা হাত দেখিয়ে বলে, নেই। কাল আনব—

ভৈরব হাতের ছোলা বাড়িয়ে বলে, নাও না তুমি—

জবারানী পিঠে হাতে বুলিয়ে ভৈরবের মাথায় চুমু খায়, না বাবা তুমি খাও—

রোগা। কোমরটা ঈষৎ ঝুঁকে মুখটা অগ্রিম সম্মুখীন। ঝাঁকড়া চুল উলটিয়ে আঁচড়ানো। হাতে ঝুলোনো হাফ স্যুটকেশ। কালো মাথায় কালো ভ্রুতে গোল গোল চোখ। গোঁফ কামিয়ে পাতলা ঠোঁট ফিনফিনে। ফুল হাতা শার্টের বাঁ-হাতটা গুটোতে গুটোতে বলে, এ হোটেলের মালিক কে ?

জবারানী মুখের আদলটা নিজের চেনা মুখের মহলে খোঁজে।

মানুষটা খানিক আন্দাজ করে কড়া গলায় বলে, কই— ? মালিক কোথায় ?

কথার মধ্যে তড়পানি তবুও কোথায় যে চেনা স্বর ! আবছা মুখ !

মানুষটা স্যুটকেশ মাটিতে রেখে ধমকায়, থানায় ধরে নিয়ে গেলে ভালো—, বলতে বলতে হেসে ফেলে মানুষটা। ছোট ছোট দাঁতগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট। পান বিড়ির কষে লালচে। তখনই জবারানী, ও বকুলভাই—

সদয়কুমার হাতের জল কোমরের গামছায় মুছতে মুছতে সামনে আসে। —দুশ শালা ! এত কথার ফড়েমি করছিলিস— ? আয় আয় বস, বলে বেঞ্চিটা চাপড়ে দেখায়।

গৌরব ভৈরব বই স্লেট সরিয়ে নেয়। বকুল বসে বলে, এ দুটো লেড়কা ?

ছেলে দুটো নতুন কথায় অবাক হয়।

—তুই কোথেকে ? তোর রানিং রুমে চাকরি হয়েছে ? জানতে চাইলো সদয়কুমার।

—দুস্। আর হয় রিফিউজিদের জ্বালায়—

—কেন ?

—রেল কোম্পানি ডাঃ বিধান রায় ওদের নিয়ে হিমসিম। তাদের তাঁবু—তাদের ইঞ্জেকশান ডোল আবার রেলের জায়গা থেকে তাদের হটিয়ে নতুন জায়গায় ব্যবস্থা।

হাঁ-করে শোনে সদয়কুমার। জবারানী। ছেলে দুটো রিফিউজি কথাটার মানে বুঝতে পারে না।

—তোর দাদা অর্জুন রেলের সাহেবদের কাছে রান্না করে। তোর চাকরি তো বাঁধা— ?

—দুস্ । শালারা চাকরিটা আমাকে দেবে, না কুটুম্বরা এসেছে লাখে লাখে তাদের দেবে ?

খালি গায়ে দুটো লটপটে প্যান্ট পরে গুড়ে ভুঁড়ে। মাথার চুলে বিকেল থেকে চিরুনি পড়েনি। পেট দুটো ডাবরা ডাবরা। বকুল হঠাৎ বড়টার হাত ধরে বলে, ওই তোরা তো রিফিউজি ছেলেদের মতো লকপক করছিস। তোদের নাম ? কোন ক্যাম্প ? ওপার বাংলার কোন জেলা ?

ছেলে দুটো বিস্ময়ে বকুলের বাক্য শোনে! তাদের প্রতিদিন শোনা কথায় তেমন তো এ শব্দগুলো আসে না !

সদয়কুমার জবারানীও সব কথার অর্থ উদ্ধার করতে পারে না। এত বড় বড় কথা কানে যেতেই মনোহারি দোকানের নিতাই মালি হাজির। কথার মোড় ঘোরাতে বলে, খুলনা—

—হ। কতদিন আইছস ? বকুল ঠাট্টায় প্রশ্ন করে।

—কহন আইসি মনে নাই। নিতাই মালি বানিয়ে উত্তর দেয়।

—মনে নাই যহন চিরা গুড় খায়েন। একটা অসংলগ্ন কথায় শেষ করতে চায় বকুল। নিতাই মালি ধীরে ধীরে বেঞ্চের কাছে দাঁড়ায়, —অনেক লোক না ?

—লোক বলে লোক। কী সব দিল্লি চুক্তি টুক্তি হল জহরলালের সঙ্গে পাকিস্তানের। তবু ঠেকাতে পেরেছে ? গরিব বড়লোক সব দলে দলে আসছে। যাদবপুর, ঢাকুরিয়ার রেল লাইনের ধারে হোগলা বন কেটে ফাঁকা—

—কেন ! অবাক হয়ে শুধোয় নিতাই মালি।

—ট্রেনে কলকাতা যাওনি ?

বকুলের কথায় নিতাই জানায়, —না, বাসে বড়বাজার যাই মাল গস্তে—

—অ। তাই চোখে পড়ে না—

নিতাই আবার গত কথার খেই ধরে বলে, হোগলা বন কী হয়েছে ?

—দু পাশে জায়গা দখল করে বসতি—কলোনি হচ্ছে। বাচ্চা কাচ্চা বর বউ ধাড়ি বুড়ি নিয়ে এক চালায় এক ছাউনিতে গাদাগাদি। জবর দখল চলছে লোকের জায়গায়, ব্যাঙ্কের জায়গায় গরমেণ্টের জায়গায়—

মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ের সব লোকজন কার্তিক মাসে রামায়ণ কথকতার উপাখ্যানের টানের মতো আগ্রহে শুনছে। তাই বকুল শিয়ালদার হোটেলে কানে আসা গল্পগুলো নিজের মতো করে সাজায়. কমুনিস্ট কংগ্রেস, আর. এস. পি. সকলে লেবে পড়েছে কলোনি গড়তে। এক একটার নাম কী! লক্ষ্মী-নারায়ণ কলোনি, আজাদ গড় কলোনি, বাঘা যতীন, রামগড় কলোনি— !

গুড়ে ভুঁড়ে ওঁত পাতে 'কলোনি' জিনিসটার মানে যে কার কাছে জানা যায়। বকুলের কাছে এগোতেই দেখে, স্যুটকেশ বাজিয়ে গান ধরেছে বকুল—

আমি এক বাস্তুহারা ভাই
আমার ঘর ছিল লাঙ্গল ছিল
ছিল পুষ্করিণী
কপাল দোষে সব হারাইলাম

আর তো কিছু নাই।
আমি বাস্তুহারা ভাই…
ভাই ভগিনী সবই ছিল
দেশ ছেড়ে বিদেশী হল
ঠিক ঠিকানা নাই…

গানটা শেষ হলে বকুল একটা বিড়ি ধরায়। বার কয়েক টান দিয়ে জুতে আসে। আরামে বেঞ্চির উপর দুপা গুটিয়ে বসে। ভৈরব কাছে গিয়ে বলে, রিফিউজি কী গো?

বকুল জোরে বিড়ি টানতে বুকে ধোঁয়া। বার কয়েক কেশে ভাষা খুঁজে উত্তরটা তীক্ষ্ন করে, ওই যারা নিজের দেশ ছেড়ে চলে আসে—

উত্তরটা মনে ধরে না ছেলে দুটোর। তখনও বকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে। সদয়কুমার ছেলে দুটোকে আশ্বস্ত করতে বোঝায়, ওই যেরে—চণ্ডী ডাক্তারের টিনের ডাক্তারখানা—ওপাশে এক ঘর রিফ্যুজি চা দোকান বসিয়েছে—

তাদের শৈশবের অনুসন্ধিৎসায় ফট করে হোটেল ঘরের বাইরে আসে। দোকানপাট কিছু কিছু বন্ধ। রাস্তাঘাট একটু অন্ধকার। জবারানী ছেলে দুটোকে বলে, ও বাপ্ তোরা পরে দেখবিখোন। যাসনি—রাত হয়ে গেছে—

বকুল বড় বড় চুলগুলো আঙুল চালিয়ে ঠিক করে নেয়। চোখ দুটো ঘুরিয়ে গলার স্বর বদলে চেঁচায়, এই পোলারা অহন রাস্তায় যামুনা—

ছেলে দুটো নিষেধের চাপে নয়। নতুন ভাষার সুরে আশ্চর্য হয়। হোটেল ঘরে ফিরে মাকে জড়িয়ে ধরে।

খাকি হাফ প্যান্ট হাফ হাতা শার্ট কোমরে মোটা চামড়ার কালো বেল্ট। পায়ের গাঁট ছাপিয়ে মোটা চামড়ার ভারি বুট। পুলিশটা এসে ডাকে, কই ঠাকুরমশাই—

গৌরব ভৈরব দৌড়ে কাছে যায়। হাত বাড়িয়ে বলে, দাও সিলিপ—

পুলিশটা বলে, তোদের বাবা নিক—। দু-জন আসামী—

স্লিপটা দিয়ে সদয়কুমার জবারানীকে বলে, এটা কাঁটা ফাইলে গেঁথে রাখতো—

বকুল পুলিশ স্লিপ দেখে খানিক বোঝে। হোটেল ঘরটার চারদিক নজর করে বলে, সদয়দা একটু সাজাও গোছাও—

—কীরকম তুই বল না, জবারানী বকুলের পরামর্শ চায়।

বকুল তো বেশ কিছুদিন কলকাতার হোটেলে কাজ করে এল। সুতরাং আর একবার ভেবে চিন্তে বলে, প্রথমে তো দরকার ক-খানা টেবিল চেয়ার। তারপর পর্দা—

টেবিল চেয়ার এই আসবাবগুলোর নাম শুনে সদয়কুমারের বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে! মকবুলের ইসলামিয়া হোটেলের গায়ে ইয়ারনবীর কাঠের দোকানটা ছিল বলে তো এই বেঞ্চটা হয়েছে! সেই দাঙ্গার পর ইয়ারনবী কোথায়! বাকি বকেয়ায় চেয়ার টেবিল বললেই বা কে করে দেবে? বকুলের কথা শুনতে শুনতে

হঠাৎ মনে হল সদয়কুমারের, দাঙ্গা হাঙ্গামায় বেজাতের মানুষ খেদানোয় শেষ শুধু হয় না···একই সঙ্গে পুড়ে যায় মাথার বুদ্ধি চোখের নজর দিয়ে তৈরি হাতের কাজকর্ম···দরকারি জিনিসপত্তর। মন মাথার জ্ঞান শিক্ষাও··· !

নিজের মনের ভাবনা সদয়কুমার নিজের মতো করে মিলিয়ে বলে, হুঁ। তারপর— !

যেহেতু শিয়ালদার হোটেলে মেঝে পাকা সেই অভিজ্ঞতা থেকে মহারানী হিন্দু ভোজনালয়কে সাজাবার জন্য বলে, তলার সব মেঝেটুকু পাকা করে নিলে ভাল দেখায়। ভেতরটা পরিষ্কার লাগবে—চোখে দেখলেই খদ্দের ঢুকবে।

জবারানী অতি দীন কণ্ঠে বলে, গোটাটা পাকা ! অত টাকা···রাজার খরচ পাব কোথায় রে ভাই···

দুজনেই বেশ মর্যাদা দিচ্ছে বকুলের কথায়। তাই আন্তরিক হয়ে ওঠে বকুল। নিজে একবার ভেতরটা ঘুরে-ফিরে দেখে অনুমান করে, সত্যিই তো ইট-বালি-সিমেন্ট মিস্ত্রি-মজুরি ধরলে বেশ বড় ধরনের খরচ। তাই ভেবে বলে, না হয় সামনেটা এখন মাটিই থাক। কিন্তু যেখান থেকে খদ্দের আসন পেতে খায়—সে জায়গাটুকু সিমেন্ট দিয়ে পাকা করে নিতে হবে যে। তবে তাদের খেতে রুচি হবে— ।

দুই স্বামী-স্ত্রী নিজেদের দৃষ্টি চালাচালি করে মত বিনিময়টা সারে। পরমুহূর্তে সদয়কুমার বলে, একেবারে ঠিক কথা। কিন্তু সামর্থ্য কোথায় রে ভাই··· । অন্তত খাবার জায়গাটুকু যদি পাকা করা যায়···

--আর, বলেই বকুল জবারানীর দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গেলে।

জবারানী বুঝতে পেরে বলে, লজ্জা পেলি কেন ? তুই আমাদের চেয়ে অনেক জানিস— । বল না—

—যে হাতে খেতে দেবে সে হাতে এঁটো-কাটা তুলবে—সে হয় না।

জবারানীর নারীজীবনে যেন ঘা মারল বকুল। গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে জবা বলে, ও বকুল ঘর-সংসারে মেয়েরাই তো রাঁধে, ভাত বেড়ে দেয়, এঁটো বাসন-কোসন মাজে ?

—ঘরে কি ছত্রিশ জাতের মানুষ ? বকুল জবর জবাব দিয়েছে। জবারানী চুপ। এতদিন নিজ হাতে রান্না করে, এঁটো বাসন-কোসন ধুয়ে-মেজে তো হোটেলটা চালিয়ে একটা পর্যায়ে আনা ! সেখানে বকুলের এই পরামর্শ মর্মদায়ক হলেও বাস্তব তো বটে ? কে আর এঁটো-ঘাঁটা হাতে পরিপাটি করে সাজানো ভাত-তরকারি মন খুলে খেতে চায় ?

রাত বাড়ে। মেঝের ওপর বিছানা। ছেলে দুটো ঘুমিয়ে কাদা। পাশে সদয়-কুমার। বকুল মনে বড্ড ব্যথা দিয়ে গেছে। এতদিন এই দোকানের সঙ্গে খেটেছি, বামুনবাড়ির মেয়ে হয়ে কত জাতের এঁটো কুড়িয়ে ঝিয়ের কাজ করেছি—, ভাবতে ভাবতে জবারানী পাশের মানুষটাকে ডাকে, —এই—এই যে গো

—উঁ ! কি—

—একটা ঝি রাখলে হয়। আমি বরং রান্নাই করব—

মানুষটা গাল হাঁ করে নাক ডাকায়। সারা দিনের শ্রমে রাত গভীর। দেহে পৃথিবী ভর করে।

ঊনতিরিশ

পাকারাস্তায় মস্ত খিরিশ গাছ। গাছটার বড় ডাল রাস্তা ডিঙিয়ে মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ের টিনের ছাউনি লাগোয়া। সারা রাত ধরে আকাশময় তারারা জ্বলে এখন প্রভাহীন। চাঁদও যে কখন পশ্চিমে হারিয়ে গেছে! পুবের আকাশে পাতলা ফেনের সাদা ছোপ। গাছের ডালটায় পালা খোঁচার বাসা। টিনের ছাউনির প্রায় সম্মুখ ছুঁয়ে শেষ রাতের হাওয়ায় শাখাটা হালকা দোলে। বাসার পাখি কিচিরমিচির ডাকে ভোরকে আমন্ত্রণ জানায়। রাতভর এইটুকু বাসায় ডানা পায়ে খিল। গোটা আকাশ টানে যে!

মহারানী হোটেলঘরটার সামনে নাট-স্ক্রু ছাড়ানো বাতিল করোগেট টিন কাঠের ফ্রেমে দুখানা ঝাঁপ। দুটো ঝাঁপের ফাঁক আর স্ক্রু ছাড়ানো ফুটো গলে লম্বা লম্বা রেখায় ভোর ঢোকে। পাশ ফিরতেই ভৈরবের চোখে সে ভোর। ঘুম ছাড়িয়ে চোখ মেলে। বিছানায় উঠে বসে। সবাই তখনও ঘুমিয়ে। মশারির বাইরে দাঁড়ায়। গৌরব জাগে। ভৈরব ঝাঁপ ঠেলে। গৌরব বলে, ওই—

—যাবি দাদা?

—কোথায়?

—ওই রাস্তায়, বলতে বলতে মোটা তারের মোচড় ছাড়িয়ে ঝাঁপটা ঠেলে। নতুন পাকা রাস্তায় বিস্তীর্ণ সকাল। কোর্টের ওদিক থেকে মনোরম হাওয়া। ডাইনে বাঁয়ে দোকান ঘরগুলোর ঝাঁপ পাল্লা সব বন্ধ। দু-একজন লোক দোকান থেকে বেরিয়ে দাঁত মাজে। জনা দুই উকিলবাবু হাতে বেতের ছড়ি নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে। কালো নিউ কাট জুতোয় ভোর চকচক করে। সদ্য পিচ ঢালাই পাকা রাস্তায় জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ। মানুষ দুটো যতই এগোয় সকালের গাঙ বেয়ে ঠাণ্ডা বাতাস পুবের আকাশে এঁকেবেঁকে কয়েকখানা লালচে আভা।

দুই উকিলবাবু যখন নদীর পাড়ে পৌঁছয়, আকাশ অনেক পরিষ্কার। এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের গাছপালা চোখে ফুটছে। কত বড় জনবসত ঐতিহ্য নিয়ে একটা বড় জেলা। ডাইনে তাকাতেই রূপনারায়ণ হুগলির মেলামেশায় সুবিস্তৃত জলরাশিতে ওপারে ভূখণ্ডের সবুজ আভাস। মধ্যবয়সী উকিল দাশগুপ্তবাবু বলে, চক্রবর্তী ওই—ওই দিকটায় তমলুক বলে মনে হয়। সেই তাম্রলিপ্ত…

—হ্যাঁ ওই বন্দরে তো পালতোলা জাহাজ থেকে ফা-হিয়েন নেমেছিল…, বলে একটু ঠাট্টা আনে—, গুপ্তদা—হিউয়েন সাংয়ের মাথার টুপির ঝুল-বারান্দায় না হয় দোয়াত ঝুলত। খাগের কলম শুকোলেই কালিতে চুবিয়ে নিত। ফা-হিয়েনের কি ফাউন্টেন পেন ছিল?

দাশগুপ্তবাবু হাসে।

চক্রবর্তীর মনে পড়ে, তমলুকের দুটো মক্কেলের তো এ-জেলায় গুড়গুড়ির লাটে একশো বিঘে করে দুটো জোত আছে। তারা মামলার দিন বয়াম ভর্তি খাঁটি ঘি আনে। কতদূরে তমলুক! সেই ঘিয়ের ঘ্রাণ বাতাসে।

দাশগুপ্তর চোখেমুখে তখন ফাঁকা নদীর বুক কেটে পালতোলা জাহাজের বাতাস। কিংবা পঞ্চাশ-ষাট জন মাঝিমাল্লার একসঙ্গে দাঁড় টানার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ। বাণিজ্য-তরীর অভিযান। ডান দিক থেকে দৃষ্টি বাঁ দিকে ফেলে। হাওয়ার পড়নে বাণিজ্য-জাহাজগুলো সাঁই-সাঁই জল কাটে। বাঁদিকের মোহনা-মুখে ধু-ধু বঙ্গোপসাগর। কতশত পেটফোলা পাল যেন চোখ থেকে হারিয়ে যায়! মালয়, সুমাত্রা পার হয়ে বালি-বোর্নিও-যবদ্বীপে ব্যবসা করতে যাচ্ছে…।

এই সকালে খিদিরপুর থেকে জাহাজটা দারুণ বেগে জল কেটে কেটে দূরে …বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে।

দাশগুপ্ত হঠাৎ বলে, চক্রবর্তী তোমার জাহাজ চড়া আছে?

—এখনও হয়নি। তবে স্টিমার—হরমোলার কোম্পানির স্টিমারে বারকয়েক কাকদ্বীপ গেছি। ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়েছিল ভাগচাষ-নিবারক রিপোর্ট নিতে—

—এই পথেই বোধহয় তখনকার পালতোলা জাহাজ বাণিজ্যে যেত সেই শ্যাম-চম্পক দেশে—!

ছোকরা চক্রবর্তী বলে, শ্যাম-চম্পক?

—ওই থাইল্যান্ড চম্পক হল গিয়ে ভিয়েতনাম—

—হো-চি-মিনের দেশ! গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিন।

উকিল দাশগুপ্ত বলে, তাকে আর টিকতে দিচ্ছে তাই, একটু থেমে বিড়বিড়িয়ে কর গোনে, পঁয়তাল্লিশের দোসরা সেপ্টেম্বর গরমেন্ট গড়ল—আর তেইশে সেপ্টেম্বর…, মানে তিন সপ্তার মধ্যে ফরাসিদের আবার বাগানবাড়ির কথা মনে পড়েছে। দখল করতে সায়গনে কামান দাগল—

—তা হোক আট-ন'বছর বেশ লড়ে যাচ্ছে চাচা হো-চি-মিন—

—দোসর ব্রিটিশ কমজোরি হয় তো মার্কিনবাবুরা বন্ধু হতে দু-হাত উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছে—ঠাণ্ডা বাতাসে চক্রবর্তী উকিলের মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা। ফলে বুকের মধ্যে বুকটা বেশ বড় হয়ে যায়। বিঘেখানেক পুকুরের পাশে কাঠা পনেরো ফলপাকুড়ের গাছপালার মধ্যে পাকা দালানে চক্রবর্তীর বসবাস। সেরেস্তা। যত হুড়োনো হুজুতে জড়িয়ে থাকা দেশ-গাঁয়ের সম্পন্ন লোক তার মক্কেল। চামড়ায় বাঁধানো মোটা বোর্ডের ওপর সোনার জলে লেখা আইনের বই থেকে যুক্তিধারা খুঁজে আর্জি সওয়ালে দারুণ প্রতিভা। তারও মনটা কেমন সেঁতিয়ে যায়। বলে, হুম। একটা যুদ্ধ থমকায় তো আর এক যুদ্ধ জন্মায়।

দাশগুপ্ত এককদম এগিয়ে বলে, দেখ চিন সোভিয়েত তো বছর চারেক আগে সমর্থন জানিয়েছে চাচার অস্থায়ী সরকারকে—। আইজেনহাওয়ার কী পথ ধরে—

মোটা মোটা দেওয়াল জাগিয়ে বিরাট ক'খানা খিলান পরিসরে চওড়া

বারান্দা দেখা যায়। মহকুমা শাসকের জমকালো বাংলো। আম দেওদার ঝাউ রাধাচূড়া গাছ, ফুলবাগান নিয়ে বিশাল প্রাঙ্গণ। কাঁটাতার ঘিরে ঘন বেড়া। মোটা থামের গেটের পাশ দিয়ে খোয়া পিচ ঢেলে মসৃণ রাস্তাটা মহকুমার কোর্ট জেলখানার উঠোনে ফুরিয়ে গেছে।

সামান্য গড়ান কাটিয়ে উঠলেই পাকা সড়ক। সড়কে ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবিতে লম্বা মানুষটা। পেছনে ধুতি-হাফশার্টে আধবুড়ো আর্দালি। চতুর চক্রবর্তী মানুষটাকে দেখতে পেয়ে দাশগুপ্তর কথায় আর আকৃষ্ট হয় না। বরং বেলা দশটার এজলাসে ভারিক্কি মুখে বসে থাকা যে মানুষকে বারবার হুজুর, মাই লর্ড, অনারেবল কোর্ট বলতে বাধ্য, তিনিই যখন এত কাছে—প্রভাতটা সুন্দর হয়ে ওঠে। চক্রবর্তী দুপা এগিয়ে যায়, গুডমর্নিং সার—

গতি থমকে মানুষটি ম্যাজিস্টেরিয়াল ভঙ্গিতে মৃদু স্বরে বলেন, মর্নিং। তারপর হাতের ইঙ্গিতে জানায়, ঠিক আছে, চলি—

তখনই দাশগুপ্তর চোখে চোখ পড়ে। দাশগুপ্ত বলে, সুপ্রভাত—।

উত্তর আসে, সুপ্রভাত—

দাশগুপ্ত তার হাকিমের চলে যাওয়া কিংবা মাপা পদক্ষেপে ভ্রমণটা দেখে। চক্রবর্তী হাকিমের আর্দালির সঙ্গে তখনও আকারে, ইঙ্গিতে অনেক কথা চালায়। এজলাসে তো সওয়াল জবাবের আগে অনেক কথা…নানা প্রস্তাব শুরু করতে হয় তার সঙ্গে। তা না হলে চক্রবর্তীবাবুর পক্ষে নামী উকিল হয়ে ওঠার পথে যে অসুবিধে দেখা দেবে। দাশগুপ্তবাবু বুকপকেট থেকে চেনবাঁধা ঘড়িটা বের করে, এবার যে ফিরব—

—আমারও তো তাই। চেম্বারে মক্কেল বসে থাকবে—

•

ভৈরব দাঁড়িয়ে থাকে খড়ের চালাটার সামনে। ইট কাদা দিয়ে চৌকো উনুন। গহ্বরটা খুবই সরু। উনুনে বসানো একটা ছোট্ট তোবড়ানো কেটলি। কাচের ছোট গেলাস খানচারেক। একটা বয়ামে চার-পাঁচখানা সস্তা বিস্কুট।

ভেতরের মেঝেতে বাসি থালাবাসন। ছেঁড়া বিছানা কাঁথা। কালি-পড়া মেটে হাঁড়ি। তার পাশে গাবদা চেহারার বাচ্চা মেয়ে দুটো। পেট বড় বেঁটে বেঁটে তিনটে ছেলে। তার বয়সী একজন রাস্তার ঢালে ছেঁড়া চাটাই পেতে ঘুমিয়ে। জায়গাটায় এখনও রোদ আসেনি। সকালের হাওয়া।

বুড়ো লোকটা বিড়ি খেয়ে বার বার কাশে। ফর্সা গা-চামড়ায় তাবলা মতো বউ। লালপেড়ে ময়লা কাপড় মাথায় ঢেকে বলে, এত কইত্যাসি, বিরির নেশা ছাড়—

বুড়োটা রেগে যায়, ছাড়ছি নাই তো কী? অহন তিন বেলায় তিনডা খাই মাত্র—। দ্যাশে থাকতে দুই বেলায় চার প্যাকেট সিগ্রেট খাইছি—অহন পাই?

—ভাত জুটে না। হিন্দুস্থানে বিড়ির লগে আপসোস। বুক যে ঝাঁঝরা হইছ্যে। ডাক্তার কয়, খেয়াল রাখসো—?

সামান্য যেটুকু বাস্তু পুকুর, চাষের বিঘা দুই জমিন, আত্মজন এলোমেলো

হারিয়ে তো এই দেশে! বুকের যাবতীয় নিরাপত্তা শৈশব যৌবন সব স্মৃতি তো সে-দেশে পড়ে আছে! শুধুমাত্র বুকের খাঁচাটা বয়ে এনেছে এখানে। সুতরাং রক্তমাংস ক্ষীণ এই শরীরাঙ্গটির আছে কী যে রোগ বাসা বাঁধবে! সে তার আধার পাবে শিকড় চালাবার! তাই বুড়োটা বলে, ডাক্তার কিছু বুঝে না—

কেটলি গেলাস ধুতে ধুতে ফর্সা তাবলা বউটা রেগে যায়, পোলাপান গুলানকে জাগাও না।

ভৈরব তখন থেকে দাঁড়িয়ে। সে ধরতে পারে না, এটা দোকান না, বসবাস!

বুড়ো স্বামী মেয়ে দুটোকে ডাকে, ওরে ও বিন্দু—ও মিনতি। সকাল হইস্যে রে। মেয়ে দুটো এক ডাকে জাগে। আধা পেটে ঘুমও আসে না সহজে। কিন্তু জাগা তো যায় দ্রুত? তাই উঠেই বলে, বাবা খাব—

বাপ চমকে তাকায় বউটার দিকে।

বউ বলে, অখন খাওয়নের কিছু নাই—। মায়ের গলায় রুক্ষ স্বর।

মেয়েটা বয়ামের দিকে চেয়ে বলে, বিস্কুট—

বাপ বয়েম খুলে একটা কড়কড়ে লেড়ো দেয়।

মিনতি চোখ রগড়ে বলে, আমার—

বাপ বয়াম থেকে আর একটা লেড়ো মেয়েটাকে দেয়। বিন্দু বাসিমুখে বিস্কুটটা চিবিয়ে আধপেটা খিদের খানিক পূরণ করে। ফুরিয়ে যেতেই হাত বাড়ায়, আর একটা দিবা গো বাবা?

থাকতে পারে না বাবাটা শিশুকন্যার এমন প্রার্থনায়। বয়াম খুলতেই বউটা ঝাঁঝ দেখায়, এ কী পুরুষ মানুষ—! বউয়ের রাগ হড়কে গিয়ে ব্যথা।

মিনতিও হাত বাড়ায়। বাপ মুখ বুজে একটা বিস্কুট বের করে। বয়াম খালি হয়।

বউটা বলে, পহ্যা কই যে কিনুম—? দোকান খুলবা না?

বুড়ো স্বামী মুখ বুজে অন্যদিকে চায়। হিন্দুস্থানের আকাশ দেখে। যে আকাশ নিজের পূর্ব পাকিস্তান ডিঙিয়ে আরও কত দেশের ওপর ছাউনি ফেলে নির্বিকার। হাজার আঘাত করলেও দাগ কাটে না। সমস্ত ক্ষত কোথাও জমা হয় মাত্র।

গৌরব কাছে এসে বলে, এই মা ডাকে রে—

ঠান্ডী বুড়ি এক পাল গরু-বাছুর তাড়িয়ে এপার থেকে পাকারাস্তার ওপারে নিয়ে যায়। পরপর দোকানঘর। এক-এক মালিক তো ইরিগেশন দপ্তর থেকে লিজ নিয়েছে হাজার গজ পাঁচশ গজ। চওড়ায় বিশ-তিরিশ গজ। প্রত্যেকের সীমানা শেষে চার-পাঁচ গজ ছাড় দিয়ে আবার আর একজন লিজ হোল্ডারের এরিয়া শুরু। ফলে দুই শুরুর মধ্যিখানের অংশটুকুই গলি। এপার থেকে গাঙের চরে যাওয়ার কিংবা মালিকদের নিজ নিজ সীমানার পেছন অংশে গমনাগমনের এটাই রাস্তা। ঠান্ডী বুড়ি গলির মধ্যে একটা একটা গরু-বাছুর ঢোকায়। চতুষ্পদ প্রাণীগুলো গাঙের চরে চেঁচকো পাতা নোনা ঘাসের লোভে হুমড়ি খেয়ে গলি পার হয়। সরকারি জায়গায় ব্যক্তি-মালিকানার সীমা পার

হলে অবাধ গোচর। কিংবা ঝড়-ঝাপটা এলে ডিঙি-বোট আশ্রয় নেয় দুর্যোগে। তাই গাঙচড়া। গৌরব আবার বলে, মা ডাকল যাবি নি ?

—দেখনা এই দোকানের ছেলেমেয়েগুলো রিফ্যুজি।

—হুঁ। ওরা তো দেশ ছেড়ে এসেছে, গৌরব শোনা কথায় সংজ্ঞা দেয়। এবার ভৈরবের হাত ধরে টানে।

যেতে যেতে ভৈরব বলে, আমাদেরও তো একটা দেশ ছিল। টিনের ঘর ছিল, পুকুর ছিল। বাবা শিবতলার থানে পুজো করত। তাহলে আমরা…।

তিরিশ

মাত্র দু-পয়সায় মুড়ি-মুড়কি। ছোট ঠোঙাটা প্রায় ভর্তি।

ভৈরব মুড়ির মধ্যে সাদা সাদা চিনির মুড়কি আবিষ্কার করতে মজা পায়। কাঠের বেঞ্চটায় বই-স্লেট খোলা।

জবারানী ঘরের মেঝেয় ঝাঁট দিতে দিতে দেখতে পায় টিনের ছাউনি থেকে এক থাবা ঝুল দেওয়ালের গায়ে জাপটে। জবারানী ঝাঁটার ডগে ঝুলের জট জড়াতে চায়। তখন ঝুলের দিকে নজর। তেল-মশলার ঝাঁঝ উড়ে কণা কণা জমেছে। উনুনের ঘুঁটে-কয়লার ধোঁয়া তার সঙ্গে তো ধূপ-ধুনোর সুগন্ধিও মিশেছে। অত দামের পয়সার জিনিসের পরিণতি এমন নোংরা ! ভাবতে ভাবতে ঝাঁটার ডগাটা লাগায়।

আগেকার হোটেলঘরটার পাশে টর্চলাইট ঘড়ি সারানো মিস্ত্রিটা এসে থমকায়। এত সকালবেলায় এমন ঘর ঝাড়পোঁছ ! আজ তো কোর্ট-কাছারি খোলা। রবিবার বা বন্ধের দিন নয়, তাই জবারানীর নিজের অনুকূলে আনতে একটু অপেক্ষা করে। ঝাঁটার তাকটা ফসকায়। তখনই জবারানীর নজরে পড়ে পুরনো হোটেলঘরের পাশ পড়শি দোকানি অমরেশ।

—কী গো দাদা ? ভালো আছ—তোমার দেশ-বাড়ির সকলে ?

—হুঁ, আছে সব। ঠাকুর কোথায় ? রান্নাঘরে ? যাব বামুনের রান্নাঘরে মাহিষ্য লোক ?

—গেলেই বা ? এ কি মহাষ্টমী বা মা কালীর মূল ভোগ রান্না হচ্ছে—, আশ্বাস দেয় জবারানী।

—আমার যে রান্নাবান্নার অসুবিধে হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের এখানে মাস-কাবারি খেতে হবে। রেখেছ দু-চারজন মাসকাবারি খদ্দের— ?

জবারানী সবে মনের কথা মুখ ফুটে বলবে, সামনের রাস্তাটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। মাটির মেঝে টিনের ছাউনি সব চকিতে ঝাঁকুনি খায়। একটা বড় চেহারার বাস পাশ সড়ক ধরে কোর্টের দিকে। কোর্ট ছাড়িয়ে সড়ক ধরে আরও দক্ষিণে। এমন ঘর-কাঁপান আওয়াজে ভৈরবের বাছা মুড়কি হারিয়ে যায় সাদা মুড়ির খাঁজে।

আবার একটা বাস রবারের হর্ন টিপতে টিপতে আসে। পাকারাস্তার

মাঝখান থেকে পায়ে হাঁটা মানুষ সরে যায়। মানুষের পথ গাড়ির হয়। মুড়ির ঠোঙা নিয়ে ভৈরব বাইরে। বড় বড় চাকার বাসগুলো, গায়ের সিটে চকচকে রঙ, নতুন কাঠের ফ্রেমে নতুন জানালা, মাথার ওপর খোপ কেটে কাচ ঘেরা, কাচের মধ্যে রঙ দিয়ে লেখা ৮৯। ভৈরব চমকে ওঠে!—এ কি আমার ধারাপাতের শতকিয়া যে…

পাশে দাঁড়িয়ে ঘড়ি সারাইওয়ালা অমরেশ। ওপাশে মনোহারি দোকানের নিতাই মালি। গায়ের কাছে বাপ সদয়কুমার। গৌরব তাকায় বাঁদিকে। বাসগুলোর উৎসমুখে। হঠাৎ চেঁচায়, গৌরব ওই যে আর একটা—

—কই? বলে ভৈরব প্রথম নজর করে কাচের খোপে শতকিয়ার সংখ্যা। বাসটা কাছে আসতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কাচের খোপের ভেতর মোটা তুলির টানে লেখা ৮৯এ। ভৈরব ঠিক ধরতে পারে না, বাসের মাথায় অমন একে চন্দ্র দুইয়ে পক্ষ…আর অ আ ই-এর এ'কারটা কেন? তার দ্বিধা আর অজ্ঞতায় পড়াটাও বিচিত্র, উননব্বুই এ'কার।

নিতাই মালি একচোট হাসে। তাদের মফস্বল শহরে প্রথম বাস চালু হল—এটা তো আনন্দের। সেই উচ্ছ্বাসে শোনায়, ও ভুঁড়ে—ওটা উননব্বই এ'কার নয় রে। উননব্বইয়ের 'এ'—রুট নম্বর।

—রুট নম্বর? ভৈরবের জিজ্ঞাসাটা চকিতে তলিয়ে যায় আগত বাসটির ভয়ঙ্কর শব্দে। বাসগুলোর অর্ধেক তো চলে যাচ্ছে দক্ষিণে—কাকদ্বীপের টার্মিন্যালে।

ঘড়ি সারাই অমরেশ বলে, যাক লাটের লোকের সুবিধে হল। দু-তিন দিন ধরে বোট বেয়ে মামলায় আসতে হবে নে। দিনের দিন সকালে ধরল তো ঠিক কোর্টের আগে এসে পড়বে—

নিতাই মালিও সায় দেয়, ডাঃ বিধান রায় তাহলে কথা রেখেছে—। ভোটের সময় শুনেছিলুম বাসরাস্তা হয়ে যাবে—বাসও চলবে—

মফস্বল শহরটায় জোয়ার-ভাটার গতিপ্রবাহ ছাড়াও বড় যন্ত্রযানের চাকা বেয়ে গতিবেগ ঢুকল। সদয়কুমার জোরে জোরে পা ফেলে রান্নাঘরের উদ্দেশে। রান্নাঘরের দরজামুখে হঠাৎ থমকে ভাবে, এত গাড়িঘোড়ার জোর…আমার হোটেলের এতে ভালো হবে তো…!

যখন বাস থাকে না, দু-চারখানা সাইকেল-রিকশার দখলে তো পাকা-রাস্তাটা। লোকজন ভিখিরি মুটে মজুরে ভর্তি। রাস্তাটায় তেমন বিস্ময়ের কিছু নেই। গৌরব ভৈরব বই-খাতায় মন দেয়।

আকাশে সূর্য উত্তপ্ত হয়। নীচের মেঘে জল শুকিয়ে হালকা। মস্ত আকাশে ভেসে বেড়ায় মেঘগুলো। কাক-বক খাল-বিলে মাছ খুঁটে খায়। পাখিরা ঝোপ-জঙ্গলে পোকা খুঁজে পেট ভরায়। টিয়া-শালিক ঝাঁক বেঁধে ফলের বাগানে কিচিরমিচির ডাকে। কচি ঠোঁটে ফলের নরম গায়ে ঠুকরে চোট করে। দিনের প্রথম পর্বে বাসা ছেড়ে খাদ্য সংগ্রহে বেরিয়েছে।

এবার তো যে যার গৃহকোণ, বৈঠকখানা, গ্রাম-গাঁ ছেড়ে এই মফস্বল শহর-

মুখো। উকিল মোক্তার মুহুরি মক্কেল ছাড়াও দাঁতের মাজন বেচা ফেরিওয়ালা, মাথার ঝাঁকায় মুড়িভাজা ছোলা মটর নিয়ে ব্যাপারি, স্ট্যাম্প কোর্ট ফি বিক্রেতা ভেন্ডার, হস্তরেখা বিচারক অতুল্য পাঠক—সবাই কোর্টমুখো। পেশকার কেরানি পিয়ন হুটপাট হাঁটে। নতুন বাস হর্ন দেয়। মানুষগুলো রাস্তা ছাড়ে।

জবারানী ছেলে দুটোকে বলে, তোদের ইস্কুলের বেলা হল। চানে যা—

তখন রাস্তায় মানুষের ভিড়। গাছের ছায়ায় পিঁড়ে পেতে কাঠের বাক্স খুলে নাপিত প্রফুল্ল। তার পাশে বিহারী রামা। রামা চামড়ায় খুরটা ঘষে ঘষে ধার তুলছে। অল্প হাওয়ায় কাটা চুল দু-চারখানা উড়ে উড়ে সরে যায়।

সাদা ধুতি আর ছ'পকেটি ফতুয়া গায়ে বুড়ো মানুষটা। হাঁটু অবধি ধুতি। তারপর তেল চকচকে ফর্সা টে পা। পায়ের গাঁট থেকে কালি করা নিউ-কাট জুতো। সাদা ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে ছাতাটা বগলে। জুতোর শব্দ খটখট। তখন তার বুকপকেটের ঘড়িতে মিনিট সেকেন্ডের কাঁটায় কুটকুট আওয়াজ। মানে বেলা দশটা।

গৌরব বলে, ওই দেখ পোস্টোমাস্টার—

ভৈরব চেঁচায়, জামায় হরি—

পোস্টমাস্টার দাঁড়িয়ে জামাটা ঝাড়ে। এদিক ওদিক চেয়ে আবার হাঁটে পোস্টমাস্টার।

—ও মাস্টারমশাই তোমার ব্যাগে হরি।

পোস্টমাস্টার পিঠের সাদা ব্যাগটা নামিয়ে একটু নেড়েচেড়ে দেখে। তারপর সেটা পিঠে বয়ে নিয়ে এগোয়। একটুও রাগে না কিংবা মুখ বিকৃতি নেই। নিতাই মালি দোকান ছেড়ে বলে, ও ভুঁড়ে বগলে যে ছাতা আছে—

ভৈরব কথার উদ্দেশ্যে বুঝেই জোরে বলে, ওই যে ছাতায় হরি—

পোস্টমাস্টার তাড়াতাড়ি ছাতাটা ঝেড়েঝুড়ে খাটিয়ে দেখে। আবার ছাতাটা বন্ধ করে বগলের ভাঁজে নেয়।

গৌরব বলতে যাচ্ছিল কাছায়, সদয়কুমার আটকায়, মাস্টারমশাইকে অফিস যেতে দে—

রাস্তার ওপারে বড় খিরিশ গাছটার ছায়ায় নাপিত প্রফুল্ল আর বিহারী রামা কাণ্ড দেখে হাসে। রামা বলে, মাস্টার বহুত ধার্মিক আদমি আছে—

সদয়কুমার পথচলতি মানুষদের মধ্যে খদ্দের বুঝে ডাকে, আসুন বাবু, আসুন, ভালো মাছ ভাত—

ওদিকে চণ্ডী ডাক্তারের চকচকে টিনের চেম্বারের পাশ-গড়ানে মহানন্দের গন্ধেশ্বরী ভোজনালয়। পেটভাতায় খদ্দের ডাকার চাকরি। আজ রেলের একটা পুরনো ফুলপ্যান্ট জোগাড় করেছে। পোর্টারদের বাতিল লাল হাফশার্ট গায়ে দিয়ে বঙ্কিম চেঁচায়, আসুন বাবু, আসুন। চেয়ার-টেবিলে বসে ঝোল-ভাত খেয়ে যান—

সদয়কুমার হাঁক দেয়, আসুন ঝোল-ভাত—গরমাগরম—।

খদ্দের টানার জন্য দুই পক্ষ যে আকুল! বঙ্কিম তখনও চেঁচায়, নতুন চেয়ার-টেবিলে বসে শান্তিতে খেয়ে আনন্দে কাজ সারুন।

সদয়কুমার একদম নিভে যায়। ভাবে, আমি চিৎকার—প্রচারে খদ্দেরের মন টানতে চেয়ার টেবিল আছে বলতে পারি কই? একবার হোটেল ঘরের ভেতরটা নিজের কাছে কত দীন লাগে! চোখে বেঞ্চটা পড়তেই আপসোস,…ইস্ যদি মকবুলকে ধরে বেঞ্চির বদলে দুটো চেয়ার টেবিল করিয়ে নিতুম ছুতোরের দোকান থেকে… !

উননব্বই উননব্বই-এ রুটের বাস দুটো একটা যায় মাঝে মাঝে। নতুন পাকারাস্তায় ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ। বাসের গায়ে রোদ পড়ে জেল্লা। মস্ত বাসটাকে রুপো-পেতলে তৈরি মনে হল। সদয়কুমার ধাতব উজ্জ্বলতার ঝলক চোখে নিয়ে হোটেল ঘরটার ভেতর দেখে ভাবে, একটু ঝকঝকে পোষ্কার-ঝোস্কার না হলে চলে… !

জনা তিনেক খদ্দের ব্যাগ ছাতা হাতে নিয়ে বলে, ও ঠাকুরমশায়, ভাত-তরকারি হবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বসুন—আপনাদের জন্যে তৈরি করে তো বসে আছি—

বেলা কেটে যায়। মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ের ভেতর একখানা চ্যাটাই পেতে জবারানী বেলা তিনটের ভাত-ঘুমে। ছেলে দুটো এখন স্কুলে। এর পর তো আবার গোছগাছ করে সন্ধেমুখে হোটেল খোলা। সুতরাং এইটুকু সময় যা গড়িয়ে নেওয়ার। খিড়কি দরজাটায় বাঁখারি বুনে আগড়। আগড় দোরটা ঠেলে দিতে পশ্চিমের রোদ সামান্য ভেতরের মেঝেয়। মেঝেটা সব সময় জল পেয়ে স্যাঁতসেঁতে। শেষবেলার রোদ পায়। বিছানার বালিশ ছাপিয়ে ভিজে চুল। রোদ মাখানো হাওয়ায় শুকোয়। জবারানী একটুখানি ঘুমোয়।

রান্নাঘরের মেজলায় ভাতের মাড়। মাড় মেজলার গা বেয়ে। শুকিয়ে চটচটে। মাছিগুলো ভনভন করে। আলগা কড়ায় বড় খুন্তি আড়াআড়ি। ঝোল-তরকারির মাছি আটকাতে পাতলা গামছা ঢাকা। ভাতের মাড়ে মাছির ডানা খানিক আঠালো। উড়ন্ত মাছি পাক খেয়ে জবারানীর ঠোঁটে বসে। সিরসিরিয়ে ভার। ঘুমন্ত জবারানী হাত দিয়ে তাড়ায়। পরিশ্রান্ত দেহ। হাতটা বিছানা বেয়ে মাটিতে।

ভৈরব বইখাতা মাচায় রেখে বলে, মা—খাব। একডাকে ঘুম ছুটে যায়। ঘুমের লেই তখনও চোখে। এক চোখ খোলে তো আর এক চোখ জুড়তে চায়। জবারানী চোখ টান করে বলে, তোর দাদা— ?

—এখনও ফেরেনি।

ভৈরব এদিক ওদিক চেয়ে বাপকে খোঁজে। বেঞ্চিতেও ঘুমিয়ে নেই। তাই জানতে চায়, বাবা কোথায়?

—দর্জি দোকানে।

—কেন গো?

—কী তৈরি করাতে গেছে, বলল জবারানী।

—তবে আমিও যাই—

—গাড়ি দেখে যাস বাপ।

এতদিন তো এ-রাস্তায় বড় গাড়ি ছিল না। চলত শুধু নিরীহ সাইকেল-রিকশা।

নন্টুবাবুর মুদিখানা দোকানের ছাউনি চাপিয়ে রাস্তা অবধি আরও ক'খানা ঘর। সেই ঘরে ছিটকাপড় সেলাই মেশিন। লেপ-তোশকের তুলো, ধুনরির ডাং সাজানো। এক ব্যবসাদার নন্টুবাবুর থাবার মধ্যে মানুষের সব কটা প্রয়োজনীয় উপকরণের জোগান কিংবা বিনির্মাণ। তাই দর্জি ছুরুল আমিন পায়ের চাপে মেশিন চালায়। সুঁচের সুতো ঘর্ঘর বুনে যায়। মেশিন প্লেট থেকে রঙিন কাপড়টা টেনে টেনে সেলাই এগোয়। সদয়কুমার একমনে দেখে। হাতে ক'খানা তামার ফুটো পয়সা। ভৈরব এসে বলে, কী হবে গো বাবা?

দর্জি ছুরুল আমিন বলে, এই খোকা তোর পা প্যান্ট। রঙ পছন্দ হয়েছে?

চার দিকের পটি মুড়ে অল্প করে সেলাই। কত বড় কাপড়! প্যান্ট কখনও এত বড় হয়! রোগা ফর্সা ছুরুলের মাথায় জালি বোনা সাদা এক থাবলা নারকেল মালার মতো টুপি। লোকটা বড় কাঁচিতে সুতোর ফোঁড় কেটে বলে, কী রে, বললি নি যে— ?

ভৈরব কিছু না বললেও সদয়কুমার চুপচাপ নিজের সঙ্গে কথা বলে, সত্যিই তো এমন কাপড়ে ছেলে দুটোর প্যান্ট-জামা হয়েও বেশি থাকত! তা না করে খদ্দের টানতে এমন ব্যবস্থা! এমনি করে যত হোটেল খাবার দোকান আছে সব জায়গায় যদি পর্দা টাঙাতে হয় তাহলে একটা কারখানার সব মাল তো বাজে কাজে খরচ হয়ে যাবে। মানুষ খাকে···পেট ভরে খাক। তার খাওয়ার জন্য এত আড়াল ব্যবস্থা কেন! সব মানুষ খেলে বা খেতে পেলে তো আর কেউ কারও খাওয়ার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না। কিংবা একবার তাকানোর মধ্যে লোভ ঝরবে না। আড়ালের দরকার হয় না।

সেলাইটা সেরে ছুরুল আমিন বলে, রঙটা ভালো হয়েছে। টাঙালে মানাবে—

—মানাবে?

—হুঁ। লোকজন তার ওপর রাস্তায় বাস হয়েছে ধুলো-ধালা পাতে পড়বেনি—

শেষ কথাটায় সদয়কুমারের এতক্ষণ সাজানো যুক্তি যেন ধুলোবালি চাপা পড়ে। তখন নিজের যুক্তির ভঙ্গুরতা ঢাকতে বলে, হ্যাঁ মাস্টারদা—ধুলো মারার যন্ত্র ব্রিটিশ, বলে নিজেকে সংশোধন করে, জহরলাল বের করেনি?

টেলারিং মাস্টার হাসতে হাসতে বলে, ব্রিটিশ বার করলে তো তবে জহরলাল পাবে—। দাও ফুটো পয়সাগুলো—

তামার ফুটো এক পয়সা বারো চোদ্দ খানা। পয়সা কটা দিয়ে সদয় বলে, মাস্টার ঠিক ভাবে কর।

সরু ফিতের মতো কাপড় পটি তামার ফুটো পয়সায় গলিয়ে আবার মূল কাপড়ে সেলাই করে। টেলারিং মাস্টার বলে, সরু তারের রিংয়ের চেয়ে এ অনেক টেকসই হবে—

অতিসাধারণ জীবনযাপন। সেই জীবনে এ-জিনিস তো একান্তই প্রথম। এবং এই জিনিসটিকে লাগাতে হবে জীবিকার জায়গায়। সুতরাং একটা ঝুঁকি তো থাকেই। দ্রব্যটি যথাস্থানে ব্যবহারের ফলে খদ্দেরপাতি না জমলে আর দ্রব্যটির মূল্য কী রইল ? তাই উৎকণ্ঠিতভাবে শুধোয়, টেকসই হবে !

রিকশায় বসে লোকটা ঢোলের গায়ে কাঠি মারতেই গ্যাড্ডা…গাড্‌ুম… গ্যাড্ডা…আওয়াজ। তিন জনেরই কান চোখ ঢোলের দিকে। রিকশাটার দুপাশে দরমার গায়ে রঙচঙে ছবিতে নায়ক-নায়িকা। সুচিত্রা উত্তম। কাঠের ডাইসে বড় হরফে লেখা 'সাড়ে চুয়াত্তর'। সময় ৩টা ৬টা ৯টা। পোস্টারের নীচে কালি দিয়ে লেখা 'চলিতেছে'। পেছনে দরমার গায়ে নায়ক-নায়িকারা ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে হাসিমুখে। ছবিব নাম 'ওরা থাকে ওধারে'। তলায় লেখা 'আসিতেছে'।

লোকটা একতালে ঢোলের চামড়ায় বাড়ি মারে। গ্যাড্ডা…গাড্‌ুম শব্দে পথচারীরা নজর ফেলে। নায়িকার ফর্সা কপালে কোঁচকানো চুল। সরু দু-এক গোছা চুল ফর্সা কপালে ঝুরির মতো হাওয়ায় দোলে। দু-ঠোঁটের হাজার কথা ছাপিয়ে চোখের টানে একাত্মতার আবেদন। আবিষ্ট পথচারী, পথচারিণী। ভালো করে 'চলিতেছে'র বিজ্ঞাপনটা পড়ে। গ্যাড্ডা…গাড্‌ুম বাজিয়ে রিকশাটা এগোয় কোর্টের দিকে। দোকানপাটের লোকজন বলে, কি রে যাবি নাকি নাইট শো-তে ?

—দুশ্। হালদারবাবুর হলে কাঠের চেয়ারে বড্ড ছারপোকা।

—সে তো সামনের সারির গান্ধী ক্লাসে।

—সব ক্লাসে বাবা।

—এ কি মেট্রো হল পেয়েছ ? গদি থাকবে—গরম কালে গা ঠাণ্ডা হবে—

রিকশাটা আবার ঢোলের বাদ্যি গ্যাড্ডা গাড্‌ুম নিয়ে ফেরে। আর আধ ঘণ্টা পরে সন্ধে ৬টার শো শুরু। স্থানীয় এবং বাইরের লোকজনের চলাচল তো কোর্ট-সংলগ্ন শহরের এ-জায়গাটায়। অতএব মানুষকে নিয়ে বেশ অনেকখানি বাজার। মনোহারি, কাপড়জামা, মুদি বেনে মশলা প্রায় সব কিছুই তো থরে থরে সাজিয়ে খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা।

কালো ভুদগো চেহারায় খাড়া দুখানা শিংয়ে বুড়ো ষাঁড়টা মিষ্টি দোকানের সামনে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক চেয়ে এঁটো শালপাতাগুলোর কাছে যায়। শাল-পাতার গায়ে মিষ্টি রস চাটে। বড় বড় চোখ আরামে ছোট হয়। মোটা কালচে জিবের ডগা থেকে লালা টপে।

খালি গায়ে পেট নাদা পরি ময়রা এক খাবলা বোঁদে শালপাতায় ঢেলে মাটিতে রাখে। নিত্য অভ্যাসে ষাঁড়টা কাছে যায়। চেটে চেটে খায়। খাওয়া শেষ হলে প্রসন্ন চোখে ষাঁড়টা তাকায় ময়রার দিকে। হাজরা বুড়ো দুহাত জোড়

করে প্রণাম জানিয়ে বলে, যা বাবা শিবশঙ্কর—এবার যাও—

তারপরেই তো পাঁচ-সাত জন লোক ঢুকে বলে, গরম লুচি হবে ?

—হবে।

—টাটকা পানতুয়া ?

—হুঁ। আপনাদের জন্যে সাজিয়ে তো বসে আছি—। আসুন—

দৃশ্যটা দেখে ভৈরবের বুকের মধ্যে আশ্বাসের চিক্কির। একসঙ্গে এতজন খদ্দের ! এজন্যেই ময়রা ষাঁড়টাকে খাওয়ায় !

গ্যাড্‌ডা…গাড়ুম বাজনাটা হঠাৎ থামে। রিকশা দাঁড়ায় অতুলবাবুর মুদিখানা মনোহারি লেমনেড, বায়রন সোডার দোকানে। তারের খোপে খোপে মোটা থ্যাবড়া বোতলে পানীয় সাজানো। অতুলবাবু ফর্সা চেহারায় গোল মুখ। মাথার মধ্যিখানে বিরল কেশ। এটুকুতে চেহারায় আভিজাত্য।

রিকশাটা থামতেই দুখানা লাল মলাটে মোটা খাতা আর একটা হাত চিঠি এগিয়ে দেয় ঢোল বাদককে। বলে, গিয়েই অ্যাকাউন্টটেন্ট, সঙ্গে সঙ্গে ঢোলবাদকের সুবিধের জন্যই সহজ করে, ওই সরকারবাবুকে দেবে। আমি আধঘণ্টার মধ্যে 'হলে' যাচ্ছি—

রিকশাচালক গাড়ি টানে। ঢোলবাদক কাঠি মারে। ঢোলের গোলাকার চামড়ায়। বড় বড় আওয়াজে দর্শকদের কান কাড়ে। তারপর নায়িকা মিষ্টি হেসে তাদের ডাকে। পথের কিশোরী কিংবা তরুণী বউ নায়কের চোখের দৃষ্টিতে শিউরে ওঠে ! পরপুরুষের টানে ভেতর বুকে ঢিপঢিপ ঢোলের ঘা।

সেলাই করা জিনিস দুটো নিয়ে সদয়কুমার হাঁটে। পিছু পিছু ভৈরব। তাদের হোটেলঘরে সেলাই করা কাপড় দুটো কেমন করে কাজে লাগবে—সেটাই এখন ভৈরবের কৌতূহল। তখন উল্টো দিক থেকে বাসটা আসে। দূর থেকে রবারের হর্ন বাজে। নতুন শহরে নতুন যানবাহন। পথচারীকে অভ্যস্ত করে তুলতে ড্রাইভারের আপ্রাণ চেষ্টা। বাসটা যদিও কাছাকাছি, জনসমাগমের জন্যেই একটু ধীরে ধীরে চাকা গড়ায়। ওপারটা অনেকক্ষণ ওপার থাকে। মহারানী ভোজনালয়ে যে যেতে পারছে না ভৈরব। ভৈরবের পাশে সদয়কুমার। এখন ভৈরবকে নতুন বাস মোটেই টানে না। অধৈর্যে জিজ্ঞাসা করে, বাবা—এটা টাঙালে কী হবে ?

—চল না। আগে টাঙাই—

বাসটা ঢিকির ঢিকির আসে। যেন একটা আস্ত পাকাবাড়ি। ভৈরব মনে মনে খুব চটে যায়, এত দেরি করে কেন… !

একত্রিশ

মাঠময় দুপুরের রোদ। অজয় মাস্টার পাশ গাঁয়ে ষোলো আনা নিমন্ত্রণ জানিয়ে ফেরে। কার্তিকের হাওয়ায় সামান্য টান হাতে পায়ের চামড়ায়। নোনা দেশে নোনতা হাওয়া। ধানের জটায় চারাগুলোর ডগ ভারি। রোদ পেয়ে জটার গায়ে

গিনি সোনার পাক ধরে। দমকা হাওয়ায় সোনার চুড়ি বালা ঝুমুর পাশা বাজে মস্ত মাঠে। অজয় মাস্টারের হাতে কলাপাতায় বাঁধা হরেক ফুল। আজ লক্ষ্মী-পুজোর আয়োজন। মাঝি দাঁড়িরা বোট ডিঙি চড়ায় তুলে দিয়েছে। তারা বোট ডিঙির মোটা কাপড়ের পাল খুলে মাস্টারের উঠোনে হাজির। বাঁশ বাখারি সাইজ করে ম্যারাপ বেঁধেছে। তার ওপর পালগুলো বিছিয়ে বড় ছাউনি। সারারাত লোক জমায়েত আর পুজো দেখার আচ্ছাদন।

এ-বঙ্গের সরল ভূভাগ ছাড়িয়ে নোনা নদীনালার জল বেগ কাটিয়ে তো প্রায় শেষ ভূখণ্ড এটা! এই ভূখণ্ডের গায়ে সমুদ্রের প্রহার কিংবা সোহাগ। বেলা শেষের রোদ্দুর ধানের গায়ে ছিটিয়ে যেন সোনার গহনায় পালিসের জেল্লা। বাঁহাতের ব্যাগে জুতো। সেটা ফেলে দু-হাত জোড় করে স্বর্ণ-প্রসবিনী মাঠটাকে প্রণাম জানায় অজয় মাস্টার। টানা সরু নাক চোখে লম্বা মানুষ। মাথায় কোঁচকানো চুলে পারিবারিক ধারা। সূর্য হারিয়ে গেলেও আজ চরাচরে সন্ধ্যার আঁধার নামে না। মেটে রাস্তা পুকুর বাগান গাছপালা কেউ দৃষ্টির ওপারে যায় না। গাছগাছালির পাতা চিকচিক করে। ঘাস দুর্বোর মাথায় পাতলা হিম যেন কাচের গুঁড়ো।

লোকজন মাটির পুরনো লক্ষ্মী বিগ্রহ নিয়ে পথে বেরিয়েছে। সঙ্গে শুধু একখানা পেট্রোম্যাক্স। মাটির ঠাকুরটা লোকজনের মাথায় সমুদ্রমুখী। সঙ্গে ব্রাহ্মণ। ঢাক ঢোল কাঁসি। পিতলের কলসি। বুড়ো মাঝি নৌশাদ আলি। গাল ভর্তি পাকা দাড়ি। সাদা জ্যোৎস্না সে দাড়িতে মেখে আরও সাদা। ঢাক ঢোল বাজিয়ে তো পুরনো লক্ষ্মীকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছে সমুদ্রে। নতুন মূর্তিটায় সাজ পরাচ্ছে পটোদার। ঝকমকে সব সোনালি গহনা লক্ষ্মীর মাথায় কানে হাতে। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও দল বেঁধেছে। বাজনার মধ্যে হাঁটছে শিশু, কিশোর-কিশোরী, বউরাও। খালি পায়ে পথ ভাঙে গোটা গ্রাম। যদিও সম্পত্তিবান অজয়বাবুর পুজো। সব গ্রামবাসীর সমাবেশ। উৎসবের আনন্দে নৌশাদ আলি কাঁসিটা বাজনাদারের হাত থেকে টেনে নেয়। বলে, দে তো ওটা আমি বাজাই। কাঁসির গায়ে কাঠি মারতেই ধাতব জিনিসটা কাঁই কাঁই বাজনা তোলে। সাতখানা বোটের মালিক, অজয় মাস্টারের ধান বয়ে নিয়ে যায় কাকদ্বীপ পাঁচ নম্বরের ধানকলে।

বুনিয়াদি ইস্কুলের মাস্টারবাবু খুশি হয়ে বলে, আলিসাহেব জোরে বাজাও —মা গঙ্গার কানে যাক এ-বাজনা। একবার চোখ মেলে দেখুক তার ভক্তদের—

পুবের আকাশ জাঁকিয়ে গোল চাঁদ। নীল মেঘ সব সাদা। কোটি বকের সাদা পালকে যেন জ্যোৎস্না লেপে আছে। চলমান সাদা মেঘ সাদা বকের ঝাঁক বলে বিভ্রম হয়। তারা মাথা ডিঙিয়ে সমুদ্রের ওপর শূন্য আকাশে ভাসে। সমুদ্রস্রোত মিশে একাকার দূর দক্ষিণ-পূবে ভারত মহাসাগরে। নোনাজলে জ্যোৎস্না বয়ে যায় বার্মা, জাভা, শ্যাম উপসাগর কাম্বোডিয়ার সমুদ্রকূল। সায়গনের সমুদ্র ভূভাগে।

কম্বোডিয়ার রাজধানী শহর নমপেনের প্রাসাদ থেকে নেমে এসেছেন রাজারানী। টনলিসেপ নদীর ধারে ছোট্ট প্রাসাদে। আজ কোজাগরি পূর্ণিমায় টনলিসেপ দুধসাদা। চারটি নদীর জলধারা মিশেছে। নৌকো দৌড় চলছে। জলোৎসব। দূর সমুদ্রকূলে গ্রামবাসীরা কলাপাতায় জ্বলন্ত মোমের ফোঁটা ফেলে। রাজার বদলে বৌদ্ধ ভিক্ষু হাজির। গ্রামবাসী কৃষিজীবী মানুষ শস্য প্রার্থনায় সমুদ্রকে বন্দনা করে। অশান্ত উন্মত্ত সমুদ্রকে মিনতি জানায়, তুমি শান্ত হও। রুদ্ররূপ সংযত কর···শস্য ফলনে করুণা কর···

বালিচর পাড়িয়ে গ্রামের ভূমি এখনও খানিকটা বাকি। দূরের গাছগাছালির পাতা সিরসির নাচে। চরের হেঁতাল গেমুয়া ঝোপে দু-একটা রাত পোকা। বুনো শিয়াল ডাকে। পুরনো খালটার উপর কাঠের পোল। শেষ পৌষে বাৎসরিক সাগর স্নানার্থীদের প্রবেশ পথ। বার বার আওড়ে ব্রাহ্মণের মন্ত্র শেষ। ছোট ঘটির মধ্যে কুশ। মাঝে মাঝে কুশ ডগার সমুদ্রজল ছিটিয়ে পথের অশুদ্ধি মোচন।

কাঠের পোল গোড়ায় এসে ব্রাহ্মণ বলে, বাবু ওই যে ওপারে একতলা পাকার বাড়ি দেখতিছেন—

—হাঁ।

—অউটা ইরিগেশন বাংলো হইতিছে। অফিছাররা আইসবে বাঁধ দেখতে সমুদ্দুর দেখতে—

—দেখু। যত পারে দেখে আর ফুড়তি করু। সমুদ্র দেবতা ক্ষ্যাপলে ওদের বাপ পিতামহের সাধ্য নাই রক্ষা করে—

—তবু বছর বছর মাটি ফেলাইতে হবে নি? ভালো করে ইট সিমেন্ট দিয়ে ধারি বাঁধতে হবে নি—

—তা হবে নি? অজয়বাবুর রাগে মাথার কলস থেকে নোনাজল খানিক চলকায়। ঠোঁট ভিজে যায়। খরখরে নুনে টাকরা অব্দি জ্বলে। চটে গিয়ে বলে, দূস্। সমুদ্র কি কইছে ভালো করি বাঁধ দিবনি—পাইলিং করবনি ভালো বালি সিমেন্টের ভাগে বদমায়েসি করতে—?

সঙ্গী সব মানুষ কাঠের পোল পার হয়। নৌশাদ আলি পাশাপাশি এসেও দূরত্ব রাখে। গ্রামবাসী হলেও তো ভিনজাতের মানুষ। তায় আবার মাথার উপর পুজোর পানী। সুতরাং একটু ছোঁয়া বাঁচাতে হয়। কাছাকাছি এসে বলে, ও মাস্টার বামুন ঠাকুরের সঙ্গে কিসের কথা কাটাকাটি?

—না না। ও কথার কথা—। একটু মন শান্ত হলে বলে, আলি ভাই কটা ছোঁড়া এত পাকা হইল কি করি বলু তো?

—কারা! ধরতে পারে না নৌশাদ।

—আগো আমার পঁচিশ বিঘাটায় আটজনকে বলছিলি তোরা চাষ কর। তোরা ধান খড় আদ্ধাআদ্ধি দিবি—

—হুঁ। তা দিবে, নৌশাদ সরলভাবে মেলায়।

—উঁহু। শালারা কয় বাবু—আদ্ধা দুবো। কিন্তু রসিদ দিতে হইবে।

—হুঁ। এ তো নতুন কথা। কমনিস্টদের শিখানো বুলি—

—যতই শিখাক। থামু মায়ের পুজাটা সারি লই। তারপর এস. ডি. ও. কোর্টকে যাব। ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার লুবো—পুলিশ দিয়া চাষ তুলবু। আমার ধান আমার ঘরকে লি যাবই—

—তা তুমি পারবে, নৌশাদ সমর্থন জানায়।

—পারবো নি মানে? উকিলবাবুর পরামর্শ মতো আমরা পাঁচ ভাই দু-ভাইপোরা মাথা পিছু পঁচাত্তর বিঘা জমিন ঠিক বণ্টন করি লিছি। সেই জমিনে ওরা পরের কথায় লাচতিছে। লাচুক—আমিও লাচাইবো—

—তুমি লিখা পড়াজানা মাস্টার লোক। তুমিই ওদের শিক্ষা দিতে পারবে।

—শিক্ষা দুবোই দুবো। এমন গুল পিরাক ওদের মুখে গাঁথি দুবো—আর ফটর ফটর কথা কইতে পারবে নি। কয়, দেশে খাদ্য নাই—গরীবের ভাত জুটে নি—। অজয় মাস্টার কাছে ডাকে নৌশাদকে, ওরা খাইতে পায় নাই অউটা ভগবানের মার। আমার সব জমিনের ধান দিয়ে দিলি আর দেশশুদ্ধ লোকের পেট ভরবে?

—তাই তো, ভরে নাকি?

—তবে? নেহরুর কাছে যা—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লিছে। বিধান রায়কে ধর। তা না আমানকে পঁচিশ বিঘায় উৎপাত—

—বেশ আছি মিলে মিশে। তার মধ্যে উৎপাত বাধাইতেছে কটা ছোকরা—?

তৃপ্ত হয় নৌশাদের কথায়। অজয় মাস্টার বলে, নৌশাদ—তোমরা বান্ধবের মতো সঙ্গে থাকু—আমি কাদু ময়লা আমার দ্বীপ থিকে ঠিক সাফ করি দুবো—

গ্রামের পথে ঢুকতেই দেখে বাড়ি বাড়ি উঠোনে, পুকুরপাড়ে শুকনো খেজুর পাতা, তাল নারকেল পাতা জাঁক বেঁধে আগুন ধরাচ্ছে গৃহস্থরা। গোটা গ্রামের রাস্তায় সেই আগুনের আলো। উৎসবের দীপ্তি।

অজয় মাস্টার আনন্দে পা ফেলে। তার উদ্যোগে গোটা গ্রাম উৎসবমুখর। সঙ্গী লোকেরা দ্রুত এগোয়। একটা ভুর পুড়ছে। কাছাকাছি আসতেই ফট ফট শব্দে কাঁচা ডালপালা ফাটে। পোড়ে! গায়ে একটু আগুনের ঝলক। থমকে দাঁড়িয়ে অজয় মাস্টার ভাবে, এক সময় কমনিস্টরা বুধাখালি চন্দন পিঁড়ি লয়ালগঞ্জে আগুন জ্বালাই ছিল। সৌ লোকগুলা কি আবার আগুন ধরাইবে নাকি…!

বত্রিশ

বাখারি বোনা আগড়ের দরজাটা ঠেলতেই পশ্চিমের আকাশ। তিন চার ফেত্তা তার পাকিয়ে শিকলের মতো। তারই দু-প্রান্তে টেপা তালার বন্দোবস্ত। জবারানী ওঠে। ভৈরবও জাগে। দরজা দিয়ে এগোলে বাঁয়ে লম্বা লম্বা গরান কোচার ঘন বেড়া। বেড়ার গায়ে গরান কাঠ চেলা করে থাক থাক সাজানো। অতুলবাবুর ব্যবসার জিনিস। দু-তিনটে ন্যাতা কানি পুকুরে ধুয়ে আনে।

জলসন্ধেই ন্যাতা নেকড়াগুলো বেড়ার গায়ে টাঙিয়ে দেয়। হাওয়ায় রোদে শুকোবে। জায়গাটাকে এমনি করে কাজে লাগায় জবারানী। বেশ বড় পরিমাণ চৌহদ্দি নিয়ে আস্ত গরান কোচার টাল। বৃষ্টি পড়লে এ কাঠের দাম বাড়বে। গাঙ…গাঙ ছাড়িয়ে তো ডিঙিগুলো ইলিশের জাল বিছোবে। তখন নদীর মাঝে, সমুদ্র মোহনায় মেছুড়েদের রান্নাবান্নার জ্বালানি। তাই সকাল থেকে খট খট শব্দে জায়গাটা ভরে যায়। ভৈরব এগোয়। গাঙের তলভূমির চেয়ে এ জায়গাটা উঁচু। ইরিগেশন দপ্তর থেকে লিজের জায়গা। পুকুর কাটিয়ে সেই মাটিতে তো ভরাট। ভরাট গরান কাঠে। খালি গায়ে কাঠুরিয়া। শুধু কোমরের কাছে একতাল কাপড়। চকচকে লোহার ফলা। বড় ডাঁপের গোড়া ধরে মস্ত কুড়ুলটা মাথার উপর তোলে। ফলার প্রান্তে তীক্ষ্ন ধার। সেই চকচকে তীক্ষ্ন ধাতবে বেলা সাতটার সকাল। ভৈরব দাঁড়িয়ে দেখে।

দু-আড়াই হাত লম্বা। গরান কাঠ এক ঘায়ে এফোঁড় ওফোঁড়। আর বার দুয়েক কুড়ুলের ঘা পড়তেই কাঠটা দু-ফালা। সুন্দরবনের দামি কাঠ। জ্বালানি হয়।

ভৈরব ইস্কুলে পড়া গল্পটা মেলায়। এক কাঠুরিয়া নদীর ধারে গাছ কাটে। হঠাৎ হাত ফসকে কুড়ুলটা জলে পড়ে যায়। কাঠুরিয়া কাঁদতে থাকে। অঝোর কান্না। জলদেবী এসে বলল, তোমার কী হয়েছে— ?

বৃত্তান্ত শুনে জলদেবী জলে ডুব দেয়। ফিরে আসে সোনার কুড়ুল নিয়ে। বলে, এটা তোমার ?

—আজ্ঞে না।

ভৈরব বলে, অধীর কাকা—

তখনও কুড়ুলটা চেলা কাঠের দু-ফাঁকে। —কি ?

—চল না। নদীর ধারটায়।

—গিয়ে ?

কত রাজার গল্প পরীর গল্প মহাপুরুষের গল্প 'পড়েছে। তাদের তো আর কাছে পায়নি। তবু গল্পের কাঠুরিয়ার সঙ্গে যেন সামনা সামনি কথা। গল্পটার শেষটুকু মেলাবার ভীষণ ইচ্ছা—। তাই ভৈরব বলে, গাছ কাটবে—

—কাটলে ?

—হাত থেকে কুড়ুলটা হড়কে ফেলে দেবে। কুড়ুলটার জন্যে আকুল হয়ে কাঁদবে।

—তারপর ? বলে ফিক ফিক হাসে অধীর কাঠুরিয়া।

—জলদেবী সব শুনে যখন জল থেকে সোনার কুড়ুল নিয়ে আসবে, বলবে না ওটা আমার নয়। রুপোর কুড়ুল আনলে বলবে, না ওটা আমার না। তখন সন্তুষ্ট হয়ে লোহার কুড়ুলটা আনলে, বলবে, ওটাই আমার—

অধীর কাঠুরিয়া বলে, তখন লোহারটা তো পাবই—সোনা রুপোরগুলো পাবো তো ? এ গল্প আমার জানা। ছোটবেলা থেকে জানি। ছেলেবেলায় তো পড়েছি—

বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ভৈরব কাঠুরিয়ার দিকে! ভৈরবের জানতে ইচ্ছে করে, অধীর কাকা তুমি ছোটবেলায় যখন কাঠুরিয়ার গল্প পড়ছিলে তখন তোমার মনে হয়েছিল—বড় হয়ে কাঠুরিয়া হবে? মনের ইচ্ছে গলায় এনে বলবে, তখনই বাড়িওয়ালা দড়াম করে কাঠের দরজা খোলে। পট করে বলে, ওই খোকা তোর কিরে? যা—ঘরে যা।

ভৈরব আশাহত। গল্পটা না মিলিয়ে তাদের দোকান ঘরে যায়।

কাঠুরিয়া আবার কুড়ুল তোলে। শব্দ খট্—খচাস্—খট্ খচাস্···। যেহেতু মন পিছু মজুরির হিসেব, কাঠুরিয়া আবার কুড়ুল চালায়। অতুলবাবু পুকুর ধরে হাঁটে। পাতলা ফিনফিনে ধুতি। গায়ে দামি গেঞ্জি। কোঁচাটা বাঁ-হাতে এগোয়। বড়সড় শুকনো চড়া। এখন দু-চার খানা ইলশে ডিঙি। পুকুর-পাড়ে মাটি ঢিল দিয়ে উনুন। বড় মাটির হাঁড়িতে গাব জল সিদ্ধ করে জেলেটা। আর কজন সুতির জালে ফাঁস দেয়। ছেঁড়া খাবলায় তালি তাপ্পি মারে। হাঁড়ির গাব বুট বুট ফুটে কালো কষ জন্ম দেয়। পাশে খালি মেজলাটায় কালচে কষের শুকনো দাগ। অতুলবাবু গাঙ চড়ায় চোখ বুলিয়ে জল কিনারের দিকে তাকায়। পাঁক কাদায় দাঁড়ি মাঝিদের পায়ের ছাপে খানা খন্দ। ঠাণ্ডী বুড়ির এক পাল গরু বাছুর নোনা কাদায় গজানো ধানি ঘাস মস মস চিবোয়। তাদের পায়ের খুরে কাদায় গর্ত। গত রাতের জোয়ারে বাসি জল সেই খানা খন্দে জমে। হাঁটতে হাঁটতে কাদার কাছাকাছি। তখন দোকানপাট গাছপালার বাঁক মোচড় কাটিয়ে গাঙটা বিস্তীর্ণ। কতদূর অব্দি যে দেখা যায়! মাঝখানে বয়াটাও। চমকে ওঠে অতুলবাবুর বুক! উল্টো হাওয়া। দাঁড় টেনে টেনে এগিয়ে আসে বোটটা। বোটের দু-পেট জলে সেঁধিয়ে মাস্তুলটা আকাশে গেঁথে। তিন তিন ছ দাঁড়ির দাবনা বুক বেয়ে ঘাম। গরান কাঠ খুঁটি খোলে ভরে গর্ভিনী বোটটাও হাঁসফেঁসে।

অতুলবাবু নিজে ব্যবসার চালান সাব্যস্ত করে হাত নাড়ায়। কোঁচার কাপড় তুলতে গিয়ে লজ্জা। পট করে গায়ের গেঞ্জিটা খোলে। সেটা হাতে নিয়ে দোলায়। বার কয়েক গেঞ্জিটা দুলিয়ে বোটটাকে ধাওটা দেখায়। বোটের মাঝি কোমরের গামছা নাচিয়ে জানান দেয়।

অতুলবাবু উত্তেজনায় চটি ফেলে রাখে। তড়বড়িয়ে কয়েক পা কাদা ভাঙে। পারলে বোটটার গুণ ধরে টেনে আনে। অনেক টাকার চালান। আসছে বর্ষায় ইলিশ সিজিনটা বাগে আনতে পারলে বিশ পঁচিশ হাজার টাকার কারবার। সুন্দরবনের মাল পাচার হয়ে মহকুমা শহরে লাভজনক বাজার।

গাব ফোটানো উনুনে জ্বালানি ঠেলে দিয়ে জেলেটা দেখে, পাশে তো একদম ফাঁকা—! লোকটা গলা চড়িয়ে ডাকে, হই কাঠ কইরে? জাল সেলাইয়ের মানুষটা ফলতে হাতে উত্তর ছোঁড়ে, ওই তো বাবু যায়। দোকান থেকে মাপিয়ে লেনা।

কথা চালাচালি শুনে অতুলবাবুর বুকে চড়াৎ করে বাজে। —সত্যিই ওরা সবটা কেনে তো? নাকি অর্ধেক কেনে বাকি অর্ধেক কাঠুরের সঙ্গে অল্প

পয়সার বিনিময়ে যোগসাজশ নয় তো !

তিনখানা মোটা গরান খুঁটির তিনটে ডগ দড়ি দিয়ে জম্পেশ করে বাঁধা। তিন ফারকায় তিন বাহুতে শক্ত ত্রিভুজ। বড় 'এস' আংটায় ঝুলিয়ে দু-খানা কেঠো পাটাতনে পাল্লা। চল্লিশ সের, বিশ সের, দশ পাঁচ সের পরিমাণে বাটখারা। দাঁড়িপাল্লার কাছি ধরে দাঁড়ায় অতুল মাস্টার, মাল এখান থেকে একদম বেচবি নি। খদ্দের এলে দোকানে পাঠিয়ে দিবি—

—দিই তো গো বাবু—

—দোকানের লোক এলে তবে খদ্দেরের মাল মাপবি।

—তাই তো করি গো বাবু, অধীর কাঠুরিয়া বলে। কাঠুরিয়ার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গুরুমন্ত্র পড়ার মতো ফিশফিশোয়, ওই হোটেল ফোটেলের ছেলে বউদের গায়ের ধারে ঘেঁষতে দিবি নি--

—দিই আর কই···

—শোন, বলে অধীরের মনোযোগ টানে। কুড়ুলটা কাঠের গায়ে ঠেকনো পেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র। গরানের লাল ছালির রসে রক্তবর্ণ। পৃথিবীর পুরনো আবিষ্কার। কত গোষ্ঠী উপজাতি সংঘর্ষে যে আক্রমণ কিংবা আত্মরক্ষার আপন আয়ুধ !

—বোটের চালান এসে গেছে। মাঝি এলেই সোজা দোকানে নিয়ে যাবি—।

নির্দেশের ভারিক্কিতে মাথা নেড়ে সায় দেয় অধীর। বাড়িওলা দরজা ঠেলে দোকানঘরে ঢোকে। একই লম্বা দৌড় ছাউনিতলায় তো মহারানী হিন্দু ভোজনালয়।

সদয়কুমার বলে, বাবা ভৈরব—ইস্কুলটা আজ বন্ধ রাখবি ? খদ্দের পাতি-গুলোকে জল নুন দে দেখি।

—হুঁ।

—মায়ের দয়ায় আজ খদ্দের পাতির চাপ হবে মনে হয়—

—হোক না, ছেলের কণ্ঠেও যে কত আকুলতা। ভৈরবকে কাছে টেনে সদয়কুমার কপালে চুমু খায়।

দু-দেওয়াল থেকে পেরেক বাঁধা লম্বা তারটায় তামার ফুটো পয়সা গলানো রিংয়ে পর্দা দুটো। এক ঢাল সবুজ রঙ তিরতির দোলে। পর্দার এপারে খদ্দের কজন তাল পাতার আসনে বসে খায়। ছোট কাচের বাটিতে নুন এগিয়ে দেয়। খদ্দেরের পাতে সিলভার ঘটির জল গেলাসে ঢেলে দেয় ভৈরব। পর্দার খানিক আড়ালে তাদের অন্ন গ্রহণ।

বাচ্চা কাঁখে ভিখিরি বউটা সুর করে বলে, বাবাগো দুটো ভাত দিবি বাবা ?

ভৈরব জল ঢালতে গিয়ে থমকায়। ডাকে সদয়কুমারকে, ও বাবা—এস।

সদয়কুমার খদ্দেরের মাছের বাটি পাতে দিয়ে সামনে যায়। বলে, কি রে মা—?

—এক মুঠো ভাত দে না বাবা।

—এখন নয় মা। সবে খদ্দের পাতি শুরু—দুপুরের দিকে আয়।

ভিখিরি বউটা নাছোড়। ভৈরব দাঁড়িয়ে। ভেতরে খদ্দের জন খাচ্ছে।

ভিখিরি বউটা মিনতি জানায়, বাচ্চাটার জন্যে এক মুঠো দে বাবা—

—বলছি না দুপুরে আসতে, সদয়কুমার রেগে ধমক দেয়।

বউটা থতমত!

সদয়কুমার ভেতরে ঢোকে। নতুন সবুজ পর্দাটা টেনে আরও আড়াল করে। খদ্দেরের পাতে টাটকা মাছভালের গন্ধ।

এত জোরে ধমক! সদয়কুমারের অমন কর্কশ আওয়াজ কানে যেতেই ভাতের হাঁড়ি ছেড়ে জবারানী রান্নাঘরের দরজায়। মুখ বাড়িয়েও হোটেলের সম্মুখ ভাগে রাস্তাঘাট লোকজন তেমন দেখতে পায় না। পর্দা দুটো তো প্রায় সবটা আড়াল করেছে। রোজ দশ বারোজন কানা খোঁড়া ভিখিরি দুঃখী মানুষ ভিখ মাঙে। এ বউটা কোন ভিখারি মা, ঠিক বাছতে পারে না। পারলে তো বুকে ব্যথা দিত! চেনা মানুষের কণ্ট! বরং পর্দাটা হয়েছে। তবু পরিত্রাণের আব্রু পেল। জবারানী তখন ভাবে,···আর একটু ঘেরাঘেরি আড়াল করলে যদি খদ্দেরের সুবিধে হয়···বা খদ্দেরপাতি বাড়ে—সেটা যদি করতে পারা যেত···! বকুলের কথাগুলো তো মন্দ নয়!

সাদা থান কাপড়ে মাঝবয়েসী মেয়েটা। তেল সাবানে খানিকটা গেরস্ত গা মুখ। মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, ও খোকা—

—কি? বল? প্রশ্নটা শেষ করে একলা বিধবাটার দিকে চেয়ে ভাবে, এই তো এক ভিখিরিকে বাবা ধমকাল। আবার?

—দোকানের মালিকবাবু কই গো?

ভৈরব দ্বিধায় পড়ে।—কেন? এ মেয়েটা কি খদ্দের? কিন্তু এমন মেয়ে—সঙ্গে কোনো লোক নেই। ভাত মাছ খেলে দাম দেবার পুরুষ কই! তাই সদয়-কুমারের কানে পৌঁছে দেবার জন্যেই জোর ডাকে, বাবা—বাইরে এস তো। কে ডাকছে—?

আজ প্রথম বেলা থেকেই খদ্দেরের ভিড়। হয়তো নতুন কোনো খদ্দের এই ভেবে সকড়ি হাতেই সামনে দাঁড়ায়। কে? কি হয়েছে?

মধ্যবয়েসী বেঁটে খাটো বিধবাটা কাছে এসে পায়ের উপর ঢিপ করে গড় জানায়।

এখনও হাতে ভাত লেগে। ধোওয়া হয়নি। খদ্দেরজনকে মা অন্নপূর্ণার দানা ঝড়া থেকে তুলে দিতে হবে। সে অবস্থায় কে—কোন জাতের মেয়ে ছুঁয়ে দিল! ভাত নিয়ে অশুচিতা তো খুব গর্হিত কাজ। আবার ব্রাহ্মণের ছেলে। তাই খানিক রাগ আর অসতর্কতায় কুণ্ঠিত গলায় বলে, কী বলতে চাও—বল না?

—বাবু। মকবুল সাহেব পাঠালে তোমার হোটেলে ঝি লাগবে। তাই আমি—

—হ্যাঁ। বলেছিলাম বটে, একবার নতুন সবুজ পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকায় সদয়কুমার। জবারানীকে খানিক টের পায়। পট করে বলে, তুমি দাঁড়াও। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি—

মেঝের দু-দিকে খদ্দেরের সারি। তারা ভাতে ডাল মাখায়—কেউ ঝোল মাখায়—। জবারানী বিধবাটাকে বলে, মা তুই কাজ করবি ?

—হ্যাঁ গো মা। পেট ভাতায় হলেও করব—

—ঘর কোথায়—কোন দেশে ?

বড্ড কঠিন প্রশ্ন! আকাশ তলে কত গ্রাম খাল পুকুরঘাট হাট বাজার! কোন দিক দিয়ে গেলে পৌঁছনো যায়! তখন পাকা রাস্তায় বড় বড় দুটো বাস সাইড করে। সাইকেল রিক্সা সরে দাঁড়ায়। গাঙ পথে বোটে করে এসেছিল এ মহকুমায়। এক মাঝরাতে। চারদিক যে আঁধার ছিল! তারপর তো এখানে ওখানে ঠেক খেতে খেতে উকিলবাবুর ঘরে থালাবাসন মাজার ঝি। সেই বাড়িতে আশ্রয়। বিধবাটা মনে মনে খানিক হাঁচিয়ে কাহিল। বলে, দেশ আছে রে মা। কোন দিকে ভুলে গেছি। ভৈরব কথাটা শুনে কেমন বিহ্বল! ভাবে, আমাদেরও তো একটা গ্রাম···পাড়া ছিল···সেটা যে কোন দিকে···!

পর্দার ভিতরে খদ্দের হাঁকে, কই গো খোকা খাবার জল দাও। সম্বিত ফেরে ভৈরবের। তাড়াতাড়ি জলের ঘটিটা নিয়ে ভেতরে ঢোকে। একই হোটেল ঘর। শুধু একটা পর্দার জন্যে তো ভেতর আর বাহির।

—রাতে কোথায় থাকবি ? জানতে চায় জবারানী।

—আটচালার ওপারে সরাইখানার দাওয়ায়। হোগলা ঘিরে থাকতে দেছে বুড়ি মাসিটা—

সব শুনে জবারানী বলে, কাজে লাগবি তাহলে ?

—হুঁ। এখন থেকে থালাবাসন মাজব।

জবারানী ভেতরে ডেকে আনে। নতুন মেয়ে খিড়কি দরজার আলো বাতাসে দাঁড়ায়। কাঁচা গরান কাঠের গন্ধ। কত নোনা জঙ্গল জলের জোয়ার ভাটায় ভিজেছে গাছগাছালি অবস্থায় কাঠগুলো! বক শামুকখোল এদের ডালে পাতায় কতবার বসেছে আবার চরের মাছ খুঁটে খেয়েছে···! যেন নিজের হারানো গাঙ পাড়···স্বামী স্বজনদের বাস্তুভিটের দেশ গাঁয়ের গন্ধ পায়।

গোল মুখ ওল্টানো চুলে বড় মাথা। শক্ত চেহারার দাবনা পিঠ। ডান বাহুর পেশি ঘিরে তামার বালায় রুপোর মোটা মাদুলি। কাপড়ের উপর হাফশার্ট গায়ে। এক জোড়া জব্বর বুট পায়ে। খটমট হেঁটে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকে, ও ঠাকুর্দা—ঠাকুর্দা—

সদয়কুমার হুড়মুড়িয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। —আরে ভীম ভাই ?

হাতের ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বলে, ঠাকুর্দা এটা গুছিয়ে রাখ—আমাদের সাত আটজন এসে খাবে—

সদয়কুমার ব্যাগটা হাতে নিয়ে শঙ্কিত। ভীম নিজের বুকে হাতের টোকা

মেরে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলে, রাখ না গুছিয়ে। ঘণ্টা খানেক পরে আসতিছি—

তবুও ব্যাগটা গ্রহণের বদলে যেন ফেরতের বাসনা বেশি।

—কোনো ভয় নেই। কে বলছে বল তো ? ভীম—যার নামে লাট···গোটা দক্ষিণের রাত কাঁপে—।

সদয়কুমার মনে মনে বলে, তা কাঁপে—

লোকটা গাট্টা গোট্টা চেহারায় মাঝারি উচ্চতা। ভারি বুটে কপা ফেলতেই পাকারাস্তার ওপার। কালীমন্দিরের সামনে ইট বাঁধানো সিঁড়ির ধাপ কেটে কেটে নামে। বাঁয়ে মন্দির, বাসঘরি মান্নার দোকান। সামনে শুকনো অশ্বত্থ পাতা। জুতোর চাপে পাতা মড় মড় ভাঙে। ডাইনে নন্টুবাবুর মুদিখানা। আরও এগোয় ভীম। পাঁচ আইন পুকুরে শানের ঘাটে দু-পটির মেয়েরা আলগা পিঠে দাঁতে শায়া কামড়ে বুক ঢেকে সাবান মাখে। ঘুপচি দোকানে খালি চা-গ্লাসে দিশি মদের গন্ধ। ভৈরব লোকটার চলে যাওয়া অবাক হয়ে দেখে!

সদয়কুমার বলে, জাঁহাদার লোক। বড় ডাকাত—।

ভৈরব বিস্মিত! লোকটা গলিতে নেমে কোথায় কার ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছে। ভৈরব কিছু জানে না। তবুও তার চোখের সামনে থেকে আস্ত ভীম যায় না। ভাবে,···ডাকাত তাহলে এমন দেখতে! জবারানী ডাকে বিধবা মেয়েটাকে, ও মা আয় কটা খদ্দেরের থালা বাসন তুলে নে—

বিধবা মেয়েটা মেঝেয় খদ্দেরের এঁটো কুড়োয়। একসঙ্গে এতগুলো থালা কাচের গেলাস যে কেমন করে সামলাবে ঠিক করতে পারে না। জবারানী বলে, এই···এই···। থেমে যায় জবারানী। বার বার একটা কিছু নাম আসতে চায় মুখে। তখন বলে, ও মা তোর নাম কিরে ?

নাম! নাম দিয়ে সেই শৈশবে বাবা মায়ের পর তো আর কেউ ডাকেনি! সে নাম নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে কোনো মোহ বা স্মৃতিও তৈরি করেনি। বরং গায়ে লেপ্টে থাকা থান কাপড়টা অনেক আপন। জিভে সে নাম আসতেও চায় না। উচ্চারণে কেমন বেসুরো। তার ব্যঞ্জনা যে কত অপরিচিত। সমাজে সে ছাড়া আর তো কেউ নিজস্ব নামটায় স্বীকৃতি দেবে না! তাই বলে, মা গো আমাকে সকলে মেজো-সেজোর মা' বলত।

—ছেলে দুটো কোথার রে ? বুড়ি মাসির দাওয়ায় ?

জবারানীর কথায় বিধবাটা কুঁকড়ে যায় অন্তরস্থ ব্যথায়। জবার নজরে ধরা পড়তেই সব এড়িয়ে বলে, ও মা বেঁটেখাটো মানুষ তুই। তোকে ভাঁটি বলেই ডাকব—। কি তাই তো ?

বিধবা মেয়েটা জবারানীর মুখের দিকে উদাসীন তাকিয়ে থাকে। ভাবে, বাবা মা কোন কালে ডাকত মঙ্গলা। তারপর চিত্রনাথের সঙ্গে বিয়ে হতে শ্বশুর ঘরে বলত, চিত্রর বউ। ছেলেপুলেগুলো হতে সকলে ডাকত মেজ-সেজোর মা। এখন ভাঁটি নামে ডাকলেই বা। একটা মানুষের নাম বদলে গেলে কি এমন ক্ষতি ? যার সম্পত্তি নেই···সংসারে আর তেমন কিছু নেই!

জবারানী বলে, ও মা ভাঁটি গেলাসগুলো তুলে আগে জলের মেজলায় দিয়ে

আয়। ভেঙে গেলে খদ্দেরকে জল দিবি কিসে ?

বাসটা বেরিয়ে যেতেই পাকা রাস্তায় খট্ খট্ শব্দ। নিতাই মালি দোকানের আয়নায় ধুলো মুছতে মুছতে বলে, ও বাপ ভৈরব ?

—কি গো কাকা ?

—ওই দেখ, কে যায়—

পাশের দোকানদার নিতাই মালির সমর্থন পেয়েই ভৈরবের মনে জোর। চেঁচায়, মাথায় হরি। পোস্টমাস্টার পাট করে আঁচড়ানো মাথায় ধীরে ধীরে হাত বোলায়। খালি হাত জনসমক্ষে উল্টে পাল্টে দেখে আবার হাঁটে।

ভৈরব চেঁচায়, কানে হরি—

পোস্টমাস্টার দু-কানে আঙুল চালিয়ে একটু ঝাঁকি দেয়। পরে আঙুলের ডগা ভালো করে দেখে। একান্ত গতিতে হাঁটে।

—জামায় হরি।

পোস্টমাস্টার দাঁড়িয়ে জামাটা টেনে টুনে দেখে। আবার একটু ধুলো ফেলার মতো ঝাড়ে। উত্তেজনায় ভৈরব চেঁচায়, জুতোয় হরি—পোস্টমাস্টার আর না দাঁড়িয়ে সোজা হাঁটে। হাতের মুদ্রায় কালীমন্দিরের দিকে চকিতে প্রণাম জানায়।

ওপারের গাছতলায় নাপিত প্রফুল্ল জোরে হেঁটে এপারে আসে।—হ্যাঁরে খোকা ঠাকুরের নাম তো ? জুতোয়, পায়ে বলতে নেই। মাস্টারমশাই তবুও তো এত লোককে তিন চারবার হরিনাম শোনায়—

কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে। তাই চুপচাপ ভৈরব।

ভাঁটি থালা বাটি গেলাস ধুয়ে আনে। খেতে বসার মেঝেটা ন্যাতা দেয়। ভিজে হাত পরা কাপড়ের আঁচলে মুছে রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায়। অবাক চোখে উনুন জোড়া দেখে। বড় বড় কড়া দু-তিন খানা। ঝড়ায় ভাত ঢালার কৌশলটাও দেখে। নিজেরা তো ভাতের ফেন কখনও ঝরিয়ে ফেলে দেয়নি। ভাত ভাতের ফেন উভয়ই যে কত মহার্ঘ !

মানুষটা আগে আগে পার হয়। পিছনে মহিলাটি। আঁচল লুটিয়ে যায় পাকা রাস্তায়। আবার সেটা টেনে বুকের কাছে পোঁটলা করে। বেঁটেখাটো মানুষটা মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ে পোঁছে পিছনে তাকায়। মহিলার ফরসা মুখ চোখে মদের ঘোর। কালো চটি পায়ে ফটাস ফটাস শব্দ।

নেশাগ্রস্ততায় পাশ থেকে হাতটা ধরে বলে, ও বন্ধু ঘরের মধ্যে অত ভালোবাসলে—বাসরাস্তায় একলা ফেলে চলে এলে—

বেঁটেখাটো লোকটা এতটুকু বেচাল নয়। আস্তে করে বলে, সঙ্গে তো ছিলুম পিয়ারি—

হাঁ। ছিলে মেরে প্যায়ার কা আদমি—। চল ভাত খাওয়াবে—

লোকটা বলল, ঠাকুর্দা একদম ভিতরে খেতে দাও তো—

সদয়কুমার ফিসফিস করে বলে, ভীম ভাই দুজনকেই।

—আলবাৎ।

খিড়কি দরজার দিকে আলো বাতাস। কোণের মাচায় ঘুটের বস্তা। তলায় কয়লা। এক টুকরো পাথরের উপর পুরনো একটা এক সেরি বাটখারা। দ্রুত ঝাঁট দিয়ে জবারানী আসন দুটো পেতে দেয়। ভাঁটি দুটো কাচের গেলাসে জল দেয়। যেহেতু মাটির মেঝে, বর্ষায় টিন গলে বৃষ্টি পড়ে মাটি খানিক খোদল। গেলাস দুটো সাবধানে রাখে।

আগেই আসনে বসে ভীম ডাকাত। তার ডাইনে পিয়ারি। সদয়কুমার এক থালা ডাল তরকারি ভাত এনে চকিতে বিব্রত! আসল খদ্দের তো ভীম, তাই থালাটা তার সামনে বসিয়ে দেয়। পিয়ারি তখনও ফাঁকা। ভীম হঠাৎ বলে, ঠাকুর্দা আর থালা লাগবে নি। একটাতে সব দিয়ে যাও—, বলেই আমন্ত্রণ জানায় পিয়ারিকে, নাও শুরু কর।

মাতাল পিয়ারি মুগ্ধ বিস্ময়ে থ! কাঁচা মদ গিললেও পেটে তো ভাত মাছের খিদে। ভীম প্রথম চোটে দু-এক গরাস খেয়ে নেয়।

পিয়ারির হাতের মুঠোয় এক ডেলা ভাত ডাল। ভীমের গালের কাছে নিয়ে বলে, হা করো—খাও। পিয়ারির বাঁ-হাতটা তার পিঠে। একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার পরশের শিহরণ! তখন ভীমের মনে হয়, সর্বশরীর দিয়ে খুঁজে খুঁটে কিই বা এমন পাওয়া যায়! হঠাৎ এক গাল ভাতে ডাকাতের বুক কাঁপে কেন…! নিজে খানিক মাছ ছাড়িয়ে পিয়ারির গালে দিয়ে বলে, খা মিতে খা—। আবার কবে দেখা হয়…

দু-জনে নিজের হাতে খানিক খায়। আবার খাইয়ে দেয়।

পিয়ারি বলে, ওসব ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে থাকো না বন্ধু—

ভীম বলে, খাব কি?

—আমি রোজগার করব—। আর তুমি অন্য কিছুতে রোজগার করলে আমিই সব ছেড়ে দুবো—।

পিয়ারির হাতে সরু ক'গাছি সোনার চুড়িতে ঝিন্ ঝিন্ শব্দ। এমন আন্তরিকতার উত্তাপে ডাকাতের বুক চিরে যায়। মনে পড়ে, বউটাও তো বলে—আট দশ বিঘে জমি। ঢের করেছ—একটু নেড়ে চেড়ে খেয়ে ঘরে থেকে সংসার করি এস—। কিন্তু…

ভীম পর পর ক-গাল ভাত মাছ খায়। খায় পিয়ারি। দেশি মদের নেশায় তার হাতের ভাত মুখের পাশ দিয়ে ঝরে পড়ে। আর এক মুঠো ভাত ডাল গালে পুরেও ডাকাতের খিদে ভরে না। ভরে না বলেই তো রাতের আঁধারে পুরো দল নিয়ে বাড়ি চড়াও হয়।…তখন সে বাড়ির সোনা গয়নার বাজনা…একসঙ্গে কত টাকার গন্ধ…দাপুটে দাম্ভিক বাবুলোক, জোত জমির বাবুরা পায়ের কাছে গড়িয়ে সম্পত্তি ভিক্ষে করে…! তখন বাবুদের সে সম্পত্তি দম্ভ যে কোথায় কোন কালে…যুগের গর্তে ভাটার মতো ফিরে যায়…!

কোর্ট থেকে বেরিয়ে পড়ে মুহুরি। এদিক ওদিক খুঁজে সিধা মহারানী ভোজনালয়। বলে, সদয়দা—ভীমেটা এখেনে এসেছে?

—হুঁ। খাচ্ছে—

—কই ? বলে ভেতরে ঢুকে বিরক্ত। কড়া গলায় বলে, মদ গিলে তুই হাকিমের এজলাসে দাঁড়াবি ? তোকে যে পাঁচ আইনে ফেলবে—

—মাইরি দাদা তেমন খাইনি

—নে শালা, বলে স্মরণ করিয়ে দেয়,—টিফিনের পর জজ কেস ধরবে—।

বিড় বিড় করে নিজের মনে, হয়তো তোর আজই সাজা হয়ে যায় রে··· !

বাতাসে ঘ্রাণ পায় ভীম। উঁচু দেওয়াল সশস্ত্র পাহারা। মোটা মোটা লোহার গরাদের মধ্যে চাইলেও তো নারী পাবে না। তাই পাশে পিয়ারিকে কাছে টেনে শক্ত হাতের চেটোয় ধরে। নিজের পেশিময় বুকের মাঠে নারীটাকে···রমণীটাকে ···নিয়ে এক গাল ভাত মুখে ঠুসে বলে, এই শালি খা—খানা রে···

একটা চাপা আতঙ্কে পিয়ারির ভারি বুক ভীমের চোখে ওঠে নামে। শ্বাসে উত্তাপ। কী যে লুট করে নিয়ে যেতে চায় ডাকাতটা··· !

তেত্রিশ

বেঞ্চটায় বসে ঠোঙায় মুড়ি তেলেভাজায় হাত গলায় অজয়বাবু। দুপুরবেলায় কোর্টে চতুর চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। কথাবার্তার পর ঠিক হল, আজ রাতে নয়। কাল সকালে সেরেস্তায় কাগজপত্র দেখে বুঝে একটা আর্জি লিখবে, ভাবতে ভাবতে ঝাল চপটায় কামড় দিতেই জিভে জ্বালা। তাড়াতাড়ি ঠোঙায় মুড়ি খোঁজে অজয় মাস্টার। কম জ্বালা নিয়ে দ্বীপ থেকে বোট বেয়ে খানিক হাঁটা পথ পার হয়ে বাস ধরা! আর্জি লেখাটা যদি আজ রাতেই শেষ করা থাকত! চিড়বিড় করে জিভটা। সাদা মুড়িতে সামান্য উপশম। তাই বুকের চিড়বিড়ানি কমাতে রাস্তাটার দিকে তাকায়। সাইকেল রিকশা বাসগুলোর যাতায়াত দেখে।

বেলা শেষের হোটেল ঘর। পর্দা দুটো একধারে গুটোনো। রাস্তার রোদ আলো সোজা ঢুকে ভেতরটা খোলামেলা। এখন তো মহারানী ভোজনালয়ে গেরস্তালি কাজকর্ম। শুকনো কাপড় পাট করে জবারানী। চুলে চিরুনি চালায় বিধবা ভাঁটি। সদয়কুমার খেজুর পাতায় বোনা চাটাই পেতে একটু গড়িয়ে নেয়।

অজয় মাস্টার বলে, ঠাকুরমশাই খাবার জল দিবেন গো ?

—ও ভাঁটি, বাবুকে জলের ঘটি গেলাস ধরে দে—অনেক দূর থেকে আসছে।

চিরুনি থেকে গুলতি পাকানো চুল আঙুলে জড়িয়ে খিড়কির বাইরে চেলা গরান কাঠের গোঁজে ফেলে দেয় ভাঁটি। জলের ঘটি গেলাসে দু-হাতের আঙুলগুলো ভিজে। মানুষটার পাশে কাচের গেলাস জল রেখে একবার রাস্তার ওপারে তাকায়। বেলা পড়ে রোদ নিরুত্তাপ। কোর্ট কাছারি সেরে ফিরতি মুখে দু-একজন গোঁফ দাড়ি কামায়। সেই বেসাতির আশায় তো কাঁচি ক্লিপ নরুন পেতে এখনও বসে প্রফুল্ল আর রামা নাপিত। প্রফুল্ল আসে দু-তিনটে গ্রাম হেঁটে। রামা তো দূর বিহারের কোন দেহাতের! বউ বাচ্চা কত রেলপথ পাহাড়ের

ওপারে। এখানে ডেরা নিয়েছে একলা মানুষ।

সারাদিন জল ঘাঁটা—ন্যাতা মোছায় হাত ভিজে গেলেও এতক্ষণ শুকনো ছিল। ঘটি গেলাসের জলে বড় বড় নখ ভিজে নরম লাগে। কাটতে গেলে যে ধারালো একটা নরুন দরকার। তাই আর দেরি না করে রাস্তাটা পার হয় ভাঁটি। দু-পরামানিকের কাছে তো দুটো নরুন। দু-জনেই চেনা মুখ। কার কাছে যে বসা যায়! দু-জনেই মুখপাতলা পুরুষ। প্রফুল্লর তো কটা গাঁ হাঁটলে বউ বাচ্চা। কিন্তু রামের···রামা নাপিতের···! কোথায় যেন ফাঁকা জায়গা পায়। ধপ করে বসে রামার পাশে। নিজের দুপাশটা তো ভীষণ ফাঁকা। সেই ফাঁকে সেঁধিয়ে ভাঁটি রামাকে বলে, দেবে গো তোমার নরুনটা? নখগুলো বনমানুষের মতো হয়েছে। কেটে ফেলাই—

প্রফুল্ল গায়ের কাছে। বাতাসে সাফসুফো ভাঁটির গন্ধ পায়। একটু তো দূরে রামার কোল ঘেঁষে। চাপা জ্বালায় নিজের মনে জপে, বনমানুষ তো নয় বন মাগীর মতো।

রামা নরুনটা হাতে নিয়ে বলে, দেখি তোমার হাঁত—

পুরুষের কণ্ঠে তার মতো খাটুনে মেয়ের হাত দেখার ইচ্ছে। সানন্দে দু-হাতের চেটো দেখায়। উল্টো চামড়ায় তখনও জল লেগে। —বড্ড বড় বড় না?

—সাবধানে লাগাও—। ধার মত্ লণ্টো করবে—হাতে হাত ছুঁয়ে শাণিত নরুনটা নিতেও যে বুকের ভেতর কেটে যায়। রক্ত ঝরে না।

রামার নরুনে খুব মন দিয়ে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা কাটে ভাঁটি। পরে অনামিকারটা। তখন প্রফুল্ল বলে, কী হল? আমার নরুনে বুঝি ধার নেই—?

বেঁটে খাটো গোলমুখে হাসি। খালি গায়ে আঁচল দিয়ে বুক ঢাকে তো পিঠ খুলে যায়।

বাসটার পিছনে পিছনে আওয়াজ। লোকজনের ভিড় ছায়াময় শেষবেলায়। মাঝে মাঝে দুম্···ডুমা···দুম···আওয়াজটা কানে আসে। বাস রবারের হর্ন টিপে লোকজন সরায়। মানুষের রাস্তায় বাস না, বাসের রাস্তায় মানুষ? লোকজন সরে যেতেই বাসটা বেরিয়ে যায়। তিনদিকে চাঁচের দরমা ঘেরা রিকশাটা আসে। তিন গায়ে তো নায়ক নায়িকা ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে। ঢোল বাদক ছোট্ট লাঠিটা তালে তালে ঠোকে। চামড়া শব্দ তোলে গ্যাড্ডা···গাড্ডুম···গ্যাড্ডা ···গাড্ডুম···ভৈরব ছুটে এসে সামনে দাঁড়ায়। সন্ধে ছটার শোয়ের আগে প্রচার পর্ব। মুগ্ধ হয়ে শোনে। দেখে চাঁচের গায়ে সাঁটা চলচ্চিত্রের আবেগময় মুহূর্ত। অজয় মাস্টার পুরনো খদ্দের। ঠোঙায় মুড়ি শেষ করে আর হাতে কাজ পায় না। চোখের কাছে সিনেমার বিজ্ঞাপন। সবে পাঁচটা পনের কুড়ি। শো শুরু হতে এখনও অনেক দেরি। ভৈরবটাও কেমন আগ্রহে লোলুপ।

অজয় মাস্টার বলল, ও খোকা যাবি বায়োস্কোপ দেখতে?

জবারানী কাছে আসে। —কোথায় গো বাবু?

—টকি শো দ্যাখতে

জবারানী কথাটায় খানিক ধাঁধায় পড়ে।

—সিনিমা শো—বায়স্কোপ গো মেয়ে

ভৈরব মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলে, যাই মা ?

ভৈরবের গায়ে ইস্কুলের জামা প্যাণ্ট।

—তোর বাপকে বলে যা—

সদয়কুমার সব শুনে বলে, অজয়বাবু যাচ্ছে। তাহলে কি— ? যাক।

পাকা দেওয়ালের উপর অ্যাজবেস্টার ছাউনি দিয়ে ঘরটার গায়ে পর পর ক-খানা জানালা। গরাদের উপর মোটা তারের জালে খোপ কেটে হাত গলাবার জায়গা। দেওয়ালে লেখা প্রথম শ্রেণী টাকা আনা দ্বিতীয় শ্রেণী·· তৃতীয় শ্রেণী ···। টিকিট কেটে বেরিয়ে আসে অজয় মাস্টার। ভৈরব দেখে টিকিট ঘরের পিছনে কত বড় টিনের ছাউনি···। গায়ের দেওয়ালও টিন দিয়ে ঘেরা। সেই উনিশ-শ পঁচিশ ছাব্বিশ সালের ঘর। ব্রিটিশ আমলের করোগেট টিন। টিন কেটে দরজা পর পর ক-খানা। ছোট ছোট কয়েকটা জানালা। টিনের দরজার গায়ে লেখা "প্রবেশ পথ প্রথম শ্রেণী", "প্রবেশ পথ দ্বিতীয় শ্রেণী", "প্রবেশ পথ তৃতীর শ্রেণী"। এখন তো এটারই পাশে খানিক ছাড় দিয়ে কী বিশাল পাকা দালানে কোঠায় রঙচঙে সিনেমা হল। দূরে খালের দিকে বাঁধা ঘরে ভট্ ভট্ শব্দে ডায়নামো ঘোরে।

হলের উপর বারান্দায় "কিরির···কিরির···" টানা বাজনাটা হয়। অজয় মাস্টার বলে, চলু বাপ্—

ভৈরব হাঁ করে তাকিয়ে থাকে টিনের দরজাটার দিকে। একজন লোক "প্রথম শ্রেণী প্রবেশ পথ" টিনের দবজায় মোটা তালা খুলে দিতেই পর পর ক-বস্তা চাল গম মাথায় মুটে ঢোকে! টিনের ছাউনির ওপাশে মোটা নিম গাছটার পাতা দোলে সন্ধে মুখের হাওয়ায়।

—কী দেখ্, রে বাপ্ ?

—ও ঘরটার গায়ে অমন লেখা কেন ?

—আরে অউটা তো এক সময় সিনিমা হল ছিল। সেই কালের সেই ছবিতে কথা ফুটতনি—

ভৈরব অজয় মাস্টারের কথাগুলো সমীহ সহকারে শোনে। শিক্ষক মানুষ এমন বিনীত ভঙ্গিতে ছাত্রবৎ ছোকরা পেয়ে বলে, সোঁ নির্বাক ছবিতে কানন দেবীর পাট দেখ্ছি—। সেই হলে তো বাবুদের ফুড কর্পোরেশনের গো-ডাউন। পাশে পাকা দেওয়ালের গায়ে সুচিত্রা উত্তম। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ভৈরব ভাবে, টিকিট বাঁচাতে মায়ের কোলে উঠে তো দু-একবার পাকা হলে সিনেমা দেখেছি। তখন বাবা তো এসব বলেনি! জানে না বলেই কী বলেনি? না দেখেনি বলে জানতে পারেনি···!

হলের বারান্দায় আবার কিরিরর···কিরিরর···আওয়াজটা। অজয় মাস্টার হাত ধরে টানে, ভৈরব চলু। বুসবো ভিতরে চিয়ার আছে—

হল ভর্তি কুপকুপে অন্ধকার। হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে আলোর নালা বেয়ে সাদা পর্দায় ঝিকমিক। লোহার খোঁটায় ভারতের পতাকাটা পত্‌পত্‌ ওড়ে। অশোক স্তম্ভ আঁকা একটা ঝলক। ফিল্ম ডিভিসনের ছবি :—

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আর সঙ্গে কৃষ্ণ মেনন। দু-জন জেনেভা সম্মেলনের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন।

এই ভিয়েতনামের রাজনীতির কলকাঠি তো ছিল প্রথমে প্যারিসে। পরে ওয়াশিংটন। সেখান থেকে সরে এল সুইজারল্যান্ডে জেনেভায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার, আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেটস ফস্টার ডালেস, ফরাসি প্রধানমন্ত্রী মেঁদের হাত থেকে ক্রমে ইডেন, মলোটভ নেহরু চৌ এন লাইয়ের দায়িত্বে। "…জেনেভার 'প্যালাইস দেস নেশনস' এ প্রথম দিকে একজন মানুষকে খুবই তৎপর দেখা যায়। মুখ লাল, ঠোঁটে চাপা ক্রোধ ও ঘৃণার হাসি। মন কিন্তু অস্থির, অশান্ত। একটার পর একটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হচ্ছে। কাউকে দলে টানতে পারছেন না।…কোরিয়ার অভিজ্ঞতায় সবাই নতুন করে এশিয়ায় অশান্তি ডেকে আনার বিপক্ষে।

শ্রী নেহরু যে ইডেনের মাথা খেয়েছেন তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ মেননকে দেখে চট করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নির্বান্ধব মানুষটি আর কেউ নন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিনিধি, জন ফস্টার ডালেস।

ঝানু আইনজীবি, রুশ ও চীন বিরোধী চক্রান্তের অন্যতম নেতা।…দক্ষিণ আমেরিকায় ও দূর প্রাচ্যে কোটি কোটি ডলারের মার্কিন মূলধন প্রবেশের অন্যতম পলিসি-মেকার। লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে নিত্য নতুন সামরিক জল্লাদকে নিজের ইচ্ছেমতো তুলছেন-ফেলছেন। হন্ডুরাস থেকে তাড়া করে এসে গুয়াতেমালার গণতান্ত্রিক আরবেঞ্জ সরকারকে ধ্বংস করবার আনন্দ সুখ তখনও ফুরিয়ে যায়নি। …ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট আবার আনবিক বোমা বর্ষণের পরিকল্পনা নিয়ে লন্ডন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাঁটু ভেঙে বাইবেল পাঠ শেষ করেই 'Asian fight Asians' পরিকল্পনা সাজাতে ব্যস্ত। ঘুমিয়েও তিনি এ গোলার্ধ থেকে ও গোলার্ধে ডলার নৃত্য দেখেন।

ভিয়েতনামের ডেমোক্রেটিক রিপাবলিককে সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দানের প্রশ্ন উঠতেই বেডেল স্মিথকে সঙ্গে নিয়ে কনফারেন্স ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কাম্বোডিয়া ও লাওস-এর মতো হো-চি-মিন রিপাবলিককে স্বীকৃতি দানে তাঁর বিস্তর আপত্তি।

চিন ও রাশিয়া দাবি করে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকই ভিয়েতনামের ন্যায়-সঙ্গত শাসন ক্ষমতার অধিকারী।

নিতান্তই একজন পর্যবেক্ষকরূপে জেনেভায় বেডেল স্মিথকে রেখে ডালেস ওয়াশিংটনের পথে প্যারিস রওনা হয়ে গেলেন। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের শেষ চালে গোটা জেনেভা কনফারেন্স কীভাবে বানচাল করা যায় সেই চিন্তাতেই তিনি অস্থির।

ইডেন তখন ডালেসের প্রস্তাব নিয়ে চার্চিলের চেকার্স পল্লিভবনে গভীর

আলোচনায় লিপ্ত। চুরুট ফুঁকছেন চার্চিল আর আর প্রবল বেগে মাথা নাড়ছেন। ডালেসের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে কমন্স সভার অধিবেশনে মিলিত হবার জন্যে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে যাবার জন্যে তৈরি হন চার্চিল। মলোটভ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক-এর প্রতিনিধি ফাম-ভন দঙকে (হোচিমিনের পক্ষ থেকে) অবিলম্বেই জেনেভায় আসবার জন্যে জরুরি তার প্রেরণ করছেন। আর কৃষ্ণ মেনন? বিশ্রাম নেই মানুষটির। কনফারেন্স যাতে ভেঙে না যায় তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

একবার (কাম্বোডিয়ার) নরোদম সিহানুক-এর ওখানে কাম্বোডিয়া পরিস্থিতি নিয়ে গভীর আলোচনা করছেন, আবার গভীর রাত্রে মঁদে ফ্রান্স-এর সঙ্গে দেখা করে শান্তি ও ভিয়েতনাম পরিস্থিতির সফল সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে ডালেসকে কতটা চটানোর ঝুঁকি নিতে হবে সে প্রসঙ্গে চাপ সৃষ্টি করেছেন। সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে শেষ রাত্রে শ্রী নেহরুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন। দিয়েন বিয়েন ফু-র অবস্থা ওদিকে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। এক একটা কমান্ড পোস্ট গেরিলাদের হাতে চলে যাচ্ছে আর ভন গিয়াপের হাতে ফরাসি সেনারা পিঁপড়ের মতো মরছে।

এই সময় একজন মানুষকে দেখা গেছে আশ্চর্যরকম আশাবাদী। জেনেভা সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। কোরিয়ান ক্রাইসিস শান্তিপূর্ণ-ভাবে মীমাংসার পর দূতাবাসে ছুটতে ছুটতে আসছেন। নিদারুণ ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি 'সিটি লাইটস' দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করায় স্বয়ং চার্লি চ্যাপলিন এসেছেন। অতিথিকে ডিনারে আপ্যায়নের জন্য দরজার সামনে প্রতীক্ষা করছেন। তার মধ্যেই সুযোগ করে নিয়ে একবার কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরতি ও শান্তিপূর্ণ সমাধানে শ্রী নেহরুর ছয় দফা প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমী এই ব্যক্তি জেনেভা সম্মেলনের অন্যতম প্রধান চরিত্র। এক সঙ্গে প্রায় চার পাঁচটি ভাষায় রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলছেন। গলাবন্ধ কোট পরা এই মানুষটি আর কেউ নন—চৌ-এন-লাই।

কাম্বোডিয়ার বিভিন্ন দলকে রাজা নরোদম সিহানুকের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক ও রাজনৈতিক দল রাজকীয় সরকার মনোনীত নির্দলীয় প্রধানমন্ত্রীকে মেনে নেওয়ায় সমস্যারও সমাধান হয়। কিন্তু কোরিয়ার মতো ভিয়েতনামকে দু-ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব ভিয়েতনামের ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক প্রতিনিধি ফাম ভান দঙ মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তাছাড়া প্রশ্ন উঠল ভিয়েতনাম ভাগ হবে কী নিয়মে? ফ্রান্স প্রস্তাব রাখে—কোচিন চিনের পুরনো ঔপনিবেশিক এলাকায় সীমান্ত টানা হোক। ব্রিটেন প্রস্তাব দেয়—১৬ অক্ষ সমান্তরাল ধরে ভিয়েতনাম সাময়িকভাবে ভাগ করা যেতে পারে। সায়গনের 'স্টেট অব ভিয়েতনাম'-এর প্রতিনিধি ত্রান ভান দো মার্কিন চাপে দাবি জানান ২০ অক্ষ সমান্তরাল ধরে ভিয়েতনামকে ভাগ করা হোক। ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকের প্রতিনিধি ফাম ভান দঙ সমস্ত প্রস্তাব নাকচ করে বলেন, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও দর কষাকষিতে তিনি রাজি নন। সাময়িকভাবে হলেও

দেশ বিভাগের প্রশ্নই ওঠে না।

সম্মিলনের বাইরে থেকে (লাওস-এর) প্যাথেট লাও প্রতিনিধি ও কনফারেন্স-টেবিলে বসে চৌ-এন-লাই দণ্ড-কে সমর্থন করেন।

জেনেভা কনফারেন্স প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম।

সম্মিলনের যুগ্ম সভাপতি ইডেন ও মলোটভ শেষ চেষ্টা করে চলেছেন। ইন্দো-চিন সম্পর্কিত আলোচনা শেষপর্যন্ত যাতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয় তার জন্যে কৃষ্ণ মেননের অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এমন সময় ইডেন প্রস্তাব দিলেন ১৭ অক্ষ সমান্তরালে ভিয়েতনামের কোটি দেশ যেখানে সব চেয়ে সরু সেখানেই বিভাগের রেখা টানা হোক। মলোটভের সঙ্গে আলোচনার পর চৌ-এন-লাই এই প্রস্তাবে মোটামুটি রাজি হন ও প্রস্তাব দেন, ভারত কানাডা ও পোল্যান্ডকে নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রন কমিশন গঠিত হোক। ফাম-ভান-দণ্ড তবু আপত্তি তোলেন। যুক্তি হিসাবে তিনি নজির দেখান যে, প্রায় এক লক্ষ ভিয়েতমিন ও গেরিলাকে উত্তরে সরিয়ে আনতে হবে। অথচ সায়গনের ফরাসি-মার্কিন ঘেঁষা সরকারের ট্রুপস মুভমেন্টের কোনো ঝামেলাই নেই।

ইডেন ও মলটোভ তখন ব্যক্তিগতভাবে আশ্বাস দেন—সাময়িক দেশ বিভাগ এখন মেনে নিন। নির্বাচনের মাধ্যমে একটি মাত্র সরকার গঠিত হবার ব্যাপারটা আমরা দেখব। একটিমাত্র বৈধ সরকারকে বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া মেনে নেবে।

ফাম-ভান-দণ্ড ইডেন ও মলোটভ প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন। সারা রাত্রি ধরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ও সাময়িক দেশ বিভাগের খসড়া তৈরি চলল।

এমন সময় মূর্তিমান বাহুর মতো ডালেস রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। ফ্রান্সের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেন—"আপনাদের নির্বাচিত সায়গনের প্রতিনিধি বুলক্-কে আমরা চাই না। সায়গনের প্রধানমন্ত্রীর পদে আমরা অদ্বিতীয় এক মানুষকে খুঁজে পেয়েছি। আমরা নগো-দিন-দিয়েমকে সমর্থন করব—।"

ঐতিহাসিক সম্মেলন শেষ হল। ভিয়েতনামের যুদ্ধ বর্জন সংক্রান্ত চুক্তি ২০ জুলাই, ১৯৫৪।

অজর মাস্টার আর ভৈরব এই মফস্বলের সিনেমা হলে ভারত সরকারে তথ্য-চিত্রটা তো দেখছে ঘটনার অন্তর এক দেড় বচ্ছর পরে। এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মধ্যে জহরলাল ছাড়া ভৈরব আর কোনো মুখ তো চিনতে পারে না। শুধু কানে শুনে যায় কটা দেশ লওস কাম্বোডিয়া ভিয়েতনাম আর ক-জন মানুষ চৌ-এন-লাই নরোদম সিহানুক। ভৈরব তার সামান্য পুস্তক পরিচয় থেকে ভাবে, আমাদের ভারত ভাঙতে সাহায্য করেছে সাহেবরা··· । আবার এই দেশগুলোকে ভেঙে ভেঙে ভাগ করে দিচ্ছে সাহেবরা! কেমন ধরনের সালিশি করা প্রতিবেশী ···গ্রামবাসী···পৃথিবীবাসী!

এরপরই পর্দায় পানামা সিগারেট, বাচ্চাদের বলবর্ধক দুধের বিজ্ঞাপন

চিত্র। তারপর গোটা পর্দা ঝিলমিল করে আসল সিনেমার ছবিটা শুরু। ভৈরব অজর মাস্টার কাঠের চেয়ারে টান টান। ছবির কাহিনীর মধ্যে ঢুকে যায়। ভৈরবের চেনা গাছপালা আকাশ ফুটে ওঠে। পর্দার ঘটনায় ভাসতে থাকে নিজেও।

চৌত্রিশ

ফিকে লাল রঙে মস্ত প্রাসাদ। দোতলা বাড়িটার বড় বারান্দা। ঘন ঘন দরজা। জানালার খড়খড়িতে রঙ খানিক চটে জেল্লাহীন। নিচের তলার বারান্দায় সাদা পাথরের কাজ। বারান্দায় ওঠার বড় পৈঠে। পৈঠের দু-ধারে দুখানা বাঘ জড়বত বসে। জমাটি দিয়ে ধারালো দাঁত। গোল গোল নাটা চোখ। লোমশ পিঠ ছড়িয়ে কোমরে পিছনের পায়ের পেশি বেশ উঁচু। জমিদার বাড়ির প্রবেশ দ্বারে প্রহরী হয়ে ওত পেতে আছে কয়েক প্রজন্ম। সামনের দু-থাবার নখগুলো ভীষণ ধারালো। পাশে মোটা আকারে ইটের প্রাচীর। প্রায় শতাব্দী ক্লান্তিকাল থেকে মাটিতে গেঁথে আছে। প্রাচীরের গায়ে বড় দরজা। ভেতর বাস্তু উঠোন বাগানের পথ। ঘাস গাছপালার মধ্যে শ্বেত পাথরে নগ্ন বক্ষে যুবতী। লজ্জা বিধুর হাসি মুখে পাশে দাঁড়িয়ে। সিমেন্ট বাঁধানো সরু পথে তাদের গায়ের মদির সৌরভ। ভ্রু ভঙ্গি, সুগোল বক্ষযুগল আর সুঠাম নিতম্ব, কোটি ঘের, উরু জঙ্ঘার খাঁজ ভাঁজে কামনার্ত আমন্ত্রণ। কত লক্ষ বছরের যৌবন যে আগলে রেখেছে দু-পাশের রমণীগুলো। বাগানে বাঁধানো রাস্তাটার দু-পাশে রঙ্গন গোলাপ পাতাবাহারের ঝোপ। যুবতীগুলোর মাথায় গন্ধরাজ রক্তকরবী স্থলপদ্ম আর বাতাবি লেবুর ছায়া। গাছগুলোর ডালপালায় ছায়া ছাপিয়ে ফুল ফলের সুগন্ধ দীঘির জলেও। বড় দীঘির মতো পুকুরটা। টলটলে জল সকালের হাওয়ায় মৃদু কাঁপন তুলে পাড়ের ঘাস মাটিতে ঢুকে যায়। মোড়ল জমিদারদের বুড়ো মালি বাঁধানো পথ ধরে যেতে যেতে গোলাপ ঝাড় ঘেরা যুবতীকে বলে, কি গো গোলাপি সখি কেমন ছিলে ? বড় জমিদারবাবু রাত কাটাতে এসেছিল ? গোলাপি সখি মুচকি হেসে বিড়বিড় করে, তোমাদের বড় জমিদার তো বুড়ো হয়ে গেছে। তাদের ছেলেরা আসে মাঝে মধ্যে—গোলাপি সখির কথায় বুড়ো মালির চোখ চলে যায় বড় পুকুরের মাঝ বরাবর। একেবারে পাকা ঘাট থেকে পর পর ক-খানা কংক্রিট পিলারের উপর ঢালাই ফেলে পোলের মতো। তলা দিয়ে পুকুরের জল নির্বিবাদে ছোট ছোট তরঙ্গ রচনা করে। পুরনো মাছ চরে বেড়ায় জলে। মাঝে মাঝে পিলারের গায়ে শ্যাওলা কুচো পোকা খেতে আসে। পুকুরটার মধ্যিখানে ক-খানা উঁচু পিলারের উপর মন্দির আকৃতির গম্বুজ ছাদ। চারদিকে ঘিরে আড়াল। জাফরি বসিয়ে জলের ঠান্ডা হাওয়ার প্রবেশ পথ। গুপ্ত কক্ষে জলে ভেসে কাম কলার নিরাপদ ছাউনি। ছোট্ট বারান্দায় রেলিং ঘেরা। নীচে জল। জলে আকাশ। রাতে তারার ঝিলমিল পুকুর বোঝাই হয়ে। পাকা ঘাট থেকে ঝুলোনো পথটায় তো লোহার রেলিং। সে লোহা জলের উপর···জলো

হাওয়া ঝড় বৃষ্টিতে মরচে ধরে না। পাকা ছাউনি ঘেরা নিরালাটুকু তো মোড়ল জমিদারদের জলটুঙি।

মালি বুড়ো জল টুঙিটার দিকে তাকিয়ে বলে, এখন আর ওই টুঙিতে যাও?

—তেমন নয়। যখন ব্রিটিশ সাহেবরা ছিল—তাদের রাতভর খুশি করতুম। তোমার বাবুরা হাজার দু-হাজার বিঘে জলা জঙ্গলা—নয়তো ঢালা জমি বন্দোবস্ত পেত।

—এখন?

—দেখি, কোন দিশি সাহেব কবে এসে ভিক্ষে চায়

—বাবুরা?

—আগের বাবুরা জলটুঙিতে টেনে নিয়ে উঠত। তোমার বাবুর বউরা আমার এই থামে বসে চেয়ে চেয়ে দেখত আর চোখের জল ফেলত।

—এখনকার বাবুরা?

—দু-একটা বউ চোটপাট করে যে। তবু বাবুদের রোখ যাবে কোথায়? এ বাগানের না হোক কলকাতা আছে যে··· ! তোমার বাবুর বউরা মন খারাপ করে···আমার নিজেরও মর্যাদায় লাগে। কেন তবে আমাকে আনা···

বুড়ো মালি দু-চার পা এগোতেই স্থলপদ্মের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পাথুরে বউটা বলে, ও মালিদা—আমার নামে খুব লাগাচ্ছিলো বোধহয়!

—দুস্! ও ওর মনের দুঃখু কইছিলো—

—তাই! আমারও না বড় দুঃখ হয়। কেন যে আমার মানুষটা নায়েবের মুখের উপর মুখ ফুটে অত জ্বালা ধরানো কথা বলল! তারপর সে মানুষ কোন পৃথিবীতে···আর আমি কত রাত যে ওই জলটুঙিতে··· ! রাগও শেষ হয় নে বাবুর বিকারও কমে নে··· ! কেন যে মুখ ফুটিয়ে অত বলল··· ! কোন যুগেই বা বেশি মুখ ফুটোলে ক্ষমতার মানুষরা সহ্য করে··· !

ব্যথিত মনে মালি বুড়ো হাঁটে। রঙ্গন ঝাড় থেকে মেয়েটা হাত ছানি দেয়, ও মালিদা শোনো—

মালি বুড়ো মুখ বাঁকায়, কেন ডাকিস রে রঙ্গিণী নেকি—?

--মাইরি দাদা বিশ্বাস কর—সবে ভিজে কাপড়ে পুকুর থেকে উঠছিলুম। তোমার ছোটবাবুর সেজোটা—

—হুঁ

—সবে গোঁফ উঠেছে। আমার বয়েসী ছেলে, হোক না জমিদার বাড়ির! কেমন বোবা মেরে চেয়েছিল···! আমারও মনে হল গরিব চাষা ঘরের অমন বয়েসী ছেলেরা সেই কাঁচিবেলা থেকে বন্ধু। বড়লোকের অমন ছেলে যদি একটা বন্ধু হয়··· ! কেমন ঠাট্টা করে···, লুকিয়ে ভালোবাসে···, গায়ের মাংসে কেমন তাগদ ···, আদরে স্বাদ কত—জানতে মন ছিলো। সেওতো বলেছিল, তুমি এত সুন্দরী···

—তাতেই তুই ভুলে গেলি? বলল মালি বুড়ো।

—খানিকটা তো তাই। কত গপ্পে রাজার কুমার গরিব কনে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে কোন তেপান্তর পার হয়ে ছিল···

—দুস্ নেকি।

—তা আমি নেকি, মেনে নেয় মেয়েটা। আবার বলে, তোমাদের সেজোটা কোথায় গো ?

—নতুন বউ নিয়ে কত বচ্ছর ঘর করছে। তুই বাগানে পড়ে থাক—

—কেন থাকব ? আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধুরা তো মাঠে···দোকানপাটে ···তাদের কাছে যাব কোন পথ দিয়ে বল তো··· !

—তা আমি বলি কী করে রে··· ! আমি পথ খুঁজি এ বাড়ি ছাড়ার, পারি কই ? যতবার বাবুদের বলি—মাইনে বাড়াও। তারা শোনায়—পাঁচ বিঘে চাষের জমি তো দানপত্র আছে—। তার দাম শোধ নাকি ?

তখন পাঁচিল ঘেরা বাগানে সূর্য জোরে রোদ ফেলে। ঘাসে পাতায় সবুজ ঘন হয়। ব্যাপ্ত চরাচরে শাসন প্রয়োগ করে।

কালো মেহগনি কাঠের বড় টেবিলে পাথর বসানো। বাঁকানো হাতল, বেতের চেটি বুনে হালকা সুদৃশ্য চেয়ার। টেবিলে ডিম পাউরুটি মুরগি সিদ্ধ করে সুপ। অনেক কাপ অনেক প্লেট। এস্টেটের উকিল মশাইকে ঘিরে সকালের চা পর্ব। বেঙ্গল পটারিজের কারুকার্যময় বড় পেট ডাবরা টি-পট। পটের নল থেকে গরম ভাপ। ভাপের মধ্যে দামি চায়ের সগন্ধ।

নভেম্বর শেষের শীত। বুড়ো জমিদারবাবু ঠাস বুনোটে বড় পাড়ে অসংখ্য লতা পাতার কাজ করা শালটা গায়ে জড়িয়েছে। হাঁটু অব্দি মোজা। হালকা চটি পায়ে। পাশে মেজবাবু মধ্যবয়েসী। সিল্কের পাজামা পাঞ্জাবির উপর কাশ্মীরি কোট মাথায় পালকের টুপি। ছোকরা ছোটবাবু সকালেই কোট প্যান্ট পরে প্রস্তুত। পর পর কয়েক চামচ সুপ খেয়ে বারান্দার দিকে তাকায়। সামনে দেখতে পায় তে-মাথানি মোড়। মোড়ে টিনের উঁচু ছাউনি তলায় রথটা। প্রথম থাকের চূড়োগুলো দেখা যায়। ছোটবাবু আর একবার সুপ খেয়ে ভাবে, আমাদের এত বড়···পুরনো ঐতিহ্যের রথ···তবু নদীর ওপারে মহিষাদল রথের নাম অত বিখ্যাত কেন··· ! সকালবেলায়ই ছোটবাবুকে একটা দুঃখ গ্রাস করে।

মাথা নিচু করে বাটির সুপে স্যাঁকা পাউরুটি চুবোয়। জাঁকজমকের রোশনাইতে কি চুবিয়ে ধরা যায় না নদীর ওপারের রথকে··· ! ভাবে আর চিবোয়।

বুড়ো জমিদারবাবু উকিল মশায়ের দিকে চায়ের কাপ প্লেট এগিয়ে ধরে বলে, দেশে এত কমানিস্টদের নেমন্তন্ন কেন বল দিখি ?

—ওই জহরলালটাই ডেকে ডেকে খাওয়াচ্ছে।

—কেন ? আমেরিকার চেয়ে রাশিয়া বেশি ক্ষমতার লোক হয়ে গেছে ?

মধ্যবয়েসী মেজবাবু চায়ের কাপ টানতে টানতে বলে, গোটা কলকাতায় হুড খোলা গাড়িতে ঘুরেছে বুলগানিন আর ক্রুশ্চেভ। বিধান রায়ও কি কমানিস্ট্

হয়ে গেল ?

উকিল মশায়ের হাতে চায়ের কাপ। টেবিলে মুখ ঝুঁকিয়ে তাকায়। সকলের নজরে পড়তেই আগ্রহ। উকিলবাবু চাপা স্বরে বলে, দেখেছ তো—অমন স্বাস্থ্য লম্বা চওড়া মানুষ। কোট প্যান্ট পরে ক্রুশ্চেভ। ভারি মুখ···কি বড় মাথা। গোটা বিশ্ব ধরে যায়। তার সামনে ধুতি পাঞ্জাবি পরে রোগা পটকা জ্যোতি বসু হ্যান্ডসেক করছে। মানায় ওসব—

—কিন্তু নেচে উঠবে যে ওদের চাষি মজুরের কৃষক সংগঠন, বলল বুড়ো জমিদারবাবু। ছোকরা ছোটবাবু হাসে। আশ্বাস দেয় বুড়ো জমিদারকে, আপনি থামুন জ্যাঠামশায়—। বন্দুক লাইসেন্সটা রিনিউ করে আনি—

মালি বুড়ো জলটুঙির ছায়ায় জলের হাওয়া পায়। ফাঁকা টুঙিতে ভীষণ একলা। ভাঙা খোলামকুচিটা নিয়ে লোহার রেলিংয়ে আঁক কাটে। দাগ কেটে ছড়ে যায় বুকের ভেতরটা। জলটুঙির গম্বুজের নীরবতায় দমকা হাওয়া। একসঙ্গে কত শাঁখা চুড়ি যে ঠুনঠান্ বেজে ওঠে! ব্যর্থ প্রতিরোধ। দেওয়ালের কাছে গিয়ে বাঁকা বর্ণে অক্ষর ফোটায় ঃ—

"মহান বুলগানিন তুমি গরীবের ত্রাতা
মহামানব ক্রুষচেভ তুমি জগতের পিতা।"

বুড়ো জমিদারবাবু উকিলের দিকে চেয়ে বলে, বিধান রায় আবার কী আইন পাশ করে—

—কত আর আইন করবে? উনিশ-শ পঞ্চাশে বর্গাদার অ্যাক্ট অনুযায়ী 'ভাগচাষ বিরোধ—নিবারক বোর্ড' করল। বাহান্নতে বর্গাদার আইন সংশোধন। দুম করে অর্ডিন্যান্স জারি—উকিলবাবুর কথার ফাঁকে বুড়ো জমিদার ভয়ানক ক্ষোভে বলে ফেলে উনিশ-শ তিপান্নতে জমিদারি দখল আইন পাশ—

যেহেতু মোটা মোটা বই ঘেঁটে আইনের সাল তারিখ ধারা উল্লেখ করে আর্জি রচনা, কোর্টে জজের সামনে সওয়াল করা উকিল মশায়ের এক্তিয়ার, সেখানে এই মাঠঘাটের মালিক বুড়ো জমিদার এত নির্ভুল কথা বলার কে? উকিলবাবুর নিজের গুরুত্ব তো কমে যায়। তাই বুড়ো জমিদারকে রুখে দিতে বলে, এই পঞ্চান্নতে ভূমি সংস্কার আইন পাশ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, জমিদারি বিলোপটাও করিয়ে নিল—। ক্ষতিপূরণটা অবশ্য দেবে—

—দিলেও সেটা পেতে কম ঘাম ঝরবে? আর ভাগচাষিরা যদি ষাট ভাগ নিয়ে নেয় চল্লিশ ভাগে আমাদের আর কতটুকু থাকবে? লোকজনের খাওয়া পরা এস্টেট চালানো— ?

ছোটজন হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। ছোকরা চাকরটাকে কড়া গলায় বলে, ডাক তো বুড়ো মালিকে। ঘরের কাজ ফেলে ছোকরাটা ছোটে। বাগানের বাঁধানো পথ ধপ্ ধপ্ বাজে। গোলাপি পদ্মা রঙ্গনাদের আলগা বুক কাঁপে। যদি আঁচল থাকত তো সে কাঁপন লুকোতে পারত! ছোকরটা জলটুঙির পোলে উঠে চেঁচায়, হেই মালিদা—মালিদা গো।

মালি বুড়ো মুখ বাড়ায়। ছোকরাটা বলে, বাবু—ছোটজন এক্ষুনি ডাকে—

মালি বুড়োর ঘোর কাটতেই ভয়। কিসের জন্যে হঠাৎ এমন তলব? নিজের মনে কারণ হাতড়ায়। পায় না। ভাবে, তাহলে কি ওই বুলগানিন টানিন লিখেছি বলে দোষ ধরবে? কী করে দেখতে পেল! বাবুরা তো এদিক তেমন মাড়ায় না—! শুধু অতিথি অভ্যাগতরা এলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিষয় সম্পত্তি দেখিয়ে একবার হাওয়া খেতে একটু ওঠে··· দু-পা বেড়িয়ে নেমে যায়। এক সময়ের এই বৈভব তো মাঝে মাঝে ভদ্দরলোকদের কাছে মোড়লবাবুদের বিড়ম্বনার! লজ্জার! তাহলে! বিব্রত মুখে মালি বুড়ো হাঁটে। রঙ্গনা পদ্মা গোলাপিরা দেখে। চুপচাপ দেখে। এতবড় জমিদারিতে তাদের একমাত্র আত্মজন তো বিপন্ন! সিঁড়ির একটা একটা ধাপ ভেঙে বুড়ো মালি ওঠে। যেন বিচারে দণ্ডাজ্ঞা শুনতে যাচ্ছে। তাই ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে ওঠে।

দোতলার বারান্দায় উঠতেই প্রচুর আলো বাতাস। দম নেয় মালি। টেবিল থেকে দেখতে পেয়ে ছোট জন ভুস করে উঠে দাঁড়ায়। এত খাদ্য খাবার অতিথি মানুষের সামনে এসে দাঁড়াবে লোকটা? তাই নিজে ক-পা এগিয়ে যায়। মালি বুড়োর গতি রুদ্ধ। ছোটজন কড়া গলায় বলে, তুমি—

বুক মুচড়ে যায় আতঙ্কে মালির।

—খেয়ে নিয়ে এক্ষুনি চলে যাও।

যেন চাকরি হারিয়ে অথই জলে মালি বুড়ো। বাকি কথাটার রেশ বুঝে হা-করে তাকিয়ে থাকে। আচমকা বাগানে বিচিত্র এক ফুলের পাপড়ির আশ্চর্য রঙ দেখছে বিস্ময়ে, মুগ্ধতায়! ছোটজন মানুষটাকে শোনায়, আজই পৌঁছোবার চেষ্টা কর কাশিয়াবাদ লাটে। পঞ্চাশ ঘর চাষিদের বলবে—বাবুদের তরফে একজন না যাওয়া পর্যন্ত ধানের মাঠে কাস্তে লাগাবে না—।

•

সন্ধে মুখে হ্যাজাকটা জ্বালাতেই মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ে আলো। পর্দা দুটো টেনে টেনে সরায় ভৈরব। তামার ফুটো পয়সার রিং তারে ঝন্ ঝন্ বাজে।

অতুলবাবুর বাইশখানা দোকান ঘরে মিষ্টি দোকানের পাশে পান দোকানটা উঠে যেতেই তো আর একটা নতুন হোটেল। সে হোটেলেও আলো জ্বলে। বড় আকারে তৈলাধার। বড় ম্যান্টেল। ঝকঝকে কাচের খোপ থেকে ভীষণ জোর আলো! দড়ির টানে কপিকলে ডে-লাইটটা ঝোলে। নতুন চেয়ার টেবিল। সিমেন্টের মেঝে। ডে-লাইটের দীপ্তিতে সব ঝকমক করে। ভৈরব পাকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে। উল্টো দিকে মহানন্দর হোটেল গন্ধেশ্বরী। ফিরে এসে সদয়-কুমারকে বলে, কী সুন্দর সাজানো গো?

বকুল শুনে বলল, ভৈরব, তোর বাপও যদি আমার কথা মতো সাজায় এ হোটেল, অনেক অনেক খদ্দের পাব—

ছুঁক ছুঁক করে বুকের ভেতরটা। বকুল তখন রান্নাঘরে। সদয়কুমার পায়ে পায়ে হাজরার মিষ্টি দোকান পার হয়। তার পরই তো নতুন হোটেলটা। এখনও পুজোর ঘট ফুল পাতা পড়ে। বার্নিশ করা চেয়ার টেবিলে আলো

ঠিকরোয়। লতাপাতার মধ্যে গোলাপ ফুল পর্দায়। বড় করে একটা খাদ্য তালিকার বোর্ড ঢুকতেই বাঁ-দিকে। মাথায় রিফ্যুজি দরমার নীল পীঠে সুন্দর করে রঙ মেরে সিলিং। ডে-লাইটের আলো সিলিং থেকে ছিটকে নীচেটাও চকচকে। সদয় চোখ ভরে দেখে!

পরে পিছনে তাকায় সদয়কুমার। মহানন্দ দুর্গাবতীর হোটেলে ভেতর মহলটায় কত জায়গা। রাতের খদ্দের খেয়ে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোতে পারে। নতুন হোটেলের চেকনাই ব্যবস্থার কাছে নিজের মহারানী ভোজনালয়ের ব্যবস্থা কত যে দীন! সেই দীনতা ঢাকতে সঙ্গী খোঁজে সদয়কুমার। তাতেও তো মহানন্দর হোটেল সদয়কে টেক্কা দেয়। একটা চাপা ব্যথায় হাঁটে···। সুব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় তো অনেক পিছনে। এই পশ্চাৎপদতা যে কেমন করে কাটানো যায়! ফিরতে ফিরতে বে-খেয়ালে নামে কালী মন্দিরের সিঁড়ি ধাপ কেটে কেটে। বাসর্ঘরি মান্নার দোকান কাটিয়ে এগোয় আটচালার পাশে। রামশঙ্করবাবুর কাঠের দোকান। আলমারি চেয়ার টেবিল তৈরি হচ্ছে। সদয়কুমার গিয়ে দাঁড়ায়। দ্বিধায় উঠতে পারে না আসবাব দোকানটার চাতালে।

খাতায় মজুরি হিসেব করতে মগ্ন। ফরসা মুখে চোয়াল খানিক বসে কপালে তিনটে ভাঁজ। মানুষটার উপস্থিতি তো বাতাসের গায়ে। তাই খানিক অভ্যাসে তাকায় রামশঙ্করবাবু। সাইকেল, লাইটের ব্যবসা ছাড়াও এটা বাড়তি।

—কি গো ঠাকুরমশাই? পাশে খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বলে, বস—

এমন সুন্দর কাঠের চেয়ারে তো বসা হয়নি। এটাই প্রথম। তাই জুবুথবু মেরে সঙ্কোচে বলে, আমার হোটেল ঘরটা একটু সাজিয়ে দেবেন না বাবু? দোকানটা চালিয়ে তো ছেলেপুলে বাঁচাই—

রামশঙ্কর কোনো মন্তব্য করে না। এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

সদয়কুমার নিবেদনটা রাখে, একটু রয়ে সয়ে নেবেন। না হয় ডেলি কিছু কিছু দিয়ে যাব—

রামশঙ্কর কলমটার নিব দেখে বলে, আচ্ছা। তোমার হোটেলের পজিশন বুঝে মিস্ত্রি মাপজোক নেবে। দুটো টেবিল চারটে চেয়ার করে দেবে খোন—

এখন চারপাশের সঙ্গে টিকে থাকতে আকুল সদয়কুমার। দোকানঘরের পরিকাঠামোটা বদলাতে যে বড় ধরনের মূলধন দরকার। তারপর তো সেটা বিনিয়োগ।

পুলিশটা ডাক দেয়, কই ঠাকুরমশায়?

বকুল বাইরে আসে। স্লিপটা হাতে নিয়ে বলে, ক'-জন আসামী, সিপাই সাহেব?

—চারজন। অন্লি ফোর—

সদয় পাশে দাঁড়ায়। পুলিশটা বলে, এই তো মালিক। বড়বাবু বলছিল, খাবার দিতে বড় লেট করেন। একটু তাড়াতাড়ি দিবেন—

স্লিপটা হাতে নিয়ে ভেতরে যায় সদয়কুমার। ডাকে, কইগো এটা কাঁটায়

গেঁথে রাখো—। জবা হাত বাড়ায়। এতদিন হোটেল চালিয়ে বুঝেছে, এগুলো শুধু কাগজ নয়। এর সঙ্গে তো জুড়ে আছে নগদ টাকার প্রামাণিকতা।

বুড়ো মানুষটা বলল, ঠাকুরমশাই এখানে খেয়ে থাকা যাবে?

—নিশ্চয়ই, বলে সদয়কুমার। বুড়োটাকে স্বস্তি দিতে সদয় আরও বলে, ভাড়া নিলে মশারি বালিশও পাওয়া যাবে—। যাবেন কোথায়?

—কাল সকালে বাসে কাকদ্বীপ। তারপর বোট ধরে কাশিয়াবাদের লাট—

মশলা বাটে ভাঁটি। কড়ায় জল চাপিয়ে আবার শিলের কাছে দাঁড়ায় বকুল। ভিট ভিট কথা বলে দুজনে। পুরুষের কণ্ঠে যে কতটান! শিলের বাইরে মশলা বেরিয়ে যায়। জবা এসে ধমকায়, ওরে ভাঁটি ফেলিসনি। ও বকুল যা না ভাই দুটো খদ্দের ডাক—

মদের নেশায় রোগা ফরসা রায়বাবু পাকা রাস্তায় গোঁজ মেরে চলে যায়। পাত্‌লা ফিনফিনে ধুতির কোঁচাটা ধরে আবার ফিরে আসে। হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে টাল খায়। রোগা শরীরে দোল মেরে সোজা হয়। বলে, হ্যাঁরে সদয়—তুই আমার ঘরে হোটেল করে ভালো ছিলিস? না, অতুলের এখেনে ভালো রোজগার করছিস? বল—

—বাবু কী আর বলি? তবে সেই দুঃসময়ে আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন—

রায়বাবুর সরু সরু ঘন দাঁতে খয়ের কিমামের দাগ। কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক বাক্য শুনেই হেসে কুটি কুটি। হাসি থামলে রায়বাবু বলে, আমার লাটের জমিতে গেলে কত প্রজা ওই কথাই বলে—

বকুল জমিয়ে তুলতে একটু উসকে দেয়, এ তল্লাটে জমিদারবাবু বলতেই তো আপনারা।

রায়বাবু নেশার ঘোরে খুশিতে সামনের দিকে দোল মেরে আবার সোজা হয়। সামলে নিয়ে তারিফ জানায়, ঠিক বলেছিস—। তুই কী রাঁধলিরে এবেলা—?

—আজ্ঞে মুগের ডাল। আলু বাঁধাকপির সঙ্গে মাছের মুড়ো দিয়ে বুলগানিন চচ্চড়ি—।

খিলখিল হেসে উঠে ভেঙে চুরে দুমড়ে রায়বাবু। আবার সোজা হয়ে বলে, আর ক্রুশ্চেভের?

—সেটা সবে তৈরি হচ্ছে।

কাশিয়াবাদগামী মালি বুড়ো বড্ড ব্যথা পায়! পৃথিবীর অত দামি মানুষ …এদেশের মান্যবর অতিথিকে নিয়ে এমন ঠাট্টা! আজকে দেওয়ালে কবিতাটার অন্তরে যে ভীষণ আঘাত!

পঁয়ত্রিশ

সারা বিকেল পাকা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভৈরব। খানিক পরে গৌরবও হাজির।

উঁচু উঁচু ফাঁপা লোহার পোস্ট মাটি খুঁড়ে পুঁতছে মানুষগুলো। বিরাট মাটির গর্ত। ইট ভেঙে বড় বড় খোয়া, বালি, সিমেন্টও পাশে। ভৈরব নিরাপদ দূরত্বে। ষাঁড়টা বেপরোয়া হেঁটে যায়। মস্ত শরীরে নির্বিকার।

কালো চেহারায় স্বাস্থ্যবান ব্যানার্জিবাবু। মাথার চুল ফাঁকা হয়ে বড় টাক। অবশিষ্ট চুলগুলো কুচকুচে কালো। রাস্তার ওপারে শোয়ানো রেলপোল। এদিক ওদিক তাকিয়ে হিসেবমাফিক দূরত্ব সাব্যস্ত করে ব্যানার্জিবাবু বলে, এইখানে বড় করে গর্ত খোঁড় রে ছেলেরা—

গাঁইতি চালিয়ে মাটি খুসে দেয় লোকটা। হুম দাম শ্বাসের শব্দ। খানিক পরে কোদাল টেনে সাফ করে। পৃথিবীর বুকে ক্রমে ক্রমে খননক্রিয়া চলে। ব্যানার্জিবাবু ছোকরাটার মাথায় মোটা কাছির বাণ্ডিল তুলে দিয়ে বলে, চল, রেল-পোলটার ও-ডগায়—

গর্তটার কাছে এসে বলে, একটু ঢালু করে তারপর ডিপ করবি ভাই। এটার অনেক হাইট—

আকাশে রোদের তেজ মরে ছায়া। অফিস-কাছারি-সেরেস্তায় অনেক মানুষ। মাঝে মাঝে দু-একখানা বাস। পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে পাশ কাটায়। রিকশা সাইকেল চলাচল করে।

ব্যানার্জি চেঁচায়, ও ভাই, রেল-পোলটার ডগায় ফুটোতে কাছিটা গলিয়ে বাঁধ—

গর্তটার গভীরতা পর্যবেক্ষণ করে নিজেই এগোয় ব্যানার্জি। কাছির গিঁটটা টেনেটুনে পরীক্ষা করে। বেশ শক্ত। তখন একবার নিজের মনেই হিসেব কষে, আর কটা পোস্ট ইনফিক্সিং করে ট্রান্সফর্মা সেটটা লাগিয়ে দিলে আমার এরিয়া শেষ—

ক্রমে আঁধার নামে। বড় খিরিশ গাছের তলায় সে আঁধার বেশি ঘন। দোকান-পাটে আলো জ্বলে। ভৈবব ফিরে যায়। থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতখানা আওয়াজ।

হোটেলঘর ভর্তি আলো। দু-খানা টেবিল চারখানা নতুন চেয়ার। কাঠের বার্নিসে হ্যাজাক আলো ঝিকমিক করে। ভৈরব থমকে দাঁড়ায়। বকুল আর সদয়কুমার তখনও ঠিক করতে পারে না, কতটা কোনদিকে টেবিলগুলো সাজালে ছিটেবেড়ার দেওয়ালঘরে দোকানটা মানিয়ে যাবে। মাটির মেঝে শতবার ন্যাতা পোছাতেও মসৃণতা অর্জন করতে পারে না। কাগজ কিংবা খোলামকুচি টেবিলের পায়ার তলায় গুঁজে দেয়। রোগা বকুল আসবাবগুলো সাজাতে সাজাতে বলে, বুঝলে এবার মেঝেটা ইট-সিমেন্টে পাকা করে নিতে পারলে…

—থাম। আস্তে আস্তে পয়সাকড়ি সংগ্রহ করি…।

তখন তো ভারত সরকারকে বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে আটশো কোটি টাকা !

তথ্যকেন্দ্র অফিস থেকে পিয়নটা বগলে একপাঁজা বড় বড় কাগজ এনে সঙ্গী বুড়োটাকে বলে, এই তো এতখানি ফাঁকা দেওয়াল। নাও আঠা লাগাও—

রোল করা কাগজটার সাদা পিঠে ভালো করে আঠা চাপড়ায় বুড়োটা। ছোকরা পিয়ন পোস্টারটা মারে দেওয়ালের গায়ে। হ্যাজাকের আলো পড়তেই ছবির বাঁধ। ঢালাই ফেলে বাঁধানো। ক'খানা বড় বড় লক-গেটে হু-হু করে জল-স্রোত। বাঁধের গায়ে লোহার পাত জুড়ে বরফি কেটে উঁচু টাওয়ার। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। ছবির এককোণে মাথায় টুপি, চোখে চশমা আঁটা জওহরলাল।

পাশের ছবিটায় তিলাইয়া ও মাইথন বাঁধ। রিজার্ভারে প্রচুর জলবন্দি। বোকারো, চন্দ্রপুরা ও দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির ছবি। ঘড়ঘড় শব্দ কানে। ১,০৭৭ মেগওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর জাতির উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার রূপরেখার হিসাবটা মেরে দেয় ছোকরা পিয়ন।

মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ের সকলে দেওয়ালের কাছে দাঁড়ায়। ভৈরব ধীরে ধীরে পড়ে। খানিক বোঝে বাকিটা আঁধারে। সাল কাথাটা বুঝলেও সালা কথাটা হৃদয়ঙ্গম হয় না। জবারানী ভৈরবকে বলে, কিরে বাপ্ ?

তেমন কিছু না পেয়ে বলে, দেশ—

জবারানী সন্তুষ্ট হয় না। বকুলের দিকে তাকায়। বকুল চোখ বড় বড় করে বলে, কত কোটি কোটি টাকারে বাবা—। পাশ কাটাতে গিয়ে ভাঁটির গায়ে ধাক্কা। সেও দাঁড়িয়ে ছবির বাঁধ বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতি দেখে। বকুল মুদু সামলে নিয়ে ভাঁটির কোমরে কাতুকুতুর ভান করে। বেটে ভাঁটি তিড়িং বিড়িং ছটকায়।

বিহারী রামা নিতাই মালির দোকানে দাঁড়িয়ে সবে বলে, কই দিবেন ? তখনই চোখে ভাঁটি আর বকুলের রঙ্গ। মুখটা ভারি হয়ে যায় রামার !

বকুল চেঁচায়, চল মশলা বাটবি—

নিতাই মালি বলে, কতরে রামা ?

—দু আনার চুল কাটাই এক আনার দাড়ি সাফাই। তিন আনা—

হাতে পাঁচ ছ-খানা ঢেউ কাটা এক আনিটা পেয়ে চারকোনা দু-আনাটা খোঁজে। টিনের বাক্সে তো ফুটো এক পয়সা, তামার গোটা পয়সা সিকি

আধুলি। দু-আনিটা যে কোথায় গেল! বার বার ঘাঁটাঘাঁটিতে বাক্সর টিনের গায়ে ঠন্ ঠন্ বাজে।

পয়সা পেতে দেরি। রামার বুকের ভেতর আধুলি সিকির ঠোক্কর। ভাবে, ভাঁটিটা তো বেশ দিল্লাগি জানে। বকুলের সঙ্গে ফাজিল করে। পান বিড়ির কষ ধোঁয়ায় লালচে দাঁত। দাঁতে দাঁত চেপে রামা কিড়মিড়োয়। পায়ে ফিতেওলা খড়ম। খড়মের ডগার চাপে মাটি খুসে খুসে রোষ গেঁথে দেয় নিতাই মালির দোকানের সামনে।

হলদে রঙের দু-আনিটা পেয়ে নিতাই মালি বলে, মিল গিয়ারে রামা—

—মিল গিয়া? তো দিয়ে দাও—

পয়সাটা নিয়ে বিহারী রামা একবার মহারানী হোটেলের দিকে নজর ফেলে। ডান চোখ তো শৈশব থেকে জখম। এক্‌খানা লাল মার্বেল গুলির মতো ডান চোখটা ঠেলে থাকে। বাঁ-চোখ চালিয়ে ভেতরটা দেখে। রান্নাঘরের দরজার সামনে তো শিল নড়া। চোখের দৃষ্টিতে ভেতরে আবছায়ায় ভাঁটিকে সাব্যস্ত করতে পারে না। তবে শিল নড়ার ঠক্ ঠক্ শব্দটা কানে আসে। খানিক স্বস্তি পায়, ভাঁটি তাহলে কাজে আছে।

দেশ থেকে কত দূরে! নিজের রমণীটির খুঁটি নাটি তো চোখে পড়ে না। পড়ে না বলে এত ধারাবাহিক উৎকণ্ঠিত নয়। যখন একান্তে মনে পড়ে দেশ গাঁ, গেউ খেত ভৈসা···কচি ছেলে মেয়ে দুটোর মুখ, মনটা উতলা হয়। কাজ কর্মে আর এত দূরত্বের যাপনে বাকি সময়টা তো ফাঁকা। সেই ফাঁকে ঢুকে পড়েছে বিধবা ভাঁটিটা। হোটেলের ভাত মাছে গা কোমর ডাঁটো। তেল জলে পরিষ্কার। একটা রমণীর জোগানে তো পুরুষ হিসেবে দায়হীন পাওনা। সেটা ধরে রাখতেও আবেগ জারিত করে।

ভৈরব বই খাতা ফেলে পরিকল্পনার পোস্টারগুলোয় চোখ বোলায়। দামোদর নদীর জখম অবস্থাটা দেখে হঠাৎ মনে হল ভৈরবের, আগে···বিদ্যাসাগর মশায়ের সময় যদি বাঁধ হয়ে যেত তাহলে তো মানুষটাকে অমন কষ্ট করে সাঁতরে মায়ের কাছে যেতে হত না···।

বকুল হাতের জল মুছে হাঁক দেয় রাতের রাস্তায় স্বল্প লোকজনের মধ্যে খদ্দেরের উদ্দেশে, আসুন বাবুরা—আসুন! নতুন চেয়ারে টেবিলে গরম গরম ঝোল ভাত—

মহানন্দর গন্ধেশ্বরী ভোজনালয়ে বঙ্কিম চেঁচায়, আসুন—আসুন বাবুরা খাওয়া দাওয়া করলে বিছানা মশারি ফ্রি—। অতি সুবন্দোবস্ত—

বকুল চেঁচায়, আসুন আসুন—আগে খেয়ে দেখে তারপর বিশ্রাম—

নতুন হোটেলের ছোকরাটা চেঁচায়, আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—তারপর খাওয়া। নতুন হোটেলে খেয়ে দেখুন—

হিসেব নিকেশ সেরে অতুলবাবু এখন দোকান বন্ধের মুখে। কর্মচারী ছোকরাটা কেরোসিন তেলের টিনে ঘুঁটেটা ডুবিয়ে পাকা রাস্তার ধারে আনে। দেশলাই কাঠিটা জ্বালাতেই ঘুঁটের গায়ে দাউ দাউ আগুন।

অন্যকর্মচারী একটা একটা ঝাঁপ বন্ধ করে। অতুলবাবু পাতলা ধুতির উপর দামি গেঞ্জি গায়ে। রাস্তায় বেরুতেই উদার হাওয়া। কাজের মানুষ। সম্পত্তিবান পুরুষ। হাওয়া, ফাঁকা আকাশ কতক্ষণ আর তাকে কর্মহীন মাথা নিয়ে থাকতে দেবে। মস্ত সম্পত্তি এসে তার মাথাকে গ্রাস করে। তাই পায়ে পায়ে সদয়কুমারের হোটেলের দিকে যায়। এক পলকে চেয়ার টেবিল কটা দেখে হিসেব করে অতুলবাবু, ভেতরটায় কতখানি জায়গা। তখন বড্ড কম ভাড়ায় দিয়ে ফেললুম। এখন হলে? নতুন হোটেলটা সদয়ের চেয়েও কত ছোট জায়গায়। ভাড়া তো সদয়ের পাঁচ গুণ বেশি দেয়। যদি সদয়কে ওঠান যেত··· তাহলে কত বেশি ভাড়ায় যে নতুন ভাড়াটিয়া পেতুম···। পাতলা চটিতে হোঁচট খায় অতুলবাবু।

সদয় ছুটে যায়, বাবু—লেগেছে না কি?

ফরসা গোল মুখ। মাথায় চুল উঠে গিয়ে সামান্য টাক। সেটাই অতুলবাবুকে আভিজাত্য দেয়। গায়ে হাত লাগিয়ে ধরতে গিয়েও সঙ্কোচে হাত ফিরিয়ে নেয় সদয়।

মদ্যপানে টলমলে পিয়ারি। চটির ডগা কালীমন্দিরের সামনে সিঁড়ি ধাপে বেধে হুমড়ি খায়। ফরসা গা মুখে ভারি শরীর। ধীরে ধীরে উঠে সোজা হয়। কালো ব্লাউজ কালো সিল্ক শাড়ি। আঁচল খসে লুটোয়। বাঁ হাতে আবার সেটা টেনে এগোয়। গলা মুখ হাতা কোমরে ফরসা রঙ। বাকিটায় রাত লেগে থাকে। পাকা রাস্তায় উঠে চেঁচায়, আমার হরিশ সিং···হরিশ সিং কাঁহা···, বলতে বলতে রাস্তা পার হয়। নিতাই মালি আটসাঁট হয়ে বসে। অতুলবাবু দ্রুত পায়ে দোকানে ঢুকে আড়াল নেয়।

পিয়ারি জড়ানো গলায় বলে,·আমি সকলকে চিনি—। এখানকার সব বাবুদের জানি—কার পেটে কোথায় তিল···কোমরে দাদ সব জানি—। টলতে টলতে হাজির মহারানী ভোজনালয়ে, ঠাকুরদা—ভাত হবে?

—কেন হবে না?

—আমার জন্যে রেখ—, বলে আবার হেলে দুলে রাস্তায় ওঠে। ফরসা মুখে ঘাম। সিঁদুর টিপ থেবড়ে বীভৎস। গায়ে আঁচলটা এলোমেলো ঢেকে ক্রমশ আঁধারে সেঁধোয়। কালো সিল্ক শাড়িতে রাত হয়ে যায়। শুধু মাঝে মাঝে বোল তোলে, হরিশ সিং—মেরা আদমি কাঁহা—? থানার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, কই বড়বাবু কোথায়? আমার হরিশ সিং কোথায়? একটু থেমে থানার সিঁড়ি ভাঙে, মেজবাবু—মেজবাবু কাঁহা মিলি—?

বড়বাবু কড়া গলায় ডাক দেন, সেন্ট্রি? ওকে হাটিয়ে দাও—

বন্দুক কাঁধে টহলরত পুলিশটা বারান্দা থেকে নীচে নামে। বেশ জোরে ধমক দেয়, হট্ যাও—

—হটে গা নেহি, গলায় আরও জোর আনে পিয়ারি।

সেন্ট্রি চেঁচায়, এই প্রসাদ ও সুবল গেট থেকে হটিয়ে দেত ওই আওরতকে। ছোকরা সুবল লুঙির উপর গেঞ্জি চড়িয়ে গুণ্ডা চেহারা। হাতে লাঠি নিয়ে

রাস্তার গেটে। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচায়, হট যাও—

পিয়ারি সরে না। বারান্দার কাঠামোয় ঝুলছে ডে-লাইট। রাস্তা ঢালের সিঁড়িতে আলোর ছিটে। মোহিনী হাসিতে রোধ করে কপট ধমক। মদের গন্ধে বাতাস ভারি। আধো আলোয় আঁচল খসে বে-আব্রু নারী। ফরসা গা গলায় নির্বিরোধ শরীরী নৈকট্য।

—ঠাকুরপো আমাকে মারবে? মার—হরিশ সিং তো এই থানার সিপাই ছিল। কোন থানায় তার পোস্টিং বল তো—ঠাকুরপো?

কয়েক মাসের ডিউটিতে সুবলও তো জেনে গেছে পিয়ারির অতীত কাহিনী-মালা। হরিশ সিং নামটা শুনে তো মোটেই অবাক নয়। পুরনো রেজিস্টার ফাইল ঘাঁটলে তো হদিশ মিলতেও পারে। চুপ থেকে এটুকু ভাবনার প্রশ্রয়েই আচমকা জড়িয়ে ধরে পিয়ারি,—ঠাকুরপো!

হকচকিয়ে সুবল কনস্টেবল দু-হাতে গা বুক ধরে ঠেলে দেয়। ধপ্ করে ঘাসে পড়ে যায় পিয়ারি। একদা রূপসী। এলাকার কামনা সঙ্গিনী।

পায়ে বুট জুতো। জামা উপচিয়ে ভুঁড়ি। মোটা গোঁফ ভারি মুখ মানুষটা মুখ বাড়িয়ে দেখে থানার গেটে। বিহার ডিঙিয়ে তো উত্তর প্রদেশের পথে পাড়ি দিতে হয়। মুখের ভাষা হিন্দি। পকেটে নোট বুক, উড পেনসিল। একই ভাষায় বিদেশ ভূমির জানানা। যখন নেশা করে না, দিনের আলোয় তো পিয়ারি শিষ্ট নারী! একটু মায়া টান কাটিয়ে পা ফেলতেই পাকা রাস্তায় খট্ খট্ শব্দ। মহারানী হিন্দু ভোজনালয়ের সামনে দাঁড়ায় মানুষটা। ভুঁড়ি বেয়ে ঘামে ভিজে গেছে সাদা পাঞ্জাবির অনেকটা। প্রায় হাঁটু ছুঁয়ে ধুতি শেষ। বুট জুতোয় বড় সাইজের পায়ের চেটো। উত্তর প্রদেশের জোত জমির মালিক এখন তো এখানে তেজারতির কারবারি। ডাক দেয়, ঠাকুরো—ও ঠাকুরো—

সদয়কুমার কৃতজ্ঞতায় গলে যায়।

পণ্ডিতজী—আপনার টাকায় এইসব—, বলে হাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখায় টেবিল চেয়ার।

—ঠিক হ্যায়। ভগবান কো নাম পার ব্যবসা চালাও। হাম হ্যায়—

সদয়কুমার পণ্ডিতজীর সংস্থার হিন্দিতে ছাপানো হাত খাতা এগিয়ে দেয়। সঙ্গে তিনটে টাকা। পকেটের পেনসিল বের করে সদয়কুমারের খাতায় ইকড়ি মিকড়ি টেনে খোপ কাটা তারিখ ঘরে সই করে। মাত্র দেড়শো টাকা। প্রতিদিন তিন টাকা হারে তিন মাসে শোধ হবে। সবে তো জমার ঘরে দু-দিন!

বাপের হাত থেকে খাতাটা টেনে নেয় ভৈরব। দেখে, মলাটের উপর ভারতীয় পতাকা দু-খানা আড়াআড়ি। স্বাধীন ভারতের পতাকা। পঞ্চবার্ষিকীর হাওয়ায় পত পত উড়ছে।

ছত্রিশ

মধ্য চৈত্রের সন্ধে মুখ। সারাদিন পৃথিবী পুড়ে জল মাটি একটু ঠান্ডা। হাওয়া সেই শীতলতা বয়ে আনে। গায়ে মুখের চামড়ায় বুলিয়ে যেতেই স্বস্তি। সেই টানে বেঞ্চটা এনেছে হোটেলের বাইরে। এখন আর মাথার উপর তপ্ত টিনের ছাউনি নেই। মস্ত আকাশ তাপ হারিয়ে যে কত দ্রুত শীতল হয়···! উর্ধ্বমুখে ভীষণ বিস্ময়ে তাকিয়েছিল ভৈরব খিরিসের মগডাল ছাড়িয়ে আরও উপরের দিকে! বড় গলকম্বল দুলিয়ে ষাঁড়টা মিষ্টি দোকানের শালপাতা চিবোতে চিবোতে যায়। সদয়কুমার বেঞ্চে বসে খুবই সন্তর্পণে গোনে টাকা কটা। খুচরো পয়সা এক আনি দু আনি তামার পয়সা পর পর পাশে রেখে ছোট ছোট ভাগা দেয়। একবার···দুবার···তিনবার গুণে সন্তুষ্ট হয়, তাহলে সাত টাকা।

টাকা পয়সা কটা গেঁটে গুঁজে অতুলবাবুর সামনে দাঁড়ায়। অতুলবাবু খদ্দেরটাকে দুটো সাবান দিয়ে দাম বুঝে নেয়। ফর্দ লেখা কাগজ পেতে কলমটা হাতে। অতুলবাবু বলে, কি গো ঠাকুরমশায়— ?

—আজ্ঞে ও মাসের ভাড়াটা

অতুল গোঁজ মেরে মাথা নীচে। কর্মচারীটা হাঁক মারে, মুগডাল এক সের —ফর্দে টোকা হলে অতুলবাবু সায় দেয়, হুঁ—

—গোটা লঙ্কা দু-ছটাক

ফর্দে পরিমাণটা লিখে আস্তে করে বলে অতুল, ঠাকুর পরে এস—

—চিনি আধ সের

—হুঁ!

—আর নেই। হিসেব করুন—

ফর্দ সারা হলেও মুখ তোলে না অতুলবাবু।

সদয়কুমারের বাড়িওয়ালা। বাধ্য হয়ে ফিরে যায় সদয়কুমার। কাপড়ের গোঁজে যে কষ্টের সাতটা টাকা।

দাম মিটে গেলে অতুলবাবু কর্মচারীটাকে কাছে আসতে ইঙ্গিত জানায়। বলে, ডাকতো নিতাই মালিকে—

সদয় বেঞ্চে বসে আনমনা। ফরসা চেহারায় লম্বাটে মুখ। মাঝখানে সিঁথি কেটেও লোকটার খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা চুল। কাঁধের ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলে ঠাকুরমশায় রান্না হচ্ছে— ?

—হচ্ছে তো গো চিত্তবাবু।

—বেশ। থাকতে হবে আজ। ঠাকুরদিকে ডাকো তো—

শুনতে পেয়ে জবারানী নিজেই বেরিয়ে সামনে দাঁড়ায়। চিত্তবাবু একটু এগিয়ে যায়, এটা সাবধানে রাখ—। এক্ষুনি আসছি।—সাবধানে কিন্তু—

জবারানী ব্যাগের ভার বুঝে আন্দাজ করে। ডিলার মানুষ। রেশনের মাল তুলতে এসেছে। সকাল হলেই তো কাজ। কাজের কাগজপত্তর টাকা পয়সা

ব্যাগে। জবারানীর দায় বাড়ে। এমন কিছু বাক্স সিন্দুক তো নেই। তাই কাঠ বিছিয়ে শোয়ার মাচা। মাচার নিচে মাটির হাঁড়ি কলসি, জীর্ণ একটা সুটকেশ, ছোট বড় পোঁটলা পুঁটলি। তিজেল হাঁড়িতে লুকোনো চাল, পাশে তেঁতুল জারিয়ে মুখটা কাপড় বাঁধা। অঘ্রান সংক্রান্তিতে পুজোর জন্যে বছর বছর নতুন ধান কিছু—সব মাটির হাঁড়ি কলসিতে। খদ্দেরের দাম পত্তর নিয়ে সদয়ের অজ্ঞাতে দুটো একটা আনি আধুলিও সরিয়ে তিজেল হাঁড়ির চালে গুঁজে রেখেছে। গোপন সঞ্চয়। সঞ্চয়ের আধার তো তিজেল হাঁড়ি। তাই ডিলার চিত্তবাবুর টাকা পয়সার ব্যাগটাও প্রথমে হাঁড়িতে ঢোকায় জবারানী। হাঁড়ির মধ্যে ঠাঁই পায় না। শেষে খদ্দেরের দামি ব্যাগটা হাঁড়ির পাশে আরও ঘুপচি জায়গায় ঠেসে ঠুসে রাখে।

রান্না সেরে বকুল রাস্তায়। প্রথম সন্ধেয় লোকজন। খদ্দের পাতি জমাবার উদ্দেশ্যে ডাক দেয়, আসুন বাবু আসুন গরমা গরম ঝোল ভাত—

ওপাশের নতুন হোটেলের ছোকরাটা রাস্তায় উঠে চেঁচায়, আসুন দাম দিতে হবে না। খেয়ে দেখে দাম—

বকুল হাঁকে, আসুন ভাই আসুন। হিন্দি চিনি ভাই ভাই, আনন্দে ঝোল ভাত খাই—পথচলতি লোকটা থমকে দাঁড়ায়, তুমি তো বেশ তরজা গাহক ছোকরা হে। কবে তারা বেড়িয়ে চলে গেছে—। এখনও মনে রেখেছ ?

—আজ্ঞে। যেন বেশি ঠাট্টা হয়ে গেছে এই অপরাধবোধে নুয়ে যায় বকুলটা।

বড্ড গরমে জামা ধুতি পাতলা হলেও রায়বাবু কোচার কাপড় অনেকখানি তুলে ভেতরে হাওয়া লাগায়। বলে, ও বকুলে যাবি চৌ-এন লাইয়ের দেশে ? আগে বললে তো সেই উড়োজাহাজে তুলে দিতুম—। পারবি দুটো কাঠিতে খেতে ? তারপরই রায়বাবু ডান হাত বাঁ হাত মুখে এনে মাকুর মতো খট্‌খট্‌ ওঠায় নামায়—

পুলিশটা এসে ডাক দেয়, ঠাকুর মশায় স্লিপ—

—কজন গো বাবু ?

—তিনজন। জলদি খানা লে যাও—বড়বাবুর অর্ডার—

—এক্ষুনি ?

—আভি। জরুর—

সদয় চেঁচায়, বকুলরে দিয়ে আয়—

রায়বাবুর নাটকে পর্দা পড়ে। চিত্তবাবু রাস্তায় পা ফেলে। মন্দিরের সিঁড়ি ধরে নীচে নামে। পটিতে তো অনেক যুবতী! বাড়ির বউয়ের থেকে রঙ ভালো গড়ন চটকদার। কাচের গেলাসে মজার তুফান। কোনো আত্মজনের নজর নেই। সামাজিক মর্যাদায় হেরফের নেই। নিজের গ্রাম দেশে নামী ডিলার। স্ত্রীর বিশ্বস্ত স্বামী দেবতা। ছেলে মেয়েদের কাছে খাঁটি পিতা।

তিনটে থালায় তিন আসামির জন্যে ভাত সাজায়। বাসি কলাপাতা শুকিয়ে কুঁকড়ে কালো। সেই পাতা টেনে টেনে থালায় ভাত ডাল তরকারিটুকু ঢাকে। কুঁকড়োনো পাতা আবার গুটিয়ে যায়। থালার ভাত আলগা। দু-হাতে দুটো

থালা নিয়েও তো আর একটা পড়ে থাকে? বকুল হাঁক দেয়, এ ভৈরব—ভৈরবরে—

ভৈরব রান্নাঘরে হাজির।

বকুল বলে, নে। ওই থালাটায় পাতা চাপা দিয়ে নে-চল—

এখন ফাঁকা বেঞ্চিতে একলা সদয়কুমার। কোমরের গেঁটে সাতটা টাকা হোটেল ঘরের ভাড়া।, অতুলবাবু নিয়ে নিলে ঝক্কি মিটে যেত! কেন যে এমন পরে বলল! বেশি বড়লোক তো…অনেক বুদ্ধিমান। সম্পত্তির সবটুকু তো আর উত্তরাধিকার সূত্রে আসে না। বেশ কিছুটা আসে বুদ্ধি ফিকিরে…খানিকটা স্বোপার্জনে। অতএব সম্পত্তিবান মানুষ সম্পত্তির একটা স্তর পর্যন্ত তো ধুরন্ধর প্রাণী…, বসে বসে ভাবে সদয়।

নিতাই মালি বাড়িওয়ালার কাছে বসে। দুজনে ভিট ভিট কথা বলে। সদয় দেখলেও বুঝতে পারে না। ফেরার সময় কাগজে একমুঠো চেনাচুর ঢেলে দেয় বু। নিতাই দুটো চারটে গালে ফেলতে ফেলতে দোকানে আসে।

বকুলের সঙ্গে ভৈরব। টেবিলের উপর হ্যাজাক জ্বলছে। বড়বাবু মেজবাবু কাগজপত্র ঘেঁটে কত কি যে লিখছে। পাশে মোটা মোটা কখানা খাতা। ফাইল।

মেজবাবু হাঁক দিল, সেপ্টি—চাবিটা খুলে দাও তো—

চার ইঞ্চি মোটা কাঠের ফ্রেমে দু-পাল্লার দরজা। লোহার গরাদ ঘন ঘন গাঁথা। ভিতরে ঘুপচি ঘরে মশা। ঝপাট ঝপাট চাপড়িয়ে মারে তিনজন অন্তরীণ মানুষ। দরজা খুলতেই সরু নালা থেকে তিন মানুষের পেচ্ছাপের কটু গন্ধ। ভাতের থালা তিনটে ভেতরে রেখে বেরিয়ে আসে বকুল। নিঃশ্বাস নিতে যে কষ্ট! ওয়াক থুঃ করে তবে মুক্ত মানুষ হয়। সেন্ট্রি তালা লাগায়। ভেতর থেকে এক আসামি চেঁচায়, স্যর এই খাবার মানুষে খায়?

—যা পাইছস খারে। তোমাকে কি জামাই আদরের খাবার দিবা গরমেন্ট? দাঁত কিড়মিড়িয়ে মেজবাবু হালকা হয়, শালা চুতিয়া—। বিড়বিড় করে, নেতাদের মিটিং করতে ঘরে ডেকে আনে—

মোটা মোটা দেওয়ালে গুলি-বন্দুকে বোঝাই ঘর…। মালখানা। দেওয়ালে ঘড়ির টিক্ টিক্ মিলিয়ে একটা উচ্চারণ ভঙ্গি আছে। মুখের ভাষায় শব্দ চয়নও ভিন্নরকম…কিংবা চিরাচরিতের গুপ্ত সরস্বতী প্রবাহ!

ভারি চেহারার বড় তালায় লম্বা চাবিটার পাক মেরে সেপ্টি রিংয়ে আঙুল গলায়। পরে অতি সন্তর্পণে মেজবাবুর পিছনে দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রাখে। কাঠের বাক্সটায় পাশাপাশি আরও কখানা চাবি পর পর ঝোলে। মানুষগুলোর হাজতবাস কিংবা হাজত থেকে মুক্তির চাবিকাঠি কি শুধু ওই লোহার চাবিটা!

সেন্ট্রি বন্দুক কাঁধে থানা ঘরের চারদিকে বারান্দা একপাক ঘুরে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকায়। সাদা গোল ডায়ালে দুটো কাঁটায় গোলাকার পৃথিবীর সময় সূচিত হয়। সেন্ট্রি দেখে আটের ঘরে ছোট কাঁটা বারোর ঘরে বড়টা। হাতে কাঠের হাতুড়িটা নেয়। পেটাই ঘণ্টিতে ঘা দেয়। ঢং…শব্দে আশপাশ কেঁপে

ওঠে। রাস্তার ঢাল থেকে ওঠার সিঁড়িতে প্রথম ধাপে পা রাখে ভৈরব। বাতাস কেঁপে পায়ে ধাক্কা। আবার ঢং··· । চরাচর দোলে। দূরে অন্ধকার। গাছপালায় ঘুমন্ত পাখি নড়ে ওঠে। ব্যাপ্ত চরাচরে কোথায় যে কাল···ঘন্টা···মিনিট··· সেকেণ্ড দাগ কাটে··· ! কী করে যে ঘড়ি সূচিত করে··· !

একটা করে ধাপ ভেঙে ওঠে দু-জন। ঢং···শব্দ বাজে। সাতখানা আওয়াজ কানে। উপরের ধাপটা পাকা রাস্তা ছুঁয়েছে। ঢং···শব্দটা বেজে ফুরোয়। তখনই পিয়ারি দামি সাদা কাপড়ে ফরসা। প্রবল বৈধব্য নিয়ে মাতাল কণ্ঠে চেঁচায়, ও ঠাকুরপো ঠিকানা দিলে না ? হরিশ সিংয়ের পোস্টিং কোথায়—

বকুল আগে আগে। পিছনে ভৈরব। পিয়ারি তখনও চেঁচায়। ভৈরব ফিরে ফিরে দেখে। পিয়ারি টলমলে পায়ে সিঁড়ি ধাপ ভেঙে থানার চত্বরে নামছে।

বড় খিরিশ গাছটার তলায় অন্ধকার খানিক ফিকে। বড় কাপড় দোকানে ডে-লাইটের আলো ছিটকে এখানে। পাশেই সোনারুপোর দোকান। স্বর্ণকার রেড়ির তেলে পিতলের প্রদীপ জেবলেছে। সলতেয় মোটা আগুন। পিতলের সরু নলে ফুঁ দিয়ে আগুন বাঁকিয়ে দ্রব্যটা গরম করে। সরু সরু রড দিয়ে তৈরি দরজার পাল্লা খোলা।

মহারানী ভোজনালয়ের বেঞ্চিতে চার পাঁচজন। ভৈরবের মনে হল, ওরা তাহলে খদ্দের। রাতে খাবে। থাকবে। নিজেও তো হোটেলের একটা কাজ করে দিলুম। বাবা খুব খুশি হবে।

এরকম একটা সন্তোষের মধ্যে দোকানের সামনে পা ফেলে ভৈরব। কিন্তু সদয়কুমার ভাঙা মনে চুপচাপ।

রিকশাটার পিছনে দশবারেজন ছোকরা, বয়স্ক চেঁচায়। মুখে মোচার আদলে টিনের চঙ। গায়ে ধরার মতো হাতল। চোঙা ফুকিয়ে লোকটা হাঁকে, 'ভোট দেবেন কিসে' ?

পিছনের লোকগুলো একযোগে চেঁচায়, 'কাস্তে ধানের শিসে'।

চোঙ হাঁকে 'আমাদের লোকসভার প্রার্থী বিপ্লবী কৃষক নেতা প্রিয় কংসারি হালদারকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন।'

সঙ্গী লোকজন চেঁচায় 'জয়ী করুন। জয়ী করুন'—

রিকশাটার সামনে দরমার উপর পোস্টারে বড় কাস্তে লেগে আছে ধানের ভারে নত একগোছা ধানচারা। চোঙ মুখে ছোকরাটা দৃপ্ত গলায় বলে, জোতদার জমিদার শিল্পপতি পুঁজিপতিদের দালাল তল্পিবাহক কংগ্রেসকে একটি ভোটও দেবেন না। আমাদের কাছের মানুষ আত্মত্যাগী সবার প্রিয়···যার যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ সে তো গরিব কৃষকের জন্য কাজ করতে গিয়ে—

টাক মাথায় চোখে গোল চশমা লোকটার খালি গা। কাঁধে সাদা লংক্লথের ফতুয়াটা। পায়ে মোটা ফিতের খাদি চটি। ছোকরার কথায় যেন গায়ে আগুন ধরে। দু-চোখে সে আগুনের ফুলকি ফোটে। পাশে বেঁটে চেহারায় কোঁকড়ানো চুলে ছোকরা মাস্টার।

একজন হ্যান্ডবিল লোকের হাতে হাতে দিয়ে যায়। দোকানে, পথচারিকে।

বেঞ্চের কাছে এসে সবাইকে একটা করে দিয়ে বলে, পড়বেন এইটা "মায়ের আবেদন"...

দলটা এগিয়ে যায়। খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে শুরু করে "কমরেড"—

বেঞ্চিতে বসেই লাইট, ঘড়ি সারাই মিস্ত্রি শুরু করে, কংসারি হালদার... বাপরে বাপ। ওর ভয়ে লাট কাঁপতো—জোতদারা ভয়ে কাঁটা। পুলিশ শত চেষ্টাতে ধরতে পারেনি। সমস্ত বেঞ্চ যেন ঘড়ি সারাই মিস্ত্রিকে ঘিরে ধরে।

—কখনও সধবার বেশে কোনো পুরুষের পাশে শুয়ে—কখনও মেয়েদের মাঝে মেয়ে সেজে—কখনও চাষিদের মধ্যে চাষি হয়ে—পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে। সবাই যেন রামায়ণ মহাভারতের গল্পের মতো টানে আগ্রহী। মিস্ত্রি এক টিপ নস্যি নাকে ঢুকিয়ে মৌজ পায়—, আরে এইবারে ভোটের নমিনেশন পেপার সই করে জমা দিল। এস. ডি. ও কাগজপত্র পরীক্ষা করতে দেখে যাবজ্জীবন দণ্ড জারি করা লোক কখন সই করে পালাল? ধর ধর—। আর ধর। স্বয়ং এস. ডি. ও-র চোখে ধুলো—। পুলিশ দারোগা ধরতে বেরুল—। আর পায়? কেউ বলে, হ্যাঁ। একজন বিধবা মেয়েছেলে গেট থেকে তো বেরিয়ে গেল—! সর্বনাশ!

—তারপর?

সকলে যেন উপকথার শেষটা শুনতে চাইছে। আসলে কি কোনো গল্প বা উপকথার শেষ হয়? রবং সেখান থেকে তো নতুন ঘটনার, কাহিনী ধারার জন্মসূত্র...!

অতুল বাবুর কর্মচারী ছোকরাটা সদয়কুমারের কাছে এসে বলে, বাবু ডাকছে—!

কথা শুনে নিতাইয়ের কান খাড়া।

সদয়কুমার গেঁটে হাত বুলিয়ে টাকাটার আন্দাজ নেয়। অর্জিত অর্থ হোটেল ঘরটার ভাড়া বাবদ দিতে যাচ্ছে তবুও কোথায় যেন আশঙ্কা বুকের ভেতর! এর আগের মাসগুলোয় দিতে গিয়ে এমন ফিরতে হয়নি! অর্থবান মানুষের তো প্রাপ্য অর্থ নিতে এতটুকু বাড়তি শ্রম হয় না। তাহলে! দুর্বলতা জেঁকে বসতেই সদয়কুমার কালীমন্দিরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে গড় জানায়।

অতুলবাবুর সামনে যেতেই একটা টুল দেয়, বসো ঠাকুরমশায়—

সদয় ভেতরে ভেতরে চমকায়! এত বড় ব্যবসায়ী, কত ভাড়াঘরের মালিক তিনি এমন খাতির করছেন হঠাৎ!

নিতাই মালি শোকেস ছুঁয়ে দাঁড়ায়।

—দাও কি দিচ্ছ—, বলল অতুলবাবু। সদরকুমার গেঁট থেকে শতযত্নে ভাঁজ করে রাখা টাকা-পয়সা কটা এগিয়ে দেয়, বাবু—নিন।

অতুলবাবু একটা একটা গুনে পাশে রাখে। রসিদ বইটার পাতা খুলে কলমটা গুঁজে দেয়। শুরু করে, হোটেল তো বেশ জমেছে—

সদয় মাথা নিচু করে বলে, আপনাদের আশীর্বাদ—

—আমার ভাড়াটা বাড়াও।

সদয় যেন আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বড়মানুষের কাছ থেকে থাপ্পড় খেল!

—বাবু। যাহোক করে চালাই।

—দুস্‌ বাবু। নতুন চেয়ার টেবিল ঝি বামুন সব তো রেখেছ? আমাকে সাতের বদলে ওমাস থেকে—, অতুল একটু দম নেয়। কিংবা দম নিতে দেয়।

সদয় হাঁ করে শোনে।

—ওমাস থেকে পনেরো দিও।

সদয়কুমার হাতজোড় করে বলে, বাবু আমার সব ধার-দেনা করে—

অতুলবাবু বোঝায়, তোমাকে কত বড় ঘর দিয়েছি। পিছনে পকুর। কত সুবিধে। এখন কাউকে ভাড়া দিলে পনেরো কি গো অন্তত ত্রিশ হত—

নিতাই মালি মুখ খোলে, হ্যাঁ ঠাকুরদা—বাবু যা বলেছে ঠিকই। তবে বাবুকে একটু বনিয়ে সনিয়ে নিতে বল—

অতুল খুশি নিতাই মালির ওকালতিতে। বেশ পরিপাটি স্বরে বলে, আচ্ছা নিতাই যখন বলছে—তুমিও ছেলেপুলে নিয়ে দোকান চালাচ্ছ। যাকগে, পনেরো নয় ওমাস থেকে চোদ্দ করে দিও—

সদয় কুল হারিয়ে হাবুডুবু। হঠাৎ নিচু হয়ে টুলের দিকে ঝুঁকে বাবুর ফরসা পা-জোড়া দেখতে পায়। মনে হল, ওখানে সব সমাধান তাবত দুঃস্থ মানুষের।

অতুল হাতে আটকায়। সদয়ের বুকে ব্যথা কেটে আঁচড়ে যায়। কত ভক্ত যজমান পা ধরে আশীর্বাদ ভিক্ষে করেছে! সে সব যে কোথায় চলে গেছে!

—কি তবে এ মাসেরটা লিখি? ও মাস থেকে চোদ্দ—তাই তো?

একটা স্বীকারোক্তির উপর এ মাসের রসিদ প্রাপ্তির শর্ত সামনে ঝোলে। তাই নিরুপায় সদয়কুমার বধ্যভুমিতে বলির মতো বলে, হ্যাঁ—তাই।

অতুলবাবু খস খস করে রসিদ লেখে। নিতাই মালি এই বাক্যটুকুর সাক্ষী হতেই যেন দাঁড়িয়ে ছিল। বুকের ভিতর আঘাতটা জমতেই মুখ ভার। হোটেলে ঢুকে দাঁড়ায়। জবারানী বলে, কি গো ভাড়া নিল!

রসিদটা এগিয়ে দিয়ে বলে, নেবে না আর? পরের মাস থেকে ডবল ভাড়া—

—সে কি! জবারানীর গলা ছিটেবেড়ার ওপাশে চলে যায়। নিতাই মাথা নিচু করে দালালিগিরি সাব্যস্ত করে। বরং যুক্তি খোঁজে নিজের মনে নিতাই মালি, কী হবে ছাই সদয়ের পক্ষে বেশি কথা বলে? তার চেয়ে কত বড় মালিকের কাছের লোক হয়ে গেলুম—

ভৈরব এসে দাঁড়ায়। হাতে তখনও 'মায়ের আবেদন' হ্যান্ডবিলটা। লেখা তো আছে, চাষির চাষ করা ধানে জোচ্চুরি করত জোতদাররা। চাষিঘরের নারীর ইজ্জত নিত খুশিমতো। সাফ করা জমি থেকে পরের বছর উচ্ছেদ করত—অত্যাচারি জোতদার—নায়েব ও তার সঙ্গী দালাল বাহিনী। তাইতো মানুষের —গরিবের জন্যে আমার ছেলে জীবনপাত করে সংগ্রামে নেমেছিল কৃষকসমিতি নিয়ে…

—কি গো বাবা ?

—পাশে থাকলেও কি আর পড়শি হয়…। বড় খেদে গড়ে ওঠে শব্দবন্ধ কটা সদয়ের কণ্ঠে। একটা একটা শুনে ভৈরবের ব্যথিত বুক ফাঁকা। তখন সেই চোঙা ফুকনো দলের মানুষগুলোর মুখ চিনতে চেষ্টা করে। বাইরে এসে দেখে তারা তো অন্ধকার ভেঙে কোথায় কতদূরে চলে গেছে! তাদের টিনের চোঙের গা কাঁপিয়ে একটু জোর গলার শোনা আওয়াজগুলো কানে ফিরে আসে, "…জোতদার পুঁজিপতির তল্পিবাহক।"

সাঁইত্রিশ

সরাইখানা মাসির দাওয়ায় হোগলা ঘিরে এখন চারদিক আড়াল ঘর। ভাঁটি তার খোরাকি ভাতটা মহারানী ভোজনালয় থেকে ডিশে গামছা বেঁধে নিয়ে আসে। সেই ভাতে বিহারী রামা আর ভাঁটি ভাগ করে খায়। বিনিময়ে রামা নিজেকে ভাগ দেয় ভাঁটির কাছে। ভাঁটি বিলিয়ে দেয় সারারাত রামার কাছে। রামার তো তবু বিহার আছে। ভাঁটির যেটুকু ছিল সে সব কোথায় যে কি হয়ে গেছে! তাই রিক্ত হয়ে কিছু সন্ধান করে।

সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ে ভাঁটি। রাস্তার ওপারে রামার কাঠের বাক্স, পিঁড়ে সাজানোর জায়গাটুকু ঝাঁটিয়ে দেয়। কাটা চুল সাবান-জাপটানো দাড়ি গোঁফ ঠেলে ঠেলে দূরে সরায়। তারপর তো মহারানী ভোজনালয়ের কাজকর্ম।

ভাঁটি বাটনা তৈরি করে সব্জি আনাজ কোটাকুটিতে লাগে। সামনে ধারালো বঁটির ডগা। আলু কুমড়ো কুচিয়ে ঢিপি। বকুল গলা চড়ায়, এক গামলা জল আন—ধুতে হবে।

ডেইলি ভাত মাছ খেয়ে লুকোনো গতর ফুটে ওঠে। জলের জন্যে ওদিক ফেরে। বকুল একটা কাটা আলু ছুঁড়ে মারে ভাঁটির ভারি কোমর পাছায়। রাস্তার ওপার থেকে ছুটে আসে রামা।

হাতে এক পায়ের খড়ম। অন্যটায় খটাস্ খটাস্ পদক্ষেপ। জালার জল মগ ডুবিয়ে তোলে ভাঁটি। রামা সোজা হোটেলে ঢুকে ভাঁটির ভারি পাছায় খড়ম দিয়ে চটাস্ চটাস্ মারে—, শালি রেণ্ডি। দিল্লাগি— ?

জ্বলে যায় পিছনটা। মুখ ফিরিয়ে তাকায়। হাউ মাউ কেঁদে বলে, কেন ? কেন মারলি— ?

—চাকর কি সাথ চাকরানির মজা হচ্ছে ? দু-চোখের রোষ বাঁ চোখেই ফুটে বেরয়।

সদয় হেঁকে ওঠে, রামা মারতে হয় তোর ঘরে মারবি—এখেনে তেড়ে এসেছিস কেন রে ?

বিশ্রি মুখভঙ্গি করে রামা, এহি হোটল না রেন্ডিখানা বনাচ্ছো ঠাকুরদা ?

রামা মুখ সামলে—, সহযোগীর আশায় সদয় বকুলের দিকে তাকায়। বকুল বঁটি আগলে বসে। ওদিকে তো রামার হাতে খড়ম।

এইটুকুতে আক্রোশ খানিক ঝরে। রামা আর এক পায়ে খড়ম গলিয়ে হাঁটে। জবারানী ডাকে লোকটাকে, ও ভাই—ভাঁটিকে আমরা ছাড়িয়ে দিই ?

রামার আক্রোশের আগুন দপ করে নিভে যায়। ভাঁটির এক ডিশ ভাতে যে রামার রাতে রুটি বানাতে হয় না। তাই সুবিবেচক ভঙ্গিমায় গুম মেরে রাস্তা পার হয়। ওপাশে নিজে বসার পিঁড়ে ডাইনে ছোট্ট কাঠের বাক্স। খোলা ডালায় বিছোনো ক্ষুর কাঁচি ক্লিপ। এক ডেলা ফিটকারি চিক চিক জ্বলে। ঢাকনা খোলা আয়নার পিছনে অশ্বত্থ গাছ। মন্দির চূড়োর ত্রিশূলের ফলা বিম্বিত। ধারালো ফলাটা ফুটে যায় বুকের মধ্যে। ভাবে রামা,…কেনই বা মারতে গেলুম ! যদি বিগড়ে যায় ঝিটা— !

কোমর পাছার ত্বকে খড়মের জ্বালা কমে। একটু একটু শিহরণ ব্যথা দেয় ভাঁটির বুকে। উকিলবাবুর উৎপাত তো পেটে ধরেছিল ভাঁটি বাবুর বাড়িতে। বাবুর বউ নিজের পুরুষকে মুখ ঝামটা দিয়ে খুব বুঝিয়েছিল ভাঁটিকে, ও মেয়ে এ যে বড্ড লজ্জার—। সাত কান হলে তুই মুখ দেখাতে পারবিনি—। আমরাও পারব নি—

—তাহলে…। বউয়ের জবানিতে ভাঁটি উকিলবাবুর ফিশফিশ আশ্বাস-গুলোয় তখন ফোঁপরা আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। গাছ গাছড়ার শিকড় বাকড় নিজে হাতে বেটে উকিল বউ বলেছিল, খেয়ে নে—।

খাদ্যবস্তু ভাতের খোঁজে এসেও তো অন্য খাদ্য গিলতে হয়। বউটা কদিন পরিচর্যায় তাগদ ফিরিয়ে দেয়। লোকলজ্জা মুছে যায় আশপাশের নজর থেকে। কদিন পরে উকিল বউ বলেছিল, ভাঁটি—তুই এবার পথ দেখ। আমার কাজের লোক লাগবেনি—।

সেই উকিলবাবু বেলা দশটায় গায়ে কালো কোট চাপিয়ে এজলাসে যায়। হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে মক্কেলের হয়ে বলে, মাননীয় আদালত আমি বিপন্ন। বিচার প্রার্থনা করছি যে—

গোমড়ামুখে রাস্তার ওপারে তাকায় ভাঁটি। রামা পিঁড়েয় বসা লোকটার সাবান ভর্তি গালে ক্ষুর টানে। তখন ভাঁটি ভাবে, উকিলবাবুর মতো গোপন রাখতে চায়নি তো হিন্দুস্থানি নাপতেটা। বরং লোক সমক্ষে আমার জন্যে আমাকে পিটিয়ে জানিয়ে দিলে আমি তার— !

রামার উপর আস্থা জন্মায়। মায়া বয়ে যায় এপার থেকে ওপারে। বকুল বলল, এই ভাঁটি গেলাসগুলো ধুবি তো—

ছিটকে ওঠে ভাঁটি—, তোমার কাজ তুমি সারো। যা কাজের কথা বাবু বলবে। আর বলবে মা—

জবারানী আনাজের খোসা কটা তোলা থামিয়ে বলে, হ্যাঁ। তাই হবে—।

বকুল চুপ মারতো—, সদয় রান্না ফেলে কাছে আসে, হ্যাঁরে বকুল তোরা কি বাজারে ভোঁড় ভেড়ুয়ার মতো যাত্রা করবি ? এটা মা গন্ধেশ্বরীর দোকানদানি তো—না কি ? একটু শুদ্ধ মনে শুদ্ধ আচারে থাকবি তো—

সম্পর্কে ভগ্নিপতি সদয়কুমার। তার বকুনিতে বকুল গম্ভীর। জবারানী

চোখ ছোট করে মাথা নামায়। অপছন্দ জানায়।

বকুল পা ঘষে ঘষে হোটেলের সামনে যায়। বেঞ্চে বসে রাস্তায় লোক দেখে। রিকশা, বাস সাইকেল দেখে। মন্দিরের ওপারে ডাল আটা নুন তেল তেজপাতার টুকরি বোঝাই লরিটা। বড়বাজার থেকে চালান। দোকানে দোকানে গস্তের ফর্দ মিলিয়ে নামিয়ে দেয় খালাসি। মাল বয় বুড়ো মুটে।

লরিটার সম্মুখে বড় চাকার পাশ থেকে নজরটা একটু বাঁকিয়ে নিতেই মহানন্দের গন্ধেশ্বরী ভোজনালয়ের সাইনবোর্ড। টেলিগ্রাফের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বঙ্কিম দাঁড়িয়ে। রেলের ফুলপ্যান্টের উপর পোর্টারের লাল জামা গায়ে। রোদ লেগে টকটকে। মাথার উপর অনেক তারের খাঁজে কাঁটা খোঁচায় কাকের বাসা। কাকছানার জন্যে মা কাক খাবার খুঁজতে গেছে। খাবার খুঁজতে খুঁজতে তো বকুল এখানে। দূরসম্পর্কের ভগ্নিপতির মুখে এমন কেচ্ছা জড়ানো ভাষায় কথা শুনে মনটা খারাপ।

ভাঁটি কাচের গেলাসগুলো ধুয়ে চকচকে করে। জবারানী দেখে বলে, খুব ভালো ধুয়েছিস তো মা। এই না হলে মেয়েছেলে? গেলাসের জল দেখে তো খদ্দেরের পবিত্র হবে ভাত খেতে--। প্রশংসায় ভারি মুখ ফরফরে হয়। গেলাস-গুলো নিয়ে জানালার পাশে রাখে ভাঁটি। একটা মোটা তক্তা জল পেয়ে নরম। তার উপর পরপর সাজায়। হোটেল ঘরের হাওয়ায় বকুলের মন খারাপ ভাসে। জবারানী ডাকে, ও বকুল—

বেঞ্চ থেকে সাড়া দেয়, এই তো—

—শোন

কাছে আসতেই জবারানী পুজোর বাতাসা দুটো ধরে বলে, হাত পাত—খা।

ভাঁটি ন্যাতাটা নিয়ে টেবিলের ধুলো ময়লাগুলো মুছতে থাকে। আর কিছুক্ষণ পর থেকে তো খদ্দেরপাতির শুরু। শুকনো ন্যাতাটা টেবিলে বুলিয়ে একবার রাস্তার ওপারে তাকায়। রামার সামনে পিঁড়িতে খদ্দের। কাঁচি চালিয়ে কচ কচ চুল ছাঁটে। ঘাড়ের কাছে কাঁটা ক্লিপ চালায়। লোকটা চামড়ার কামড়ে ঠিকরে ঠিকরে ওঠে। রামা ধমকায় খদ্দেরকে, কেয়া হোতা— ?

পরে হাতের চেটোয় ধারালো ক্ষুরটা একবার উল্টোপাল্টা টানে মুছে তীক্ষ্নতা বাড়ায়। বাটির নোংরা জল ফেলে দিয়ে জলের শিশিটা দেখে একদম ফাঁকা। জলে ঘাড় জুল্পি না ভিজোলে ক্ষুর টানবে কেমন করে?

ভাঁটি সংকট বুঝে ন্যাতাকানি টেবিলে ফেলে, এক মগ জল নিয়ে রাস্তার ওপার।

ষাঁড়টা গলকম্বল দুলিয়ে থপ্ থপ্ হাঁটে। পিঠের উপর কাকটা বসে। পরের ঘাড়ে যাত্রী।

ঝোল তরকারি ঢাকা দেওয়ার বড় কখানা কাপড় টুকরো হাতে নিয়ে জবারানী ডাকে, ও ভাঁটি—

বেঞ্চিতে বই খাতার পাশে ভৈরব বলে, ভাঁটিদি ওপারে—

—কোথায় রে? বলে সামনে আসে জবারানী। দেখে, রামার গাবদা বোতলের সরু মুখে খুব যত্নে মগের জল ভরে দিচ্ছে ভাঁটি।

গায়ের কাছে চণ্ডাল রাগের রামা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রামা ভাঁটিকে দেখে ভৈরবের চোখ আটকে যায় খিরিশ গাছটার ঢাউস কাণ্ড উচ্চতায়। কত সপ্তাহ পার হয়ে গেল এখনও গাছে চাঁচ'য়ের গায়ে কাগজের বড় পোস্টারটা দামি আঠায় সাঁটা। সেখানে, 'জোড়া বলদ' জোয়াল কাঁধে হাল টানছে।

আটত্রিশ

পেট ডাবরা বড় কাচ লাগানো হ্যারিকেনটা নিয়ে আগে আগে হাঁটে গ্রুপ ডি কর্মী। গায়ে খাকি জামা পরনে খাকি ফুল প্যান্ট। জামার বুক পকেটে লাল সুতোর কাজে মোটা মোটা তিনটে সাহেবি বর্ণ এস. ডি. এইচ.। পিচ ঢালাই কালো রাস্তায় পেট ডাবরা আলো ক্রমশ এগোয়। পিছনে প্যান্ট শার্ট বুট জুতোর আওয়াজ করে হাসপাতালের বড় ডাক্তার। সঙ্গে ধুতি শার্টে ফরসা মুখ চোখে কম্পাউন্ডার।

আলোর বলয়ে তিন মানুষ হাঁটে। তারা থানা ফেলে মহারানী ভোজনালয়ের সম্মুখ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাক্য গড়ে। সেই গড়নে টুকরো টুকরো গল্প তৈরি হয়।

কম্পাউণ্ডার বলে, স্যার ওষুধের রিকুইজিশান লিস্ট তৈরি করতে হবে।

বড় ডাক্তার, কাল স্টক রেজিস্টার একবার দেখিয়ে লিস্ট শুরু করে দিন।

পেট ডাবরা আলো মহানন্দার গন্ধেশ্বরী ভোজনালয়ের সামনে।

বঙ্কিম, আসুন বাবু—, বলে সমীহতে থমকে যায়।

বড় ডাক্তার, আজ পোস্ট মর্টমের সময় ম্যাজিস্ট্রেট মজুমদার হুড়হুড় বমি করে ফেলল।

—হ্যাঁ স্যার। আমি জল দিয়ে ওষুধটা খেতে বললাম। তবুও খেতে কত দ্বিধা।

এবার আলোটা মহকুমা শাসকের কোর্ট চত্বরে ঢোকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ট্রেজারি পাশ কাটায়। রাত আটটা বেজে দশ। সেন্ট্রির চিৎকার, হল্ট্।

ডাক্তারবাবুর গম্ভীর গলা, হুম্!

কম্পাউন্ডার বলে, স্যার ওরা জানে। তবু চেঁচাবে রোজ—

ডাক্তার একটু হাসে।

বড়পুকুরের এপাশে তো উঁচু উঁচু মোটা দেওয়াল তুলে জেলখানার মস্ত প্রাচীর। গেটের মুখে মোটা মোটা রডের বড় পাল্লা। ভারি লোহার ভারি দরওয়াজা। সেণ্ট্রি বন্ধুক কাঁধে অ্যাটেনশান ভঙ্গিতে জুতো ঠুকে স্যালুট জানায়।

বড় ডাক্তার একটু থমকে কপালে হাত ছুঁয়ে প্রত্যাভিবাদন জ্ঞাপন করে। কয়েক পা এগিয়ে বলে, জানেন কম্পাউণ্ডারবাবু—আজ এক ডাকাতের জবর

দেখছিলুম। তার কব্জি যে কত শক্ত না—!

—হবেই তো। ওই হাতে সোর্ড চালায়—মার্ডার করে যে

সারাদিনের বিক্রিবাটার ক্যাশ মিলিয়ে হাঁপ ছাড়ে অতুলবাবু। তালায় চাবি লাগিয়ে একটু বেরোয়। কর্মচারীরা ঝাঁপ নামায়। হাওয়ায় একপাক দিয়ে হঠাৎ মনে পড়তেই অতুলবাবু আবার দোকানে ঢোকে।

সামনে চ্যাটাই পেতে কজন খদ্দের খালি গায়ে হাওয়া লাগায়। জবারানী নারায়ণ শিলার সামনে লম্ফর আলোয় ছোট মশারিটার ছেঁড়া জায়গায় তাপ্পি মারে। হাতে সুঁচ-সুতো। খদ্দেরকে মশারিটা ভাড়া দিতে পারলে তো দু-আনা পয়সা। এটা এই হোটেলকে বাঁচিয়ে জবারানীর নিজস্ব উপার্জন। ভাবে, আরও খান দুই মশারি তিনটে বালিশ করতে পারলে তো ভালো হয়। শীতের জন্যে দুটো কম্বল। শুনি তো সরাইখানায় এক কম্বলের ভাড়া এক টাকা—। কত এক পয়সা দু পয়সা চার পয়সা পাশাপাশি রাখলে যে একটা টাকার সমান হয় ···! চালের তিজেলে যা দু-চার পয়সা জমানো সেটা গুণে দেখলে তো হয়। পনেরো বিশ টাকা হবে না···। হঠাৎ সুতোটা কেটে যায়।

জবারানী সুতোর খুঁটটা খুঁজে পায় না। অনেকক্ষণ তো স্বল্প আলোয় সূচীকর্ম চলছে। চোখটা ধাঁধিয়ে যায়। নিজেরও বয়েস একটু একটু ভারির দিকে। সুতোর ডগাটা জিভে ভিজিয়ে আবার সুঁচের বিঁদে ঢোকায়। প্রবল নিবিষ্টতায় সুতো আর সুঁচ একাকার। সুতোটা সেঁধিয়ে যেতেই স্বস্তি। ছেঁড়া জায়গায় টুকরো কাপড়ের পটিতে দু-তিনটে ফোঁড় দিয়ে ভাবে, দু-হাতে সরু দু-গাছা সোনার চুড়ি করতে কত সোনা লাগে? কত দাম হতে পারে···! গেরস্ত ঘরে তো এক চিমটি সোনার কিচ্ছু নেই। সুঁচ দিয়ে ছেঁড়া জায়গায় পটি বুনে যায় আর চুড়ি জোড়ার উপর সোনার লতাপাতা কিংবা প্রান্ত থেকে চৌকো খোপ খোদাই করে আপন মনে। স্বর্ণকার হয়ে।

পটিটা সেলাই দিতে ছেঁড়া জায়গা ঢাকা। একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, হবে কি আর অমন দু-গাছি সোনার চুড়ি? মাস গেলেই তো এখন ডবল ভাড়া দিতে হয় বাড়িওলাকে। তার পাজি দোসর তো ওই নিতাইটা—!

কাচের গেলাস আয়না বাটির উপর আলো। ছোট হ্যাজাকেই কাচের দ্রব্যগুলি ঝকমক করে।

অতুলবাবু ডান হাতের মুঠিতে কটা খুচরো পয়সা এনে বলল, নিতাই দেখবি আয়—

—কি বড়দা?

—নয়া পয়সা

—তাই! দেখি—, একেবারে যেন লাফ দিয়ে বাইরে এল নিতাই। পয়সা কটা দেখতে দেখতে বলে, হ্যাঁ এই সাতান্ন সালের ১লা এপ্রিল থেকে চালু হবার কথা। এর মধ্যে বাজারে এসে গেল?

—আসবে না? আজ তো এপ্রিলের তিন তারিখ, স্মরণ করিয়ে দেয় অতুলবাবু।

অতুলবাবুর ফরসা হাতের চেটো থেকে নিতাই মালির শিরা ফুটে ওটা কালো মুঠির মধ্যে নয়া পয়সার ক্ষুদ্র এককগুলি পর পর। চকচকে তামায় পাতলা গোলাকার এক পয়সা। গোলাকার প্রান্তে ঢেউ কেটে সাদা ধাতবে দু-পয়সা। চার কোনায় ঝকঝকে পাঁচ পয়সার একক। দু-পয়সার থেকে খানিক বৃহৎ আদলে তো দশ পয়সা। আলো পেয়ে নয়া পয়সাগুলো ঝিলমিল জ্বলে। নাকি পয়সাই তার দাহিকা তেজ নিয়ে নিজেই জ্বলছে!

ভৈরব মুখ বাড়ায় পয়সাগুলোর দিকে। সদয়কুমার পিছন থেকে দেখে। বকুল ঘাড় উঁচু করে তবে ঠাঁই পায়। বেঁটে ভাঁটি সকলের কোমরের নীচে। সবাই উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়ে। কখন যে নতুন পয়সাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা যায়। এত কষ্ট···খাটা খাটুনি সব তো পয়সার জন্যে!

—বড়দা, তাহলে পুরনো পয়সা আর চলবে না? আমরা খদ্দেরের কাছে দাম নেব কীসে?

নয়াপয়সায়?

মাত্র তো একটা ছিটেবেড়ার ওপারে নিতাই মালির দোকান। কথাবার্তা খসে খসে জবারানীর নারায়ণশিলা সাজানো চৌকির কাছে পৌঁছয়। ফলত কথা-বার্তার ভাঙাচোরা অংশ খানিক কানে ঢোকে।

—দিন কয়েক নতুন পুরনো দুরকম পয়সা বাজারে চলবে। তারপর পুরনো পয়সা একদম বাতিল—, বলে অতুলবাবু।

হঠাৎ 'পুরনো পয়সা বাতিল' কথাটায় মাথা ঝাঁঝিয়ে ওঠে জবারানীর। তৎক্ষণাৎ মশারি সুঁচ সুতো ফেলে হোটেলের সামনে আসে। অতুলবাবু তখনও দাঁড়িয়ে। নয়া পয়সা চোখের সামনে পেয়ে মানুষটার কৌতূহল উপভোগ করে। জবারানী বাড়িওয়ালাকে দেখে মাথায় কাপড় দেয়। সমীহ জানানোর আর কোনো পদ্ধতিতে রপ্ত নয়।

নিতাই মালির হাতে তখন পয়সা কটা। ভৈরব সদয়কুমাররা পয়সাগুলোর ওজন কেমন, আঙুলে গোনা যায় কেমন করে—সেটা পরখ করার জন্যে হাঁইফাঁই করে। কিন্তু এত বড় বাড়িওলা কত পয়সার মালিক স্বয়ং নিতাইয়ের হাতে নয়াপয়সা, সদ্য ব্যাংক···থেকে আসা পয়সাগুলো পেয়েই তো প্রিয়জন হিসেবে নিতাইকে আগে বেছেছে। পাশাপাশি একইরকম ভাড়াটিয়া হলেও সদয়কুমারের থেকে নিতাই তো বাড়িওয়ালার কাছের জন! তাই দেখতে মন ছটপট করলেও চাইতে গিয়ে নিজেকে সংযত রাখে।

—বড়দা

—উঁ

—আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা এমনি হিসেব পারে না তার উপর এই একশো পয়সা করে গোনা—মাথা গুলিয়ে ফেলবে।

অতুলবাবু উৎসাহে বলে, শুধু পুরনো পয়সা বাতিল? ওজনও বদলাবে। আর তোরা এক সের আধ সের আধ পো এক ছটাক বললে মাল পাবি নি। এবার বলবি এক কিলো পাঁচ শো গ্রাম এক শো গ্রাম—

জবারানী কথাগুলোয় ভয় পায়। মাথায় ঘোমটা দিলেও যেন কানের কাছে কাপড় নেই। কী দ্রুত যে কানের মধ্যে দিয়ে মর্মটা বুকে পাক মারে। আর দাঁড়াতে পারে না। সোজা ঘরে ঢুকে পিতলের রেকাবিতে বসানো নারায়ণ শিলার সামনে চুপচাপ। লম্ফটার পলতেয় আগুন। লম্ফটা হাতে নিয়ে বিছানা পাতা মাচার তলায় ঢোকে।

পর পর সাজানো পুজোর সুপারি হরিতকির ছোট্ট একটা মালসা। পরে বছর বছর সংগ্রহ করা এক আধমুঠো পুজোর ধান। তার পাশে বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া পাকা তেঁতুল ছাড়িয়ে নুন মেরে তিজেল। পরেরটায় ভাঙা চিরুনি ওষুধের খালি শিশি বোতল, প্যাঁচ কাটা ছিপি, বাতিল সুতো দড়ি। এ তিজেল হাঁড়িটায় দিনের শেষে বা প্রথমে বাজার থেকে কেনা চালের এক আধ মুঠো। মাচার উপর বিছানা কাঁথা। নীচে জ্বলন্ত লম্ফ। আগুনের শিস বেয়ে গরম ধোঁয়াটা বিছোনো তক্তার পিঠে লাগে। একটু একটু করে ভুষো কালি জমে কাঠের গায়ে।

জবারানী তিজেল হাঁড়ির চালে হাতড়ায়। আঙুলে ছুঁয়ে যায় তামার গোটা পয়সা। সেটা তুলে মাটিতে রাখে। আবার হাতড়াতে পায় একটা হলদেটে এক আনি। পরে ডবল পয়সাটা। এবারে বড় মতো চারকোনা দু-আনি। সেটাও মাটিতে পেতে রাখে। ভাবে, আমার কত কষ্টের সঞ্চয়…এগুলো আর বাজারে চলবেনি! এর বদলে নতুন পয়সা…! এগুলো যে কতদিন ধরে একটা একটা পয়সা লুকিয়ে চুরিয়ে গোপনে রাখা। সে সব বাতিল হয়ে যাবে…বাজারে কেউ নেবেনি…সোনাওলাও না…!

চোখ ভর্তি হয়ে জল আসে। লম্ফর শিখার সামনে কাঁদে জবরানী। গাল গড়িয়ে টপ টপ চোখের জলে শুকনো মাচাতলা খানিক ভিজে যায়। পাশ ফিরতে নারায়ণ শিলার চৌকি। গোপনে সঞ্চিত পয়সাগুলোর জন্যে লোক জানিয়ে কাঁদতে চায়। নিজের যে কী গোপন ব্যর্থতা! ভেজা গলায় নারায়ণ শিলার দিকে তাকিয়ে বলে জবারানী, হে বাবা ঠাকুর তুমি ছাড়া আমার এ চুরি করে সঞ্চয় গোটা সংসারে আর কেউ জানেনি। তুমি এই করলে…

মূক জড়বত শিলাখণ্ডটুকু লাল চেলি জড়িয়ে চুপচাপ। গোটা ধনবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর কাছে এই মাচাতলায় জবারানী যে কত ক্ষীণ! মুদ্রা ব্যবস্থা, মুদ্রা মান, মুদ্রা উপার্জন ও সঞ্চয়ের মূল্যমানের কাছে তো মুহুর্মুহু দীন!

ঊনচল্লিশ

সিনেমা হলের তেতালায় বড় মাইকটার গোল মুখ দিনরাত বেরিয়ে থাকে বাইরের দিকে। জোর ভল্যুমে গানটা বেজে ওঠে, 'মা আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা…' পরের গানটা 'ছন্দে ছন্দে দুনিয়া নন্দে, আমি বনফুল গো…'

চড়া আওয়াজে গান ক'খানা ভেসে যায় বাজারহাট, আশপাশের পাড়াপল্লী

আশপাশ বাড়ির বউ-মেয়েরা ঘাড় ফেরায় হলের দিকে। কবজিতে তো হাতঘড়ি তত ঝিকমিক করত না। দারোগা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা বড় উকিল জোতদারের বউ-মেয়েদের হাতে দু-একটা ঘড়ি অলঙ্কারের সমীহে টিকটিক বাজত। বাকি তো সব ওই গান শুনে পুকুর দাওয়ার গেরস্থালি ফেলে শাড়ি-ব্লাউজে তৈরি হয়ে নিত। এবারের গান '···প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম···।' তখনই জোরে জোরে পা ফেলে সঙ্গী পুরুষ বউ, কুটুম্ব মেয়েদের বলত, আড়াইটে বেজে গেল। চল বই আরম্ভ হয়ে যাবে—

সেই সকালর অফিস টাইম থেকে বকুল ডেকে হেঁকে দু-চারজন খদ্দের যা জোগাড় করেছে। তৈরি ভাত-ডাল-মাছের ঝোল কড়ায় জমে আছে। ভাঁটি খিড়কি দরজার ওপাশে আলোয় বসে। আলগা চুলে আঙুল চালায়। একটা দুটো উকুন পায়। দুহাতে বুড়ো আঙুলের নখে টিপে মটমট মারে।

খদ্দেরপাতি ডাকলেও আসে কই? সব তো মহানন্দার গন্ধেশ্বরী ভোজনালয়ে নয়তো নতুন হোটেলে। তাদের টেবিলে শ্বেতপাথর বসিয়ে দুধসাদা আসবাব। নতুন ইলেকট্রিক লাইট। মাথায় তিন ব্লেডের সিলিংফ্যান। চেনা খদ্দেরগুলোকে ডাকলেও হাত নাড়িয়ে স্তোকবাক্য জানায়, আসছি। পরে আসিয়ে···। বড় লাগে সদয়কুমারের! ভাবে, সত্যিই তো চারদিকে গরম। আকাশে সূর্য কঠিন রোদ ছড়াচ্ছে। ভাত খেতে বসে খদ্দের বড্ড ঘামে। মাটির দেওয়াল। ঝকঝকে মেঝে নেই। ওপরে আলাদা সিলিং করে হোটেলঘরে খাওয়ার জায়গাটা পরিচ্ছন্ন নয়। পুরো ব্যবস্থাটা খদ্দেরকে আকৃষ্ট করতে পারে না! কী করে যে ওপাশের গন্ধেশ্বরী নতুন হোটেলের সাজগোছ আর আয়োজনের সমান সমান হয়ে ওঠা যায়!

কিস্তিওয়ালা পণ্ডিতজী বলে, ঠাকুরো—ও ঠাকুরো—। সম্বোধনটা সেরে ঝুল পকেট থেকে উড পেন্সিলটা বের করে দাঁড়ায়। একটু গলা চড়ায়, উত্তরপ্রদেশের তেজারতি কারবারি মানুষটা, কই রুপিয়া দাও—

—পণ্ডিতজী খদ্দেরপাতি কম। ও-বেলা নেবেন—, নিবেদন রাখতে রাখতে সদয় একবার তাকায় টেবিল-চেয়ারগুলোর দিকে। ধাঁ করে মস্তিষ্কের কোষে দ্যোতনা, কিস্তিওলার টাকায় এসব করেও খদ্দেরজন আসে কই? ক'মাস ধরে তো বাজার মন্দা! সব যে কেমন হয়ে গেল! পণ্ডিতজী ধমকায়, আভি টাকা দেও। খাতায় খেলাপি করছ তুমি—

—রাতে তো আসবেন। তখন দুদিনের কিস্তি একসঙ্গে দুবো—, কত করে বোঝায় সদয়কুমার। পণ্ডিতজী পেন্সিলটা কানে গুঁজে গালের পান আর এক কষে চালান করে বলে, লেকিন শামসে ঘুরাবে না। বাত রাখবে—

এই বাত, কথা রাখাটা যে বড় কঠিন হয়ে পড়ছে সদয়কুমারের। ঝি বামুনের খরচ তার সঙ্গে ঘর ভাড়াটাও ডবল। এরপর বাজার-দাম হু-হু করে বাড়ছে—তাল রাখতে পারছে না সদয়কুমার। ভাবে, রাঁধুনি বকুলকে ছেড়ে দিয়ে শুধু ঝি ভাঁটিকে রেখে আবার আগের মতো নিজে চালালে কি খানিকটা খরচের সাশ্রয় হবে?

ষাঁড়টা গা থপথপিয়ে হাঁটে। গোটা হোটেলঘরটার মেঝের আসনের সম্মুখ ভাগে মাটি শুকনো। খদ্দের হয়নি তাই সকড়ি থালা-গেলাস তুলে ন্যাতা দিতে হয়নি। যার ফলক্রমে কড়ার ঝোল ডাল কড়া বোঝাই হয়ে আছে এখনও।

ষাঁড়টা কাছাকাছি আসতেই জবারানী পুজোর ছোট্ট রেকাবিতে একটুখানি বাসি আতপচাল আর বাতাসার পড়ে থাকা গুঁড়ো নিয়ে এগিয়ে যায়। ডাকে দেবভক্তের আন্তরিক গলায়, আয় আয়—

বাবা শিবশঙ্কর ষাঁড়টা রাস্তার দুপাশে কটা খাবার দোকানে আমন্ত্রণের 'আয় আয়' শব্দ দুটোর অনুরণনে অভ্যস্ত। সুতরাং পায়ের গতি কমে যায়। বড় বড় চোখে তাকায়। জবারানীর হাতে পিতলের ছোট্ট রেকাবিতে সাদা চাল ফুলের দু-এক কুচি পাপড়িতে বোঝে তারই খাদ্যবস্তু।

জবারানী দু-পা এগোয়। ষাঁড়টা তরতর করে কাছে আসে। দুখানা বড় শিংয়ের চারদিকে শাঁখা-চুড়ির মতো গোলাকার দাগ। চোখের ভ্রূতে বড় দুব্বোর মতো লোম। চোখের বড় মণিতে খাদ্যের লালসা। জবা মাটিতে না ঢেলে রেকাবটা হাতে ধরে থাকে। ষাঁড়টা খরখরে কালো জিভে চেটে খায়। মস্ত শরীরের অমন ভারি মুখে খাওয়ার এক-একটা উদ্যোগে কবজিতে প্রবল চাপ। শাঁখা নড়ে ওঠে। শিবশঙ্কর দু-তিনবার চাটতেই রেকাব ফাঁকা হয়ে চকচকে। অতবড় প্রাণী বিশাল উদরের কাছে এ আর কতটুকু খাদ্যকণা। একটু দাঁড়িয়ে থাকে ষাঁড়টা।

জবারানী রেকাব উল্টে বলে, আর নেই গো বাবা শিবশঙ্কর। তুমি দয়া কর—খদ্দেরপাতি হোক, দোকানপাতি চলুক—রোজ চাল-বাতাসা রাখব—।

জবারানী দুহাত জোড় করে চতুষ্পদীটাকে গড় জানায়। জবার বুকে খরিদ্দারহীন ফাঁকা দোকান ঘর বড্ড ব্যথা দেয়।

লম্বা চেহারায় স্বাস্থ্যবান মানুষ। ফর্সা চোখমুখে ভারি গাল। মাথার চুল সব সাদা। হাঁটুর ওপর কাপড় গায়ে সাদা হাফশার্ট। কাঁধের কালচে ব্যাগটায় কাগজপত্তর, একখানা গামছা। সোজা এসে বলে, ও ঠাকুরমশায় ভাত-তরকারি হবে তো ?

—নিশ্চয় হবে। আসুন শশীবাবু···

এতক্ষণ পরে একজন খদ্দের। সদয় উঠে দাঁড়ায়।

জবারানী বলে. বাবু তুমি তো আমাদের সকালবেলার খদ্দের। এত দেরি ?

শশীবুড়ো ব্যাগের গামছায় মুখ-গলা মুছে বলে, উকিল মুহুরিদের পিছন পিছন ঘুরে সময় গেল। এতক্ষণে ফুরসত পেলুম।

জবারানী সব শুনে রাস্তায় ষাঁড়টার দিকে তাকায়। ষাঁড়টা আপন মনে হাঁটে মিষ্টির দোকানের খোঁজে। জবারানী ষাঁড়টার উদ্দেশে মনে মনে গড় জানায় আর বিড়বিড় করে, সাক্ষাৎ মহাদেব। বাবা শিবশঙ্কর—তা না হলে সঙ্গে সঙ্গে খদ্দের আসে···।

শশীবাবুর প্রিয় আসন দেওয়াল শেষে খুঁটির গায়ে। এক পুরনো শাল খুঁটি মিস্ত্রির হিসেবের ছাড় হয়ে মস্ত টিনের ছাউনিটাকে ঠেকনো দিয়ে

রেখেছে। শশীবাবু আসনে বসে ব্যাগটা হাতড়ায়। আমটা পেতেই শশীবুড়ো চেঁচায়, কই গো মা-ঠাকরুণ, আমটা ধুয়ে কেটে দাও—

জবারানী আত্মজনের মতো হাজির। আমটা হাতে নেয়, তাই তো বলি, বাবু কি আম আনতে ভুলে গেছে?

সামনের দাঁতগুলো পড়ে মাড়ি ফাঁকা। হাসতেই লালচে মাড়ি শিশুর আদলে জ্বলজ্বল করে। বকুল ভাতের থালা সামনে দেয়। শশীবাবু গেলাসের জল একটু কোষে নিয়ে থালার চারদিকে ছড়িয়ে গণ্ডুষ করে।

কাটা আম ভাতের উপর ঢিপি হয়ে বসে। মানুষটা খায়। টিনের ছাউনি থেকে গরম। স্বাস্থ্যবান মানুষ ঘেমে যায়। গামছায় কপাল মোছে, গলা মোছে। সদয়কুমার ভাবে, ওই মানুষ যদি একদিন দামি হোটেলগুলোর ফ্যানের হাওয়ায় বসে খাওয়ার আরাম পায়—তাহলে কি আর এমন আমার হোটেলে আসবে? হঠাৎ বিছানা থেকে তালপাতার হাতপাখাটা এনে হাওয়া করে সদয়কুমার, বাবু বড্ড ঘামছে গো—

শশী লজ্জা পেয়ে বলে, বাবাঠাকুর তুমি হাওয়া করলে যে আমার পাপ হবে। বরং আমার হাতে দাও—

সদয় পাখাটা ছেড়ে দিতে দিতে এই প্রতীতিতে পৌঁছয়, খদ্দেরপাতি ধরে রাখতে গেলে যে শুধু আদর-যত্ন নয়। কলকবজার যন্ত্রপাতি লাইট-ফ্যান বড্ড দরকার। কিন্তু···!

বেলা গড়িয়ে যায়। সদয়কুমার অনেক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেয়, বাজারহাট বুঝে করবে। সেজন্যই ভৈরবকে বলে, চল তো ব্যাগটা নিয়ে স্টেশন বাজার। এ বেলা শাকসবজির দাম কম হয়।

তখন রাস্তায় রিকশাটা। তিনদিকে সিনেমার পোস্টার মারা। রিকশা গড়ায়। গ্যাড্‌ডা···গাড়ুম···গ্যাড্‌ডা···গাড়ুম। বাদক ঢোলের গায়ে কাঠি মারে।

আলুর গোডাউন। কুমড়ো পেঁপে শাকসবজি সাজানো। সাড়ে ছটার শো-এর দর্শক রিকশায় যায়। জোরে রবারের হর্ন। কয়লার ইঞ্জিন টানা রেলগাড়ি স্টেশনে পৌঁছতে প্রচুর মানুষ। বাজারের রাস্তায় ভিড়।

সদয়ের হাতে আলু কুমড়ো আদা পেঁয়াজের ব্যাগ। ফল ফলে ডগ পাতায় পুঁই শাকের বাণ্ডিলটা ভৈরবের ব্যাগে। বাজারের দোকানপাট ছাড়িয়ে পাকা সড়কে ওঠার মুখে ক'খানা দোকান। লোকজন মিলিয়ে জমজমাট। চায়ের দোকানে বেঞ্চ সামনে নড়বড়ে টেবিল। ছোকরাদের সঙ্গে ক'জন বয়স্ক বসে। পান-বিড়ির দোকানে বড় আয়না। নারকেল ছোবড়ার দড়িতে দিন-রাত ধিকধিক আগুন জ্বলে।

কাঠের ছোট্ট শো-কেসে দুটো র‍্যাক। ধুলো-ময়লা রুখতে সম্মুখের কাচ খানিক ভেঙে ফাঁকা। সেখানে কাগজ মেরে ঢাকা। বাঁদিকে মাটির উনুনে কড়ায় তেল। লঙ্কা-মশলায় থাসা আলু চাপটে ফাঁটা বেসনে চুবিয়ে তেলে ফেলতেই চড়বড় শব্দ। সামনের চুল উঠে মাথাভর্তি টাক। গোল ফ্রেমে ভারী কাচ বসানো চশমা। খালি গায়ে আগুনের সামনে। পর পর চপ ছাড়ে তেলে। টগবগ

ফোটে। চৌকির পাশে দু-বাণ্ডিল শালপাতা। চায়ের দোকান থেকে ছোকরাদের একজন হাঁকে, পুলিনদা—

—বলুন।

—চারটে চপ।

ঝাঁঝরিতে চপ ক'টা আর একবার উল্টে নেয়। ভেজে মুচমুচে হয়। পুলিন-বাবু চেঁচায়, ওরে ও ভরোসুলভ বাবুদের চারটে চপ দিয়ে আয়—

কোনো সাড়া নেই ভরোসুলভের। পাশে শালপাতার কাঠি খুলে আলগা করছিল ছেলেটা। পুলিনবাবু বলে, ও মলোটভ চপ চারটে দি আয় তো—

সদয় দাঁড়িয়ে বলে, চশমা চোখে তেলেভাজা লোকটা— ?

—হ্যাঁ, সায় দেয় ভৈরব।

—কমনিস্ট।

বাপের মুখে ভৈরব শুনে অবাক! ভাবে কমনিস্ট দেখতে এমন! ক'বচ্ছর আগে টিনের চঙা ফুকেছিল লোকগুলো—এরকম একজনকে দেখেছিল বলে মনে পড়ে। তাই সে দেখার সঙ্গে এখন মিলিয়ে নেয়।

লোকটা চেঁচায়, ভরোসুলভ একসের—উঁহু, আচ্ছা একসেরই বেসন নিয়ে আয় তো কপাটের দোকান থেকে—

বাজার হাতে বাবু লোকটা পাশের বন্ধুকে বলে, বাব্বা লেনিনের গলার জোর শুনেছ ?

সঙ্গী লোক বলে, হবে না ? চেঁচিয়ে লোক তাতায় যে—

পাজামা শার্ট পরে মাঝবয়সী লোকটি বিড়ি ধরাচ্ছিল নারকেল ছোবড়ার দড়িতে। বিড়িটায় টান দিয়ে বলে, ও দাদা—ভদ্রলোকের নাম পুলিন—

লোক দুজন মুখ গোমড়া। চুপচাপ হাঁটে। ভৈরব ভীষণ ধাঁধায় পড়ে, সত্যি লোকটার নাম পুলিন, না, লেনিন ? কারণ, সে তো শুনেছে গান্ধীজী, জহরলাল, নেতাজী। সিনেমা হলে সেবার তথ্যচিত্রে শুনেছিল জোর, চৌ-এন লাই। মার্কস কিংবা লেনিন তখনও তেমন শোনেনি। বাজার হাতে লোক দুজন তাহলে ঠাট্টা করে গেল, না কি অবহেলা ? অবহেলায় তো রাগ থাকে। ঠাট্টায়··· !

—চল রে ভুড়ে। সন্ধে হয়ে এল—আলো জ্বালতে হবে।

চল্লিশ

হাতে বই খাতা নিয়ে কজন বন্ধু। মার্চ মাসের রোদ্দুরে হাওয়া কম। যেহেতু এদিকটায় একদা বড় গাঙের একটা ঝারা অনেক দূর ঢুকে গেছিল, এখন সেটা বড় জলনিকাশি ড্রেনেজ। কত দূর সুন্দরবনের গেমুয়া ক্যাওড়ার দানা ফল জোয়ারে ভেসে আসে। ফলত বনকেঁটাকি, সুঁদরি ডগ নোনা পাঁক ফুঁড়ে গজায়। যত্রতত্র জংলা স্তূপ। এই ফাঁকা জায়গায় ফুরফুরে হাওয়া। একখানা কাঠের পোল দিয়ে মানুষ হেঁটে এপার ওপার যায়। সাইকেল বড়জোর রিকশার ভার বহন করে কেঠো পোলটা। পোলের ওপারে তো পুরনো বাজার। একটা নুনের

গোলা ছিল। উনিশশো বাহান্ন থেকে ভূদান যজ্ঞের সর্বোদয় আশ্রম খড়ের ঘরটায়। ভৈরব বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলের পথে। কাঠের পোলের ও-প্রান্তে যেতেই এ-প্রান্তে খুরের শব্দ খটখট। পাশ দিয়ে চলতি ছাত্র-ছাত্রীরা পেছনে তাকায়। ছেলেগুলোর হইহই চিৎকার—, ঘোড়ায় চড়ে তিনকড়ি। হাতে একটা খাতা। সঙ্গে পাতলা বই। ডান হাতে লাগাম। ঘোড়ার পেছন পেছন ছেলেগুলো ফেউ লাগে, তিনকড়িদা সাবাস—। কেউ তার ইতিহাস বইয়ের ছবি অনুযায়ী বলে, ছত্রপতি শিবাজী। তিনকড়ি দুপায়ে গোড়ালির গুঁতো মারে রোগা ঘোড়াটার কোঁকে। ঘোড়াটা গা দুলিয়ে ছুটতেই কাঠের পোলে খটখট বাজনা। সবাই মজায় সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ছাট বাঁচাতে অনেকটা সরে দাঁড়ায়।

পুলিশ সাহেবের ঘোড়া। কোয়ার্টারের শেষে পাকাঘরে টিনের ছাউনি দেওয়া ঘোড়াশালা। পুলিশ সাহেব গরমেন্টের চারচাকা নতুন জিপ পেয়েছেন। ফলে ব্রিটিশ প্রথার ঘোড়া বাতিল। যেহেতু প্রাণীটা মারা যায়নি, একজন আর্দালি ঘাস খাওয়ায়। ঘোড়া দেখভালই তার চাকরি। ঘোড়াশালের পাশে টেম্পোরারি শেড বানিয়ে জিপটার গ্যারেজ। ঘোড়াটা মরে গেলেই আস্তাবল গ্যারেজঘর হবে।

আর্দালিকে এক প্যাকেট সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে তো তিনকড়ির ঘোড়া চড়া।

কাঠের পোল পেরোলেই গার্লস স্কুলের গেট। ছাত্রীরা কলতলা ছেড়ে গেটের কাছে ভিড় করে। দোতলা থেকে রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়! দোতলার বারান্দায় ঝুঁকে কিশোরী তরুণীরা ঘোড়সওয়ার ছাত্র দেখে। ফর্সা চেহারায় লম্বাটে নাকমুখে তিনকড়ি। সামনের দাঁতগুলো বড় বড়। গম্ভীর থাকলেও ঠোঁট ফেঁসে দাঁতের সারি। হাসলে মাড়ি মূল অব্দি ধবধবে সাদা।

খয়েরি রঙের লোমে রোগা ঘোড়া। ঢ্যাঙা তিনকড়ির রোগা লম্বাটে থাই, পা তো হাফপ্যান্টের পর থেকে। গোড়ালি দিয়ে গুঁতো মারতে ঘোড়াটা খানিক বেগ নেয়, আবার গতি থামে। ছাত্রগুলো তো ঘোড়াটার সঙ্গে সঙ্গে। ভৈরবের বন্ধু বলে, তিনকড়িদা আমাকে নেবে?

তিনকড়ি দাঁত কিড়মিড়োয়, ভাগ্—।

খোয়া বিছিয়ে রোলার টানা রাস্তাটা হাইস্কুল অব্দি। তারপর তো নৌ-বিভাগের সেনা ট্রেনিং কেন্দ্র। বিশাল মাঠ-ঘাট খাল-জঙ্গল প্রাচীরবদ্ধ করে একদা মিলিটারি ক্যাম্প। নদীমুখো বড় বড় কামান বসানো। সেটাই তো এখন ন্যাভাল কোস্ট ব্যাটারি। গেটের কাছে নকল কামানটার গায়ে কালো রঙ। মার্চ মাসের রোদে গোলা-বারুদের গন্ধ বের হয়।

ঘোড়ায় চড়ে সোনার দোকান পাশ কাটায় তিনকড়ি। অশ্বত্থ গাছটার ছায়ায় ছাউনি ঘেরা পির মছলন্দি সাহেবের মাজার। ছাত্রছাত্রী, পথচলতি মানুষ একফাঁকে কপালে হাত ছুঁয়ে গড় জানায়। কালী, পঞ্চানন থানের অভ্যাসে। তিনকড়িও গড় জানাতে গিয়ে বগলের বই আলগা। ঘোড়া তখন বেয়াদব। পায়ের গুঁতোয় ঘোড়াটা সোজা খোয়া পথ ছেড়ে ডাইনে মেটে পথের বাঁধ ধরে।

ঘোড়ার পিছু পিছু ছেলেদের দলে ভৈরব জুটে যায়। মেটে বাঁধের দুপাশে বউ-মেয়েরা ঘর ছেড়ে বের হয়। তারা বলে, ইস্কুলের ছেলে না, নায়ক দিলীপ-কুমার—। ছ্যা!

সিভিল কোর্টের মুহুরি মক্কেল তাকায়। কালো কোট গায়ে উকিলবাবুদের একজন বলেন, ছোকরার কাণ্ড দেখেছ? ইস্কুলে যাবার পথে চ্যাংড়ামি—ওর বাপকে তো আমি চিনি—

উকিলবাবু স্কুল কমিটির মেম্বার। সেই ক্ষমতার এক্তিয়ার থেকে পেছনে ছেলের দলকে বলেন, এই খোকা—তোমরা বই-খাতা নিয়ে বেরিয়েছ ঘোড়ার সার্কাস খেলা দেখতে? যাও—সোজা ইস্কুলে। তা না হলে আমি হেডমাস্টার মশাইকে গিয়ে বলছি—। হঠাৎ মনে পড়ে আজ ৩১ মার্চ। কমিটি-মিটিং আছে। ফট করে শাসায় উকিলবাবু, মিটিংয়েই বলব—

ঘোড়ার পেছনে ফেউয়ের দল চুপসে যায়। দু-পাঁচ জন ছেলে ইস্কুলমুখো। জোরে পা ফেলতেই শুনতে পায় মনবিহারীর ঘণ্টা। ঢং ঢং করে এগারোখানা আওয়াজ।

প্রার্থনাশেষে শ্রেণীকক্ষে ঢুকছে ছাত্ররা। এমন সময় বড় গেট-এর মধ্যে প্রবেশ করে তিনকড়ির ঘোড়া। শ্রেণীকক্ষের দরজায় ছাত্রদের ভিড়। সবাইয়ের মধ্যে উল্লাস। চিৎকারে ঘোড়া বেকুব। অশ্বারোহী তিনকড়ির প্রবেশ যেন প্রবল হর্ষধ্বনিতে অভ্যর্থিত হল। এই ছোট্ট মফস্বল স্কুলের আওয়াজ সারা ভারতে ভূ-ভাগের ওপর-আকাশ কাঁপিয়ে দিল। দোতলায় হেডমাস্টার মশাইয়ের অফিসঘর। জানলা থেকে দেখতে পান, ঘোড়ার পিঠে লম্বাটে আদলে তিনকড়ির ফর্সা মুখ। কপালের দিকে চুলও খানিক বিরল। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, গায়ে গেরুয়া পোশাক পরিয়ে দিলে তো সাক্ষাৎ দালাইলামা! তিব্বতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন খাম্পা উপজাতি। তাদের মধ্যে নতুন সভ্যতার আলো পেঁছে দিতে গিয়ে তো ধর্মীয় কাঠামোয় ঘেরা সুযোগভোগী সাধুসন্ত জোতজমির বাবুদের গায়ে আঁচড় লাগে। খাম্পাদের নাচিয়ে দিতেই তারা বিদ্রোহী। দালাইলামা নেপথ্য ছেড়ে এবার খাম্পা বিদ্রোহে যোগ দিলেন। সমাজতান্ত্রিক চিন এই চক্রান্ত দমনে কঠিন হাতে নেমে পড়ে। তিব্বতে তখন পঞ্চাশ হাজার চিনা সৈন্য। '১৯৩১ সালের এক ভোর রাতে পরিজনবর্গ এবং শ'খানেক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লাসা ত্যাগ করলেন দালাইলামা। সম্ভাব্য অনুসরণ-কারী চিনা সৈন্যদের বাধা দেবার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র একদল তিব্বতি সৈন্য পেছনে রয়ে গেল। চীনারা এদের আক্রমণ করে; কিন্তু দালাইলামা নিরাপদ দূরত্বে চলে না যাওয়া অবধি চিনাদের বাধা দিয়ে রাখে তারা।...এভাবেই দালাইলামা সদলে নিকার ছোটাংমো-র পথে ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে ভারতে উপস্থিত হলেন।'...সে দিনটা তো ৩১ মার্চ...।

যদিও ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে নেহরু চৌ এন লাইকে একখানি পত্র লেখেন, তার উত্তরে চৌ-এর একটি মন্তব্য হল, '...আমরা মনে করি না যে সীমান্তরেখা যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তা সর্বক্ষেত্রেই যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তির

ওপর হয়েছে।' এছাড়া পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে চিনের বক্তব্য চিঠিতে যা চৌ-এন লাই নেহরুকে লিখেছিলেন, '…আপনি অবগত আছেন যে চিনের তিব্বত অংশের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের আক্রমণাত্মক নীতির ফলশ্রুতিতে ম্যাকমোহন রেখার জন্ম। ন্যায়ের দৃষ্টিতে একে বৈধ বলা চলে না। আমি আপনাকে বলেছি চিনের কেন্দ্রীয় সরকার কখনও একে স্বীকার করেনি। যদিও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র চিনের তিব্বত অংশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছে, কিন্তু তিব্বতের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই একপাক্ষিকভাবে অঙ্কিত সীমারেখার জন্য প্রকৃতপক্ষে অখুশি। এবং আমিও তাদের অসন্তুষ্টির কথা সরকারিভাবে আপনাকে জানিয়েছি। অপরপক্ষে যে বিরাট ও উৎসাহজনক পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটেছে যা কেউ লক্ষ না করে পারে না তা এই যে সীমারেখার সঙ্গে জড়িত দুটি রাষ্ট্র ভারত ও বর্মা পরপর স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং চিনের বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। উপরি উল্লিখিত জটিল উপাদানগুলির জন্য একদিকে চিন সরকার ম্যাকমোহন রেখা সম্পর্কে কম-বেশি বাস্তব মনোভাব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে এবং অপরদিকে বিজ্ঞতার সঙ্গে কাজ না করে পারছে না এবং সমস্যাটি সমাধানের জন্য আরও সময়ের দরকার মনে করছে। একাধিকবার আপনার সামনে এ-সমস্ত কিছু আমি তুলে ধরেছি। যা হোক, আমরা বিশ্বাস করি, চিন ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের স্বার্থে সীমান্তের এই অংশের জন্য একটি আপোস সমাধান অবশেষে পাওয়া যাবে।'

খাটো চেহারার সহকারী প্রধান শিক্ষক। পায়ে অনেক ফিতের চামড়া-চটি। ঝটপট পা ফেললেই বারান্দায় খুরের শব্দ। নিজেই একবার নিজের পেছন দিকে তাকায় ভীষণ সংশয়ে, ঘোড়াটা সিঁড়ি টপকে দোতলার বারান্দায় নাকি ? কত গিরিখাত তো একলাফে পার হতে পারে তালিমপ্রাপ্ত ঘোড়া। তাহলে! একেবারে হেডমাস্টার মশাইয়ের দরজার সামনে এসে বলেন, স্যার—একটা কিছু সমাধান করুন—

—কেন ?

—ছেলেরা ক্লাসে ঢুকছে না। ওই যে ঘোড়ার পিঠে রাণা প্রতাপ—

—ক্লাসটিচাররা ? জানতে চাইলেন প্রধান শিক্ষক।

—টিচাররা ঠেলেঠুলে এক দরজায় ঢোকায় অন্য দরজা দিয়ে নলের জল বেরিয়ে যায়।

হেডমাস্টার একটু ভেবে বলেন, টিচারদের ক্লাসে থাকতে বলুন। আমি দেখছি—

কাঠের বড় আলমারির পাশে অযত্নে হেলে থাকা বেতটা বের করেন। টুকরো কাপড়ের ডাস্টার একটু ঘষতেই লিকলিকে বেতটার রঙ ফিরে চকচকে। বারান্দা পেরিয়ে গম্ভীর গলায় চাপা স্বর, মনবিহারী সঙ্গে চল—

ভারি চেহারায় লম্বা মানুষ। বড় ফোল্ডের সাদা ফুলপ্যান্ট। ইস্ত্রি টানা সাদা হাওয়াই শার্ট। কালো নাসিকার ওপর ঝকঝকে চশমা। হাতে সরু বেত

নিয়ে দোতলার সিঁড়ি থেকে ধীরে ধীরে নামেন। চারদিকে ক্লাসরুম। থিকথিকে সবুজ লনে ইট পাতা রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার চারপাশে তাকান হেডমাস্টার-মশাই। সরু লিকলিকে বেতের যে কী ভীষণ শক্তি! ছেলেরা হুড়মুড় ক্লাসে ঢোকে। হেডমাস্টার মশাই বেত হাতে গেটের দিকে এগোন। তখনও বইখাতা হাতে পনেরো-ষোলো জন ঘোড়ার কাছে। সবুজ লনের আস্তর যেন উত্তরের মহান পর্বতগাত্রে চাঁই পাথরে বর্ষাধারায় থিকথিকে সবুজ শ্যাওলা। ধবধবে সাদা প্যান্ট-শার্ট তার ওপর যেন বরফের স্তূপ। মার্চের গরমে জমা বরফ গলে চলমান।

হেডমাস্টার মশাইয়ের চোখে দালাইলামার অনুষঙ্গ সরে গিয়ে, পাজি তিনকড়ি। রোগা ঘোড়াটা চোখের সামনে লিকলিকে বেত দেখে আচমকা উল্টো পাক মেরে সোজা গেটমুখো। ছেলেগুলোর সঙ্গে ভৈরবও কাঁচুমাচু মুখে সরে দাঁড়ায়। হেডমাস্টার মশাই গলা চড়াতেই স্বর ভেঙে যায়, যা তোরা। গার্জেনদের চিঠি আনলে তবে কাল ঢুকতে পারবি—। একটুক্ষণ পরে পাশে তাকিয়ে বলেন, মনবিহারী গেট বন্ধ কর—

ওপরে তো ধু-ধু আকাশ। মার্চ শেষের রোদ্দুরে একদম শুকনো বাতাস। এত তাপে মেঘও তার লুকনো জলকণা আগলাতে জেরবার। ভৈরব মনখারাপ কাটাতে বারবার নিজেকে প্রশ্ন উত্তরে ফেলে বিপর্যস্ত। শেষে ভাবে, তিনকড়ির পিছু না নিলেই ভালো হত…।

হোটেলঘরে ফিরে আসে ভৈরব। চেয়ার-টেবিল ফাঁকা। মাটির মেঝেয় পাতা আসনে একজনও খদ্দের নেই। মা জবারানী ষাঁড়টাকে রেকাবের চাল-বাতাসা খাওয়ায়। বলে, বাবা শিবশঙ্কর—খদ্দেরজন নেই কেন গো বাবা?

ভৈরব বলে, মা—বকুলমামা? •

—সে কাজ ছেড়ে চলে গেল।

—কেন গো? বেশ উৎকণ্ঠা ভৈরবের গলায়!

—খদ্দেরগুলোকে হেঁকে ডাকতে বলল তোর বাপ। বকুলটা কত করে ডাকল। তবু এল না। তোর বাপ বলল, দুস্ পারলি নি?

বকুল বলে, মানুষ খাবে কি হোটেলে? চালের দাম তো চল্লিশ টাকা মণ। মামলা সেরে ঘরে পালায়। যার পকেটে পয়সা সে তোমার এ-ঝুপড়িঘরে না ঢুকতে চাইলে কী করব?

—না পারিস তবে যা। শুধু শুধু খোরাক মাইনে দিয়ে তোকে পুষতে পারব নি…

তখন হোটেলঘরের পেছনে চেঁচামেচি। ভৈরব ছুটে খিড়কি দিয়ে বাইরে যায়। মিত্রবাবু হাত নেড়ে বলে, তোমার ভাড়াটের ফেন জল এদিকে আসবে কেন?

—ও তো আমার জায়গায় ফেলে, বলল অতুলবাবু।

চার ফুট ছাড় দিয়ে পাশের জায়গায় মিত্রবাবুর আটখানা দোকানঘর ভাড়ায়। ইরিগেশন দপ্তর থেকে 'লিজ' নেওয়া জায়গা। তাই মিত্রবাবু বলে,

আমার ম্যাপ বলে ওই চার ফুটের মধ্যে তো আমার এখনও আড়াই ফুট ঢুকে আছে—সদয়কুমার যেহেতু অতুলবাবুর ভাড়াটে, অতুলবাবুর মুখের দিকে পরম আশায় তাকায়। অতুল দু-পা এগিয়ে ড্রেনটার কাছাকাছি হয়ে বলে, মিত্তির উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে ব্রিটিশের কাছ থেকে তো আমার লিজ। আমারও দলিলে ম্যাপ আঁকা আছে—

ভৈরব ফিরে আসে। লালপেড়ে শাড়িতে মা তখনও ফাঁকা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে। কেউ···কোনো খদ্দের আসেনি।

ভৈরব জবারানীকে বলে, ওরা অমন করছে কেন গো ?

—সীমানা নিয়ে কথা কাটাকাটি। চাপান-উতোর—। কত গভীর নিরাসক্তি থেকে যে কথাটা বেরিয়ে আসে জবারানীর মুখে। ঘর সীমানায় কী হবে ! দোকানে খদ্দের কই···!

একচল্লিশ

ঘন রাত্রি ক্রমশ গড়াচ্ছে পশ্চিমের আকাশে। সেই ঘনত্বে আকাশের ঢালে তারা-গুলো ভীষণ ঝকমকে। দূর পুবের আকাশ···জাপান সমুদ্রের ওপারেও যে কোথায় সূর্যের তখন ঘুম ভেঙে গেছে !

এখানে শেষরাতের অন্ধকারে বোটটা এসে চরে ঠেকে। ওপরের কাঠকুটো সরিয়ে চার-পাঁচ জন লোক মাথায় চালের বস্তা পার করে। চরের পাঁক কাদা নরম। তায় লোকগুলোর মাথায় দেড়মনি চালের ভার। নোনা পাঁকে মুটে পাঁচ জনের গোড়ালি ডোবে, পায়ের গুলি গেঁথে যায়। বাঁ পা টেনে তুলতেই বস্তায় চালের ভারে ডান পায়ের হাঁটু পাঁকে ডুবুডুবু। ক্রমে তারা কাদা কাটিয়ে শুকনো ডাঙায়। আকাশের তারা হাসে। মাথায় মাথায় চাল পুকুরপাড় দিয়ে সোজা দোকান ঘরে। দরজা খুলতেই খটাং শব্দ। বাবু কর্মচারীটা সঙ্গে নিয়ে খাড়া।

শব্দটায় ঘুম ছটকে যায়। ভৈরব উঠে বসে। রাতে অনেক জল খেয়েছিল। ফলত নিজেকে হালকা করতে বের হয়। খিড়কির আগড় দোরটার তলায় ফাঁক। সেই ফাঁক বন্ধের পিঁড়ে কাঠটা সরায়। চাবি-তালার ব্যবহার তো নেই। তার বদলে মোটা তারের প্যাঁচানো বেড়টা আলগা করে। বাঁশ বাখারি বুনে দরজা। ফ্রেম পাল্লার চৌকাঠহীন ! তাই বেঁকেচুরে অতখানি ফাটক বন্ধ হয় মাত্র। ভৈরব দুহাতে আগড় দোরটা ঠেলে। কড়কড় শব্দ এত রাতে !

দোকানের পেছনে দরজা খুলে অপেক্ষমান অতুলবাবু চমকে ওঠে ! অন্ধকারে টের পায় আওয়াজটার উৎস কেন্দ্র। কারণ একই ছাউনি টানার মধ্যেই তো ভাড়াটিয়া ঘরগুলো। অতুলবাবুর কর্মচারী ধমকায়, কে রে-এ ? যা, ভিতরে যা।

গা ছমছমে রাত ! ক্রমে রাতের ঘনত্ব ফিকে। দেখতে পায় পরপর তিন জনের মাথায় চালের বস্তা। মেদিনীপুর 'জেলা কর্ডন' ছিঁড়ে ঢুকছে ঘাটতি জেলায়। এখান থেকে কলকাতা তো আরও কাছে। মনপ্রতি আটত্রিশ-চল্লিশ

তো মুহূর্তে। মানুষের দিন-রাত্রের খাদ্য রাতের গভীরে গোপনে নদী পার হচ্ছে। সাজানো হচ্ছে টাল দিয়ে। ডাল চিনি তেজপাতার টুকরি আড়াল গহ্বরে।

সকাল হয়। বেশ ক'মাস বকুল তো আর এখানে নেই। সদয়কুমার গোছ-গাছে ব্যস্ত। ঝি ভাঁটি বাসি সকাড়ি ধোওয়া মোছা করে। সদয়কুমার ধামাটা নিয়ে মুদিখানা দোকানে যায়। মাসকাবারি খাতাটা অতুলবাবুর সামনে ধরে। মধ্য-অগস্ট পেরনো সকাল। ক'দিন আগে ঝিরঝির বৃষ্টিতে আবহাওয়া ঠাণ্ডা। তবুও এই সকালে পেছনে টেবিলফ্যান অবিরাম ঘোরে। মফস্বলে বিলাসদ্রব্য ও কৃৎকৌশল যা কিছু পৌঁছয় সবই এদের নাগালে। শুধু মফস্বলেই বা কেন? গোটা দেশেই তো। খাতাটা নিয়ে টকটক করে হিসেব বসিয়ে দেয়। আঠারো টাকা পঁচাত্তর পয়সা। সদয়কুমার আটটা টাকা বাড়িয়ে ধরে বলে, বাবু আমার বাজারটা লিখুন—

টাকা আটটা বাঁ হাতে রেখে পেছনের পাতা ওল্টায়। বকেয়া তো একশো ছাপ্পান্ন টাকা ষাট পয়সা! তার ওপর আঠারো টাকার মধ্যে মাত্র আট টাকা জমা! রাগে খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে অতুলবাবু বলে, যাও, বাকি এগারো টাকা আন, তবে বাজার পাবে—

সদয়কুমারের মাথায় বাজ পড়ে। অনেক অনুনয় জানায়, বাজারটা দিন। বাকি টাকা ও-বেলা শোধ করব—

—দুস্! আগের অত টাকা পড়ে আছে আবার খুচখুচ বাকি—আমি পারব কী করে। রোজ রোজ জিনিসের দাম বাড়ছে—আমাকে তো মহাজনের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে আনতে হয়—

···সবই তো সত্যি। মানুষ হিসেবে তো আমি হাঁইফাঁই চেষ্টা করি···! কিন্তু হয় কোথায়! ভগবান···বাজারদর···না বাজারের কায়দাকানুন! গরমেন্ট দেশ না, কপাল···, ভাবতে ভাবতে মুষড়ে যায় সদয়।

ডাল চাল লঙ্কা তেলহীন ফাঁকা ধামাটা দেখে জবারানী শুধোয়, কী গো বাজার কই!

—হবে নে। বাকি টাকা শোধ চাই—

জবারানী শুনে খানিক থ'। ভৈরব বেঞ্চ থেকে মায়ের কাছে। জবারানী সংশয় কাটাতে বলে, ক'মাসের বকেয়াটা সুদ্ধু?

—সেটা হলে তো উত্তম। তা না হলে কালকের বাজারের আরও এগার টাকা—

জবারানী গুম মেরে চুপচাপ। ভৈরব তার অসহায় বাপকে দেখে। ভাবে, কত ছেলের বাবারা কত যোগ্য, দক্ষ। তারা এমন দুঃখে তো পড়ে না···

হাঁড়ি-কলসির মধ্যে থেকে খুচরো-খাচরা খুঁজে আনে জবারানী। বলে, এই কটা নিয়ে বাবুর হাতে দাও। বাজার চাও—

বাবুর কী মর্জি হয়···কে জানে!

কটা ভিখিরি বাচ্চা ভিখিরি মায়ের সঙ্গে। তারা দাঁড়াতেই পেছনে চার-

পাঁচ জন মেয়ে-পুরুষ দাঁড়ায়। মা-টা বলে, দুটো পানতা দিবি গো মা—

জবারানী বলে, মারে—আমরাও এখন তোদের মতো—। দোকান চলে না, হরদম বাকি বকেয়া—

ভাঁটিটা মুখ শোনায়, ভিক্ষের আর সোময় নেই ? এই সকালা— ?

বেলা বাড়ে। দেড়টার ট্রেনটা স্টেশনে পৌঁছতেই ভিড়। পনেরোই অগস্টের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান কবে হয়ে গেছে। দড়িতে টাঙানো কাগজের ছোট ছোট জাতীয় পতাকা তখনও হাওয়ায় দোলে। মানুষের ভিড়। শ্বাস-প্রশ্বাসে গরম হাওয়া। কাগজের পতাকার গায়ে গরম হলকার ছোঁয়া।

মানুষগুলোর হাতে ছোট-বড় পোস্টার। পোস্টারগুলোর নানা আয়তন। ছোট-বড় সরল কিংবা বাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা, 'সব মানুষকে ১৭·৫০ টাকা মন দরে চাল সরবরাহ করতে হবে।'

বুড়ো মানুষটার কাঁধে লাঠির ঠেকনোয় চাঁচে মারা 'রাজ্যব্যাপী সংশোধিত রেশন সম্প্রসারিত করে সব মানুষকে মাথাপিছু ১॥' সের চাল ও ১ সের গম দিতে হবে।'

ছোকরাটার কাঁধে চারকোণা পোস্টারে লেখা, 'খোলা বাজারে খুচরা দোকান মারফত পর্যাপ্ত ও নিয়মিত ২০্ হইতে ২২্ টাকা দরে চাল সরবরাহ করতে হবে।'

বাচ্চা ছেলেটার হাতে, 'চালকলগুলির উপর শতকরা ৫০ ভাগ লেভি বসাতে হবে।'

বউটার ঘাড়ে পোস্টারটা নেতিয়ে 'রাজ্য থেকে সংগৃহীত পরিমাণ হিসেবে ৫ লক্ষ টন খাদ্য মজুত করতে হবে।'

মধ্যবয়সী বিধবাটা বুকের সামনে পোস্টারের হাতল ধরে 'ব্যাপক টেস্ট রিলিফ ও সপ্তাহব্যাপী মাথাপিছু দৈনিক দেড় টাকা হারে চালু করতে হবে।'

খুকিটার হাতে 'সর্বস্তরে সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করতে হবে।'

ছোকরাটার হাতের শিরা যেন দড়ি। দু-হাতের মুঠিতে পোস্টারের শিরদাঁড়া ধরে দাঁড়িয়ে, "অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় মজুতদারদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাতে হবে। উদ্ধার প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য সস্তাদরে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন চাই—"

একটা শিশু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে "খাদ্য মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের অবিলম্বে অপসারণ চাই।" তলায় আলতা, রেড অক্সাইড দিয়ে লেখা, সারা ভারত কম্যুনিস্ট পার্টি।

রাস্তা কাঁপিয়ে চিৎকার। এত মানুষের মিলিত দাবি ঘোষণায় পাকা রাস্তায় ঢেউ ওঠে। থানা থেকে পুলিশ অনেক আগে কোর্ট চত্বর ঘিরে রাখে। কাঁটা তারের বেড়ায় মহকুমা শাসকের বাংলো রক্ষিত। মাত্র দু-খানা মোটা থামে ভারি কাঠের গেট। গেট আটকে পুলিশ। মাথায় লোহার টুপি কাঁধে রাইফেল। হাতে ইট পাটকেল প্রতিরোধের জালতি।

মিছিলে নারী পুরুষ কিশোরদের চিৎকার। সম্মুখে বয়স্ক মধ্যবয়স্ক

মানুষ। কে যে যতীশ রায়, নলিনী ঘোষ, পলাশ প্রামাণিক প্রভাস রায় হাজরা-বাবু—ভৈরব তো চেনে না। শুধু খোঁজে, এই ভিড়ের মধ্যে তেলেভাজাওয়ালা কমনিস্ট্‌টা আছে? দোকানদাররা সবাই দোকান ছেড়ে সামনে। অত মানুষ এক সঙ্গে চেঁচায়,…মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে…। ভৈরব পট করে পাশে অতুলবাবুর দোকানের দিকে তাকায়। কেউ…অতুলবাবুও নেই দাঁড়িয়ে। যেন তারা শুনতে পায়নি এত চিৎকার। কান বধির! হঠাৎ ভৈরব হোটেলের মধ্যে ঢুকে সোজা খিড়কির দিকে যায়। এপাশ দিয়ে তো গরান হেঁতাল বাখারি বেঁধে ছিটে বেড়ার গায়ে মাটির প্রলেপ দিয়ে দেওয়াল। ওপারে অতুলবাবুর মুদিখানার গোডাউন। মালভর্তি বস্তার টানাটানিতে বেড়ার মাটি খসে ফাঁক ফোকর। সেই ফাঁকে চোখ রাখে ভৈরব। দেখা যায় ওপারে ডাল চিনি লংকার বস্তা। সেই বস্তাগুলোর আড়ালে চাল। চালের বস্তা টাল দিয়ে সাজানো। রাতে নোনা কাদার ছিটে বস্তার গায়ে।

বাজারে চালের দর পঁয়ত্রিশ চল্লিশ। কত গরিব দুঃখী ভিক্ষে চায় এসে। কী দুর্দিন জবারানী মিছিলটা দেখতে দেখতে ভাবে, কিন্তু এত মানুষ…খাদ্য চাইছে দলবেধে…আবার চালের দর বেঁধে দিতে বলছে…। সেই দুর্ভিক্ষের সময় তো কত কাতর দীনভাবে চাইত, মা গো একটু ফ্যান দিবি…! কীসের জোরে এত মানুষ দল বেঁধে এসেছে? কারা সঙ্গে আছে তাহলে…!

৩১ অগস্ট। মনুমেন্ট পাদদেশে খাদ্যের দাবিতে জমায়েত। লোকজন বাসে ট্রেনে যেতে শুরু করেছে। পাঁচজন একসঙ্গে দল বেঁধে হাঁটলেই তো পুলিশের জেরা। লোকটা হন্তদন্ত হয়ে মহারানী ভোজনালয়ে ঢুকে বলে, ঠাকুরমশাই ভাত হবে?

—হবে। বসুন—

—শুধু ডাল ভাত দিবেন। পুইস্যা কম। আমাদের গাড়ি লোক সকলকে আটকাইছে পুলিশ—

জলের গেলাস দেয় ভাঁটি। ভাতের থালা ধরে দিতেই লোকটা তাড়াতাড়ি খায়। শুধু ডাল আর ভাত। এই ভাতের দাবিতে সমাবেশে যাচ্ছে মানুষটা।

মহারানী ভোজনালয়ের ঊর্ধ্ব আকাশে মেঘের আনাগোনা। জুন জলাইয়ে তো বৃষ্টি ঝরিয়েছে অনেক। গুমোট আবহাওয়া হঠাৎ। আকাশের মেঘেও প্রচুর জলকণা জমে। থোকা থোকা মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তরে। মনুমেন্টের উপরে। অকল্পনীয় আবেগে হাজার হাজার অন্নদাতা অথচ অন্নহীন কৃষক নারী পুরুষ মিলিত হন মনুমেন্টের পাদদেশে। মিছিলের স্রোতে কলকাতার রাজপথে প্লাবন। তারপর সেই অগণিত অভিযাত্রী সংগ্রামী পদক্ষেপে এগিয়ে চলল রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে। তিন লক্ষাধিক মানুষের মাথার উপর বৃষ্টিপাত। তারা সরকারি অফিস অভিমুখে শান্তিপূর্ণভাবে আগুয়ান। অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে পুলিশের কর্ডন ভেঙে, কংগ্রেস সরকারের সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বিশাল জনতা যখন প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে এগিয়ে চলেছে তখন অসভ্য পুলিশের দল নেমে পড়ল—

"জোর করিয়া বলিতে পারি যে, শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহী, বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী কিংবা অগণিত পথচারী দর্শকবৃন্দ কাহারও তরফ হইতে বিন্দুমাত্রও প্ররোচনামূলক কোন কাজ করা হয় নাই।···মিনিটের মধ্যে কর্ডনের দুপাশ হইতে নৃশংস লাঠি চার্জ শুরু হইয়া যায়। বিমূঢ় জনতা অপ্রত্যাশিত আক্রমণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। মুহূর্তেই তাহারা দক্ষিণমুখী হইবার চেষ্টা করে। পূর্ব হইতেই গভর্নর হাউসের সামনাসামনি গেট হইতে সমস্ত রাস্তা জুড়িয়া এই বিশাল জনতাকে নৃশংসভাবে ঠেঙাইবার জন্য আর একদল পুলিশবাহিনী প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। একদিকে পিছন হইতে নৃশংস লাঠিচার্জে জনতাকে ঠেঙাইয়া তাড়া করা হইতেছে, অপরদিকে অগ্রবর্তী পুলিশ লাইন পলায়নপর জনতাকে পুরুষ-নারী শিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে নির্দয়ভাবে লাঠির আঘাত হানিতেছে। এবং তাহার ফলে অনেকেই ধরাশায়ী হইতেছে। এক করুণ দৃশ্য। সামনেই মারমুখী পুলিশ জনতাকে ঠেঙাইতেছে। যাহার ফলে, অনেকে আহত হইয়া ফুটপাতের পাশে পড়িয়া গেল। আহত নরনারীর গগনভেদী আর্তনাদ চারদিকেই ছড়াইয়া পড়িল। আমার সামনেই আহত হইয়া কয়েকজন পড়িয়া গেল। তাহার উপর আমি পড়িয়া গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িল পুলিশের লাঠি। পড়িয়া যাওয়া লোকগুলিকে পুলিশ উপর্যুপরি লাঠি চার্জ করিতে লাগিল।···সমস্ত রাস্তাটায় যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ধরাশায়ী লোকের ন্যায় অগণিত নরনারী পড়িয়া আছে এবং যাহারা পালাইতেছে তাহাদের উপর পুরুষ নারী নির্বিশেষে লাঠি চার্জ হইতেছে। সমস্ত দোকান রেস্টুরেন্ট বন্ধ। আশ্রয়ের কোনো স্থান নাই। বিক্ষিপ্ত জনতা এদিক সেদিক ছুটিতেছে। দেখিলাম উত্তর দিকে চৌরঙ্গির মোড়ে এবং সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোডের একটু পশ্চিমে চৌরঙ্গীতে লাঠি চার্জ হইতেছে। সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড দিয়া পূর্ব দিকে চলিলাম। কিন্তু কর্পোরেশন বিল্ডিংয়ের কাছেও পুলিশ। তখন শুধু মনে হইতেছে যে, পালাইবার পব পথগুলিতেই কি পুলিশ দিয়া ঠেঙাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে···"

দমকা হাওয়ায় ঝিমঝিমি বৃষ্টি এখানে। নদীর উপর জলের ছররা। ইলিশ উঠছে ডিঙি ভর্তি হয়ে। সেগুলো জল কাটিয়ে চালান আসে কোর্ট সংলগ্ন রাস্তার আড়তে। মফস্বলে নতুন বিদ্যুতায়ন। আড়তের সামনে বাখারি বোনা চাকনে কলাপাতা বিছানো। তার উপর টাটকা ইলিশ। চাকনের পাশে লোহার শিক নয়তো বাখারি পুতে আড়তদারদের ডুম ঝোলানো। একশো পাওয়ার বাল্বের আলোয় ইলিশের আঁশ জ্বলে এই সন্ধ্যায়। মাঝে মাঝে বৃষ্টির গুঁড়ো। ভাসা মেঘে আকাশ উজ্জ্বল। ইলিশের আঁশ ধুয়ে চকচকে হয়। উকিল মুহুরি চাকরি করা লোকজন ঘিরে দাঁড়ায় পরপর ইলিশের চাকন।

তখন তো কলকাতা ভিজে যায় বৃষ্টিতে। খাদ্য চাইতে গিয়ে লাঠি চার্জে রক্তপাত। বৃষ্টিতে সে রক্ত ধুয়ে চকচকে হয় মহানগরের পিচ খোয়ার রাজপথ।

ভৈরব দাদার সঙ্গে মাছ দেখে রেডিও শোনে। রেডিও খবরের কাছে কত লোক যে দাঁড়িয়ে। "পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে সাড়ে তিনশো লোক ভীষণ

আহত।"

দুম করে মনে পড়ল ভৈরবের, আজ যে লোকটা তাড়াতাড়ি ডাল ভাত খেয়ে গেল—তারও মাথায় লাঠি লেগেছে··· !

তারপর খবরের বাক্য "···১ সেপ্টেম্বর ছাত্রধর্মঘট ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ডাকে ৩ সেপ্টেম্বর হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট···"

২ সেপ্টেম্বর বিকেল। রায়বাবু হোটেলে ঢুকে বলে, কিরে সদয় ?

—আজ্ঞে বাবু ?

—কিরে কাল বন্ধ রাখবি নাকি ?

—আর পাঁচজনে যা করবে আমিও তাই মানবো। আমার আর কি বাবু— ? বড় দোকানদারদের বেশি চিন্তা—

রায়বাবু বেশ মজা পাচ্ছে। খুব আনন্দ করে বলে, গতকাল তো কলকাতায় ছ-সাত জন গুলিতে মরেছে। আহত প্রায় এক হাজার—

সদয়কুমার বলে, সব ছাত্র—ছেলেমানুষ তো বাবু ?

—কী বললি, ছাত্র ? রাখ তো কলকাতায় ওরকম বখাটে ছোঁড়া অনেক পাওয়া যায়—

ভৈরবের ঠিক পছন্দ হয় না মতামতটা। রায়বাবু বক বক করে বেরিয়ে যায়। আবার ঢোকে অতুলবাবুর দোকানে। বলে, অতুল খুলে রাখবি। তোদের দেখে তবে অন্যরা খুলবার সাহস পাবে—।

রায়বাবুর বুকে যে কত আক্রোশ। সেটা ধর্মঘটের না, খাদ্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে ? নিজের তো অনেক জমি। নাকি জমির চাষি মজুরগুলো দল বেঁধে কলকাতায় গেছিল বলে রাগ।

সন্ধে নামছে পাকা রাস্তায়। লোকজন তাড়াহুড়োয় বাসে লরিতে নিজ নিজ গন্তব্য চিন্তায় উদ্বিগ্ন। সদয়কুমার হ্যাজাক লাইটটার গা মোছে ন্যাকড়ায়। কেরোসিন তেলের বোতলটা পাশে। কাঁপা পরায় হ্যাজাকের তৈলাধার নলে।

বিধবার থান কাপড় পরে অল্পবয়েসী মেয়েটা হাজির। ভৈরবকে কাছে পেয়ে বলে, হ্যাঁ ভাই হোটেলের মালিক কে ?

—বাবা তোমাকে ডাকে

সদয় মেয়েটার কাছাকাছি এসে বলে, কী মা ?

—আপনার হোটেল ? কাল সকাল থেকে বন্ধ রাখবেন এ্যাঁ—।

মেয়েটার গলায় যে কত অনুনয়। ফট করে বেরিয়ে যায়। দাঁড়ায় পাশের দোকানে। নিতাই মালিকে ফিস ফিস বলে, কাল দোকানটা সকাল থেকে বন্ধ রাখবেন দাদা—। বেরিয়ে পাশ কাটায় মেয়েটা। পথচলতি মানুষের সঙ্গে মিশে হারিয়ে যায় কোন পথে যে ঠিক হদিশ করতে পারে না ভৈরব। খানিক থিতোলে ভাবে, ও কে··· ! ওর এমন বলে লাভ ! ও কি খেতে পায় না ? ও খাদ্য আন্দোলনের মেয়ে ?

দিশা পায়না ভৈরব। ভৈরবের তো জানা নেই বামপন্থী নেতাদের পুলিশ ধরছে। কর্মীদের নিবর্তন মূলক আটক আইনে জেলে নিয়ে আসছে। তাদের বদলে তাদেরই পরিবারের কেউ কিংবা অন্যজন দায়িত্বটা সেরে গা ঢাকা দিল।

তারই বয়েসী বা কিছু বছরের বড় তো মেয়েটা। এমন গোপন নির্দেশে কত আন্তরিক যে সমবয়েসিনী! পুলিশের চোখেও ধুলো দিচ্ছে। বেশ বীরাঙ্গনা। আচমকা মায়া জেঁকে বসে ভৈরবের মনে।

শেষরাত থেকে ঘুম ভেঙে যায়। হরতাল দিনটা কেমন—সজ্ঞানে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চায় ভৈরব। তাই ধৈর্য হারিয়ে সকালের অনেক আগেই বিছানা ছাড়ে। রাস্তায় তখন পুলিশের কালো গাড়ি এক পাক ঘুরে কোথায় চলে গেল।

একটু বেলা হতেই বন্দুক কাঁধে পুলিশ চারজন। হাজরার মিষ্টি দোকানে ঝাপের টিন চাপড়ায়। বলে, খোলো। চা বানাও—

বুড়ো পরি হাজরা বলে, সার—যদি কিছু…

কথা শেষ করার আগেই পুলিশটা আশ্বাস দেয়, আরে খোলেন। আমার হাতে রাইফেল। কোন বেটা কমনিস্ট আছে—আসুক। বাপের নাম বলতে সময় পাবে না। কালী মুখার্জির কড়া অর্ডার—

পাশের পুলিশটা বলে, বি. ছি. রায় চায় শান্তি শৃঙ্খলা—

হাতে খইনি টিপে পুলিশটা আওয়াজ দেয়, চা বানাও তো—

হাজরা বুড়ো ভাবে, পুলিশ তাহলে সরকারের। কিসের নিরপেক্ষ…

বেলা বাড়ে দু-চারজন পায়ে হাঁটা মানুষ রাস্তায়। বাইরের বেঞ্চে তাস জমে। ভৈরবের হঠাৎ মনে আসে তেলেভাজাওলার মুখটা।

রাস্তার ধারে মোটা কাণ্ডে বিশাল ক-খানা খিরিশ গাছ। ডালপালায় পাকা রাস্তাটা মাঝে মাঝে ছায়াময়। ভৈরব তেলেভাজাওলা কমনিস্ট্‌কে দেখার আবেগে লম্বা লম্বা পা ফেলে। দ্রুত রাস্তা ডিঙোতে চায়। ভৈরব তো জানে না ততক্ষণে কলকাতার সতেরোটা জায়গায়, চব্বিশ পরগনায় আটটি স্থানে আর হাওড়ার পাঁচটি পয়েন্টে ভয়ংকর গুলিবর্ষণ হয়ে গেছে। কদিনেই প্রায় আশি জনের মৃত্যু!

ঘন পিচ জমাট খোয়ার মসৃণ পিঠে রোদ। থানার বারান্দায় পেটা ঘড়িতে ঢং…ঢং…ঢং…বাস লরি দোকানপাটের কোলাহলহীন পাকারাস্তা বেয়ে সে আওয়াজ গড়ায়। বেলা নটা। মানুষ গিজ গিজ ভিড় স্টেশন বাজার একদম ফাঁকা। প্ল্যাটফরম আর ইয়ার্ডে রাতের রেল গাড়িরা দাঁড়িয়ে। মোড়ের দোকান-পাট বন্ধ। চা দোকানটার বাখারি বোনা বেড়ায় শিকল জড়িয়ে টেপা তালা। যে বেঞ্চে বসে লোকগুলোর সঙ্গে ছোকরারা পশ্চিমবঙ্গ দিল্লি সরকার আইজেন হাওয়ার ক্রুশ্চেভ হোচিমিন ভন গিয়াপ নগুদেন দিয়েম মানিক তারাশঙ্কর, ঋত্বিক ঘটক কেরলে প্রথম বামপন্থী সরকারকে পতন ঘটানো নিয়ে কথা কাটা-কাটি করে সে বেঞ্চগুলো ফাঁকা। এতসব শোনা কিংবা জানা নেই ভৈরবের। সে শুধু ভাবে, কত মানুষ বসতো বেঞ্চ দুটোয়। কালি কষপড়া কেটলি, শুকনো কাচের গেলাস পরপর সাজানো দেওয়াল ঘেঁষে বেঞ্চটায়।

এপারে ছোট্ট তক্তাপোশের চার পায়ায় চারটে বাতা পুতে তার উপর হোগলা ছাউনি। রোদে জলে খসে খাবলা। তেলেভাজাওলা পুলিনবাবুর দোকান।

ভৈরব এগিয়ে যায়। মাটির উনুন নিভে ঠাণ্ডা। নিত্য ব্যবহারে আদা বাটা পেঁয়াজ লঙ্কার গন্ধ এখনও। ফাঁকা তক্তাপোশ। বেসন গোলার জায়গাটায়

কয়েক ফোঁটা বাসি বেসন কাঠের কোনায়। সারা রাত হাওয়ায় আর সকাল থেকে রোদ পেয়ে সে বেসন শুকনো। ভাঙা আধখানা খাবলা হাত পাখা উনুনের মুখে গোঁজা। উনুনে ঘুঁটে কয়লা না ধরিয়ে কোথায় যে পুড়তে গেছে লোকটা!

বিয়াল্লিশ

গত বছরটায় ভৈরব যে দিকে তাকায় শুধু রবীন্দ্রনাথ। দোকানে দোকানে ক্যালেণ্ডারে রবীন্দ্রনাথ। দুরন্ত জলকলরোলে বজরা বেয়ে চলেছেন তিনি। সামনে ছোট্ট টেবিল। খাতায় কলমের নিব ছুঁয়ে আছে। মুক্তোর মতো হাতের লেখা, কবিতা ফুটে উঠছে…

"ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে ?
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।…"

অন্য ক্যালেন্ডারে পিছনে হাতের উপর হাত রেখে ঈষৎ ঝুঁকে সম্মুখে… প্রান্তর…দেশান্তর ছাড়িয়ে কত দূরের আগামিকালের দৃশ্যতে যে মগ্ন। গলায় মালার ফুল শুকোয়। ভাবনাগুলো তো টাটকা থেকে যায়।

সরকারি অফিস কাছারিতে, বড় বড় মনোহরি দোকানে দামি কড়ি, চিনেমাটি, প্লাসটার অব প্যারিসে পূর্ণাবয়ব কিংবা আবক্ষ রবীন্দ্রনাথ। ভৈরব দেখেছে। দাম করতে সাহস পায়নি। সেবার রেললাইন পার হয়ে খোয়া বিছোনো রাস্তায় পা রাখতেই ঝম ঝম বৃষ্টি। ফাঁকা জায়গাটায় বড় বট গাছ। তিনটে গ্রামের মেটে পথ বটের ছায়ায় মিশেছে। কিংবা বটতলা থেকে গ্রন্থি ছিঁড়ে তিন দিকে বেরিয়ে গেছে তিনটে রাস্তা। হঠাৎ বৃষ্টিতে মেলা মুখো মানুষগুলো বটের মোটা পাতার ছাউনি তলায় ঠাঁই নেয়।

বাইরে বৃষ্টি ধরে যায়। তখন ডালপালায় বট পাতার ডগ বেয়ে জল টপে। মানুষগুলো হাঁটে। ভৈরবও পা মেলায়। প্যাচ পেচে কাদায় মেটে রাস্তা খানিক হড়কা। আষাঢ়ের মেঘ সাদা। উঁচু চুড়ো থেকে লালচে পতাকাটা হাওয়ায় লত্‌পত্ ওড়ে। এতক্ষণে ভিজে টুকরো পতাকাটা হাওয়ার দমকে গায়ের জল ছিটোয়। তেরো চূড়ার উচ্চস্থান থেকে জলের কণা উড়ে আসে। কাদায় রথের কাছি জাবড়ে ময়াল চেহারা। ভৈরব সে দিকে যায় না। কাঁচা তাল পাতায় ছাওয়া দোকানটার সামনে দাঁড়ায়। লক্ষ্মী গণেশ, এক ছাঁচে 'জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা'। গায়ে সবুজ পালক লালচে ঠোঁটে টিয়া বসে। তারপাশে ওল্টানো বড় বড় চুল গোঁফ দাড়ি মিশে ঋষি মুখে দুখানা দীর্ঘ চোখ। সে চোখে পৃথিবী। ছাঁচের মাটি কেটে বুক অব্দি। মূর্তিটাকে সব পয়সা দিয়ে কেনে। আকাশ তখন গুম গুম বাজে। মাটির রবীন্দ্রনাথকে জামা ঢেকে রাস্তা ভাঙে। বটতলা ফেলে আবার বাড়ি মুখো। বাড়ি তো নয় বসবাস এবং জীবিকার ঠাঁই ভৈরবদের। খুব যত্নে জিনিসটা নারায়ণ শিলার চৌকির পাশে রেখেছিল। আর তো তেমন সাজিয়ে রাখার মতো আসবাব নেই। মা জবারানী নট করে মাটিতে কপাল ঠোকে। মাটির মূর্তি কে যে দেবতা কিংবা দেবপ্রতিম তেমন বোঝে না। বর্ণবোধে বোঝার যে শিক্ষাটুকু আয়ত্ত করতে হয় সেটা তো

হয়নি। তবে অবচেতনে বিনয়টুকু তার বড্ড বড় পুঁজি।

যেহেতু সারা দেশব্যাপী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী, সরকারি বেসরকারি পোস্টার, দেওয়াল লিখনে মফস্বল শহরটা ভর্তি। পাড়ার বাঁক মোচড়ে দেওয়ালগুলোয় কালি চুনে তুলি ডুবিয়ে লেখা "রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সন্ধ্যা"…।

১৯৬২-র জানুয়ারিতে শীত জাঁকিয়ে পড়েছে। বাংলা হিসেবে তো মাঘ মাস। শীত মাটি জল কামড়ে জঙ্গলে সেঁধোয়। জব্দ করে বাঘকেও। জব্দ তো হচ্ছে মার্কিন মিলিটারি এড অ্যান্ড অ্যাডভাইসারির সাহায্যপুষ্ট দাক্ষণ ভিয়েতনামে পুতুল সরকারের প্রধান সায়গনি মানুষ নগোদিন দিয়েমের পোষাবাহিনী ভিয়েত কং গেরিলাদের কাছে।

সময় যায়। বছর ঘুরতে থাকে। অন্য গোলার্ধে গরম। এ গোলার্ধে শীত। আইজেনহাওয়ার ক্ষমতা থেকে সরে গেছেন। ক্রমে দিয়েম দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রবল তেজে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। সোভিয়েত রাশিয়া নোভিয়া জালমিয়ায় পঞ্চাশ মেগাটনের হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। মস্কো পিকিং আদর্শগত বিরোধ দানা বাঁধছে। লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে নাটকীয় উত্তেজনা। ডাঃ ফিদেল কাস্ত্রো নিজেকে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করলেন। মার্কিন পেণ্টাগন চেগুয়েভারার গেরিলা রণকৌশল পাঠ করে ফেলেছেন। এবং পেণ্টাগন লাতিন আমেরিকার জন্যে আরও বেশি 'মার্কিন এড প্রোগ্রাম'য়ের ডলার খরচ বাড়াতে পরামর্শ দিলেন।

প্রেসিডেণ্ট জন. এফ. কেনেডি ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভিয়েতনাম পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখলেন। "সমস্ত তরফের মতামত জানতে চাইলেন। বক্তব্য অনেক ও দৃষ্টিভঙ্গির ফারাকও ছিল বিস্তর। তবু সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি পিছিয়ে আসে বা বর্তমান নীতিই চালিয়ে যায়, তবে দিয়েমের পতন অবশ্যম্ভাবী। কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করবেই। দিয়েম সরকারকে যদি বাঁচাতে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত অবিলম্বেই আরও সামরিক সাহায্য ও সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এগিয়ে যাওয়া।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি ল্যান্সডেলকে পছন্দ করলেন। বললেন,—ফিলিপাইনে আপনি যা করেছেন তার তুলনা নেই। আপনি না থাকলে ম্যাগসেসে কমিউনিস্টদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। প্রথম থেকেই সায়গনে থাকায় আপনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাতে আমাদের অনেক সুবিধে। আপনি সায়গনে কিছুদিন থেকে আসুন। সংকটটা কী? সমাধানের উপায় কী? দিয়েমকে রাখলে ক্ষতি কী? সরিয়ে দিয়েই বা কী লাভ? তদন্ত শেষ করে একটা রিপোর্ট আমাকে দেবেন তো? ব্যাপারটা যে কত জরুরি আশা করি সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলার নেই।

ল্যান্সডেল দক্ষিণ ভিয়েতনাম পরিক্রমা শেষ করে ওয়াশিংটন ফিরে গেলেন। তাঁর লেখা 'দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমস্যা ও সমাধানের উপায়' প্রেসিডেন্ট কেনেডি পছন্দ করলেন। কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি ল্যান্সডেল। সায়গনে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে নগোদিন নু ও মাদাম নু (দিয়েমের ভাই ও ভাইয়ের

স্ত্রী) সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আর্মির অসন্তোষ সম্পর্কে জোর দিয়েছেন। ল্যান্সডেল সোজাসুজি বলেছেন,...আর্মির ওপর পেন্টাগনের চাপ সৃষ্টি অবিলম্বেই বন্ধ করা দরকার।..."

এরকম সময়ে তো মফস্বলে, শহরে মাটির বাড়ি, ছিটে বেড়া পাকা দেওয়ালে কলি চুন, লাল রঙে লেখা হচ্ছে, ভোটের কথা। এখানকার দেওয়ালে ফুটে উঠছে ঃ

এই শহরে এতদিনে তো এই প্রথম কমিউনিস্ট প্রার্থী। তার পাশে কংগ্রেসের প্রার্থী জগদীশচন্দ্র হালদার, নির্দল প্রার্থী আশরাফ মণ্ডল, পি. এস. পি. প্রার্থী রামানুজ হালদার।

শীতের রাতে হঠাৎ বৃষ্টি। অতুলবাবুর গো-ডাউন ছুঁয়ে ছিটে বেড়ার দেওয়ালে বাখারি পুতে তার উপর তক্তা পেতে র‍্যাক। র‍্যাকে ভৈরব গৌরবের বই খাতা। এক ধারে বসান রবীন্দ্রনাথ। টিনের ছাউনিতে চড়বড় শব্দে বড় বড় ফোঁটা। ঘুম ভেঙে যায় ভৈরবের। তাড়াতাড়ি গায়ের কাঁথা সরিয়ে পেঁছয় বইয়ের র‍্যাকের কাছে। উপরে টিনে ফুটো। জল পড়ে টপ টপ। বই খাতা ঝটপট টেনে টেনে নামায়। ছর ছর করে জল পড়ে রবীন্দ্রনাথের গায়ে। নরম মনের মানুষ। ভিজে রঙ ধুয়ে একদম কাদা। নিজেরও স্বপ্নের রঙ তো চটে গেল!

পরদিন সকাল থেকে প্রচণ্ড রোদ। খেলার মাঠটার এপ্রান্তে বড় দোতলা বাড়ি। বাড়িটা ছাড় দিয়ে গোলপোস্ট ঘেঁষে বড় প্যান্ডেল। কাঠ বিছিয়ে উঁচু মঞ্চ। সামনে প্রচুর মানুষ। মানুষের মধ্যিখানে ভারতের জাতীয় পতাকা। উঁচু মঞ্চে ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা কালো রঙের স্বাস্থ্যবান মানুষ। চোখে কালো চশমায় অতুল্য ঘোষ। সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়। বললেন, দেশের যা কিছু উন্নতি তো এই কংগ্রেস করেছে। সুতরাং আপনাদের এলাকার প্রার্থী কংগ্রেস কর্মী দেশসেবক এলাকায় কলেজ প্রতিষ্ঠাতা নিরহংকারী মানুষ জগদীশ হালদারকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন।"

কদিন ধরে তো টিনের চোঙা ফুকিয়ে চিৎকার সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের নির্বাচনী জনসভা। বক্তা কমরেড জ্যোতি বসু। রিক্সার হ্যান্ডেলে বাঁধা হাফ সাইজ মাইক। জনসভার স্থান-তারিখ বার বার ঘোষিত হয়।

যেহেতু মাঠের পিছনে দোতলা পাকা বাড়িটা দেওয়ানি মামলার আদালত, তাই নাম হয়ে যায় কাছারির মাঠ। মাঠের সামনে উঁচু বাঁধের পাশ দিয়ে কল কল জল বয়ে যায় টাঙানো পোলের লম্বা লম্বা লোহার খোটায় চোট খেয়ে আরও দূরে গাঙ মুখো। জানুয়ারি শেষ হলেও শীত তত দমেনি। চাদর মাফলার মুড়ি দিয়ে মানুষ বসে। দাঁড়িয়ে। নীলচে জিন,কাপড় ঘিরে মাঝারি সাইজের মঞ্চ। মঞ্চের মাথায় লাঠির ডগায় টকটকে লাল ক-খানা পতাকা।

এলাকার প্রথম কমিউনিস্ট প্রার্থী চাদরটা গলায় এক পাক মেরে বলে

যাচ্ছেন অনেক কথা—।

চেনা মাস্টারমশাই কজন মঞ্চের কাছে নানা নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনায় নিবেদিত। ইতিহাসের রাগি মাস্টারমশাই, ড্রিল ও অংকের মাস্টারমশাই। মুহুর্মুহু সিগারেট খায় বেঁটে চুল কোঁকড়ানো কালো চেহারার মাস্টারমশাই। সবাই বলে, ম্যাট্রিকে এক থেকে দশের ছাত্র। ধুতি পাঞ্জাবিতে বাংলার মাস্টার-মশাইও। চোখে গোল চশমা এঁটে তেলেভাজাওলা লোকটা কতজনের সঙ্গে যে কথা বলে। দীন পোশাকে মানুষ চাষি বাড়ি ছোকরাদের সঙ্গে কজন ভালো ছেলেও মাস্টারমশাইদের নির্দেশে অনুগত ভঙ্গি। প্রার্থীর বক্তৃতা শুনতে শুনতে মাস্টারমশাইদের প্রতি সমীহ জন্মায়। মমতা মন জুড়ে বসে।

সন্ধ্যা নামে। মঞ্চের সম্মুখে দু-কোণে দুটো ডেলাইট দড়ির টানে খর খর শব্দে উপরে উঠে ঝোলে। আলোর ঢেউ চলকায় মঞ্চটার সামনে। দু-পাশে। তারপর অন্ধকার। অন্ধকার তো দেশ জুড়ে!

স্কুলের রাস্তা ঘুরে কালো ট্যাক্সিটা কোর্ট চত্বরে ঢুকতেই, মঞ্চের পাশ পিছন থেকে চিৎকার, শ্রমিক কৃষক মজদুরের নেতা কমরেড জ্যোতি বসু লাল সেলাম—। তখনই অনেক কণ্ঠের চিৎকার, লাল সেলাম লাল সেলাম—। শীতের রাতে জুবুথবু মানুষগুলো সঙ্গী পেয়ে উষ্ণতা বোধ করে। শীত ছুটে যায়।

সভাপতি উকিল ঘোষবাবু পাশে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দু-তিনখানা চেয়ার তো খালিই রাখা। শ্যামল রঙে চাপা চোয়াল তীক্ষ্ম নাসিকায় উজ্জ্বল দু-চোখ। বেঁটে চেহারায় ধুতির উপর ফুলহাতা হাওয়াই শার্ট। তার উপর বোতাম লাগানো হাত কাটা সোয়েটার। সঙ্গে ধুতি পাঞ্জাবিতে ফরসা নাক মুখে লম্বা চেহারার মানুষ সিদ্ধার্থ রায়। মাটিতেই দাঁড়িয়ে জোড়হস্ত বুকের কাছে ঠেকিয়ে উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে নমস্কার নিবেদন করেন চল্লিশোত্তর জ্যোতি বসু। মাইক্রোফোনের সামনে বলতে থাকেন,…নির্বাচনের সামনে এখন লক্ষ্য বিকল্প সরকার গঠন। সুতরাং টাটা বিড়লা সিংঘানিয়ার স্বার্থবাহী কংগ্রেসকে একটি ভোটও নয়…।

প্রতিটি কথা আগ্রহে শোনে মানুষ। মাথার উপর শীতের রাত। এরপর তো কৌতূহল উপস্থিত মানুষজনের। খাদ্যব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতি তার প্রতিবাদে কংগ্রেসি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে এসেছেন যে মানুষ তাঁর মুখের কথা শুনতে। তাই শুনে যায় সবাই সিদ্ধার্থ রায়ের বাক্য বন্ধন। বক্তৃতার মাঝে হঠাৎ পাশ পকেট থেকে সাদা চিরকুট বের করে বললেন,…বেশি সময় নেই। এরপর আমাদের যেতে হবে—, চিরকুটটায় লেখা 'কাকদ্বীপ'। নামটার উচ্চারণে সংশয়! তাই ভেবে চিন্তে পড়লেন, কাকোদ্বীপ—

কথাটা খট্ করে কানে লাগে ভৈরবের! তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর দু-দশজন চাপা হাসিতে মৃদু গুঞ্জন তোলে।

ভৈরবের মনে খটকা যেন সমর্থন পেল। তাই আপন মনে ভাবতে ভরসা পায়, এই দেশেরই একটা মোটামুটি বড় গঞ্জ জায়গা। কত গান আছে গল্প আছে জায়গাটা নিয়ে। সে জায়গায় যাচ্ছে এত দামি মানুষ—তাঁর কি নামটাও জানা নেই! কখনও শোনেনি! উচ্চারণে যে কত অবহেলা…! যাদের দেশ গাঁ অমন

উচ্চারণে তো তাদের মনে ব্যথা লাগে!

ফলে ভৈরবের মনে মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা মচ করে ভেঙে যায়।

তেতাল্লিশ

একটা গোলাপি কার্ডয়ে জবারানীর নাম। স্বামীর নাম। ঠিকানা সব আছে। এক কোণে গোল ছাপে অশোকস্তম্ভ। সামাজিক ন্যায় সাম্য শান্তি জ্ঞাপক। রবার স্ট্যাম্পে সেটা কালি জাবড়ে বীভৎস। হাঁড়ি মালসার মধ্যে খুঁজে পায়। সেটা অতিযত্নে হাতে রেখে দুটো মোটা সুতোর গামছাও নেয়। পাকা রাস্তা পেরিয়ে মিলিটারি ডাক্তারের ক্লিনিক পাশে রেখে এগোয়। রঙচঙে দোতলা বাড়ি। অনেকগুলো কামরা। এটাই তো হারু চাউলের ভাগনা বাড়ি। জবারানী পাকা দালান কোঠাটার সামনে দাঁড়াতেই যেন নাকে গন্ধ পায়—একসঙ্গে কত ইলিশ মাছ ভাজা হচ্ছে। বারো চোদ্দসের ওজনের পাঁঠাটা সিদ্ধ হচ্ছে। হারু চাউলে ঘোরাঘুরি করছে বড় পুকুরপাড়ে। বসে গালগপ্পো জমিয়েছে সান বাঁধানো ঘাটে। মাথা ছাপিয়ে উঁচু লাঠিটা কাত খেয়ে পাশে। একজন সতর্ক প্রহরীর মতো। গোল কালো মুখ। সামনের দু-একটা দাঁত পড়ে ফাঁকা। হাসলে পান চিবোনো রসে টুকটুকে লাল জিভ দেখা যায়। কদিন আগেও তো মানুষটাকে দেখেছে জবারানী হোটেলের সম্মুখে দিয়ে হেঁটে যেত। উঁচু লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দে রাস্তাটা তো সেদিন কাঁপছিল।

আর একটু এগোতে দেখে কোণের ঘরটায় চাল ও গমের বস্তা টাল দিয়ে সাজানো। ঘরের বাইরে চলতি রাস্তার ধারে মেয়েগুলো বসে। প্রত্যেকের হাতে গোলাপি কার্ড। পর পর বসে কথা বলে। কজন লোক তারাও একপাশে। একজন করে ঢোকে কার্ড হাতে। বাবু লোকটা খাতায় টিক মেরে কাজের ছোকরাটাকে বলে, মেপে দে—

লোহার পাল্লা বাটখারা। ঘিয়ের টিন কেটে মাল মাপার আধার।

জবারানী সামনে মেয়েটার ফরসা গা পিঠ মাথায় বড় বড় চুল দেখে ধন্দে পড়ে। মুখটা বাড়িয়ে তবে দ্বিধা কাটায়—, সত্যিই তো পিয়ারি। একদম নিকট সম্মুখে মেয়েটা। মাঝে মধ্যে তো মহারানী ভোজনালয়ের খদ্দের। সেই সুবাদে বলে, হ্যাঁরে মা—ভালো আছিস?

পিয়ারি ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। ফরসা কপাল মুখে এখনও কত রূপসী। পট করে জবারানীর পায়ে হাত ছুঁয়ে গড় জানায়, হ্যাগো বামুন মা।—কাটিয়ে দিচ্ছি।

লাইনের অগ্রভাগে মাথায় ঘোমটা এঁটে দুজন বউ। রেল রাস্তা পার হয়ে এক ক্রোশ হাঁটলে তাদের গ্রাম। বেলা দুটোর শোয়ের আগে সিনেমা হলের মাইক ফুঁড়ে গান তাদের উঠোন বাস্তু গোয়াল ঘরে বাতাস বয়ে আনতে পারে না। কিন্তু পিয়ারিকে তারা লোকের কথায় মেয়েদের মুখে মুখে কত শুনেছে। অমন ফরসা রূপ গতরে মেয়েটার আঁচল খসে জরি জেল্লার ব্লাউজে চটক নারীত্ব। কথায় ডুবে একবারও আঁচলে মন নেই। বউ দুটো ফিসফিস করে, এই জন্যেই

বলে খানকি—। গা বেচে মন মজায়—। শুধু কি মেয়েমানুষ আছে এখেনে? ওপাশে তো কটা মদ্দমানুষ দেঁড়িয়ে—

এক মেয়ে রিলিফের চাল গম পুটলি বেঁধে পাশ কাটায়। পিয়ারির চোখে পড়তেই মনে ধাক্কা। বলে, নিয়ে আয় তোরে দিদি—কী দিল ইলিফের বাবু?

বউটা পোঁটলা খোলে। আতপ চালে ভেপনো ধরে ডেলা ডেলা। পিয়ারি চালের ডেলায় আঙুলের চাপ দিতেই ভেঙে ঝুরো ঝুরো গুচ্ছের খুদ।

নিজের বিহার দেশে সেই কিশোরী কালে তো আতপ চালের ভাত খেত। এত খুদ দেখে বলে, বাবুরা কোন দেশ থেকে নিয়ে এলে রে বাবা—গমে হাত দিয়ে দেখে, ভাঙা। পোকায় ফোঁপরা শস্য দানা।

এবার একটা বুড়ো ভিতরে যায় কার্ড হাতে। খাতা লেখা রিলিফবাবুকে বলে, চালে এত খুদ বাবু—দুগ্গাপুজো লক্ষীপুজোয় ছেলেপুলেরা কি করে খাবে?

—এই পাচ্ছো নিয়ে যাও। আর পাবে কি না কে জানে—!

বুড়োটা ভ্যাবলা মেরে তাকায়।

রিলিফবাবু জোরে জোরে সকলকে শোনায়, চিন-এ দেশে যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। চিন এগিয়ে আসছে দখল করতে—। এসব চাল আটা গরমেণ্ট দেবে কখন আর যুদ্ধ সামলাবে কখন? শালার কমনিস্ট চিন—, বলে নিজের কোমর পাছায় ব্রিটিশ আমলে পুলিশের রুল বাড়ির ঘায়ের জ্বালা কমায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে পিকেটিং করত তো কোর্টের সামনে।

মেয়েগুলো, পুরুষ—পুরুষের মধ্যে বুড়ো কজন রিলিফবাবুর মুখের বাক্য শুনে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। যুদ্ধ…কথার সঙ্গে খানিক পরিচিত। কমনিস্ট সেটাও বেশ শোনা। পাড়ায় ঘরের দাওয়ায় রাতে দু-একটা বৈঠকে হাজির হয়েছে। কিন্তু চিন…তেমন তো হাতের কাছে…এই মহকুমা শহরে ধারণা করার মতো অনুষঙ্গ পায় না। হিমালয়ের গায়ে কোথায় যে আকসাই চিন, লাদাক 'নেফা'—ম্যাকমোহন লাইন তাদের জানা নেই। অবাক সমীহে পুরুষগুলো…মেয়েগুলো রিলিফবাবুর দিকে তাকায়। ভাবে,…বাবুটা গোটা দেশ তাহলে তন্ন তন্ন করে জানে! দেখেছে কত…!

রিলিফের মানুষগুলো দেশের মাটিতে বসে আছে চাল গমের আশায়। বাবুর খাতার ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী ডাক পাবার অপেক্ষায়। তবুও তারা চেয়ে থাকে দেশবাসী হয়ে রিলিফবাবুর দিকে প্রবল বিস্ময়ে!

এমনই ভয়ানক বিস্ময়ে তো বিপর্যস্ত ব্রিগেডিয়ার দালভি! তিনি ভাবছেন, এখন ফিরব কী করে!

হিমালয়ের একটি গুহায় আত্মগোপন করেছেন। চিনা বাহিনী পাশ দিয়ে অতিক্রম করছে। তারপর পিছু পিছু চলতে লাগলেন নিজের বাহিনীর দলবল নিয়ে। নিয়াম জঙ চু উপত্যকায় পৌঁছে আবার আত্মগোপন করে চলার জন্যে একটি জঙ্গলের মধ্যে নেমে পড়লেন। জঙ্গল পেরিয়ে সম্মুখে একটুকরো সবুজ জমি দেখতে পেলেন ব্রিগেডিয়ার দালভি।…"আমি প্রথমে ছিলাম, পিছনে দলের

আর সাতজন। এই খোলা জায়গায় যেই পা দিয়েছি অমনি দেখলাম আমি একটি চিনা পদাতিকবাহিনীর মধ্যে পড়ে গেছি। ওই বাহিনী ওখানে বিশ্রাম গ্রহণ করছিল। তৎক্ষণাৎ আমি দেখতে পেলাম আমার চতুর্দিকে ডজন খানেক রাইফেল উঁচিয়ে আছে। আমি এখনও নিশ্চিত নই কে বেশি বিস্মিত হয়েছিল! আমি, না চিনারা? আমি হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টি দিলাম। সময়টা ছিল ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের ২২ তারিখের সকাল ৯-টা ২২ মিনিট। আমি তখন চিনা গণমুক্তি ফৌজের হাতে একজন বন্দি। এই সময় আমি ৬৬ ঘণ্টা যাবত অনাহারে ছিলাম। এবং ১০,৫০০ ফুট থেকে ১৮,৫০০ ফুট উঁচুতে একবার উঠেছি তারপর আবার ১০,৫০০ ফুট উচ্চতায় নেমেছি। একটি জলধারার কাছে। আমি ছিলাম ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত দাড়ি গোঁফ কামানোহীন এক চূড়ান্ত হতাশ অবস্থায়।"

১১ অক্টোবর রাতে শ্বাসকষ্ট, গায়ে জ্বর নিয়ে জেনারেল কাউল পালাম বিমান বন্দরে পৌঁছলেন। পৌঁছেই তিনি খবর পেলেন নেহরুর সভাপতিত্বে একটি জরুরি বৈঠক চলছে। তাঁকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে। তাই উপস্থিত হয়ে রণাঙ্গনে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পরে সভাস্থ সকলের সামনে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন, বর্তমান অবস্থায় চিনাদের আক্রমণ করলে আমাদের বিপর্যয় অনিবার্য। সুতরাং ঢোলা পরিত্যাগ করে সমর কৌশলের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত এমন স্থানে আমাদের সরে যাওয়া উচিত যেখান থেকে আরও ভালোভাবে চিনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো যেতে পারে। ঢোলা শীঘ্রই তুষারবৃত হয়ে পড়বে। তখন সেখানে ঘাঁটি বজায় রাখা যাবে না। চিনাদের অগ্রবর্তী সৈন্য সংস্থানের পশ্চাদ্দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত থাকায় তারা উন্নততর সৈন্য বিন্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম। এই সুবিধাটি আমাদের নেই।

"সব শুনে নেহরু মন্তব্য করলেন, আমাদের বিরুদ্ধে যদি এতসব অসুবিধাই থাকে এবং উক্ত রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসাবে আমার মনোভাব যদি এই হয় তাতে সে অবস্থায় চিনাদের আক্রমণ না করে বর্তমান ঘাঁটিগুলি আগলে রাখার প্রস্তাবটিতে তিনিও সায় দিচ্ছেন।"

এর একদিন পর সকালে সিংহলে তিনদিন সফরের উদ্দেশ্যে নেহরু যাত্রা করেন। পালাম বিমান বন্দরে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরেন নেহরুকে।

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন।—"নেফা সীমান্তে সেনাবাহিনীকে কী আদেশ দেওয়া হল?

উত্তর—আমাদের নির্দেশ হল আমাদের ভূভাগ মুক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন—কবে?

উত্তর—আমি তারিখ ঠিক করতে পারি না। এটা সম্পূর্ণ সামরিকবাহিনীর জানার। থাগলা অঞ্চলে শীত পড়ে গেছে এবং চিনারা বেশ শক্তভাবে অবস্থান নিয়েছে কারণ তারা সংখ্যায় বেশি এবং উঁচু স্থানে রয়েছে। তাছাড়াও তাদের সীমান্তে তাদের মূল ঘাঁটি খুবই কাছে।

প্রশ্ন—সরকার কি চিনের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন?

উত্তর—যতদিন পর্যন্ত এই বিশেষ আক্রমণ চলবে, আলোচনার কোনো সম্ভাবনা নেই।”

তেজপুরে চতুর্থ কোরের সদর দপ্তরে ফিরেছেন জেনারেল কাউল। নেহরুর সাংবাদিকদের কাছে এই বিবৃতি তাঁকে ক্ষিপ্ত করে। কাউল তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন,…“১১ অক্টোবর রাতে তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নেহরু আমাকে যে আদেশ দিয়েছিলেন, এই বিবৃতি ছিল ঠিক তার বিপরীত। ১৩ তারিখে নেহরু যে কেন এই পরস্পর বিরোধী বিবৃতি প্রদান করলেন তা একটি দুর্বোধ্য ব্যাপার।…

…চিনারা আমাদের আঘাত হানতই, তখন না হয় পরে। কিন্তু নেহরুর এই উক্তিই তাদের আক্রমণ ত্বরান্বিত করেছিল এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।”

রিলিফবাবু হাঁক দেয়, কই পিয়ারি সিং— ?

জবারানী সংকটে পড়ে। পিয়ারি যে বলে গেল, বামুন মা—আমি নোবো। এক্ষুনি আসছি। কিন্তু কোথায় গেল মাতাল মেয়েটা ?

পাশের বউটা জবারানীকে বলে, তাহলে তুমি যাও—

রিলিফবাবু দেখে বলে, তোমার তো হোটেল আছে। আবার রিলিফ কেন ?

জবারানী আঁকুড় পাকুড় বলে, সে হোটেলে খদ্দের পাতি নেই গো বাবু—

খাতা লিখে বাবু জানায় ছোকরাটাকে, মেপে দে—

মাথার উপর রোদ। বেলা এগারোটায় স্কুলের জন্যে পা বাড়িয়েছে ভৈরব। জবারানীর দু-হাতে দুটো পোঁটলা। ছেলেকে কাছে পেয়ে শুধোয়, হ্যারে—দেশে নাকি যুদ্ধ লেগেছে আবার ?

—হুঁ। বিশে অক্টোবর। আজ দু-তিন দিন হল—। খবরের কাগজে দিচ্ছে কদিন—, বলতে বলতে বইখাতা হাতে পাকা রাস্তায় ভৈরব।

বেলা বাড়ে। স্কুলে ছাত্ররা শিক্ষকের মুখের কথা শোনে। কালো বোর্ডে লেখা চলে। অঙ্ক শেখায় মাস্টারমশাইরা।

ওই মাঝ দুপুরে হেঁটে হেঁটে গাঙ বাঁধের রাস্তায়। পিয়ারি সিং দাঁড়িয়ে। চরের গা ছুঁয়ে কটা ইট ভাটা। এই ইট ভাটার টিকিট সরকার মাথার উপর ছাতা খাটিয়ে বসে। মাথায় দশখানা করে ইট বয় কুলি রেজারা। একটা করে প্লাস্টিকের টিপ গুঁজে দেয় লেবারদের কোঁচড়ে নয় তো পকেটে। ছাতার ছায়ায় যতীন কালা। পঞ্চাশ-বাহান্ন বয়েসী লোকটা একদিন…মাত্র একদিন পিয়ারি সিংয়ের ঘরে রাত কাটাতে গিয়েছিল। সেই থেকে খদ্দেরটাকে খুঁজতে আসে পিয়ারি। মন খারাপ করলে, বুকের ভেতর আনচান আঁচড়ালে—এই ফাঁকা বাঁধে এসে দাঁড়ায়। এরকম সময়ে তো লোকটা ঘরে ভাত খেতে যায়।

পিয়ারির মুখে মদের গন্ধ। রিলিফে লাইন তখনও শেষ হয়নি। পিয়ারি টিকিট সরকার যতিন কালার জন্যে দাঁড়িয়ে। বাবলা গাছটা ছায়া দেয়।

বেলা সাড়ে চারটেয় পুলিশ কোয়ার্টারের মাঠটায় লোক ভর্তি। মাঠের এক কোণে মাইক টাঙানো। টেবিলে কাপ মেডেল। ওপাশে কখানা কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার। চার ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতা মাপের ছেলেদের মধ্যে টেনিস বলের

ফাইন্যাল। এক পক্ষে শেঠঘর পাড়া। আর এক পক্ষে থানা পাড়া। দু-পক্ষে ভীষণ লড়াই। একটা ছোট্ট বল নিয়ে পায়ের কেরামতিতে গোল দিতে বেশ হিমসিম দু-পক্ষই।

চেয়ারে বসে রিলিফবাবু। খাকি পোশাক খুলে সাদা পোশাকে থানার বড়বাবুও বসে। খেলায় ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লোক মাঠ উপচে বড় রাস্তার কানায়। ভৈরবও দাঁড়িয়ে রাস্তায়। হাফ টাইমের পরও কোনো পক্ষে গোল নেই। মাত্র আর দেড় মিনিট। হঠাৎ শেঠ ঘর পাড়ার কালো ছেলেটা কয়লার ইঞ্জিনের মতো ফুঁসে টেনিস বলটা কাটিয়ে গোল দেয়। ছোট্ট মাঠটা গো-ও-ল চিৎকারে কেঁপে ওঠে। হাততালিতে বাতাস ফেটে যায়। সেন্টারে বল বসে। পাশ দিতেই বাঁশি বেজে ওঠে। খেলা শেষ।

রিলিফবাবু কাপ প্রাইজ দেন শেঠ ঘর পাড়াকে। থানা পাড়া মেডেল পায়।

খেলোয়াড় ছেলেগুলো সামনে বসে। সভাপতি রিলিফবাবু মাইক্রোফোন পেয়ে বলেন,…এমন খেলা পাড়ায় যত হয় তত ভালো! এই সময় থেকে শরীর চর্চার সঙ্গে একটা লড়াইয়ের প্রস্তুতি দরকার। দেশব্যাপী প্রস্তুতি। আমাদের প্রতিরক্ষার প্রস্তুতিও দরকার। আমাদের দুর্বলতা দেখে চিন আমাদের মাতৃ-ভূমিকে আক্রমণ করেছে। আমাদের সঙ্গে গোপনে গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। হিমালয়ে রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে—। চিনের ড্রাগন বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলছে। আমাদের দেশকে সতর্ক থাকতে হবে—। কমিউনিস্ট চিন পীক জাতি —তার বন্ধু, গুপ্তচর এখানকার কমিউনিস্টরা।

দর্শকদের অনেকে হাততালি দেয়। চেঁচিয়ে ওঠে, বন্দেমাতরম্।

উৎসাহ পেয়ে রিলিফবাবু বলে, কমিউনিস্টরা চিনকে ডেকে আনছে—পথ বলে দিচ্ছে। কমিউনিস্টরা দেশদ্রোহী—

মাঠের মধ্যে কত উল্লাসী মানুষ। তারমধ্যে ভৈরব কেমন মনমরা! হঠাৎ ভৈরবের মনে হয়, ইতিহাসের রাগী স্যার, ড্রিলের মাস্টারমশাই, বাংলার স্যার কোঁকড়ানো চুলে বেঁটে খাটো মাস্টারমশাই—ওরা সব তাহলে গুপ্তচর… ! দুম করে মনে পড়ে,·· তেলেভাজাওলা লোকটা? সেও… !

চুয়াল্লিশ

রাত আটটাতে হ্যাজাক লাইট দপ্‌দপ্ করে। সদয়কুমার পিন মেরেও হ্যাজাকটার জ্যোতি ফেরাতে পারে না। নামিয়ে পাম্প দেয়। সদয়কুমার বোঝে, তেল কমে গেছে লাইটটায়। আলোর পেট ভরাট তেল জোগানও বেশ খরচের। তবুও খানিক আলো বাড়ে আগের তুলনায়।

মাছওলা প্রমথ ছোট স্লিপ বের করে বলে, দাও ঠাকুরদা—। আজ এক কিলোর দাম ছ-টাকা পাঁচ আনা—বকেয়া বারো। মোট আঠারো টাকা পাঁচ আনা—

স্লিপটা ধরে সদয় উল্টে পাল্টে দেখে। সাদা কাগজে শিশুকালের শতকিয়া, পণ, কড়া গণ্ডায় এখনও তো হিসেব চলছে কিলোগ্রামের সঙ্গে। তারপর সাদা

চিরকুটটা সামনে থাকলেও মন চলে যায় ঝুপসি রান্নাঘরে। উনুনের আগুন ধোঁয়ায় কড়ার নীচটায় তো ঝুলে কালির মোটা পরত। কড়ার খোলে তেল মশলায় গট করা লালচে ঝোলে পিস পিস মাছগুলো ডুবে আছে। সকালে খদ্দেরপাতি ছিল না তেমন। তাই বিক্রি হয়নি। এবেলায় সন্ধে কেটে তো এতখানি রাত গড়ালো। একজনও খদ্দের আসেনি।

সারাদিন ঝাঁকা চাকন আগলে মাছ বেচে এখন সাফসুফ। রঙকরা নিউকাট জুতো কাচা ধুতির উপর নীলচে রঙের হাফহাতা শার্ট। বুক পকেটে ছোট্ট ডায়েরি। কুচো স্লিপে চিপি। বাঁ-হাতে দু-ব্যাটারি টর্চ। গায়ে এখন মাছের গন্ধ একটুও নেই প্রমথর। বলল, কই গো ঠাকুরদা—টাকা দাও, আরও তাগাদায় যেতে হবে—

—এ বেলা তো এখনও বউনি হয় নে রে ভাই, বলে করুণ প্রার্থনায় তাকায় সদয়।

—ও বেলা তো বেচেছো। সেই টাকা থেকে দাও—

প্রমথ এখনও আলগা মনে কথা বলে যায়। সদয় খানিক প্রশ্রয়ের সুযোগ পায়। নিজের কথার সত্যতা প্রমথর চোখে প্রমাণ করার জন্যে অনুরোধ জানায়, চল ভাই রান্নাঘরে কড়া দেখবি চল—বিক্রি হয়নি। ওদিকে কটা নতুন হোটেল খদ্দের দেখলেই যা টানা হেঁচড়া করে—। এদিকে আসতে দেয় কই ?

প্রমথ অসন্তুষ্ট। বলে, কড়া দেখে হাতি হবে। কি দিচ্ছ দাও দিকি—। আমাকেও তো আড়তদার মহাজন মেটাতে হবে— ?

—কাল। কাল সকালে সব দিয়ে আসব—

—সে কি ! বিস্ময় কাটিয়ে প্রমথ শোনায়, একি পয়সা না মিটিয়ে বউ বউ খেলা ? ব্যবসা করতে এসেছ। ব্যবসা করো—। এক নাও এক দাও—। বাজে লোক—

একেবারে সামনাসামনি কড়া কথায় সদয়ের ফরসা মুখ নিচু।

বেঞ্চে বই খাতা নিয়ে ভৈরব। মাছওলা প্রমথ কাকার কথাগুলোও তার বুকে বড্ড লাগে। বাপের দিকে তাকাতে দেখে, কি অসহায় সে মুখ ! সদয়কুমার গালে হাত দিয়ে দূরের দিকে তাকায়। এখন তো আর পাকা রাস্তায় সেই পুরনো আঁধার নেই। বাস যায়। রিকশা সাইকেলের হর্ন বেল বাজে। ইলেকট্রিক পোস্টের গা বেয়ে বাল্বের আলো রাস্তায়। ফলে চোখের দৃষ্টি আঁধারে থিতু হয়ে মন জুড়োবার মতো কিছু পায় না। চোখে বিঁধে যায় মহানন্দার হোটেল গন্ধেশ্বরী। সিমেন্ট করা ঘর মেঝে টেবিল চেয়ারে ইলেকট্রিক আলোর বান উপচে সম্মুখে পাকা রাস্তায় পড়েছে। সেই জেল্লার টানে খদ্দের জনের ওঠা নামার ভিড়। ভিড় তো নতুন হোটেলে। আর আমার ? সেই মাটির দেওয়াল—হ্যাজাক আলোটাই সম্বল। তার তেল জোগানের খরচ তো উঠতে চায় না রাতের বেলায় ! খদ্দেরের সমাগম কম বলে কি খদ্দের কম আসে ? নাকি সব খদ্দেরের পয়সা বেশি হয়ে গেছে বলে ওখানে যায় বেশি দাম দিয়ে··· । শুনি তো ভেতরে দু-তিনটে ছোট ছোট কামরা করেছে। মেয়েছেলে নিয়ে রাত কাটাবার সুবিধে আছে। পুলিশ ধরে নে··· । বড়বাবু মেজবাবু জানে !

—ও ঠাকুরো। ঠাকুরো-ও।

ডাক শুনে পিছনে তাকাতেই কিস্তিওলা পণ্ডিতজীর পাঞ্জাবি ঢাকা ভুঁড়িটায় প্রথম দৃষ্টি। সদয় আস্তে আস্তে তাকায় বুক, বুক পকেটে উড পেনসিল, গলা মুখমণ্ডলের দিকে। ধীরে ধীরে মনে পড়ে, মাত্র তিন মাসের চুক্তিতে দেড়শো টাকা নিয়ে এই চেয়ার টেবিল। তিন মাসের বদলে তো সুদ টেনে দু-বচ্ছর ধরে শোধ। আবার হঠাৎ ডবল ভাড়া সাব্যস্ত হতে বাকি বকেয়া। একসঙ্গে আট মাসের ভাড়া একশো বারো টাকার জন্যে আবার পণ্ডিতজীর খাতায় টিপ ছাপে নিজেকে আর জবারানীকে বন্দক রেখে সুদে টাকা ধার। সেটাকার গোছা নিয়ে অতুলবাবুর ভাড়া শোধ দিতে যাওয়ার সময় মনোহারি দোকান থেকে বলেছিল নিতাই মালি, ঠাকুরদা কোথায় গো ?

—বাবুর ভাড়া মেটাতে।

—কিস্তি করে ?

—উপায় কি ভাই···, বলে দোকান কাটিয়ে তো অতুলবাবুর উদ্দেশে পা ফেলেছিল। নিতাই মালি কি বাবুর দালালি করার জন্য ব্যথিত হয়েছিল সে দিন! নাকি প্রতিবেশী ভাড়াটিয়া হয়েও কোনো ষড়যন্ত্র ছক কাটবার জন্যে অনুমানের ভিতটা কুপিয়ে দেখেছিল। সাত টাকার বদলে হঠাৎ চোদ্দ টাকা ভাড়া চাপান তো একটা বড় ধকল!

—আরে হামাকে কি আগে দেখেন নাই নাকি ? রুপিয়া আউর খাতা ভি আনেন—।

সদয়কুমার দাঁড়িয়ে বলে, পণ্ডিতজী আজ সেল নেই।

মোটাসোটা মানুষ। ঘাড় গর্দানে প্রচুর মাংস। গলা ফুলিয়ে বলে, কেয়া বাত ? আংরেজি কথা—সেল ? আরে ছোড়ো—জলদি রুপিয়া আনো—

নিজের দু-হাত কচলাতে কচলাতে সদয় বলে, পণ্ডিতজী আজ বাজার বড্ড খারাপ। কাল দেবো—

পাহাড়ি ঢালের পরে যে নিম্ন সমতল ভূমি সেখানে মোটা মোটা আল দিয়ে জল আটকাত পণ্ডিতজী। চাষের সময় অরাজি মজুরকে তো ভৈসা বয়েল চাবকানো ছড়িটা উঁচিয়ে আস্ফালন করত পণ্ডিতজী। নয়তো জোর ফলাতে চওড়া কব্জির মোটা মোটা আঙুলের ধাক্কায় ঠেলে দিত পণ্ডিতজী নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সেই উত্তাপে গরম হয়ে সদয়ের পিঠে ঠোক্কর দেয়, আরে অন্দরমে যাও রুপিয়া লিয়ে আস। না হবে তো বহুকে রুপিয়া কামিয়ে আনতে বলো।

কথাটায় যেন অন্য সুর। সদয় ঘুরে দাঁড়ায়।

পণ্ডিতজী গলা চড়ায়, আরে যাও। রুপিয়া মিটাও—

ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচিতে দোকান ছেড়ে বাইরে আসে নিতাই মালি। পিছনে দাঁড়ায় মালিক অতুলবাবু। পণ্ডিতজীর মুখে বৃত্তান্ত শুনে বলে, হ্যাঁ। লোকটা মোটে পয়সা দিতে চায় না। আমার ভাড়াও বাকি ফেলে চার পাঁচ মাস—

ভৈরব হাঁ-করে মানুষগুলোর পরিস্থিতি ব্যাখ্যা শোনে। ক্রমে মাথা নীচে

নামে। দুনিয়ার সম্পন্ন মানুষরা তো এক জোট। তাদের দাসানুদাসও এ দুনিয়া থেকে যে মেলে!

রান্নাঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে জবারানী। সদয় বলে, কিছু আছে তোমার?

—যা ছিল কতদিন ধরে দু-টাকা এক-টাকা তোমাকে তো দিই। গণ্ডা চারেক তামার পয়সা আছে। তাতে হবে?

শেষ কুটো টুকুও নাগাল ছাড়া। ছুটে যায় খিড়কির আগড় দোরে। কাঠের পিঁড়িটা তো ঠেকনো দিয়ে আগড় আটক। পিঁড়েটা খুঁটে নিয়ে ঢাঁই ঢাঁই নিজের কপালে মারে। জবারানী চেঁচায়, ওরে এ লোক মাথা ফাটাচ্ছেরে— ছুটে আয়—

ভৈরব দৌড়ে এসে ধরে, একি গো বাবা—

সদয়কুমার মাটির ঠাকুর ফুল ঘটের চৌকির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে। পিঁড়েটা নিয়ে কপালে ঢাঁই ঢাঁই মারে আর আক্ষেপে অভিযোগ করে, কেন, কেন আমার খন্দের জোটে না··· । পোড়া কপাল পুড়ে যাক—

বহুকষ্টে পিঁড়েটা ছাড়িয়ে নেয় ভৈরব। বাপের কপাল লাল। জবারানী জালার জল এনে চাপড়ায়।

ভৈরব ভাবে···, ঠাকুর দেবতার অনুগ্রহ নিয়ে কত গল্পমালা পুঁথি পাঁচালিতে! দুঃখী বাপের খন্দের জোটানোর ব্রত কথা কি আছে··· !

পঁয়তাল্লিশ

শীতের ভোর। জানুয়ারির কুয়াশায় পাকা রাস্তা, রাস্তার ওপারে কালীমন্দির কিছুই দেখা যায় না। ঘন কুয়াশায় একটু তফাতের দোকানপাট, বড় খিরিশ গাছগুলোকে গ্রাস করে আকাশ নেমে এসেছে। ইসলামিয়া হোটেলের মকবুল কাকা রাস্তা ঘেঁষে দাঁত মাজে গুড়াকু তামাকে···তাকেও দেখতে পায় না ভৈরব। দু-একটা ভোরের বাস হেডলাইট জেবলে রাস্তা পার হয়। মাথার উপর গুঁড়ো গুঁড়ো কুয়াশা। খিরিশ গাছের পাতা বেয়ে কুয়াশা মাঝে মাঝে টপে পাকা রাস্তায়। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার মতো গোল দাগ কাটে। মাটির উপর পড়তেই চকিতে সে ফোঁটা ছাতরে পুজোর বাতাসার ছাঁচ। তখন গুঁড়ো গুঁড়ো কুয়াশায় মাথা ভিজে যায় ভৈরবের। ভিজে যায় মাঠে ঘাটে ধানবাদায় ফলবতী ধানের শিস। শিস বেয়ে চান করে ভাগ চাষি, জোতদার ক্ষুদ্রমালিকেরও ধান খড়।

ভোর সকালের দিকে গড়ায়। ধানের মাঠে মানুষ নামে। কাজের মানুষ পথে পা ফেলে। কুয়াশা আরও থিকথিকে বার্লিঘন। পাকা রাস্তা ছুঁয়ে কালচে আভা। তার মধ্যে ঠক্ ঠক্ শব্দ। কতদিন আগেকার তিনকাড়ির ঘোড়ার খুর বাজছে হঠাৎ! উৎকর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে ভৈরব। সাদা কুয়াশার মধ্যে সাদা কাপড় দু-ফেত্তায় পা ঢেকে লুঙি করে বাঁধা। গায়ে সাদা ফতুয়া। ঠক্ ঠক্ শব্দটা এগিয়ে আসে। ক্রমশ কাছাকাছি। সাদা কাপড় ফতুয়া কালো মানুষ বিশাল চেহারায় ফুটে ওঠে। গোল মুখ। মাথা কেশহীন। হাতের লাঠিটা মাথা ছাপিয়ে অনেক উঁচু। মোজা পায়ে চামড়ার নিউকাট। পরিব্রাজকের ভঙ্গি। লাঠি নির্ভর

নয় মানুষটা। লাঠিটা অস্ত্রের দর্পে ঠুকে ঠুকে হাঁটে। অতুলবাবু চাবি বের করে দিতে, সবে একখানা ঝাপ খুলেছে দোকানের কর্মচারী। অতুলবাবু দাঁড়িয়ে। সাদা ধুতির উপর সাদা গেঞ্জি, গায়ে কাজ করা কাশ্মিরী শাল। ঠক্ ঠক্ আওয়াজটা কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে ছড়িয়ে যায়। ক্রমে আওয়াজমালা কাছাকাছি হয়। আওয়াজের ছন্দটা খুব চেনা লাগে। পাশ ফিরে দাঁড়ায়। কুয়াশা ধসিয়ে আওয়াজ কাছাকাছি। সঙ্গে মানুষটাও। অতুলবাবু বলে, মামা—হারুমামা এত সকালে ?

—পারলে মাঝ রাতেই আসতুম।

—কোথায় যাবেন ?

—দ্বিজেন উকিলের কাছে। এদিক দিয়ে হাকিমের অর্ডারে পুলিশ ফোর্স নোবো। ধান কাটাবোরে—শালার মজুর চাষাগুলো আমার জমির ধান কেটে নেবে বলে শাসায় ?

—তাই !

—শালারা কাকদ্বীপ বুধাখালিতে ঘাঁটি করছে। আমারও এই লাঠি আছে সঙ্গে পুলিশ ফোর্স। কত চিন ইন্দোনেশিয়ায় কমনিস্টদের বংশ আছে দেখব একবার—

—ইন্দোনেশিয়ার মিলিটারি জেনারেল সুহার্তো ইব্রাহিম আজিরা দিচ্ছে তো শেষ করে কমনিস্টদের। ওদের নেতা আইদিত কোথায় পালিয়েছে—। পাঁচ ছ-লাখ তো খতম—

—তোরাও লাগ না ফলতায় তো ওরা ঘাঁটি গেড়েছে, বলতে বলতে হারু চাউলে কাছে ডাকে, শোন। তোরা লাগ, তা নাহলে রাখতে পারবি এত দোকান পাট বিষয় সম্পত্তি ?

পিছন দিক থেকে বাস আসে। হারু মামার কথা ছিঁড়ে যায়। কর্মচারী ছোকরা দোকানের সব ঝাঁপ খুলেছে। থোকা থোকা কুয়াশা দোকানে ঢোকে। কর্মচারী ছোকরা হাতে তামার ঘটিটা নিয়ে ডাকে, বাবু···জল আনতে যাব—

অতুলবাবুর খেয়াল হয়, দোকানে না বসলে ছোকরাটা টাটকা জল আনবে কী করে ? সে জলেই তো ছড়া ঝাঁট দিয়ে গণেশের পটে ধূপ জ্বালাবে। সদ্য সকালে দোকান শুরু। সিদ্ধিদাতা গণেশকে তো নিত্য আরাধনা।

হারু চাউলে লাঠির ঠক্ ঠক্ বাজনা রচনা করে এগোয়। ডাইনে কোর্টের নামকরা উকিল দ্বিজেনবাবুর চেম্বারের পথ ধরে। একটু একটু করে লাঠির বাজনা ক্ষীণ···। হারু চাউলেও কুয়াশায় হারিয়ে যায়।

ভাঁটি ঝাঁটা চালায় মহারানী ভোজনালয়ের সম্মুখে। উড়ো শাল পাতা, ছেঁড়া কাগজ, ঠোঙা কুয়াশায় ভিজে মাটি জাপটে। ঝাঁটার খোঁচায় সেগুলো উসকে যায়।

জর্দার কৌটোয় সারাদিনে রাতে বিক্রিবাটার খুচরো পয়সা, কটা নোট মাত্র। সদয়কুমার পাঁচ পয়সা দশ, বিশ, পঞ্চাশ পয়সার আধুলি ক-খানা গোনে। পাশে দাঁড়িয়ে জবারানী। একেবারে ঘর ন্যাতা জল তোলা পুজারী ব্রাহ্মণের গেরস্থ বউ ক্রমে ক্রমে হোটেলওলার স্ত্রী। ফলে দু-পাঁচ দশ নয়া পয়সা তো

নাড়াচাড়া করছে। সেই খুচরো পয়সাগুলোর মিলিত যোগ ফলে মোট কত টাকা, সে অনুমান তো ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে। সেই অনুশীলন থেকে ভাবে, এতে কি সকালের বাজার হাট হবে···

গোনা শেষ। সদয়কুমার ভারি মুখে জবারানীর দিকে তাকায়। জবারানী দেখে, লোকটার ফরসা মুখে বয়সের ঝুল কালি···মাথার চুল কাঁচা পাকা। আকাশে ভোরের সূর্য পেকে ওঠে। তাপে শুষে যায় কুয়াশা। ফুঁসে ওঠে রোদের ঢেউ রাস্তাঘাটে মন্দির ছাউনিতে। মফস্বল শহরটায় দোকানপাট জমতে থাকে। মালপত্তর সাজায়। খদ্দেরকে দেয়—দাম নেয়। বাণিজ্যের প্রস্তুতি কিংবা শুরু। সদয়কুমার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে আটকে পড়ে। বিনিয়োগ পুঁজিতে যে বড় রকম ঘাটতি। তাকায় জবারানীর দিকে। তার চোখে জবারানীর মুখ দাগ কাটে না। দু-কানে কোনো দুল, পাশা নেই। মূল্যবান আভরণও নেই যা দিয়ে একটা নারী মুখ দামি হয়ে ওঠে। সুতরাং সদয় চোখ নামায়। জবারানীর দুকব্জি দেখে নিরুপায় পুরুষের চোখে। সরু দু-গাছা সোনার চুড়িও নেই! বাড়ির বউ দেহের···মনের···দিন যাপনের বিপন্নতায় তো আশ্রয় হয়ে ওঠে তার ক্ষীণতম সামর্থ্য নিয়ে সাদামাটা সংসারে। সদয় বড্ড দীনতায় এই সকাল কাটায়। চোখের সামনে দেখে রোদের আলো। সেই আলোয় খুঁজতে থাকে একটা পথ। হোটেলের থালা গেলাস কড়া বালতি, ক-খানা চেয়ার টেবিল ছাড়া আর দামি দ্রব্যই বা কি আছে! প্রবল অন্বেষণ সদয়কে তোলপাড় করে। কোনো মানবিক···দৈহিক দ্রব্যও নয় একটা মূল্যবান ধাতব দ্রব্য। হঠাৎ মোটা শিকের হাতলে হ্যাজাক লাইটটা দুলে ওঠে চোখের সামনে। প্রতিটা দোলন মস্তিষ্ক কোষে জাগরণ ঘটায়। সোজা উঠে যায় সদয়কুমার। নারায়ণ শিলার চৌকির পাশে ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাথা থ্যাবড়া পেরেক পোতা। সেই পেরেকে হ্যাজাকটা হাতল গলিয়ে দেওয়ালের ঠেকনোয় জুড়োয়। সদয়কুমার সেটা টেনে আনে। জবারানী থমকে দেখে। সদয়কুমার ডাকে, ও ভৈরব যা তো সুরেশ স্যাকরার দোকানে—

জবারানী বোবা। ভৈরব দাঁড়িয়ে থাকলেও ছটফট করে সারা বুক জুড়ে। খুট করে বলে, কেন?

সদয়কুমার বোঝায়, সুরেশবাবুকে লাইটটা দিয়ে বলবি—বাবা চারটে টাকা চাইল—।

হ্যাজাকটার হাতল ধরে রাস্তা পার হয় ভৈরব। গোল শিকের মধ্যে দোলে পেট্রোম্যাক্সটা। পাঁচ ছ-বছরের প্রথম শৈশবে পাওয়া নিজেদের আলোক আধার। যেন এটা ভাঙা দোকানঘর ভাসিয়ে জ্বলছে। সাঁ সাঁ শব্দে। হাতের চামড়ায় তাপ। জ্বলে যায় পাঁচ আঙুল। শৈশবের প্রথম আলো বন্ধক দিতে।

ওপাশের দোকানদার খবরের কাগজটা পড়ে উল্লাসে চেঁচায়, সুরেশ দা—

সুরেশ স্যাকরা পিতলের নলে 'ফুকো'টায় ফু থামাতে প্রদীপের আগুন আবার নিজের মতো সোজা। —কী বলছেন?

—কচ্ছের রান ছাম্ব সেকটারে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধটা যাই হোক মেটালো সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট।

—এ তো আমাদের রোগ। দেশ ভাগ করে সাহেব, যুদ্ধ মেটায়ও তারা—

দোকানদার হুমড়ি খেয়ে যেন বোঝায়, না সোভিয়েতের কোসিগিন লাল-বাহাদুর আর আয়ুব খানকে ডেকে ডুকে নিয়ে তাসখন্দে চুক্তি করল—

সুরেশবাবুর সামনে আগুন থাকতেও পকেটের দেশালাইয়ে বিড়ি ধরিয়ে বলে, উনিশ-শ ছেষট্টির এ্যাঁ-এ্যাঁ-দশই জানুয়ারি—। আরও কোথায় কখন বাধে? আপনার কড়া বালতি বেচা আমার নলে 'ফুকো' দিয়ে চালাতেই হবে—

—তবু গণ্ডগোল থামলে যদি ব্যবসা বাণিজ্যে স্বস্তি ফেরে।

সুরেশবাবু বিড়িতে দম মেরে হাসি বিনিময় করে। আশ্বাসের হাত দেখিয়ে সুরেশবাবু ইঙ্গিতে ভৈরবকে বলে, থাম বাবা দিচ্ছি।

স্যাকরা আবার কাঠের টুকরোর খোপে সোনার কান পাশায় প্রদীপে জ্বলন্ত আগুনের শিখাটা নলে ফু দিয়ে বাঁকিয়ে নেয়। আগের তাপ বেশি জুড়োতে পারে না গয়নাটার গায়ে। কোন মায়ের কানের জন্যে যে তৈরি হচ্ছে!

সুরেশ ফু বন্ধ করে দ্রব্যটি দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্রদীপের সলতেয় আগুন জ্বলছে। আগুনটা আছে বলেই আলো। দরকার মতো বাঁকিয়ে চুরিয়ে নেয়। পাশের দোকানদার বলে গেল, যুদ্ধ থামল এবার ব্যবসা বাণিজ্যে যদি স্বস্তি আসে। আমার বাবার···আমাদের দোকানের কি স্বস্তি আসবে? নাকি স্বস্তিটা ওই আগুনের আলোর মতো? বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিলে তবে সুযোগ-সুবিধে। আমার বাবার—আমাদের তো অত কিছু কায়দা জানা নেই!

টাকা চারটে পেয়ে ভৈরব বাবার সামনে দাঁড়ায়। বেশ বড় সংকট উত্তীর্ণ কিশোর কিংবা তরুণের মতো।

বাবা হাত বাড়িয়ে নেয় চারটে চকচকে ধাতব টাকা।

মা জবারানী পাশে। বেলা আটটার রোদ্দুর। মায়ের দু-চোখের কোটর জুড়ে আচমকা কুয়াশা। কণা অনুকণায় কুয়াশা জমে ভারি হয় মায়ের চোখের আকাশে। টপ টপ করে ঝরে। বেয়ে যায় গাল গড়িয়ে।

ছেচল্লিশ

চারপাশের দোকানপাট বাল্ব টিউব লাইটে ঝলমলে। মহারানী ভোজনালয়ে টেবিলটায় পিতলের বড় লম্ফ। ওইটুকু আধারে ভরাট কেরোসিন। মোটা পলতে অনেক আগুন নিয়ে জ্বলে।

ইস্কুলে পড়া বন্ধুরা দু-একজন ভৈরবদের হোটেলঘর দেখে। কেমন করুণায় তাকায়। ভৈরব তার ক্লাসে দু-এক বছর উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সেই অযোগ্যতা না কি চারপাশে এমন বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেই গ্রাম্য লম্ফ ব্যবহারে দীনতার জন্যে? ভৈরব বেঞ্চে বসে। স্বল্প আলোয় আপন বীক্ষণে তলিয়ে যায়।

হাতে পিতলের করতাল আর একজনের কাঁধে মৃদঙ্গ। হঠাৎ করতালের ঝম্ ঝম্ শব্দ হোটেলঘরে। মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে মানুষটা দু-হাতের কৌশলে বোল তোলে। সঙ্গে ধুতি আর সাদা ফতুয়া পরা মানুষটি দু-হাত ঊর্ধ্বে তুলে গায়,

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। রাম রাম রাম হরে হরে—। লয়ে—বিলম্বিত লয়ে গায় মানুষ তিনজন।

সাদা ধুতি ফতুয়া পরা মানুষটিকে দেখে ভৈরব চমকে ওঠে!

সদয়কুমারের হাতে তেল মশলার গন্ধ। জবারানীর হাতে ভাতের হাঁড়ি নামানোর ন্যাতা কানি। ঝি ভাঁটি কাপড় সেঁটে বাটনা বাটছিল। সবাই হাজির। সদয়কুমার মনে মনে বলে, পোস্টোমাস্টার মশাই···! চাকরি শেষ হয়ে গেছে? হুঁ। আর তো বেলা দশটায় গুট গুট যেতে দেখিনি। সাদা ধুতি ফতুয়া পোস্ট-মাস্টার ভাগবতের পদ ধরে

"কলি-যুগে সর্ব ধর্ম হরি সংকীর্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ॥
কলি যুগে সংকীর্তনধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হইলা প্রভু সর্ব পরিকরে॥

জোরে মৃদঙ্গ বাজিয়ে শেষ করে পোস্টমাস্টার, হরি বল হরি বল···।

জবারানী বলে, মাস্টারবাবু—পরিণামে এই পথ ভালো গো বাবু ভালো—

পোস্টমাস্টার দু-হাত উপরে তুলে উদাসীন ভঙ্গিতে বলে, কে জানে···

মহকুমা শহরটা থিতিয়ে গেছে। জ্বলন্ত লম্ফটা পলতে পুড়িয়ে শিস কেটেছে ঘণ্টা তিনেক। পলতের গায়ে ভুমো ভুমো ভুষো।

পাঁচ-ছজন লোক। তাদের কাঁধে বাঁক। বাঁক-এ সিলভারের বড় বড় হাঁড়ি। কুঁচো কুঁচো পোনার মীন বেচতে গেছিল দূর লাটে। গাঁয়ে। তাদের মোড়ল বলে, ও ঠাকুরমশাই খাবার হবে?

সদয় এক সঙ্গে এত লোক দেখে ভেতরে খানিক কুঁচকে যায়। সেটা সামাল দিয়ে বলে, নিশ্চয়ই হবে। এক্ষুণি খাবে—?

—না। হাত পা ধুয়ে ঘুরে আসি—তুমি ব্যবস্থা কর না? মাছের সঙ্গে ডাল তরকারি হবে তো?

—কেন হবে নে?

বাঁক, সিলভারের হাঁড়ি কটা দেখিয়ে বলল, আমাদের যন্ত্রপাতি কটা রইল—

মানুষগুলো গামছা কাঁধে লুঙি কাপড়ের ব্যাগ হাতে এগোয়। থানার পুকুরে গা হাত ধুয়ে সাফ হতে যাচ্ছে।

মানুষগুলোকে দেখে জবারানী বলল, পোস্টমাস্টার দেবতা গো। নাম গান গাইল তাই ভগবান খদ্দের পাঠিয়ে দিয়েছে—

মফস্বলের বাজার, ভোগ্যপণ্যের জোগান চাহিদার হাওয়া বাতাসের মাঝেও সদয় কপালে দু-হাত ছুঁয়ে বলে, বাবা নারায়ণ মহাপ্রভুর দয়া—।

রান্নাঘরে ঢুকে সদয় ডাকে, কই গো—কড়ায় এইটুকু ডাল?

—তবে কিনতে পাঠাব?

—দুস থামো দিকি—এত রাতে আবার কিনব কখন আর রাঁধব কখন? বলেই কড়াটা উনুনে চাপায় সদয়কুমার। আগুনের তেজ মরা। তখনই বলে, গোটা কতক কয়লা আনো দিকি—

জবারানী ঘুঁটে কয়লার মাচা বাক্সর কাছে দাঁড়ায়। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

গিয়ে সদয়কে বলে, অল্প অল্প কেনা। কয়লা তো সব ফুরিয়ে গেছে—

—সব্বনাশ! এখনও তো জন তিনেকের ভাত বসাতে হবে—। জ্বালুন কই?

একসঙ্গে এতগুলো খদ্দের অথচ এত রাতে জ্বালানির অভাব। জবা আশ্বাস দেয়, তুমি ডাল চাপাও—আমি জোগাড় করিয়ে।

সদয়কুমার গরম ডালে দু-ডাবু ফেন ঢেলে দেয়। বুট বুট ফোটে। আর এক খাবলা নুন তেজপাতা। তখন জবারানী খিড়কি দরজা খুলে এগোয়। বাঁয়ে তো গরানের খুঁটি দিয়ে চেলা করা গরান কোচা থরে থরে সাজানো। উনুনে দিলেই হুহু জ্বলবে। তিনজন কেন তেরোজনের ভাত ফুটবে। বাবা নারায়ণ মুখ তুলে তো চেয়েছে—, এমন ভেবেই টান দেয় দু-হাতে কখানা চেলা কাঠ ধরে। টাল দিয়ে সাজানো কাঠ। চাপে চাপে টাইট। দু-হাতে সমস্ত শরীর ঢেলে টানে। একটা বেরিয়ে আসে। হাতের চেটোয় সরু চোঁচ ফোটে। যাতনায় সিঁরিয়ে ব্যথা কাটে। একটু হুড়মুড় শব্দ হয়। মরীয়া হয়ে আরও খান চার পাঁচেক চেলা কাঠ বের করে। বাড়তি কয়লা কেনার সংগতি তো হোটেলটা তেমন দিচ্ছে না। সুতরাং জ্বালানি বড্ড জরুরি।

মাত্র তো ছিটে বেড়ার এপার ওপার নিতাই মালির দোকানের। একসঙ্গে খদ্দের এতগুলো—কয়লার অভাব, সব খেয়াল রেখেছে প্রতিবেশী ভাড়াটিয়া। টের পায়। কান খাড়া করে বাকি দৃশ্য নিজেই মিলিয়ে মিলিয়ে তৈরি করে। বড় উনুন। চেলা কাঠগুলো দিতে দাউ দাউ আগুন। ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছে সদয়কুমার। কত রাত তো শুধু তেল পুড়িয়ে হোটেল বন্ধ। আজ ছ-জন! মহানন্দার হোটেল···নতুনটাকে কাটিয়ে তবু তো এসেছে।

—কই ঠাকুর কোথায় গো? অতুলবাবুর দু-চোখ গরম। কড়া গলায় ডাক। লম্ফটার শিখা কেঁপে যায়।

সদয়কুমার আলো-আঁধারি রান্নাঘর থেকে বের হয়। অতুলবাবু চটি খট-মটিয়ে রান্নাঘর মুখো। জবারানী জোরে কাঠগুলো আগুনে ঠেলে দিয়ে জ্বালানির আকার বিকৃত করতে চায়। ততক্ষণে ঢুকে অতুলবাবু কাঠগুলো শনাক্ত করে। সদয়কুমারের মুখের উপর আঙুল নেড়ে নেড়ে বলে, একাঠ তো তোমার কেনা নয়। আমার টাল থেকে চুরি করা—

সদয় চুপ। অতুলবাবু আর এক কদম এগোয়, তোমার গিন্নি—গিন্নি কই?

মাথায় ঘোমটা টেনে লজ্জায় মুখ ঢাকে। নত মস্তকে দাঁড়ায় মা জবারানী। পাশে ভৈরব। অতুলবাবু দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, —নেহাৎ মেয়েছেলে, ছাড় পেলে। অন্য কেউ হলে? নাকে খত খাওয়াতুম—

নিতাই মালি ভেতরে আসে। হরিনামের দোহারকির মতো বলে, নাকে খত কেন গো বড়দা? বৃত্তান্ত শোনানোর পর অতুলবাবু বলে, একে আট-নমাস করে ভাড়া বাকি। তার উপর আমার ঘরে থেকে আমার কাঠ চুরি···? বাকি কথাটা ভাবনায় গুছিয়ে নিয়ে অতুলবাবু বলে, ঘরের মধ্যে চোর পুষেছি তো! কিসের বামুন-বামনি—তোমরা? শুধু ঘণ্টা নেড়ে নারায়ণ সেবা করলেই সৎ ব্রাহ্মণ? ছ্যা!

বাবু মানুষটা যে গভীর গোপন, লুকোনো ক্ষতে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে গেল ! সদয়ের মনে হল, এসব ছেড়ে ফেলে দিয়ে আবার সেই গাঁ গ্রাম যজমানে ফেরা যায় না ! পরক্ষণেই মাথার মধ্যে ঘূর্ণি···, সে ঘর পুকুর তো আর নেই··· । সে গ্রাম শিবমন্দির যজমান বংশরা কি তেমন আছে··· !

চারখানা চেলা কাঠ পুড়ে কখন ছাই । জবারানীর বুকের মধ্যে সেই কাঠ ক-খানার দহন যে চলতে থাকে,···যদি দুটি খানেক কয়লা পড়ে থাকত··· !

সাতচল্লিশ

বৈশাখের রোদ্দুরে পুকুর নালার জল শুকিয়ে মাটিতে নুন ফুটছে। কাঠ ফাটছে খা খা রোদে। পিয়ারি দাঁড়িয়ে। গাঙ পাড়ের ইট ভাটায় কালো চিমনি মুখে গল গল ধোঁয়া। সকালের ইট বওয়া এখন বন্ধ। রেজা কুলি মেয়েরা মাইলো ভুট্টার জাউ, পি. এল.৪৮০-র গমে বাসি রুটি চিবোতে ছুটি পেল।

টিকিট সরকার যতীন কালা ছাতা মাথায় হাঁটে। বাঁধ পেরিয়ে সামনের গ্রামটায় পৌঁছলে তার বাস্তু ভিটে। ভাত রুটি তরকারি ডিশ চাপা আছে। কাছাকাছি আসতেই পিয়ারি ধরে, চল—

পিয়ারির মুখে এখনও বাসি মদের গন্ধ। যতীন কালা বলে, দুস। ভাত খেতে যাচ্ছি—।

—মাইরি বলছি শোল মাছের ঝাল আর ভাত আমিও রেঁধে এলুম। চল আমার ঘরে।

ষাঁড়টার মুখে দুটি আতপ চাল বাতাসা ধরে জবারানী। চেটে পুটে খায় মস্ত প্রাণীটা। মোটা মোটা শিংদুটো নড়ে। জবারানী প্রার্থনা জানায়, হে বাবা শিবশঙ্কর এমন হয়ে গেল কেন দিন কাল ? বাজার হাটে হুহু দাম বাড়ছে। চালের দর আগুন। ব্যবসা পত্তরে এত কষ্ট কেন গো—

মোটা খাকি কাপড়ে কাঁধের ব্যাগটা। গায়ের জামা ফুলপ্যাণ্টও খাকি রঙের। হাতে একগুচ্ছের চিঠি খাম পোস্টকার্ড। পাতলা মতো কাগজটা বের করে বলে, একটা চিঠি আছে। নাওগো ঠাকুরমশাই—

—চিঠি ! অবাক হয় সদয়কুমার। কিয়ৎক্ষণ ভাবে। তাকে চিঠি লেখার মতো কোনো আত্মীয় কুটুম্ব তো নেই ! থাকলেও লিখতে পারে কই···

—কীসের চিঠি গো পিয়নবাবু ? এগিয়ে আসে জবারানী।

—উকিলের নোটিশ। রেস্টারি—সই করে নিতে হবে।

—উকিলের নোটিশ··· ! বেশ বিস্মিত সদয় মুখুজ্জে ! —কীসের ? কী বিত্তান্ত ?

—ঘর ভাড়া বাকি—

মুখ ঘুরে দাঁড়ায় সদয়কুমার। জবারানী এগোয়। কোর্ট কাছারি যে বাঘ ভালুক নয়—সেটা বোঝে জবারানী। নিজের দাদা তো কোর্টের কর্মচারী। তাই জোর দিয়ে বলে, নুটিশ কেন গো ?

—ভাড়া বাকি আর উচ্ছেদ-টুচ্ছেদ হবে বোধহয়···

—উচ্ছেদ…! যেন কু-বাতাস বয়ে গেল জবারানীর চারদিকে। সদয়কুমারের মুখ চোখে ধুলো বালির ঝাপটা।

সদয় বলে, ও নুটিশ ফুটিশ নোবোনি—

পিয়নটা বলে, আজ না নাও কাল আসব। শেষে কোর্টের পেয়াদা আসবে—

—কোট কাছারি না যম, বলতে বলতে ভাবে, একবার খন্দের দেবেন মুহুরি নয় তো এপারের কোর্টে মুহুরিদের কাছে জানলে হত…।

সদয়কুমার আতঙ্কিত। পিয়নটা বলে, ও ঠাকুরমশাই নোটিশ নিলেই কি উচ্ছেদ নাকি? কোর্ট আছে উকিল আছে—বিচার হবে। নাও সই করে এটা নিয়ে নাও।

পিয়নটা মোটা কাগজে ইংরেজি হিন্দিতে ছক কাটা ফর্দ বের করে। কলমটা ধরে বলে, নাও।

সদয়কুমারের বুকের ভিতর তছনছ। হাতের আঙুলে অক্ষর ফুটতে তো অনভ্যাস। বলে, টিপ দোবো।

পিয়নটা কলমের কালি সদয়ের বাঁ হাতে বুড়ো আঙুলে লাগায় আর বলে, একটা ভালো উকিল ধরবে—এসব নোটিশ মামলা কিছু নয়। সরকারি লোকটা যেন আত্মীয় বন্ধুর মতো সাহস জোগাচ্ছে। খানিক বল পেয়ে সদয়কুমার বলে, কোন উকিল দিলে ভালো হয় বল তো?

কাগজে সদয়ের বুড়ো আঙুলের দাগদোগ নিয়ে প্রাপ্তি চিহ্নিত হল। দপ্তরের দায় সারলো। বিচার ব্যবস্থার সহযোগী হল। সামান্য হোটেলওলা সদয়কুমার রাষ্ট্রীয় কাজ কর্মে প্রত্যক্ষত জড়িয়ে পড়ল। জড়িয়ে পড়ল বলেই ক্রমে কোর্ট, হাকিম, পুলিশ মালিক ভূমি ব্যবস্থা লিজ হোল্ডার—এইসব নিত্য দেখা কিংবা খানিক শোনা কথাগুলো তার মাথায় বাজে।

জবারানী গোটা হোটেল ঘরটার টিন ছাউনি তলভূমি চেয়ার বেঞ্চি দেখতে দেখতে ভাবে, এখেন থেকে তুলে দেবে বাবুলোকটা! যাব কোথায়! খাব কি…! হঠাৎ সেই উনিশ-শো বেয়াল্লিশে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হুহু বানের জলের শব্দ কানে লাগে। একটু থেমে সদয়কুমারকে বলে, হ্যাঁগো—দাদাকে খবর দেব?

গৌরব বাস টার্মিনালে ড্রাইভারের সঙ্গে বন্ধু পাতিয়ে তাদের বাড়ি। যখন তখন কলকাতা যায়। গাড়ির যন্ত্রপাতি খুলতে সারাতে মজা পায়। তার তো এক জায়গায় স্থির থাকতে মন চায় না। সেও যদি এমন সময় পাশে থাকত, ভাবে জবারানী। ভৈরবকে দেখতে পেয়ে ডাকে, এই কি নুটিশ বোঝরে। আর আমাদের এখেনে থাকা চলবেনি।

কাগজটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে, দেওয়ানি কার্যবিধি মতে…। বাদী—শ্রীঅতুলচন্দ্র বাগুই বিবাদী—সদয় মুখুজ্জে।

অত্র নোটিশ দ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে বাদী আপনার নাম বরাবর মহামান্য আদালত…, পড়তে পড়তে খানিক বোঝে বাকি তো তার আয়ত্তের বাইরে। কোর্ট কাছারির ভাষা চাল চলন একেবারে ভিন্ন। এদেশের মানুষের জন্যে হলেও বিদেশী কেতায় তৈরি!

নোটিশটা নিয়ে বেরিয়ে যায় ভৈরব। জবারানী আটকায়, যাস কোথায়?

—থাম না আসছি।

জোরে জোরে পা ফেলে ভৈরব। পাকা রাস্তার প্রান্ত ধরে হাঁটে। ইলেকট্রিকের পোস্টগুলো রুপোলি রঙ মেখে খাড়া দাঁড়িয়ে। মানুষকে পাশ কাটিয়ে এগোয়। আজই যেন অনেক মানুষ পথ চলছে। বার বার পাশ দিতে হয় তাকে। পেঁছে যায় জায়গাটায়। ডাইনে কাঠ বাঁধিয়ে মাটির স্তূপে রেলের বাফার। পোড়ো ঘাসের মধ্যে ক'খানা লাইন পেতে বাড়তি ইয়ার্ড। খুঁটি খোঁটায় সিগন্যাল। এপাশ দিয়ে পাকা রাস্তাটা উত্তর চিরে কলকাতা মুখো। বাঁয়ে পাঞ্জাবি হোটেল। সাইন বোর্ডে কোর্ট প্যান্ট টুপি এঁটে আই. এন. এ-র সর্বাধিনায়ক নেতাজী। পাশ দিয়ে সরু গলি। একটু এলোমেলো হলেই ডান দিকে স্টেশনারি দোকানের পাকা দেওয়াল। কনুইয়ে ঘষা লেগেই ছিঁড়ে যাবে।

ভৈরব এঁদো ডোবাটার পাড় ধরে হাঁটে। যেহেতু কয়লা ডিলার রায়বাবুদের জায়গা, সরু পথে পোড়া ঘেঁষ বাতিল কয়লা গুঁড়োয় মাটিটুকু ঢাকা। পায়ের চাপে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দ। ডোবাটার খানিক ছাড় দিয়ে অতুলবাবুর তে-তলা সাদা বাড়ি প্রাসাদের মতো। ছাদে দাঁড়ালে কলকাতা পুব দক্ষিণের মেঘ দেখা যায়। চক্ষুষ্মান বাবুরা আগেই মেঘ দেখে সাবধান হতে পারে। ভৈরব মাথা নিচু করে হাঁটে। নোটিশটা গোপন করে পকেটে ঢুকিয়ে। অতুলবাবু বা তাদের কেউ যদি আন্দাজ পায়—সেটাই আতঙ্ক।

আর বি ঢালাই দিয়ে নিচু ছাদের ছোট ছোট দু-খানা ঘর। সামনে এক চিলতে উঠোন ঘিরে পাঁচিল। ভাঙা চোরা কাঠের পাল্লা দিয়ে নড়বড়ে সদর দরজা। রোদ বাতাস হীনতায় স্যাঁতস্যাঁতে। দরজা ঠেলেই ডাকে, স্যার—

—ভেতরে এস।

বার্নিশ হীন কাঠের পুরনো হাতলওলা একখানা চেয়ারে বসে বই পড়-ছিলেন কোঁকড়ানো চুলে বেঁটে খাটো মাস্টারমশাই। পাশে ছোট্ট টুলে আরও দু-তিনখানা বই। চায়ের খালি কাপ। বললেন, কি খবর তোমার—?

—স্যার···আমাদের তুলে দিচ্ছে—

—তোমাদের হোটেল ঘর? কারা?

তখনও উঠোন থেকে তে-তলা প্রাসাদ দেখা যায়। পাঁচিল ঘিরেও ওটাকে··· ওদের বাড়িকে আটকাতে পারেনি। আটকানো যায় না। কিংবা আটকাতে গেলে আরও শক্ত উঁচু পাঁচিল তো দরকার। তার স্থপতি যে কোথায়! কোন মানুষের মধ্যে···কোন দশকে। কোন শতকে যে! বাড়িটাকে দেখিয়ে ভৈরব বলে, ওদের দোকানঘরগুলোর একটায় তো ভাড়া নিয়ে আমরা আছি—

—বেশ। তুলবে কেন?

—ভাড়া বাকি। আট-ন-মাসের।

মাস্টারমশাই বইটা টুলে রেখে বলে, বড্ড বেশি বাকি পড়ে গেছে। বাবাকে বল কষ্টসৃষ্টে সংগ্রহ করে মালিককে মিটিয়ে দিতে—

—তাছাড়া কোর্টের নোটিশ, বলে কাগজটা এগিয়ে দেয়।

কোঁকড়ানো চুলে বেঁটে খাটো মাস্টারমশাই নোটিশটা নিয়ে পড়েন। পরে যেন কিছুই নয় এমন হালকা ভঙ্গিতে বলেন, সিভিল কোর্টে আমার নাম করে

বোসদাকে ধর। নামমাত্র ফি নিয়ে হাকিমকে বুঝিয়ে বললে মিটে যাবে—

—স্যার, ওরা উচ্ছেদ করতে চায় যে।

—সেটা বাধা দেবে ওই উকিলবাবু।

ভৈরব গুম মেরে থাকে। আর যে কী বলা যায়! হঠাৎ মুখ খুলে বুকের কথা আলগা করে, স্যার—আমরা···আমার বাবা বড্ড একা। কেউ নেই বলে ওই অতুলবাবু বড্ড জ্বালায়। এখন উঠিয়ে দিতে পারলে অনেক টাকা সেলামি নিয়ে বেশি রেটে ভাড়া পাবে। তাই এমন কোর্ট কাছারি—

—উঠিয়ে দিলেই হল? ঠিক আছে আমি আছি—আমরা আছি তোমাদের সঙ্গে। আমাদের আর সবাইয়ের সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিই—

বুকে বল পেয়ে ভৈরব হাঁটে। গুঁড়ো কয়লায় পায়ের পাতা খানিক ফুটে যায়। সরু গলিমুখটার ডান দিকে তো সিংজীর হোটেলের দেওয়াল, বাঁ-দিকে স্টেশনারি দোকানের দেওয়ালে সবে পলেস্তারা। রাস্তায় উঠতেই সাদা ধুতির উপর নীল পপলিন কাপড়ের ফুল হাতা শার্ট বুক পকেটে কাগজের ঢিপি, একটা কলম গোঁজা মানুষ। লম্বাটে মুখে কালো চেহারা। কাছে এসে বলল, ও খোকা—কি খবর দিলে বেঁটে মাস্টারকে? অসিত বসু পাঠিয়েছিল?

লোকটার কথায় অবাক ভৈরব! বলে, কে অসিত বসু? আমি কি জানি—

—বেশ। কী কথা হল? আজ রাতে কোথাও মিটিং আছে?

ভয় পেয়ে যায় ভৈরব। এ লোকটা তো থানায় থাকে। ঘর ভাড়া উচ্ছেদ—সেটাও এ জানে নাকি? ভৈরব একটু ভেবে নিয়ে বলে, আমি স্যারের কাছে লেখা পড়ার ব্যাপারে গেছিলুম।

—খুব ভালো। কী খবর দিতে যাচ্ছো সুপ্রকাশকে? সে কার বাড়িতে? তুমি তো সদয় ঠাকুরের ছেলে?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা যাও, বলে লোকটা ভিড় কাটিয়ে উল্টো দিকের চা দোকানে বসে। ভৈরব একবার পিছনে দেখে খানিক সোজা হাঁটে। ভিড় পেয়ে আবার ওপারে মানুষের মধ্যে মিশে যায়। মানুষের সঙ্গে না থাকলে তো একলা! ভয় করে!

আটচল্লিশ

মায়ের মাথার চুলে পাক ধরেছে। কালো হাতে শিরাগুলো ফুটে দড়ি। গোলাপি রঙের রেশন কার্ডটা ধরে জবারানী বললো, যা পাঁচশো কেরাসিন তেল নিয়ে আয়। কালতো আবার হরতাল—লম্ফটা জ্বালাতে হবে।

মায়ের হাত থেকে বোতলটা ধরতেই কাচের শীতলতায় ভৈরবের সারা শরীর চমকে ওঠে! মনে হল, মাত্র···মাত্র উনিশ দিন আগে কেরোসিন তেল চাইতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মরল·নুরুল নামে ছেলেটা···! এখেনেও তো লাইন পড়েছে। পুলিশ···যদি···! আমিও তো এক সময় ছাত্র ছিলুম—

অতুলবাবুর ভাই রেশন কার্ডে তারিখ দিয়ে স্লিপ কাটে। স্লিপ মিলিয়ে পয়সা নেয় অতুলবাবু। বড্ড গরম তাই কাঠের ক্যাশ বাক্স নিয়ে ফাঁকা হাওয়ায়।

কর্মচারী ছোকরাটা বড় টিন থেকে তেল কাটায়।

বউটা তেল নিয়ে বলে, এই টুকু—সাত দিন চালাব কী করে। দু-ঘরে দুটো কুপি ভরতেই কুলোবেনি—

কথাটায় চোট খায় অতুলবাবু। মুখ বাঁকিয়ে বলে, প্রফুল্ল সেন আছে তাই ঘরে চেরাগ কুপি জ্বালাতে পারছ। ওই দশ পার্টির জ্যোতি বসু সোমনাথ লাহিড়িরা এলে এক শিশিও জোগাতে পারবেনি—

বিধবা বুড়িটা মুখ তোলে, চাবি-ছড়ান শাউড়ির আঁচলে বউরা কি করবে গো বাবু— ?

অতুলবাবুর ভাই ধমকায়, দাদা চুপ মারো তো। ঠিক মতো পয়সা নাও—

লাইনের মাঝ বরাবর ভৈরব।

এখন তো বামপন্থী নেতারা বিবৃতি দিচ্ছেন, "যদি ধর্মঘট দমননীতি অবলম্বন করে বন্ধ করবার চেষ্টা হয় তাহলে সাধারণ ধর্মঘট চলতেই থাকবে।"

১৯৬৬-এর ১০ই মার্চ ক্রমশ এগিয়ে আসে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ৫ মার্চ বললেন, এ ধর্মঘট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বামপন্থীরা তাদের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করছে। ৮ মার্চ তিনি আবার বললেন, "এই ধর্মঘটের সঙ্গে খাদ্য-সমস্যার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই আমি কোনো আলোচনাতে বিরোধী নেতৃত্বের সঙ্গে বসব না।" ৯ মার্চ কংগ্রেস নেতৃত্ব সরকারের খাদ্যনীতির সমর্থনে বললেন, "কায়েমি স্বার্থ ও বিরোধী দলগুলি সাধারণ মানুষের দুর্দশা এবং প্রশাসনিক ত্রুটিবিচ্যুতি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।"

সারা দিনের গরম জুড়োতে সারা রাত লেগে যায়। ভৈরব দেখতে পায় সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে ফরসা লোকটা। মোটা চামড়ার চটি। হাতে জংধরা কালো অ্যাটাচি। তিনজন পুলিশ ঘিরে। তারমধ্যে হাঁটছেন বোস মশাই। পেছনে নীল পপলিন শার্টের লোকটা আজ ঘিয়ে রঙের ফুলহাতা শার্ট পরেছে। লোকটা বড় দারোগা প্রামাণিকবাবুকে ফিস ফিস বলে, স্যার অসিত-বাবুকে ধরলাম। কিন্তু ছোকরা সুপ্রকাশটা ফাঁকি দিল।

কাঠের খোপে ছোট বড় বর্ণ। ছাপাখানা এখন বন্ধ। বেঞ্চ পেতে ভৈরব তাদের সঙ্গে তো বসে। থানার সিঁড়িতে নেমে দাপুটে দারোগা প্রামাণিকবাবু জোরে হাঁক মারে, কারা দোকানের সামনে ? আপনারা দোকান বন্ধ করে ভেতরে চলে যান—

বাক্যটায় পরামর্শ না বধ্যভূমি থেকে শেষ পরোয়ানা। ভৈরব দোকান ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবে, আমার মাস্টারমশাইগুলো !

সারারাত ধরে গরমে হাঁসফাঁস করেছে পৃথিবী। শেষ রাতে খানিক ঠান্ডা। ফলত তন্দ্রাচ্ছন্ন গোটা মফস্বলবাসি। ধুলোবালি পুরিয়ে ভোরের বাতাস মৃদু শীতল। সে বাতাস মাটির আস্তরে বয়ে যায়। বয়ে যায় মানুষের দেহ আস্তরের উপর। শেষ রাত একটু ফ্যাকাশে হতেই ধোঁয়া উড়িয়ে জিপ ছোটে। কালো জালাতি ভ্যানের পেট্রল পোড়ে। কত রাস্তা যে টহল দেয়। মোড়ে মোড়ে পুলিশ। গোর্খা, সি-আর-পি রাইফেলের নল জালে গলিয়ে নতুন জায়গায় দেশ দেখে। দেশটা তো শুধু নিজের প্রদেশে আল বাঁধে আটকে নেই !

বেলা আটটায় রাস্তা-ঘাট ফাঁকা। ভৈরব বাইরে দাঁড়ায়। মনে পড়ে, ছ-সাত বছর আগে তেলেভাজাওলা লোকটার দোকান দেখতে গেছিলুম··· ! সেই ভরসুলভ মলোটভদের দোকান! ভাবনাটা স্মৃতিকে পেঁচিয়ে ধরে। তারমধ্যে তো একটা গোপন যাতনা থাকে! নিজের বে-খেয়ালে পায়ে পায়ে হাঁটে। থানা ভীষণ কর্মব্যস্ত। দশ বিশজন ভিন প্রদেশের পুলিশ একেবারে প্রস্তুত।

মোড়ে পেঁছে অবাক! চারখানা বাতার উপর সে হোগলা কই! মাটির উনুনটা ভাঙাচোরা হয়ে উপড়োনো। বেসনের ফোঁটায় ফোঁটায় কড়ার তেল কালিতে চিটচিটে সে তক্তাপোশ! সব তো তছনছ।

ততক্ষণে উত্তর কলকাতার বারো জায়গায়, কটা জেলার পাঁচটি স্থানে গুলিবর্ষণ। তেরোটা মানুষ শেষ।

হোটেল ঘরে ঢুকতেই মায়ের কান্না। আঁতকে ওঠে ভৈরব। চেঁচায়, কী হল··· !

—আয়। আয় না দেখবি—, মা হাত ধরে টেনে আনে। ভীত পায়ে এগোয় ভৈরব। মায়ের হাতের চাপে টের পায়, মা চায় একটা বিহিত। ভেতরে ঢুকে ভৈরব থমকে যায়!

ছিটে বেড়ার দেওয়ালটার এপারে মহারানী ভোজনালয়ের তলস্ত ভূমি। ওপারে অতুলবাবুর মুদিখানা গো-ডাউন। একটা দয়ের খাঁজ কেটে বেড়াটা। সে বেড়াটা ভেঙেচুরে সোজা করে নিচ্ছে অতুলবাবু। চওড়ায় দু-হাত লম্বায় পনের হাত পরিমাণ ভূমি। ভাড়া অংশের ভূমিতল ছোট হয়ে যায়। বড় হয় অতুলবাবুর গো-ডাউন। ভাড়া বাকি উচ্ছেদ মামলাধীন এঘর, বিচারের রায় বেরুনোর আগেই উৎপাত? লোকজন কাজ করে। অতুলবাবু ধবধবে ধুতি পাছা পাক দিয়ে হাতে খুঁটটা ধরে থাকে।

ভৈরব বলে, মা দেওয়ালে গাঁথা র‍্যাকে আমার বইগুলো?

—ওই যে ওপাশে।

সব এলোমেলো হয়ে পড়ে। বড় বড় শুকনো মাটির চাপড়া ভাঙা কঞ্চি বাখারি সব বইয়ের উপর! ভাঙচুর তছনছ তো শুধু তেলেভাজা দোকানে নয়। এখানেও!

ঊনপঞ্চাশ

পরের বছর ২ মার্চ নতুন মন্ত্রীসভা শপথ নিল। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। উত্তাল জনস্রোতে ভেসে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। উল্লাস কলকাতার বাস ট্রাম অফিস কাছারিতে। সে গল্প এখানেও। মুখস্থ হয়ে যায় ভৈরবের, মুখ্যমন্ত্রী বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জি। উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সি. পি. আই.-এম-এর। ভৈরব পট পট বলে দেয়, হরেকৃষ্ণ কোঙার সোমনাথ লাহিড়ি বিশ্বনাথ মুখার্জি সুশীল ধাড়া জাহাঙ্গীর কবিরের নাম।

তার কথা শুনতে পায় নিতাই মালি। নিতাই মালি হয়ে পেঁছে যায় অতুলবাবুর কানে। কোনোদিন তার কথা হয়নি অজয় মুখার্জি জ্যোতি বসুর সঙ্গে।

চেনেও না জ্যোতি বসু বিশ্বনাথ মুখার্জি ভৈরবকে। তবুও মনে জোর ভৈরবের। অতুলবাবুকে দেখে হঠাৎ বুক দাপানি উবে যায়।

হরিরামকে ডেকে অতুলবাবু বলে, একি হল! কাঁধে চড়ে বসল যে—

—কাঁধ নয়। মাথায়—, বাবুকে আরও সায় দিয়ে বলে হরিরাম মুহুরি।

অতুল মাস্টার চুপি চুপি বলে, ও ছোকরার যাওয়া আসা আছে—

—কার কাছে?

—বেঁটে মাস্টার···, বলল অতুলবাবু আকার ইঙ্গিতে।

মার্চ শেষে দক্ষিণের নোনা সমুদ্রে প্রবল ঢেউ। হাওয়ায় দমক। সে হাওয়া এবঙ্গের দক্ষিণে লাট ঘাট গাঁ গঞ্জ পার হয়ে এখানেও। নোনা ঝাঁঝ ধুলো বালির সঙ্গে গল্প ভেসে আসে। হরিরাম মুহুরি বলে, লাটের গাঙ ধারে চোত বোশেখে বড় বড় নালা কেটে 'রল' তাতে নোনা জল ঢুকিয়ে মেছো ঘেরি—? বর্ষায় আবার সে ঘেরির উঁচু মাটিতে ধান চাষ—। সারা বছর মাছ না হয় ধান—কুল্পীর ঘোষেদের সে ধানঘেরি—

আশঙ্কায় অতুলবাবু বলে, লুঠ?

—শুধু লুঠ? লাল পতোকা গেঁথে দিয়েছে—, বলল হরিরাম।

অতুলবাবু দোকানের পিছনে পাতা তক্তাপোশে চুপচাপ। জানালার কেঠো গরাদ গলে উপাদেয় হাওয়া এই গরমে। নিঃশব্দে গা বুলিয়ে যায়। তখন কাপে চুমকুড়ি মেরে চা খায় হরিরাম। সামনে হাজরার মিষ্টি দোকানের সদ্যভাজা সিঙ্গাড়ায় গরম ভাপ বেরোয়।

অতুলবাবু জানলা গলিয়ে চোখ চালায়। দেখে, নিজের পুকুরটা আর খানিক বাড়াতে পারলে গাঙের গা ছুঁয়ে যেত। সরকারের জায়গাটা পড়ে থাকত না। ইঞ্জিনিয়ার হেডক্লার্ককে দু-চার হাজার টাকা খাওয়ালে ওইটুকু কি আর লিজ পাওয়া যেতনি কটা মাস···বছর আগে?

সিঙ্গাড়ার খানিক সাবাড় করে হরিরাম বলে, বাবু লাটের শাসমলবাবুরা চাষিদের চাবকে দুমড়ে রেখেছিল। বিনা রসিদে সুড় সুড় করে ধানের ভাগ নিয়ে যেত। তারাই গোলা ঘিরে রেখেছে—

—আর শাসমলবাবু! শুধোয় অতুল বাগুই।

—লাট থেকে পালিয়ে দেশের গ্রাম মেদিনীপুরে উঠেছে।

অতুলবাবু শুনে চুপচাপ। জানালার ওপাশে বড় পুকুর। সেই পুকুরের মাটি দিয়ে ভরাট মাঠের মতো সম্পত্তি শহরের এই দোকানঘরগুলোর পিছনে। এখনই বেচলে তো লাখ লাখ টাকা। যত বচ্ছর এগোবে কোটিতে দাঁড়াবে—। এসব ছেড়ে পালাবার মতো তো তার মেদনীপুর নেই! সম্পত্তির ভারও তো এক ধরনের বিপন্নতা আনে। সেই চাপে অতুলবাবু বলে, হরিরাম—

—আজ্ঞে?

—শাসমলবাবুর মেদনীপুরের চাষি-মজুররা যদি বেয়াড়াপানা করে?

—তখন উনি···উড়িষ্যায় চলে যাবে। ওদের এক পুরুষ তো সেখেনে জায়গাজমি নিয়ে বসবাসী।

একটু ক্ষীণ হেসে অতুলবাবু আবার চুপচাপ। সিঙ্গাড়ার গা খসে ক-খানা

টুকরো কাপড়ের উপর। সে কটা খুঁটে খুঁটে খেয়ে হরিরাম শোনায়, কলকাতার আশেপাশে অবস্থা ভালো নয়। কলকারখানার মালিক ম্যানেজারদেরও লেবাররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘেরাও করছে—মজুরি বকেয়া পাওনা গণ্ডার জন্যে—

—হুম। বলে তক্তাপোশ ছেড়ে বেরিয়ে আসে অতুলবাবু। পুকুর গাছ-পালা সবুজে জায়গাটা বড় উদোম। বুকের ভেতরটায় গা-ছুন ছুম রাতের মতো ভয় বাসা বাঁধে। সেটা ঢাইয়ে সরিয়ে দিতে দু-চার পা হেঁটে যায়।

হরিরাম কাছে গিয়ে বলে, বাবু—এত জায়গা ফাঁকা রেখে লাভ নেই। কারা কখন লোভে পড়ে উপদ্রব তৈরি করে—

তাকিয়ে জানতে চায় অতুলবাবু, তাহলে কী?

—গোটা জায়গাটা বেড়া দিন। নটে পালং ছড়ান। তবু পুলিশ কোর্ট কাছারিকে বলতে পারব, সমস্ত জায়গা আমাদের চাষ শাক-সব্জিতে আমাদের—

—তারপর?

—ভাড়াটেরাও আসতে ফিরতে পারবেনি। কলি হয়ে শনি কি শনি হয়ে কলি ঢুকতে পারবেনি।

—ব্যবস্থা করতে পারবে? —আপনি বললেই এক্ষুনি রেডি—

সাত আটজন লোক অতুলবাবুর গরান কোচা চেলা কাঠ নিয়ে বেড়া বাঁধে। সে বেড়া ভৈরবদের খিড়কি ছুঁয়ে যায়। জবারানী সদয়কে বলে, হ্যাঁগো আমরা কী করে পুকুরে যাব। থালা বাসন ধোব কোথায়?

ভৈরব দেখে ছটকে ওঠে। রাগে গরগরিয়ে পা ফেলে পাকা রাস্তায়। সোজা চলে যায় পাঞ্জাবি হোটেলের সরু গলি। ডাকে, স্যার—স্যার আছেন?

ফাঁকা সরু বারান্দায় কাঠের চেয়ারটা। চেয়ারে বই।

বাড়ির লোক বলল, স্যার তো পোলের কাছে।

—ফিরবে এক্ষুনি?

—না না। ওখেনে খুব কাজ চলছে—। কখন ফেরে—

খালের এপার ওপার ছুঁয়ে পোলটা। কলকাতা মুখো বাস-লরি পিঠে বয়ে ওপারে দেয়। কলকাতা থেকে দক্ষিণগামী যানবাহন পিঠ পেতে এপারে আনে। মালের লরি পার হতেই কংক্রিট পোলটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। নীচ দিয়ে জল স্রোত। কতগুলো থানার ধানবাদা বাস্তু ভিটের বর্ষা জল এই খাল টেনে টেনে গাঙে ফেলে যে। ডাইনে মাটিটা দ্বীপের মতো অনেকখানি। বাঁয়ে খাল ডাইনে বদ্ধ জলাধারে মাছ চাষ। ভিতরে কাস্টমসের পুরনো অফিস বিল্ডিং। আম জাম তেঁতুল গাছের ঝাড়। ক'খানা খেলার মাঠ যে ঢুকে যেতে পারে। সেই খাল পাড়ে কত মানুষ। বউ বাচ্চা-কাচ্চা কিশোরী যুবতী বুড়ি পুরুষ যুবক। বাঁশ কাঠে কাটারির ঠক ঠক শব্দ। শাবল কোদালে মানুষের হুমহাম শ্বাস প্রশ্বাস। বাঁশ বাখারির দড়ি বাঁধতে শাঁখা চুড়ি, এয়োতি নোয়ার ঝন্ ঝন্ বাজনা। আকুল আগ্রহে মাটির উপর বাঁশ কাঠের মাচা, ফ্রেমে চট চ্যাটাই, ছেঁড়া কাপড় ঘিরে গৃহ রচনা। বসবাস বোনা।

ছোকরা কর্মী, যুবক সমর্থক, মধ্যবয়েসি পৃষ্ঠপোষক মানুষজন প্রবেশ

পথ ঘিরে। লাল পতাকাটা খুঁটির ডগায়। তার সামনে প্রবল বিশ্বাসে নিজেদের গৃহের ভিত গড়ে। নিজেদের পুকুরঘাট বাঁশ নারকেল দু-চার খানা যা ছিল সব তো ওপার বঙ্গে। র‍্যাডক্লিফের ধারালো কাঁচিতে কেটে গেছে। এখন সেটাতে কাঁটাতার।

মোটা মোটা বাঁশের খুঁটি, পুরনো শাল বল্লা গরান খোঁটা গায়ে গায়ে দু-তিন প্রস্ত পুঁতে যায় কজন ছোকরা, যুবক। একেবারে দু-পাশের মাটি আগলে জলের কিনারে। মাথা ডিঙিয়ে উঁচু খুঁটিগুলোর গায়ে ঘন করে কাঁটাতার। নিজেদের লোক ছাড়া অন্যলোকের প্রবেশ রুদ্ধ। রুদ্ধ তো পুলিশ। অন্যপক্ষের গুণ্ডা দলবলও।

কাঁটা তারের ওপারে উৎসব। বসবাসের। গ্রাম নির্মাণের। ইতিহাসের মাস্টারমশাইকে দেখতে পেয়ে বলে, আমাদের স্যার কোথায় বলতে পারেন?

—কোন স্যার? —যে আমাদের ইংরিজি পড়াত।

—কেন? তিনি ভিতরে মিটিং করছে।

ভৈরব চুপসে যায়। ইতিহাসের মাস্টারমশাই ছেলেটার কালি মুখ দেখে বলে, কী হয়েছে রে?

—আমাদের দোকানঘরে বেড়া দিচ্ছে মালিকটা। আমরা বেরুতে পারবোনি—

—অ। সেই অতুলবাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মানুষটা হঠাৎ কাছে ডেকে বলে, এই তুই তো বেশ মদ্দ হয়েছিস। গিয়ে ভেঙে দেনা—

—একলা পারি স্যার…

—থাম। ভেতরে দেখা হলে তোর স্যারকে গিয়ে বলছি—

সাদা ধুতি পাঞ্জাবিতে বুড়ো লোকটা পিছনে হাত বেঁধে হাঁটে। পুরনো চটি পাকা রাস্তায় ঘষে যায়। পাশের লোককে বলে, আমাগো এই কলোনির নাম কী হইব?

কানে যেতেই ভৈরব বুকে ধাক্কা খায়! বকুলমামার মুখে শুনেছিল 'কলোনি'। নিজের চোখের সামনে কলোনি গড়া দেখে। যুদ্ধের ক্ষিপ্রতা! দুর্গের মতো আরক্ষা।

মাথায় ভগ্ন বাখারি কটা আধলা খুঁটি বিছানা কাঁথা, বস্তায় ঘটি বাটি নিয়ে মতি বাঙাল। চণ্ডী ডাক্তারের টিন ঘেরা চেম্বারের পাশে চা দোকান থেকে তারা উঠে আসে। ছেলেমেয়েগুলো খুঁটে খেয়ে মাথায় বেড়েছে। তাদের সকলের মাথায় দুটো চারটে দ্রব্য। বুড়ো মতি বাঙাল সঙ্গে বুড়ি। জোরে জোরে বলে আর হাঁটে, আমাগো একটকু মাটি দিবেন গো—

মৃত্যুর জন্যে মাটি লাগে। মাটি তো জরুরি বেঁচে থাকার জন্যেও।

কাঁটা তারের ব্যূহ গলে তারা ভিতরে যায়। ভৈরব চেনা মুখগুলোর এমন প্রবেশ দেখে। চারপাশে তাকায়, জায়গাটার দু-দিকে জল। গাছপালায় কতখানি লম্বা। এখানে ভাড়া বাকি মামলা নেই…। অতুলবাবুর দাপট নেই।

আচমকা ভৈরবের বুকে মোচড় কেটে আপসোস,…আমাদেরও তো একটা গ্রাম ছিল…! সে গ্রামটা যদি ও বঙ্গে…ওপার বাংলায় হত…।